মানবসেবা ও সূফীবাদে শাহ্‌সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর ভূমিকা

(The Role of Shah Sufi Maulana Muhammad Abdul Jabbar (R.) in Humanitarian Service and Sufism)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান (খণ্ডকালীন)

রেজিস্ট্রেশন নং ৩০/২০১৭-১৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

নানান প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যাদের অসীম উৎসাহ আর অনাবিল দু'আর বরকতে এ পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছি সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন পিতা মওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান ও মমতাময়ী মা মোছাম্মৎ ছালেহা বেগম (উম্মে ছালেহা) এবং আমার সম্মানিত শিক্ষকগণের প্রতি।

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, **'মানবসেবা ও সূফীবাদে শাহ্‌সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর ভূমিকা'** (The Role of Shah Sufi Maulana Muhammad Abdul Jabbar (R.) in Humanitarian Service and Sufism) শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণাকর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোনো গবেষক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোনো অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

তারিখ, ঢাকা
৩০ মে, ২০২২

(মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান)
পিএইচ.ডি. গবেষক (খণ্ডকালীন)
রেজি. নং ৩০/২০১৭-২০১৮
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬২৯১, ৬৩০৬
ফ্যাক্স : ৮৮-২-৯৬৬৭২২২
ওয়েব : http://islamicstudiesdu.ac.bd/

Dr. Md. Akhteruzzaman
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 9661920-73/6291,6306
Fax : 88-2-9667222
Web : http://islamicstudiesdu.ac.bd/

সূত্র :

তারিখ : ৩০ মে, ২০২২

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **'মানবসেবা ও সূফীবাদে শাহ্সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর ভূমিকা'** (The Role of Shah Sufi Maulana Muhammad Abdul Jabbar (R.) in Humanitarian Service and Sufism) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে লিখিত ও সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম; কোনো যুগ্মকর্ম নয়। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমার জানামতে, ইতিপূর্বে কোথাও কোনো ভাষাতেই এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার; যাঁর অপার কৃপায় ও রহমতে আমার পক্ষে এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তিদূত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি; যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন মানবজাতির পথপ্রদর্শক ও মহান শিক্ষক হিসেবে।

আমার এ গবেষণাকর্ম বহু জ্ঞানী-গুণীর মূল্যবান পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতায় পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথমে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামানের প্রতি; যাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও জ্ঞানগর্ভ দিক-নির্দেশনায় আমি গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। শত ব্যস্ততার মাঝেও আমার গবেষণার কাজে সময় প্রদানে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ এ অভিসন্দর্ভ রচনার কাজ সহজতর করেছে।

এরপর শ্রদ্ধাভরে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি, যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সুপরামর্শে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি; বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, প্রফেসর ড. শেখ মোঃ ইউসুফ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ ছিদ্দিকী, প্রফেসর ড. আহমদ আলী, প্রফেসর ড. এনামুল হক এবং আরবি বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শাযাআত উল্লাহ্ ফারুকী প্রমুখ।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বায়তুশ শরফের পীর এবং 'আনজুমানে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ'-এর সভাপতি বিশিষ্ট গবেষক ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভীর প্রতি; যিনি গবেষণা নির্দেশক ও তত্ত্বাবধায়কের সাথে আমাকে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন। গবেষণাকর্ম সম্পাদনে আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন, সবসময় খোঁজখবর নিয়েছেন; সর্বোপরি, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। কাজটির প্রতি তাঁর আগ্রহ-উদ্দীপনা ও নিখুঁত ভালোবাসা যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা'র সিনিয়র শিক্ষক, মাসিক 'দ্বীন দুনিয়া' ও 'শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া'র সম্পাদক মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, সহকারী অধ্যাপক (আরবি) মওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, 'ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-এর শরি'আহ্ পলিসি ও প্লানিং ডিপার্টমেন্টের প্রধান ড. সালেহ মোঃ আঃ মতীন (FAVP), 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে'র ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শফিউর রহমান, বিশিষ্ট কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক অধ্যাপক শাব্বির আহমদ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রিসার্চ এন্ড রেফারেন্স অফিসার (সিনিয়র সহকারী জজ) ছোটো ভাই মুহাম্মদ আশেকুর রহমান, 'কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র সহকারী অধ্যাপক রায়হান আজাদ, বিশিষ্ট লেখিকা জাকিয়া ছুফিয়ান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আমার প্রিয় ছাত্র মুহাম্মদ রবিউল হোসেন ও মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং হাতিয়ার মুহাম্মদ শাহজাহানের প্রতি, যারা অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে অভিসন্দর্ভের প্রুফ দেখে ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

আরও কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি ‘দারুল উলুম কামিল (অনার্স, মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা’র অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মুহসিন ভূইয়া, আরবি প্রভাষক মওলানা অলি আহমদ, মওলানা খালেদ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, মওলানা মোহাম্মদ মুনির উদ্দিন, ‘বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা’র অধ্যক্ষ, আমার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ ড. মওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমানের প্রতি; যাদের অকৃত্রিম সহযোগিতা ও উৎসাহ আমার গবেষণাকর্ম অনেক এগিয়ে দিয়েছে।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ‘বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশে’র সেক্রেটারি আলহাজ ইদ্রিস মিয়া, ‘কক্সবাজার বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে’র মহাপরিচালক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক আলহাজ এম এম সিরাজুল ইসলাম, ‘কক্সবাজার বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতালে’র স্টোর ম্যানেজার আবু সুফিয়ান, ‘বায়তুশ শরফ কামিল মাদ্‌রাসা’র অফিস সেক্রেটারি জনাব মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিনসহ যারা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি। নানাবিধ অন্তরায় ও প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য যে সব বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি অনুপ্রেরণা ও সাহস জুগিয়েছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এছাড়াও আমি যাদের কাছে গিয়েছি, মোবাইল ফোনে আলাপ করেছি, তারা সকলেই আমাকে তথ্য সরবরাহে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের কাছেও ঋণী।

এতদ্‌ব্যতীত এ অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি যে সব প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা নিয়েছি, সেগুলোর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা লাইব্রেরি, বায়তুশ শরফ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি, শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। অনেক দুষ্প্রাপ্য দলিল ও গ্রন্থ, দুর্লভ কিতাব, সাময়িকী ও পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য আহরণে উদারভাবে সুযোগ দানের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষের কাছে আমার ঋণ অকপটে স্বীকার করছি। এছাড়া আরও যারা ধৈর্য ও ঔদার্যের সাথে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের এহসান সর্বদা স্বীকার্য। তাদের জন্য বলি ‘জাযাহুমুল্লাহ্’।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ মওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান ও আমার প্রাণাধিক শ্রদ্ধেয় মাতা আলহাজ মোছাম্মৎ ছালেহা বেগম (উম্মে ছালেহা); যারা সর্বদা আমার কাজের অগ্রগতির ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেন এবং যাদের স্নেহধন্য বিশেষ দু‘আর বরকতে আমি অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি–মহান আল্লাহ্‌র নিকট তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

ধন্যবাদ জানাই প্রিয় সহধর্মিণী তাওহীদা ইয়াসমীন নূরকে; যার প্রতিনিয়ত উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা আমার গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করেছে। গবেষণাকর্মের ক্লান্তি ও একঘেয়েমিতার মাঝে আমার একমাত্র সন্তান মুহাম্মদ মিশকাতুর রহমান তার হাসি-দুষ্টুমি আমাকে প্রাণচাঞ্চল্য দান করেছে। আল্লাহ্ যেন তাকে দীন, দেশ ও জাতির খাদেম হওয়ার তাওফিক দান করেন। মহান আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য, সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। পরিশেষে, মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের সহায় হন। আমিন!

মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

গবেষক

প্রতিবর্ণায়ন (الحروف الهجائية العربية)

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
وُ	উ	ـَـ	া	ض	দ/জ্ব	اَ	অ
◌ُوو	ঊ	ـِـ	ি	ط	ত	ب	ব
وِيِ◌	বি/ভী	ـُـ	ু	ظ	য	ت	ত
ىَ	ইয়া	اَــ	া	ع	‘	ث	স
◌ِ◌ِ◌ِ◌ِيِ	◌ِ য়ি	ـِـ ي	ী	غ	গ	ج	জ
بِيِ◌ِ	বি	ـُـ وُ	ূ	ف	ফ	ح	হ
ىُ	উ	اَ	আ	ق	ক্ব/ক	خ	খ
يُو	ইউ	أ	আ	ل	ল	د	দ
عَ	‘(উলটোকমা)	اِ	ই	م	ম	ذ	য
عَا	‘আ/‘য়া	اِي	য়ি	ن	ন	ر	র
عِ	ই	اُ	উ	و	ও	ز	য
عِي	ঈ	أُو	ঊ	ه	হ	س	স
عُ	উ/য়ু	وَ/وَا	ওয়া	ء	’(উর্ধ্বকমা)	ش	শ
عُو	ঊ	وِ	বি	ي	য়	ص	স

দ্রষ্টব্য : ء আলিফের মতো; তবে সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

যেমন : مُؤْمِن (মু’মিন), مُؤْتَمَن (মু’তামান)

ع সাকিন হলে (‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

যেমন : رُعْب (রু‘ব), جَامِع (জামি‘) ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় বহুলপ্রচলিত বিদেশি শব্দের বানানসমূহ বিভিন্ন স্থানে অভিন্ন রাখা হয়েছে। যেমন : পীর, আলেম, ওযু, নামায, দীন প্রভৃতি।

শব্দসংক্ষেপ

কুর'আন	: প্রথম সংখ্যা সূরা, দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াত (১ : ১০)
অনু.	: অনূদিত/অনুবাদিত
অদ্যাবধি/বর্তমান	: ২০২২
আ.	: 'আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হউক)
ই. ফা. বা.	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
খ.	: খণ্ড
খ্রি.	: খ্রিষ্টাব্দ
জ.	: জন্ম
ড.	: ডক্টর
ডা.	: ডাক্তার
তা. বি.	: তারিখবিহীন
দ্র.	: দ্রষ্টব্য
এম.ফিল. (M.phil.)	: Master of Philosophy
পিএইচ.ডি. (Ph.D.)	: Doctor of Philosophy
পৃ.	: পৃষ্ঠা
পূর্বোক্ত	: পূর্বের উক্তি
মৃ.	: মৃত্যু
মও.	: মওলানা
রহ.	: রহমতুল্লাহ 'আলাইহি (তাঁর ওপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক)
রা.	: রাদি আল্লাহু 'আনহু/ 'আনহা (আল্লাহ্ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট থাকুক)
সম্পা.	: সম্পাদিত
সং.	: সংস্করণ
সা.	: সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
হি.	: হিজরি
P.	: Page
PP.	: Pages
Vol	: Volume
Ltd	: Limited

উপর্যুক্ত শব্দসংকেতগুলো অভিসন্দর্ভটিতে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

সূচিপত্র

❖ উৎসর্গ	i
❖ ঘোষণাপত্র	ii
❖ প্রত্যয়নপত্র	iii
❖ কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iv
❖ প্রতিবর্ণায়ন	vi
❖ শব্দসংক্ষেপ	vii
প্রথম অধ্যায় **গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা**	
❖ গবেষণা প্রস্তাবনা	১-২
❖ গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব	২-৪
❖ গবেষণার উদ্দেশ্য	৪-৫
❖ গবেষণার পদ্ধতি	৫-৭
❖ গবেষণার পরিধি	৭-৭
❖ গবেষণার উৎস	৮-৮
❖ গবেষণার সময়ব্যাপ্তি	৮-৯
❖ গবেষণাকর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা	৯-১০
❖ প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা	১০-১৩
❖ অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা	১৩-১৫
দ্বিতীয় অধ্যায় **শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সমকালীন অবস্থা**	
প্রথম পরিচ্ছেদ : সামাজিক অবস্থা	১৭-২৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	২৬-৩৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক অবস্থা	৩৮-৪৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : রাজনৈতিক অবস্থা	৪৮-৬৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় অবস্থা	৬৪-৭১

তৃতীয় অধ্যায় শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবনবৃত্তান্ত	
প্রথম পরিচ্ছেদ : জন্ম ও বংশপরিচয়	৭৩-৭৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষাজীবন	৭৯-৯৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কর্মজীবন	৯৭-১১৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক মাধুর্য	১১৯-১৪১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিকতা	১৪২-১৫৩
চতুর্থ অধ্যায় **শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অবদান**	
প্রথম পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ও নৈতিকতা প্রসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন	১৫৫-১৭৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : গ্রন্থরচনা ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ	১৮০-১৯১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : জ্ঞান-গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা ও যোগ্য ব্যক্তি তৈরি	১৯২-২১৫
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র ও ধর্মীয় মাহফিল প্রতিষ্ঠা	২১৬-২২৬
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুসলিমগণের ঐক্যের প্রয়াস ও নীতিভিত্তিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ	২২৭-২৪১
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শিরক-বিদ‘আতমুক্ত সমাজ গঠন ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা	২৪২-২৪৭
পঞ্চম অধ্যায় **মানবসেবায় শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অবদান**	
প্রথম পরিচ্ছেদ : মানবসেবার পরিচয়	২৪৯-২৫১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে মানবসেবার গুরুত্ব	২৫২-২৫৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন	২৫৮-২৭৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আর্তমানবতার সেবা	২৮০-২৮৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইসলামি মিশনারি ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রম	২৮৮-২৯৫
ষষ্ঠ অধ্যায় **সুফিবাদের বিকাশে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ভূমিকা**	
প্রথম পরিচ্ছেদ : সুফিবাদের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	২৯৭-৩০৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুফিবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৩০৯-৩১৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কুর’আন-সুন্নাহ্ ও মনীষীদের দৃষ্টিতে সুফিবাদ	৩১৪-৩১৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ সুফি তরিকাহ্সমূহ	৩২০-৩৩৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সুফিবাদ বিকাশে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)	৩৩৪-৩৪৫
উপসংহার :	৩৪৬-৩৪৯
গ্রন্থপঞ্জি :	৩৫০-৩৬৯
পরিশিষ্ট :	৩৭০-৩৭৭

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- গবেষণা প্রস্তাবনা
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব
- গবেষণার উদ্দেশ্য
- গবেষণার পদ্ধতি
- গবেষণার পরিধি
- গবেষণার উৎস
- গবেষণার সময়ব্যাপ্তি
- গবেষণাকর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা
- প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা
- অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা
- উপসংহার

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal)

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন এবং সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সত্যপন্থি 'আলিম-'উলামা ও পীর-আউলিয়ার ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তারা নবিগণের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে যুগ-যুগ ধরে মানবাত্মার পরিশুদ্ধি এবং আর্ত-মানবতার সেবায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করে আসছেন। তাদের সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ অর্থাৎ 'আলিমগণই নবিগণের উত্তরাধিকারী।'[১] কেননা, তারা নবিগণের নবুয়তি 'ইলমের উত্তরাধিকারী। অনুরূপভাবে, তারা তাদের চিন্তা-চেতনারও উত্তরাধিকারী। তারা কুর'আন-হাদিসের সঠিক জ্ঞান মানুষের মধ্যে প্রচার করেন এবং দীনকে সর্বপ্রকার বিকৃতি থেকে রক্ষা করেন।

বস্তুতপক্ষে, বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার-প্রসারে পীর-আউলিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তারাই সর্বপ্রথম ইসলামের সুমহান বাণী নিয়ে বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেন; মানুষকে দীন, ঈমান ও 'আমল শিক্ষা দিয়েছেন। তারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে বহু মসজিদ ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। মসজিদ-মাদ্‌রাসাকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও তারা গড়ে তোলেন। সেখানে সাধারণ মানুষকে নামায-কালামসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

তাছাড়া তারা সমাজে বিরাজমান শিরক-বিদ্'আত ও কুফরের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) হিসেবে আবির্ভূত হন শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)। তিনি বহুমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সমাজ ও দেশে শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের সময় অসহায়-দুঃস্থ-এতিম শিশুদের আশ্রয়স্থল হিসেবে একাধিক এতিমখানাও প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার নিমিত্তে একাধিক হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। নৈতিকতার উন্নয়নে বহু খানকা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমাজে বিদ্যমান শিরক-বিদ্'আতের বিরুদ্ধেও আপসহীন ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য সাধন ও তাদের কল্যাণে আজীবন প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। অধিকন্তু, বাংলাদেশে ইসলামি অর্থব্যবস্থার রূপরেখা পেশ ও বাস্তবায়নেও তিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা।

এককথায়, তিনি ছিলেন সমকালের স্মরণীয়-বরণীয় ইসলামি ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির সেবায় আত্মনিবেদিত এ মনীষীর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত অধ্যয়ন ও গবেষণার দাবি রাখে; যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে নিকট অতীতে ঘটে যাওয়া

---

১. আবু দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ'আশ, *আস-সুনান* (বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি.), বাবুন আল-হাছ্ছু 'আলা তালাবিল 'ইলমি, হাদিস নং ৩১৫৭, পৃ. ২১১; আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান* (বৈরুত : দারু এহইয়াইত তুরাস আল-আরাবি, তা. বি.), বাবুন মা জাআ ফি ফদলিল ফিকহি 'আলা 'ইবাদাতি, হাদিস নং ২৬০৬, পৃ. ১১৩

পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্পর্কে অবগত হতে পারে। তাছাড়া সত্যনিষ্ঠ ‘আলিম-‘উলামা ও পীর-আউলিয়ার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড মসজিদ কিংবা খানকাকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা সমাজ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করতে পারে; সে সম্পর্কেও জাতি অবগত হতে পারে।

উল্লেখ্য যে, ১লা মে, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে’ শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর স্মরণে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তাগণ তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর পিএইচ.ডি. গবেষণা পরিচালনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এরই প্রেক্ষিতে তাঁর জীবন ও কীর্তি নিয়ে গবেষণার প্রয়াস চালানো হয়েছে। যদিও তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়নি; কিন্তু সেই ছোটোবেলা থেকেই তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর মুরিদ[২], আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ মওলানা মাহমুদুর রহমানের শেষরাতে বায়তুশ শরফ সিলসিলার যিকিরের শব্দাবলি আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

অধিকন্তু, ‘বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা’য় কামিল (হাদিস) অধ্যয়ন ও অধ্যয়ন পরবর্তী শিক্ষকতা জীবনে তাঁর রেখে যাওয়া বহুমুখী কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে। ফলে ছোটোবেলা থেকেই মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর প্রতি আমার মনে ভক্তি-শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। ফলে অদেখা মানুষটিও দেখা জগতের চেনা মানুষদের চেয়েও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে হৃদয়-গভীরে। এ যেন মরমি কবি আবদুর রহমান জামী (১৪১৪–১৪৯২ খ্রি.) এর এই বস্তুনিষ্ঠ উক্তির প্রতিধ্বনি :

نہ تنہا عشق از دیدار خیزد - بسا کیں دولت از گفتار خیزد

> অর্থাৎ ‘প্রত্যক্ষ দর্শনেই শুধু প্রেম উদ্‌বেলিত হয় না; অনেক সময় বলাবলি ও স্তুতি শ্রবণেও এ সম্পদ অর্জিত হয়।’[৩]

আর এ কারণেই প্রাসঙ্গিকভাবে ‘মানবসেবা ও সূফীবাদে শাহ্‌সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ভূমিকা’ শিরোনামের ওপর পিএইচ.ডি. গবেষণার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and Importance of the Research)

ইসলাম[৪] আল্লাহ্ তা‘আলার মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ অর্থাৎ ‘নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন।’[৫] এ দীন ব্যবস্থার

---

২. মুরিদ শব্দটি ইরাদত শব্দ থেকে উৎপত্তি। ইরাদা অর্থ সংকল্পকারী বা ভক্তি পোষণকারী, কাঙ্ক্ষিত বিষয়কে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রণালি অবলম্বন করা এবং উদ্দিষ্ট স্থানের প্রতি ধাবমান হওয়া। দ্র. মওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ২০১৭), পৃ. ৩৫৪; পরিভাষায়, সুফি সাধকদের কোনো সিলসিলায় কিংবা কোনো দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য স্বীয় শায়খ বা পীরের হাতে ভবিষ্যতের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে যে বায়‘আত বা শপথ গ্রহণ করে তাঁকে মুরিদ বলা হয়। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), খ.২০, পৃ. ২৮৩-৮৪

৩. উদ্ধৃত : সাঈদ হোসাইন, ‘অদেখা দাদুজানের স্মরণ’, মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্, *কুতবে জমান*, *শাইখুল আরব ওয়াল-আজম আল্লামা শাহ্ হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রহ. : জীবন, কর্ম ও অবদান* (চট্টগ্রাম : আল্লামা শাহ্ ইউনুস রহ. একাডেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৫), পৃ. ৫৪৫

মূল সংবিধান মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন[৬]। এতে মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ও পারলৌকিক জীবনের সুন্দর দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাকে পাওয়ার প্রধান মাধ্যম হলো নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي অর্থাৎ 'হে নবি, আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমি নবির অনুসরণ করো।'[৭]

রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর রিসালতের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় খোদাভীরু আলিম ও ওলিগণের ওপর। এরাই যুগ-যুগ ধরে সমাজের পথভোলা ও দীনহারা মানুষকে সরল ও সঠিক পথের দিশা দিয়ে আসছেন। বিশ্বায়নের এ যুগে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ওলিগণের সাহচর্য আবশ্যক। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এমনই একজন আল্লাহ্‌র ওলি ছিলেন। তাঁর সাহচর্যে এসে অসংখ্য মানুষ সরল ও সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে তাদের জীবনকে ধন্য করেছেন।

শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) (১৯০৮–১৯৭১ খ্রি.) বায়তুশ শরফ[৮] দরবারের প্রধান রূপকার ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ২রা অক্টোবর, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে মসজিদভিত্তিক এ দরবার প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলামি জীবনব্যবস্থা আত্মস্থ করার মাধ্যমে একজন মানুষকে খাঁটি মু'মিনরূপে গড়ে তুলে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বলে বলীয়ান করাই বায়তুশ শরফের মূল লক্ষ্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ দরবার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

---

৪. ইসলাম আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা, বশ্যতা স্বীকার করা, ইসলাম গ্রহণ করা ও মুসলিম হওয়া। দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯), পৃ. ৯৯; শরি'আতের পরিভাষায় ইসলাম হলো, মহান আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা ও তাঁর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা; বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা। ইসলাম হলো, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসুল বলে সাক্ষ্য দেয়া। দ্র. অধ্যাপক আবদুল মান্নান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২), পৃ. ৩৩

৫. আল-কুর'আন, ৩ : ১৯

৬. পবিত্র কুর'আন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মানবজাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত একটি নির্ভুল মহাগ্রন্থ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, **ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ** অর্থাৎ, 'এ সেই কিতাব; তাতে কোনো সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য তা পথ-নির্দেশক।' দ্র. আল-কুর'আন, ২ : ২; পবিত্র কুর'আন হলো ইসলামি আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও অন্যান্য নির্দেশনার প্রধান উৎস। এটি মানবজাতির নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ আসমানি কিতাব। সর্বশেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এটি অবতীর্ণ হয়। দ্র. অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার, *ইসলাম ঈমান ও শিক্ষা* (ঢাকা : দারুল খিদমাহ প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ৪৭-৪৮

৭. আল-কুর'আন, ৩ : ৩১

৮. বায়তুশ শরফ নামের কয়েকটি তাৎপর্য রয়েছে; সেগুলো হলো : **প্রথমত :** সম্মানের ঘর, অতিশয় সম্মানিত ও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র ঘর। মসজিদের চাইতে সম্মানিত ঘর দ্বিতীয়টি হতে পারে না। **দ্বিতীয়ত :** এ ঘরে এলে মানুষ সম্মানিত হয়। তাকওয়া অর্জন করার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌র দরবারে সম্মানিত হয়। বায়তুশ শরফের বহুমুখী কর্মসূচির আওতায় আধ্যাত্মিক সাধনা ও মানবসেবার পথ ধরে মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে যেমন সম্মানিত হয় তেমনি মানুষের কাছেও। **তৃতীয়ত :** বায়তুশ শরফ মানুষকে সম্মান দেয়; যারা বায়তুশ শরফের পীর সাহেবের মেহমান হয়েছেন অথবা তাঁর মুরিদের সাথে মিশেছেন তারা এ অর্থের তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। বিশেষত, 'আলিম সমাজ (অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়)। দ্র. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, 'যেখানে আমার স্বপ্নেরা ভিড় জমায়', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব* (চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১৯৩-৯৪

এবং ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নসহ অগণিত সেবা ও কল্যাণমূলক কাজ করে যাচ্ছে। ফলে ‘বায়তুশ শরফ দরবার’ জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন ও আধ্যাত্মিকতা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু এবং পিতৃমাতৃহীন এতিম শিশুদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়।

শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) তাঁর জীবদ্দশায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর ‘ইলম-‘আমল, চারিত্রিক গুণাবলি ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের বিচারে নিজের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে খলিফা নিযুক্ত করে যান। ফলে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় মুর্শিদ ইন্তিকাল করলে এ দরবারের গুরুদায়িত্ব তাঁর স্কন্দে বর্তায়। কঠোর পরিশ্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনাবলে তিনি বায়তুশ শরফ দরবারকে ইহ ও পরকালীন কল্যাণে নিবেদিত একটি বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলেন। তিনি দেশ-বিদেশে এর শতাধিক শাখা-উপশাখা প্রতিষ্ঠা করে বায়তুশ শরফকে ফুলে-ফলে ও পত্র-পল্লবে সজ্জিত করে মহিরুহ রূপ দান করেছেন। তিনি আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে মানুষের অন্তরকে বিমুগ্ধ ও বিমোহিত করে দেশব্যাপী একটি আধ্যাত্মিক ও সেবামূলক বিশাল প্রতিষ্ঠানরূপে এ দরবারকে দাঁড় করিয়েছেন। ফলে তিনি ব্যক্তিপরিচয় অতিক্রম করে প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তৃত আবহে নিজেকে মেলে ধরে আদর্শিক জীবনে মাইলফলক হয়ে ওঠেন।

তাঁর জ্ঞানগরিমা ছিল বৈচিত্র্যময়। তিনি জ্ঞান-গবেষণায় এবং আধ্যাত্মিকতা অর্জন ও বিতরণে পুরো জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর এই অবিরাম সংগ্রামী সাধনার ফলে দেশ ও জাতি বহুমুখী সেবা লাভের পাশাপাশি পেয়েছে অমূল্য সব রচনা ও গ্রন্থাবলি। একজন সফল লেখক ও অনুবাদ হিসেবে তাঁর লিখিত ও অনূদিত ছোটো বড়ো গ্রন্থের সংখ্যা ২৬টি। অধিকন্তু, তাঁর একনিষ্ঠতা ও আধ্যাত্মিকতার বদৌলতে এ দরবারে অসংখ্য আলিম ও দা‘ঈ তৈরি হয়েছে। তারা স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে দেশ ও জাতির সেবা করে যাচ্ছেন।

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ যুগ-যুগ ধরে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে; আধ্যাত্মিকতার চর্চার মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠান দেশ ও জাতির কল্যাণে বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষকে অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রেখে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। অনুরূপভাবে, পরকালীন মুক্তিপথে লক্ষ-কোটি মানুষকে দিশা দিয়েছে। এমন একজন শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, আধ্যাত্মিক সাধক ও আল্লাহ্র ওলির নানামুখী কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন হওয়া এখন সময়ের দাবি। এজন্য ‘মানবসেবা ও সূফীবাদে শাহ্সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ভূমিকা’ শিরোনামটি পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Research)

একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অজানা বিষয় সম্পর্কে জানা বা নতুন বিষয়ের আবিষ্কার করাই গবেষণা।[৯] গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো এমন লুকায়িত সত্যের আবিষ্কার যা এখন পর্যন্ত

৯. ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ্ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামি ও আরবি বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৬), পৃ. ২৪

আবিষ্কৃত হয়নি।[১০] তাই এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো মানবসেবা ও সুফিবাদ চর্চার মাধ্যমে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সমাজ পরিবর্তনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং নবিগণের একজন উত্তরসূরি হিসেবে তাঁর ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্ব কতটুকু পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা নির্ধারণ করা। এ ছাড়াও গবেষণার উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- মানবসেবার পরিচয়, কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে মানবসেবার গুরুত্ব এবং ইসলামে 'ইলমে তাসাউওফ চর্চার গুরুত্ব স্বীকারপূর্বক এতদ্‌বিষয়ে তথ্যভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করা।
- তাসাওউফ ও তরিকত চর্চা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ 'আলিমগণ ও সাধারণ মানুষের ভুল ধারণা অপনোদনের চেষ্টা করা।
- মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা এবং তাঁর কর্মনীতি অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে জনসমাজে তুলে ধরা।
- তাঁর কর্মকাণ্ডসমূহ অনুসন্ধান করে সমাজ পরিবর্তনে তা কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রেখেছে তা জাতির সামনে উপস্থাপন করা।
- তরিকত চর্চার মাধ্যমে মানবসেবার সঠিক চিত্র তুলে ধরে নতুন প্রজন্মকে সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি উৎসাহিত করা।

গবেষণার পদ্ধতি (Research Methodology)

সাধারণ অর্থে গবেষণা[১১] হলো সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোনো বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলা হয়।[১২] গবেষণার আলোচ্য বিষয় : প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞান সংযোজন করা। গবেষণার উদ্দেশ্য ও নীতিমালাকে ঠিক রেখে প্রথমে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। বিষয় নির্বাচনের পর

---

১০. ড. মোঃ শাহজাহান তপন, *থিসিস ও এ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল* (ঢাকা : প্রতিভা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩), পৃ. ১৩

১১. আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'গবেষণা' শব্দটির অর্থ তত্ত্ব অনুসন্ধান, তথ্যের সন্ধান, নিবিড় পর্যালোচনা, উদ্ভাবন, আবিষ্কার, তত্ত্বানুশীলন ইত্যাদি। দ্র. মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০০), পৃ. ৩৪৩; এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Research (গভীর অনুসন্ধান), Search and Search (পুনঃপুন তদন্ত করা)। দ্র. Mohammad Ali, Mohammad Moniruzzaman and Jahangir Tareque, *Bangla Academy Bangla-English Dictionary* (Dhaka : Bangla Academy, 27 Reprint 2010), p. 163; গবেষণার আরবি প্রতিশব্দ হিসেবে **اَلْبَحْثُ، اَلْكَشْفُ، اَلطَّلَبُ، اَلتَّفْتِيْشُ، اَلتَّفَحُّصُ، اَلتَّحْقِيْقُ** ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। দ্র. ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ্ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামি ও আরবি বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৬), পৃ. ১৮; এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে মুহাম্মদ 'আজ্জাজ আল-খাতিব বলেন, **هو الفحص والتقصي المنظم لمادة أي موضوع من أجل إضافة المعلومات الناتجة إلى المعرفة الإنسانية أو المعرفة الشخصية.** অর্থাৎ 'সুবিন্যস্ত নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করে যে কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান বা পরীক্ষণ পরিচালনা করা, যাতে মানুষের সামষ্টিক বা ব্যক্তিগত জ্ঞানের সাথে গবেষণালব্ধ নতুন তথ্য সংযোজিত হয়।' দ্র. মুহাম্মদ 'আজ্জাজ আল-খাতিব, *লামহাত ফীল মাকতাবাতি ওয়াল বাহছি মাসাদিরি* (বৈরুত : মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৯৯৩), পৃ. ১০০

১২. ড. মোঃ শাহজাহান তপন, *থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

ধারাবাহিকভাবে গবেষণার নকশা তৈরি, তথ্য[১৩] ও উপাত্ত[১৪] সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আদর্শ ও উপযুক্ত আর্থ-সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

এ গবেষণায় অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার বর্ণনামূলক[১৫] (Descriptive) ও বিশ্লেষণমূলক[১৬] (Analytical) ধাপসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি কার্যোপযোগী গবেষণাধারার মাধ্যমে (Action Research Paradigm) সম্পন্ন করা হয়েছে।[১৭] উপরের ত্রিবিধ পদ্ধতি অনুসরণ করতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ, আলোচনাভিত্তিক বিবৃতি, যেখানে যেটা উপযোগী, সেখানে সেটা প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণা বিষয়বস্তুর গভীরতা ও জনস্বার্থের সর্বজনীন প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে কখনও একক বিশ্লেষণ আবার কখনও গ্রুপভিত্তিক মতামতের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎসের মাধ্যমে তথ্যের পূর্ণাঙ্গ সমাবেশ ঘটানো হয়েছে।

এ গবেষণার ভাষামাধ্যম বাংলা; তবে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিক সহযোগিতার জন্য ইংরেজি, আরবি, উর্দু ও ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিও সংযুক্ত হয়েছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর পূর্ববর্তী গবেষক ও লেখকগণের লিখিত গ্রন্থ, এমনকি প্রায়োগিক দিক সরেজমিনে জানার জন্য অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ[১৮]

---

১৩. তথ্য হলো **هي البيانات التى تمت معالجتها بحيث أصبحت ذات معنى وباتت مرتبطة بسياق معين** অর্থাৎ 'যে উপাত্তকে নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থবহ করা হয় ও নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়।' দ্র. www. ar.wikipedia.org/wiki/معلومة. Visited on : 24.01.2021

১৪. ঘটনা বা বিষয়কেন্দ্রিক তথ্য, যা সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা হয় এবং পরীক্ষা, নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপযোগী করা হয় তাকে উপাত্ত বলে। দ্র. রহমত আলী ছিদ্দিকী, *সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০২), পৃ. ১০

১৫. বাস্তব কোনো বিষয়ের বাহ্যিক দিকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা হয় তাকে বর্ণনামূলক গবেষণা বলা হয়। অনেক সময় এ প্রকার গবেষণার মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা এবং ঘটনাবলির অন্তর্নিহিত কারণ ও ফলাফল উদ্ভাবন করা হয়। দ্র. ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ্ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামি ও আরবি বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

১৬. গবেষণা সমস্যার সমাধানকল্পে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের সূক্ষ্ম ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে গবেষণা সম্পন্ন হয় তাকে বিশ্লেষণমূলক গবেষণা বলা হয়। দ্র. ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ্ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামি ও আরবি বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

১৭. মানসম্পন্ন গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৪টি ধাপ হলো : ১. ঐতিহাসিক (Historical) ২. বর্ণনামূলক (Descriptive) ৩. বিশ্লেষণমূলক (Analytical) এবং ৪. পর্যবেক্ষণমূলক (Observational)। একটি গবেষণার জন্য উল্লিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করলে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর খুব গভীরে প্রবেশ করা যায় এবং একটি মানসম্পন্ন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো সম্ভব হয়। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে ইতিহাস, বর্ণনা, বিশ্লেষণ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ, এ চারটি দিক যথাযথভাবে সমন্বয় করতে পারলে লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত হয়। এ গবেষণার ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত ধাপসমূহ সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার অর্জিত ফলাফল যাতে টেকসই কৌশলে পরাজিত কিংবা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত না হয় সে বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

১৮. গবেষক তাঁর গবেষণা সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যের সাথে একটি নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করে তাদের বিভিন্ন কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করেন এবং দলের সাথে অবস্থানের সময় গবেষক সুচারুরূপে দল সম্পর্কে তার পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করাকে 'অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ' বলে। দ্র. আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ শরীফ, *মানাহিজুল বাহছিল 'ইলমি : দলিলুত*

(Participant Observation Method), নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি[১৯] (Intensive Interview Method) এবং দলীয় আলোচনা[২০] (Group Discussion) পদ্ধতির সাহায্যে তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপাত্ত ও তথ্যসমূহ যথাযথ নিয়ম মেনে পরিবেশন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'বাংলা একাডেমি' থেকে প্রকাশিত বহুলপ্রচারিত ও সর্বশেষ মুদ্রিত 'বাংলা একাডেমি বাংলা বানান-অভিধান' ও 'বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান' কে অনুসরণ করার সাধ্যমতো চেষ্টা করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে 'বাংলা একাডেমি' ও 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' কর্তৃক নির্দেশিত নিয়মাবলির সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। আরবি শব্দের প্রতিবর্ণায়নে ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 'বাংলা একাডেমি' থেকে প্রকাশিত 'বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের অভিধান' গ্রন্থে বর্ণিত বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পবিত্র কুর'আনের আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনূদিত 'আল-কুরআনুল করীম'-এর অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে। কোনো শব্দের একাধিক বানানরীতির ক্ষেত্রে পুরো অভিসন্দর্ভে একই রূপের সমতা বিধানে চেষ্টা করা হয়েছে; তবে উদ্ধৃতি ও তথ্যপঞ্জির ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের বানান হুবহু রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি (Scope of the Research)

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন, কর্ম ও দর্শন এ গবেষণার পরিধিভুক্ত। প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর সমকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও এ গবেষণা পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা, মানবসেবা, সমাজসংস্কার ও সুফিবাদ বিকাশে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর দর্শন সত্যিকার অর্থে কোন্ মাত্রায় মানবজাতিকে প্রভাবিত করেছে এবং তাঁর সংস্পর্শে তাদের জীবনের নৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার পরিবর্তনের কী আভাস পাওয়া যায় তা বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখাও এ গবেষণা পরিধির আওতাভুক্ত। তাছাড়া কল্যাণকামী, ইনসাফমুখী ও দরদি সমাজকাঠামো বিনির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্বশীল ও আন্তরিক ভূমিকা অনুসন্ধান করা এবং সুফিবাদ চর্চা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে যে ভুল কিংবা অস্পষ্ট ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা দূরীকরণ এ গবেষণা পরিধির অন্তর্ভুক্ত।

তালিব ফি কিতাবাতিল আবহাস ওয়ার রাসাঈলিল 'ইলমিয়্যাহ (আলেকজান্দ্রিয়া : আল-মাকতাবুল আরবি আল-হাদিস, তা. বি.), পৃ. ১৫

১৯. নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি হলো, পারস্পরিক কথোপকথন যা দুই ব্যক্তির মুখোমুখি অবস্থানে সম্পন্ন হয়ে থাকে; সেখানে একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎদানকারীর কাছে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে আহ্বান জানান। দ্র. 'আব্দুল বাসিত মুহাম্মদ হাসান, *উসুলুল বাহ্ছিল ইজতিমা'য়ি* (কায়রো : মাকতাবাতুল অ্যাংলো আল-মাসরিয়্যাহ, ১৯৭১), পৃ. ৪৪৮

২০. দলীয় আলোচনা কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি কর্মসূচি সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমধর্মী সদস্যদের মধ্য থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত একটি ক্ষুদ্র দলকে (সাধারণত ৬ থেকে ১২ জন) সুনিয়ন্ত্রিত আলোচনার সুযোগ দিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোভাব এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হওয়াকে 'দলীয় আলোচনা' বলে। দ্র. খুরশিদ আলম, *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি* (ঢাকা : মিনার্ভা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮), পৃ. ১৭১

গবেষণার উৎস (Sources of Data)

গবেষণাকর্মটি প্রাথমিক[২১] (Primary Source) এবং দ্বৈতয়িক উৎসের[২২] (Secondary Source) ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। উভয়বিধ উৎস অনুসরণে গবেষণারীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে উৎসসমূহ ব্যবহারে সূত্রের পূর্ণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস (Primary Source)

প্রাথমিক উৎসসমূহের (Primary Source) মধ্যে রয়েছে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ, এসবের নিজস্ব প্রতিবেদন, অফিসিয়াল রেকর্ড/ ডাটা, এতৎসংক্রান্ত ওয়েবসাইট, তাঁর মুরিদগণের সরাসরি সাক্ষাৎকার ও দলভিত্তিক আলোচনা ইত্যাদি।

দ্বৈতয়িক উৎস (Secondary Source)

দ্বৈতয়িত উৎস (Secondary Source) হলো পবিত্র কুর'আন ও কুর'আনুল কারিমের তাফসির, হাদিস ও হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ফিকহ গ্রন্থ, সমকালীন আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট সংক্রান্ত মৌলিক গ্রন্থ এবং মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবনীর ওপর লিখিত ও সম্পাদিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রভৃতি। আরও নানাবিধ সংকলন, বিশেষ ক্রোড়পত্র, স্মারকগ্রন্থ, বুলেটিন ও পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি এ গবেষণাকর্মের দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গবেষণার সময়ব্যাপ্তি (Research Epoch)

এ গবেষণার সময়ব্যাপ্তি ৪ বছর। এ সময়ব্যাপ্তিকে বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত করে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষায় লিখিত দেশি-বিদেশি বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, জার্নাল, অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট, গবেষণা শিরোনামের সাথে সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, সরকারি পরিসংখ্যান তথ্যাদি ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাসমূহ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।
দ্বিতীয় পর্যায়ে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান; যেমন : মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, হেফযখানা, একাডেমি, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রকাশনা, রিপোর্ট, জার্নাল ও ডাটাসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে। বায়তুশ শরফের বেশ কিছু ভক্ত-অনুরক্ত এবং

---

২১. কোনো ঘটনার সাথে সরাসরি যারা জড়িত ছিলেন অথবা প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের লিখিত রচনাবলিকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে অভিহিত করা হয়। লেখক বা রচয়িতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুবাদে অথবা ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হওয়ার কারণে তার লেখার গ্রহণযোগতা ও যথার্থতা বহু গুণে বেড়ে যায়। দ্র. ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ্ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামি ও আরবি বিষয় একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

২২. যে সব উৎসের লেখকগণ ঘটনাবলির সাথে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন; বরং অন্য কারও থেকে শুনেছেন অথবা কোনো লেখা পড়ে সাহিত্য রচনা করেছেন তাদের রচিত কর্মকাণ্ডগুলোকে দ্বৈতয়িক উৎস বলা হয়। দ্র. ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ্ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামি ও আরবি বিষয় একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

বাস্তবভিত্তিক উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি সাধারণভাবে শিক্ষা, মানবসেবা, সমাজসংস্কার ও সুফিবাদ বিকাশে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর দর্শন সমাজে কী ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আনতে সক্ষম হয়েছে এ বিষয়ে সচেতন জনগোষ্ঠীর মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই ও পুনর্মূল্যায়ন করে গবেষণাকর্মটির মানদণ্ড বজায় রেখে এটি অতি যত্নসহকারে সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম খসড়া (Drafting), সম্পাদনা, পুনঃসম্পাদনা, চূড়ান্ত প্রুফসহ থিসিসটি[২৩] উপস্থাপনযোগ্য করতে গবেষকের সময় লেগেছে মোট ৪ বছর ১ মাস ১৩ দিন। গবেষণাকাজে ব্যবহৃত মোট সময়কে নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

ব্যয়িত সময়ের তালিকা (List of Spending Time)

ক্রমিক	কাজের ধরন	ব্যয়িত সময়
০১.	প্রথম পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	১০ মাস
০২.	দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	৬ মাস
০৩.	প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন	৮ মাস
০৪.	তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	৬ মাস
০৫.	কম্পিউটার কম্পোজ	৮ মাস
০৬.	প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রুফ	৭ মাস
০৭.	চূড়ান্ত প্রিন্ট, সম্পাদনা এবং বাঁধাই	৩ মাস
	মোট ব্যয়িত সময়=	৪ বছর ১ মাস ১৩ দিন

গবেষণাকর্ম পরিচালনার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Research)

এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে গবেষককে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্যভান্ডার অপর্যাপ্ত হওয়া ছাড়াও প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা এবং তথ্য প্রদানে তাদের অনীহা গবেষণার তথ্য-উপাত্তকে আরও

২৩. থিসিস (Thesis) শব্দটির বহুবচন Theses, যার শাব্দিক অর্থ যুক্তির দ্বারা সমর্থিত বা সমর্থনীয় বিবৃতি বা তত্ত্ব; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের জন্য পেশকৃত অভিসন্দর্ভ। দ্র. Zillur Rahman Siddiqui (ed), *English-Bangla Dictionary* (Dhaka : Bangla Academy, 23rd Edition, 2003), p. 823; ইংরেজিতে থিসিসের জন্য Dissertation শব্দও ব্যবহৃত হয়। বাংলায় অভিসন্দর্ভ, সন্দর্ভ, গবেষণাপত্র, গবেষণা প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রতিশব্দ রয়েছে। আরবিতে رِسَالَةٌ، أُطْرُوْحَةٌ، بَحْثٌ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল., পিএইচ.ডি. বা ঐ জাতীয় ডিগ্রি লাভের জন্য পেশকৃত তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানগর্ভ রচনাকে অভিসন্দর্ভ বা থিসিস বলা হয়। দ্র. আবদুল্লাহ্ আল-মুতী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *শিশু বিশ্বকোষ* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ১৯৯৫), খ.১, পৃ. ৩৫; আহমদ শরীফ সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ২৬৮; ড. শাহজাহান তপন, *থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল* (ঢাকা : প্রতিভা ৫/৬, ইস্টার্ণ প্লাজা, ১৯৯৩), পৃ. ৩; ড. মোহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ্ ও ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন, *ইসলামি ও আরবি বিষয়ে একাডেমিক গবেষণার রীতি ও পদ্ধতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮

শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য করার পথে সামান্য হলেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে; তবে গবেষণাকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার দায়ভার গবেষকের সম্পূর্ণ নিজের।

গবেষণাকর্ম পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক নিম্নরূপ:

১. **অবিন্যস্ত তথ্য-উপাত্ত :** মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) প্রতিষ্ঠিত সব প্রতিষ্ঠান 'বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' নামক সংগঠনের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ সংগঠনের প্রধান কার্যালয় চট্টগ্রাম জেলার ধনিয়ালাপাড়ায় অবস্থিত। প্রধান কার্যালয়ে শাখা প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে তেমন কোনো কার্যক্রম চোখে পড়ার মতো নয়। তাছাড়া এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সাথে যে বা যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিলেন তাদের অনেকেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। অধিকন্তু 'আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ'-এর অধীনে পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্যের তুলনায় কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ অফিস স্পেসের স্বল্পতার পাশাপাশি লোকবলেরও ঘাটতি রয়েছে। ফলে তথ্য সংগ্রহ করতে গবেষককে রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে।

২. **কেন্দ্রের সাথে শাখার নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ না থাকা :** মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তিন পার্বত্য জেলাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত রয়েছে। বায়তুশ শরফের প্রধান কার্যালয়ের সাথে বহু শাখা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ অনেক দিন ধরে নিরবচ্ছিন্ন না থাকায় সংগত কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হয়েছে।

৩. **তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা :** মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ২৫শে মার্চ, ১৯৯৮ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তাঁর জীবদ্দশায় সম্পন্ন হলেও কিছু প্রতিষ্ঠানের যাত্রা খুব বেশি দিনের নয়। সংগত কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্যভাণ্ডার নিতান্তই অপ্রতুল। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির (Information Technology) ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটলেও বায়তুশ শরফ অনেকটাই এ প্রযুক্তিতে এখনও দুঃখজনকভাবে পিছিয়ে রয়েছে। ফলে এ সব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

সাহিত্য পর্যালোচনা বলতে বোঝায়, গবেষকের নির্ধারিত বিষয়কে কেন্দ্র করে ইতিপূর্বে রচিত বিভিন্ন গবেষণাকর্ম তথা প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন এবং প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণা থিসিস পর্যালোচনা করা। এতে গবেষকের গবেষণা বিষয়ের ন্যায্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গবেষণার জন্য প্রণীত তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর যৌক্তিকতা উপস্থাপিত হয়। গবেষণার জন্য নির্বাচিত বিষয়ে গবেষকের সম্যক ধারণা ও বিষয় নির্ধারণের যৌক্তিকতা উপস্থাপন করাই সাহিত্য পর্যালোচনার উদ্দেশ্য।

এ বিষয়ে পূর্বে রচিত ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ তুলে ধরে, তাতে কোনো ঘাটতি বা সীমাবদ্ধতা থাকলে যৌক্তিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করে গবেষকের নিজস্ব মতামত তুলে ধরাই সাহিত্য পর্যালোচনা[২৪]।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর কর্ম ও জীবনদর্শন, সমাজসংস্কার, দীনি শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা সম্প্রসারণ, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন, আর্ত-মানবতার সেবা, সত্যিকারের তাসাওউফ চর্চার মাধ্যমে মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধীকরণ ইত্যাদি বিষয়কে উপজীব্য করে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছুসংখ্যক বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, প্রবন্ধ ও জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে এসব বই-পত্রসমূহের কয়েকটির পর্যালোচনা করা হলো:

কে. এম. মাহফুজুল করিম *‘পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান’* শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ থেকে খ্যাতিমান জ্ঞানতাপস প্রফেসর ড. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দিন এর তত্ত্বাবধানে এপ্রিল, ২০০৩ সালে এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ রচনা করেন; যা একই শিরোনামে মার্চ, ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের ‘হোমল্যান্ড পাবলিকেশন্স’ কর্তৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জন্ম, শিক্ষা, তরিকত শিক্ষা, দীন প্রচার, সমাজসংস্কার, নানান প্রতিষ্ঠান স্থাপন সর্বোপরি, দেশের কল্যাণে তিনি যে তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছেন সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে; তবে অভিসন্দর্ভটি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ইন্তিকালের কয়েক বছরের মধ্যে সম্পাদিত হওয়ায় তখনও তাঁর সম্পর্কে অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। ফলে গবেষণাকর্মটি সন্তোষজনক হয়নি বলে গবেষক নিজে স্বীকার করেছেন তার অভিসন্দর্ভের ভূমিকায়। তাই গবেষক বিষয়টির পূর্ণতার জন্য পরবর্তী গবেষকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

বিশিষ্ট লেখক মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্‌ভী ও জীবনীকার জাকিয়া ছুফিয়ান কর্তৃক যৌথভাবে লিখিত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও কর্মসংবলিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো *‘হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার রহ. : জীবন ও আদর্শ’* (চট্টগ্রাম : আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৭৬)। গ্রন্থটিতে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর বংশপরিচয়, জন্ম, শিক্ষাজীবন, কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্‌রাসা, এতিমখানা, হেফযখানা, একাডেমি, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়, দীনি তা‘লিম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থখানি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি উত্তম সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে; তবে গ্রন্থটির আকার বেশি বড়ো হওয়ায় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত

২৪. সাহিত্য পর্যালোচনা সম্পর্কে Walter A. Borg বলেন, The review of literature involves locating, reading and evaluating reports of search as well as reports of casual observation and openion that are related to the individual’s planned research project. অর্থাৎ ‘সাহিত্য পর্যালোচনা বলতে কোনো গবেষকের পরিকল্পিত গবেষণা কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য ও প্রতিবেদনের অবস্থান নির্ণয়, অধ্যয়ন, মূল্যায়ন এবং সাথে সাথে নৈমিত্তিক পর্যবেক্ষণ উপস্থাপনসহ তার গবেষণার সাথে উক্ত সাহিত্য ও প্রতিবেদনের সম্পর্ক নির্ণয় করা।’ দ্র. এ. এস. এম. আতীকুর রহমান ও সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি* (ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০), পৃ. ৫২

আলোচনা স্থান পাওয়ায় সঠিক মর্ম উদ্‌ঘাটন করা সাধারণ পাঠকদের নিকট কষ্টসাধ্য। অধিকন্তু, গ্রন্থটির রচনা ও সম্পাদনা সুনির্দিষ্ট কোনো গবেষকের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন না হওয়ায় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করা হয়নি এবং আন্তর্জাতিক গবেষণারীতিও অনুসরণ করা হয়নি। ফলে গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থের মানদণ্ডে মানোত্তীর্ণ হয়নি।

মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান *'পীর এ বায়তুশ শরফ শাহ্ আবদুল জব্বার রহ.-এর পবিত্র জীবন'* (চট্টগ্রাম : আলহাজ্ব মোহাম্মদ তাহের সোবহান, ২৫ মার্চ, ২০০০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪৮) নামক গ্রন্থে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সচিত্র বিবরণ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর একাধিক প্রবন্ধ সংকলন ও সম্পাদনা গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও মূলত এটি তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে রচিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। লেখক দীর্ঘ দিন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর খাদেম হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করায় ব্যক্তিগতভাবে অনেক তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। সে হিসেবে তাঁর এই গ্রন্থে বহু সূক্ষ্ম বিষয় স্থান পেয়েছে; যা অন্যান্য গ্রন্থে সেভাবে পায়নি। তবে শৈশবকাল থেকে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হওয়ায় বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি অতি আবেগের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এটা নিরপেক্ষ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়।

মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত *'জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর সাহেব'* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১১) শীর্ষক গ্রন্থটি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর প্রথম প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ। আলোচ্য স্মারকে বিশিষ্ট লেখক, কবি ও সাহিত্যিকের বেশ কিছু স্মৃতিচারণমূলক লেখা স্থান পেয়েছে। তাতে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের খণ্ডচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। সময় ও প্রবন্ধে শব্দের সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁর সম্পূর্ণ জীবন-আদর্শ ফুটিয়ে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অধিকন্তু, স্মারকটি তাঁর ইন্তিকালের নিকট সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সংগত কারণে পরবর্তী গবেষণার দাবি রাখে। ফলে এই সংকলন প্রামাণ্য কোনো জীবনচরিত হিসেবে মর্যাদা লাভ করেনি।

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সংকলিত ও সম্পাদিত *'ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)'* (চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমি, ১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬০) শীর্ষক গ্রন্থে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে বাংলাদেশের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, জীবনীকার, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে প্রায় শতাধিক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এতে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক স্থান পেলেও ধারাবাহিক জীবনচিত্র ফুটে ওঠেনি। ফলে সাধারণ পাঠকের কাছে এর মাধ্যমে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি অপ্রস্ফুটিত থেকে যায়।

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সংকলিত ও সম্পাদিত *'আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)'* (চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমি, ১৯৯৯ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬০) শীর্ষক গ্রন্থে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর

জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু লেখক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, জীবনীকার, ভক্ত ও অনুরক্তগণের আটাশটি প্রবন্ধ ও দুটি সাক্ষাৎকার স্থান পেয়েছে। এসব লেখায় তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। ফলে এসব লেখায় ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ও আবেগের আতিশয্য স্থান পেয়েছে অতিমাত্রায়। অধিকন্তু, এতে ভাব, ভাষা ও তথ্যের বিন্যাসে কোনো রীতি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে উচ্চতর পর্যায়ে উপস্থাপনযোগ্য কোনো মৌলিক জীবনীগ্রন্থের স্থান লাভ করে নিতে সক্ষম হয়নি।

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সংকলিত ও সম্পাদিত *‘আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক শাহ্‌সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)’* (চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমি, ২০০৫ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮২) শীর্ষক গ্রন্থে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু লেখক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ভক্তগণের লেখা ত্রিশটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। চিরাচরিত নিয়মে লেখা এসব নিবন্ধে একাধিক লেখায় আলোচনার পুনরুক্তি স্থান পেয়েছে। অধিকন্তু, এসব লেখায় তথ্য-উপাত্তের চেয়ে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সাথে লেখকগণের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা এবং স্বীয় পীর-মুর্শিদের আধ্যাত্মিক ঘটনাবলির বিবরণ এসেছে অতিমাত্রায়। ফলে এটি কালজয়ী মানোত্তীর্ণ কোনো গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর লিখিত আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা; যেমন : *‘মাসিক দ্বীন দুনিয়া’* ও *‘শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া’* এর সম্পাদক মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ কর্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত *‘বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন’* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ২৩শে জানুয়ারি, ২০১০ খ্রি., পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৮), *‘মাসিক দ্বীন দুনিয়া’* স্মরণ সংখ্যা ১ (মে ১৯৯৮) ও ২ (জুন ১৯৯৮)। এগুলোতে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু লেখক, গবেষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার বহু মূল্যবান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। গ্রন্থসমূহে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছে। গবেষণাকর্মে উপরিউক্ত গ্রন্থাবলি ও পত্র-পত্রিকা তথ্য-উপাত্তের অন্যতম উৎস হিসেবে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Thesis Structure Planning)

গবেষণার সুবিধার্থে ‘মানবসেবা ও সূফীবাদে শাহ্‌সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ভূমিকা’ শীর্ষক এ পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৬ (ছয়টি) অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়কে কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম এবং পরিচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নরূপঃ

প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে মূলত গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার অবতরণিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে; যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা,[২৫] গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি, গবেষণার পরিধি, উৎস,

---

২৫. গবেষণা পদ্ধতিবিদ্যার দৃষ্টিতে গবেষণা প্রস্তাবনা হলো : A research design is an application of scientific method to the particular problem to be investigated, a pheenomenon about which the researher of

গবেষণার সময়ব্যাপ্তি, গবেষণাকর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা, সাহিত্য পর্যালোচনা এবং অভিসন্দর্ভ গঠন ইত্যাদি ধারাবাহিক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সমকালীন অবস্থা। এর মধ্যে তাঁর সমসাময়িক সামাজিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থার একটি চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। উল্লিখিত শিরোনামে বিষয়বস্তুর আলোচনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সন্নিবেশ করে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সূত্রসহ সংযুক্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণাকর্মের তৃতীয় অধ্যায় শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবনবৃত্তান্ত' সম্পর্কিত। এ অধ্যায়ে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে তাঁর জন্ম ও বংশপরিচয়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর শিক্ষাজীবন, তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাঁর কর্মজীবন, চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক মাধুর্য এবং পঞ্চম আধ্যাত্মিকতা তথা কাশ্ফ-কারামাত ও শিক্ষণীয় বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ফলে পাঠকগণ অভিসন্দর্ভের মূল অধ্যায় অধ্যয়নের পূর্বে তাঁর সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায় 'শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অবদান' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। এতে শিক্ষা ও নৈতিকতা প্রসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, গ্রন্থরচনা ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ, জ্ঞান-গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা ও যোগ্য ব্যক্তি তৈরি এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র ও ধর্মীয় মাহফিল প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। তাছাড়া মুসলিমগণের ঐক্যের প্রয়াস ও নীতিভিত্তিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং শিরক-বিদ'আতমুক্ত সমাজ গঠন ও ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে অত্যন্ত সুচারুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

অভিসন্দর্ভের এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'মানবসেবায় শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অবদান'। এখানে মানবসেবার পরিচয়, ইসলামে মানবসেবার গুরুত্ব, সেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন; যেমন : মসজিদ, এতিমখানা, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন, পোস্ট অফিস স্থাপন, আর্তমানবতার সেবা, শিরক্ ও বিদ্'আতমুক্ত সমাজ গঠন, ইসলামি মিশনারি ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রমের একটি খণ্ডচিত্রও তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

---

theorist seeks greater insights and increased body of factual knowledge. অর্থাৎ 'গবেষণা নকশা হলো, নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান কল্পে অনুসন্ধানের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ও একটি ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বাহ্যিক বস্তু সম্পর্কে তাত্ত্বিক গবেষকের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্যক্ষেণ, যার ফলে বাস্তব জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়।' দ্র. A. B. Blalock & H. M. Blalock, *Introduction to Social Researh* (New Jersey : Prentice Hall, 2nd Edi, 1982), p. 105

ষষ্ঠ অধ্যায়

গবেষণাকর্মের ষষ্ঠ অধ্যায় হলো 'সুফিবাদের বিকাশে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)'। সুফিবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সুফিবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, কুর'আন-সুন্নাহ্ ও মনীষীদের দৃষ্টিতে সুফিবাদ, বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ সুফি তরিকাসমূহ, শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) অনুসৃত তরিকাহ এবং সুফিবাদের বিকাশে তাঁর গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

উপসংহার

অভিসন্দর্ভের শেষ পর্যায়ে উপসংহার (Conclusion) লেখা হয়েছে। উপসংহার হিসেবে এতে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সার-নির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যে অনুভূতিতে এর উপাত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে সে বিষয়ে গবেষকের একান্ত অভিব্যক্তি উপসংহারে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। পরিশেষে, গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট সংযুক্ত করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

গবেষণার চিরাচরিত নিয়ম অনুসরণ করে অভিসন্দর্ভের শেষের দিকে একটি দীর্ঘ গ্রন্থপঞ্জি সংযোজন করা হয়েছে। এতে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সাময়িকী, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, থিসিসসহ যেসব উৎস থেকে অভিসন্দর্ভ রচনা করতে সাহায্য বা উদ্ধৃতি নেয়া হয়েছে সেগুলোর একটি তালিকা সংযোজন করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট

সন্দর্ভটিকে আকর্ষণীয় করার নিমিত্ত পরিশিষ্টে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ও তাঁর পৈতৃক নিবাস, তাঁর কবর, প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ, মাদ্‌রাসা, এতিমখানা, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় ও গুণিজন সংবর্ধনার আলোকচিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বন্যাদুর্গত বিপন্ন মানুষের পাশে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর আলোকচিত্র, তাঁর লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গ্রন্থ, মাসিক ম্যাগাজিন দ্বীন-দুনিয়া ও শিশু-কিশোর দ্বীন-দুনিয়া এবং তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত পুরস্কার ও সনদের প্রচ্ছদ ছাপ সংযোজন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সমকালীন অবস্থা

- প্রথম পরিচ্ছেদ : সামাজিক অবস্থা
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক অবস্থা
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : রাজনৈতিক অবস্থা
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় অবস্থা

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সমকালীন অবস্থা

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। একই সমাজে বিভিন্ন মানুষের বসবাস সামাজিক নিয়মেই গড়ে উঠেছে। সমাজের রীতিনীতি, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুশাসন, রাজনীতি ইত্যাদি দ্বারা সমাজের মানুষ বেষ্টিত। তাই কোনো ব্যক্তির মননশীলতা ও সামাজিক মান নির্ণয়, উক্ত ব্যক্তির সমাজের সংস্কৃতি, রাজনীতি, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অবগত হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভব।[১] কেননা, সমাজের প্রতিটি মানুষ তার জীবনাচরণ ও চিন্তা-চেতনায় সমসাময়িক সমাজের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোনো ব্যক্তির মননশীলতা ও ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর জীবনকালের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সময়টি তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় দিক থেকে অন্যান্য যুগের ওপর প্রভাব-বিস্তারকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বেনিয়াদের শাসনামলে তিনি বর্তমান মায়ানমারের (বার্মার)[২] থাংগু জেলার পিনজুলুক রেলওয়ে স্টেশনস্থ বাঙালি কলোনিতে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ, মোতাবেক ১৩৫২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে, প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাতাশ বছর পর ২৫শে মার্চ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

মহাকালের বিবেচনায় ১৯৩৩–১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পৌনে এক শতাব্দী কোনো সময়ই মনে হবে না; কিন্তু ব্যক্তিজীবনে, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ৬৫ বছর একটি বিরাট সময়। এ সুদীর্ঘ সময় বাংলাদেশে শিক্ষাদীক্ষা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যেমন বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তেমনি নানান উত্থান-পতন, যুদ্ধবিগ্রহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, শোষণ, নির্যাতন বা নিপীড়নের ইতিহাসও সৃষ্টি হয়েছে। এসময় অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি দ্বারা তাঁর জীবন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

সুতরাং, এই মহান ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, সুফিবাদের বিকাশ ও মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে হলে তাঁর সমসাময়িক যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বা ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। তাই এ অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

---

১. ইবন খালদুন, গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত, *আল-মুকাদ্দিমা* (ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ১৯৮২), খ.১, পৃ. ৩৩; *Encyclopaedia of Social Sciences* (New York : The Macmilan Company, 1963 A.D), Vol. 13, p. 225; Adam Kuper, *The Social Science Encyclopaedia* (London : Routledge, 1996), p. 784

২. বার্মার প্রাচীন নাম ব্রহ্মদেশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। মায়ানমারের আনুষ্ঠানিক নাম হলো মায়ানমার প্রজাতন্ত্র (পিইদাউন্যু থাম্মাদা মিয়ামা নাইংঙন্দাউ)। মায়নমারের রাজধানী নেপিদ। তৎকালীন বার্মার গণতান্ত্রিক সরকারের উৎখাতের পর ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে সেখানকার সামরিক সরকার বার্মার নতুন নামকরণ করে 'মায়ানমার' এবং প্রধান শহর ও তৎকালীন রাজধানী রেঙ্গুনের নতুন নাম হয় ইয়াঙ্গুন। দ্র. https://bn.wikipedia.org/wiki/মায়ানমার, visitted on : 12.10.2020

প্রথম পরিচ্ছেদ

সামাজিক অবস্থা

শাহ্[৩] সুফি মওলানা[৪] মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জন্মের সময় ভারতবর্ষের শাসনভার ঔপনিবেশিক ইংরেজদের হাতে ন্যস্ত ছিল। তাঁর জীবনকাল (১৯৩৩–১৯৯৮ খ্রি.) ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতবর্ষ বিভাগ পরবর্তী স্বাধীন পাকিস্তান, স্বাধীন পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ পর্যন্ত চলে এসেছে। এ সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশেও অনেক সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সমকালীন দেশের সামাজিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্য তাঁর সময়ের বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ তৎপূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনকালের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। অবশ্য তাঁর জীবনকালের এতদঞ্চলের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দেওয়ার পূর্বে সমাজের পরিচয় উল্লেখ করা প্রয়োজন; কারণ প্রতিটি সমাজের অবকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে সামাজিক অবস্থা গড়ে ওঠে।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যে থেকেই তাঁর সামাজিকতা ঠিক রেখে তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। যুগ-যুগ ধরে এটাই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস। এই সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া সভ্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য দার্শনিক অ্যারিস্টটল[৫] বলেছেন,

> Man is by nature a social animal; .... therefore does not partake of society, is either a beast or a god. 'মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক জীব। ... যে লোক সমাজ-সভ্য নয়, সে হয় পশু, না হয় দেবতা।'[৬]

---

৩. শাহ্ মানে আধ্যাত্মিক জগতে রাজকীয় মর্যাদাপ্রাপ্ত। এটা আধ্যাত্মিক জগতের প্রেমিকদের উপাধি। যারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমে দুনিয়ার সর্বস্ব ত্যাগ করে, ফকির-দরবেশ অর্থাৎ চিন্তা ও কর্মে নিঃসম্পদ হয়ে যান, তারা এ সম্মানজনক পদবি লাভ করেন। দ্র. ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, 'মাওলানা শাহ্সুফি শেখ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার স্মরণে', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, স্মরণ সংখ্যা ১, মে ১৯৯৮, পৃ. ৪২

৪. মওলানা আরবি শব্দ; এর অর্থ আমাদের প্রভু। শব্দটি অভিভাবক, জিম্মাদার, বন্ধু, নেতা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 'মওলানা' শব্দের বিভিন্ন রূপ এবং প্রত্যয়যুক্ত শব্দ সচরাচর সম্মানসূচক সম্বোধনের শব্দরূপে ব্যবহার মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত উপমহাদেশে প্রচলিত আছে। যেমন : উত্তর আফ্রিকাতে মওলানা শব্দটি আমাদের প্রভু অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিদ্বান ও দরবেশ শ্রেণিকে বোঝানোর জন্যও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। কুর'আন ও হাদিসের জ্ঞানে জ্ঞানী হলে তাদের সম্মানসূচকভাবে সম্বোধনের জন্য মওলানা শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা-ধারার সর্বশেষ ডিগ্রি কামিল বা দাওরায়ে হাদিস উত্তীর্ণ হলে তাদেরও 'মওলানা' নামে সম্বোধন করা হয়। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), খ.২, পৃ. ১৮৬

৫. এরিস্টটল (৩৮৪–৩২২ খ্রিষ্টপূর্ব) সর্বকালের অন্যতম প্রধান দার্শনিক হিসেবে বিশ্বব্যাপী পরিচিত। তিনি মেসিডোনিয়ার স্টাগিরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭ বছর বয়সে প্লেটোর একাডেমিতে যোগ দেন। বিশ্বজয়ী আলেকজান্ডারের শিক্ষক হিসেবে মেসিডোনিয়াতে যান। মতবিরোধ দেখা দিলে আবার এথেন্সে ফিরে আসেন। জীবন ও জগতের এমন কোনো দিক ছিল না যেদিকে তিনি গবেষণকের দৃষ্টিতে থাকাননি। এজন্য তাকে জ্ঞানের সমুদ্র বলা হতো। বিজ্ঞান ও দর্শনে তার চিন্তা দেড় হাজারেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বের জ্ঞানপিপাসুদের প্রভাবিত করেছেন। দ্র. বদিউর রহমান, *এরিস্টটলের পোয়েটিকস্* (ঢাকা : গতিধারা, ২০০১), পৃ. ১৬-১৭

৬. Aristotle, Translated by Benjamin Jowett, *Politics* (Princeton : Batto the Books Kitchener, 1999), p. 5

কিছু মানুষ একটি সংঘবদ্ধ পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যখন কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বসবাস করে তখন তাকে সমাজ বলে।[৭] সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস (১৮৫৫–১৯৩১ খ্রি.) বলেন,

> Society is a group of interacting individuals whose collective behavior, dominated and stimulated by the consciousness of kind, follows the laws of cosmic evolution.[৮] 'সমাজ হচ্ছে এমন মিথস্ক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি, যাদের সামষ্টিক আচরণ একই ধরণের সচেতনতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও উদ্দীপিত এবং যারা মহাজাগতিক বিবর্তনের নিয়মসমূহকে অনুসরণ করে।'

অন্যদিকে, ম্যাকাইভার (১৮৮২–১৯৭০ খ্রি.) ও চার্লস এইচ. পেজ (১৮৪৩–১৯১২ খ্রি.) বলেছেন,

> Society as a web of relations, a complex system of usages and procedures of authority and mutual aid of many groupings and divisions, of control of human behavior and of liberties.[৯] 'সমাজ হচ্ছে কর্তৃত্বের নীতিমালা ও কার্যবিধি এবং মানুষের আচরণ ও স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের পারস্পরিক বহু উপদল ও বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের এক জটিল জাল বিশেষ।'

আর সামাজিক এ সম্পর্ক গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা এবং অন্যান্য আচার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট (জন্ম ১৯৫৩ খ্রি.) বলেন,

> Society in general, consists in the complicated network of social relationship by which every human being is interconneted with his fellomen.[১০] 'সাধারণভাবে সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের এমন একটি জটিল জাল যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি মানুষ তার সঙ্গীদের সাথে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ।'

সমাজের এই পারস্পরিক সম্পর্কের জাল বা আচার ব্যবস্থাগুলো এমন সুনিবিড় সম্বন্ধযুক্ত যে, এখানে এককভাবে কোনো ব্যক্তির যথেচ্ছ আচরণের কোনো অবকাশ নেই।[১১] অতএব, সমাজের ক্ষেত্রে নৈতিকতার ব্যাপারটিও গুরুত্বপূর্ণ। সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস (১২২৫–১২৭৫ খ্রি.) সমাজকে 'প্রজ্ঞাশীল জীবের একটি স্থায়ী নৈতিক সম্মেলন' বলে উল্লেখ করেছেন।[১২]

---

৭. নাজমুল করিম, *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৯), পৃ. ১২-১৭

৮. Franklin Henry Giddings, *The Elements of Sociology* (New York : The Macmillan Company, 1906), p. 22

৯. Robert Morrison Maciver & Charles Harrison Page, *Society : An Introductory Analysis* (New York : Rinehart, 1949), p. 15; পরিমল ভূষণ কর, *সমাজতত্ত্ব* (কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯০), পৃ. ১১৯

১০. উদ্ধৃত : ড. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও অন্যান্য, *সমাজবিজ্ঞান* (গাজীপুর : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১), খ.১, পৃ. ৪৪

১১. পরিমল ভূষণ কর, *সমাজতত্ত্ব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

১২. উদ্ধৃত : শ্রী প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত (প্রণতি) ও শ্রী মতিলাল মুখোপাধ্যায় (পরিমার্জিত), *সমাজ দর্শন* (কলিকাতা : ব্যানার্জী পাবলিশার্স, একাদশ মুদ্রণ ১৯৮০), পৃ. ৪৯ (পাদটীকা)

এজন্য আল্লাহ্[১৩] তা'আলা মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করার মানসিকতা দিয়ে, সামাজিকতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি মানুষের সবকিছুই সমাজের ভেতরে ঘটে থাকে। তাই সমাজ-বিচ্ছিন্ন কোনো কাজ মানুষের জীবনে নেই। সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ বসবাস করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

অর্থাৎ 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তাঁর স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুইজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।'[১৪]

উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই সমাজের উৎপত্তি। আর সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোক বসবাস করলেও সবাইকে নিজেদের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনের তাগিদে একতাবদ্ধ হয়ে, সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়। আর বিচিত্র মানুষের পদচারণায় সমাজের রূপ-রং-প্রকৃতি হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময়। তাই কোনো সমাজের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে তার বাস্তব রূপের চিত্রায়ণ করতে চাইলে প্রথমে ঐ সমাজে বসবাসরত অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের গোড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় : প্রাচীনকাল থেকেই এ উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতি আগমন করেছে; তবে তাদের কেউ নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি[১৫] ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি। তৎকালীন সময়ের হিন্দু-ভারতবর্ষ তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নিয়েছিল। আর্য বিজয়ের কাল থেকে শক (মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতিবিশেষ), হুন (মধ্য এশিয়ার প্রাচীন যাযাবর জাতিবিশেষ), গ্রিক প্রভৃতি যে সব জাতি ভারতবর্ষে আগমন করেছে, ভারতীয় সংস্কৃতি তাদের সংস্কৃতিকে গ্রাস করেছে।[১৬] এদেশের মুসলিমগণের ওপর হিন্দুদের প্রভাব বিস্তার মূলত চারটি কারণে হয়েছিল : (১) হিন্দু-মুসলিম

১৩. আল্লাহ্ তা'আলা হলেন একক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তিনি চিরঞ্জীব ও শাশ্বত। তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি এবং তাঁর থেকেও কেউ জন্ম নেয়নি। তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, সর্বশক্তিমান ও মহাপরাক্রমশালী। তিনিই জগতের সকল কিছুর স্রষ্টা, মহাপরিকল্পনাকারী, নিয়ন্ত্রক ও ব্যবস্থাপক। তিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। তিনি সর্বজ্ঞানী; প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবকিছু জানেন। তিনি অসীম; সব ধরনের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি থেকে মহাপবিত্র। তিনিই হলেন সকলের দাসত্ব ও নিরঙ্কুশ আনুগত্য লাভের একমাত্র অধিকারী। তিনি আরশে আযিমের ওপর স্বমহিমায় সমাসীন; তবে তাঁর 'ইলম ও কুদরত জগতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ড. আহমদ আলী, *যুবদাতুল বায়ান ফী ঈদাহিল কুরআন* (ঢাকা : প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০১৯), খ.১, পৃ. ৫৩-৫৪

১৪. আল-কুর'আন, ৪ : ১

১৫. সংস্কৃতি শব্দের ইংরেজি ও আরবি প্রতিশব্দ যথাক্রমে Culture ও ثَقَافَةٌ، تَمَدُّن; এর সাধারণ বোধগম্য অর্থ হলো উত্তম বা উন্নতমানের চরিত্র। দ্র. এ. রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০), পৃ. ২৫১; এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে, সংস্কার, অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতিনীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি। দ্র. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, তা. বি.), পৃ. ৮০০; সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদানে টি. এস. ইলিয়ট বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, নৃত্য-সংগীত, নৈতিক মূল্যবোধ, আইন-কানুন, রীতিনীতি এবং সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ যা কিছু অর্জন করে তার সমষ্টিগত নাম কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। দ্র. উদ্ধৃত : *অগ্রপথিক*, জুলাই, ১৯৮৭, পৃ. ২৪; কুর'আন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে পরিচালিত মানবজীবনের সকল কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপ ও আচরণই হচ্ছে ইসলামি সংস্কৃতি। দ্র. অধ্যাপক হাসান আইয়ূব, অধ্যাপক মওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ্ অনূদিত, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ১৯

১৬. সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা : গোল্ডেন বুক হাউস, ১৯৬৭), পৃ. ৬

বিবাহ (২) মুসলিম পীরের হিন্দু মুরিদ এবং হিন্দু যুগির মুসলিম শিষ্য (৩) মুসলিম মানসে হিন্দু চিন্তাধারা ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব এবং (৪) ধর্মান্তরের অসম্পূর্ণতা অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষার নির্ভরযোগ্য পটভূমি ব্যতিরেকে ইসলাম গ্রহণ।[১৭]

মুসলিমগণের সাথে হিন্দুধর্মের সুদীর্ঘকালের সুসম্পর্কের ফলে স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত ধর্মবিধি ও আচারাদি গড়ে উঠেছিল তার ওপর ভিত্তি করেই এ ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল; পবিত্র কুর'আন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শের সাথে যদিও তার কোনো মিল ছিল না। মহৎ ব্যক্তিদের সমাধিস্থলে অসংখ্য পূজাপার্বণ উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। মুসলিমগণের সমাজ জীবনে দৈনন্দিন কাজকর্মে ভোগ বিলাসিতার অনুপ্রবেশ এবং পুতুল প্রীতিতে উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৮]

ইসলামে পৌত্তলিকদের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সম্রাট আকবর (১৫৪২–১৬০৫ খ্রি.) ইসলামের এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। তিনি নিজের মুসলিম স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত কঠোর আচরণ করতেন। অপরদিকে, জয়পুরের রাজা বিহারী মল (১৪৯১–১৫৭৪ খ্রি.) এর রূপসি দুহিতা জোধাবাঈ (১৫৪২–১৬২৩ খ্রি.) কে বিবাহ করে মহিষীরূপে গ্রহণ করেছিলেন।[১৯] সম্রাট আকবরের একাধিক হিন্দুপত্নী ছিল বলে জানা যায়। সে সময় হিন্দু রাজাগণ সম্রাট আকবরের নিকট তাদের কন্যা সম্প্রদান করে তাদের স্বার্থ হাসিল করতেন। তার হিন্দু পত্নীগণ রাজপ্রাসাদে মূর্তিপূজা ও যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে পালন করতেন। সেই সময়ে মোগল বাদশাহের শাহিমহল মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজার মন্দিরে পরিণত হয়েছিল।[২০]

এভাবে আকবরের ওপর হিন্দু পত্নীদের পাশাপাশি হিন্দুধর্মেরও বিরাট প্রভাব পড়েছিল। এই সব মহিষীর গর্ভে যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল তাদের মন-মানসিকতার ওপর পৌত্তলিকতার ছাপ কতখানি ছিল তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। এর স্বাভাবিক পরিণাম হিসেবে দেখা যায়, হিন্দু পত্নীর গর্ভজাত সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৫৬৯–১৬২৭ খ্রি.) দেওয়ালি পূজা করতেন এবং শিবরাত্রিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও যোগীদেরকে তাঁর সাথে একত্রে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করতেন। তাঁর শাসনের অষ্টম বৎসরে আকবরের সমাধিসৌধ সেকেন্দ্রায় হিন্দু মতানুসারে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করেন। শাহাজানের পুত্র দারা শিকোহ (১৬১৫–১৬৫৯ খ্রি.) তাঁর রচিত *'মাজমাউল বাহরাইন'* নামক গ্রন্থে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন।[২১]

সম্রাট আকবরই সর্বপ্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য 'দীনে ইলাহি' নামে নতুন ধর্মের প্রবর্তন করেন। এই নতুন ধর্মের অধিকাংশ কার্যকলাপ ইসলাম

---

১৭. Murry T. Titus, *Islam in India and Pakistan : A Religious History of Islam in India and Pakistan* (Madras : The Diocesam Press, 1959), pp. 160-161; আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৯), পৃ. ১৬

১৮. ড. এ.আর. মল্লিক, *ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলিম* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ. ১

১৯. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* (ঢাকা : আজাদ অফিস, ১৯৬৫), পৃ. ১২৯; সুরজিৎ দাশ গুপ্ত, *ভারতবর্ষ ও ইসলাম* (কলিকাতা : সঙ্কর প্রকাশন, ১৩৮৩), পৃ. ৭২

২০. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

২১. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০০), পৃ. ৬১

বিরোধী ছিল। সম্রাট আকবর এই নতুন ধর্মের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম সবাইকে একই জাতিতে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি।[২২]

ভারতীয় মুসলিম সমাজের এহেন অধঃপতনের পশ্চাতে একাধিক কারণ বিদ্যমান ছিল। অনেকে প্রকৃত শিক্ষাহীনতাকে এর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু দেখা যায়, অভিজাত শিক্ষিত সমাজেও ঐসব আচার-বিধি প্রচলিত ছিল। ধর্মের আদেশকে অস্বীকার বা অনুধাবনের অভাবও এর অন্যতম কারণ হতে পারে। হতে পারে তদাপেক্ষাও বড়ো কারণ সমাজতত্ত্বের মধ্যে নিহিত; কেননা, ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ দীর্ঘ দিন হিন্দুদের সাহচর্যে থাকার ফলে তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আদর্শকে প্রায় ভুলে গিয়েছিল। এই সব কারণে তাদের মধ্যে শ্রেণিবৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং তারা ইসলামের সাম্যনীতি ও ভ্রাতৃত্বের প্রতি আঘাত এনেছিল। আর এ বিভক্তির কারণে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়নি।[২৩] মুসলিম সমাজের এহেন অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে ইতিহাসবিদগণ বলেন,

> ‘মুসলিম সমাজে পৌত্তলিক ভাবধারা অনুপ্রবেশের প্রধানতম কারণ হলো ভারতীয় নওমুসলিমগণের পৌত্তলিক থেকে অর্ধমুসলিম (Half-Conversion) হওয়া।’[২৪]

অনেকে মোগলদের আধিপত্য লাভ এবং মোগলবংশে সম্রাট আকবরের অভ্যুদয়কে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন।[২৫]

ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ গঠন কাঠামোর বিন্যাসে হিন্দু প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যদিও ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম। এতে নেই বর্ণবৈষম্য; নেই ছোটো-বড়ো, উঁচু-নিচু ও জাত-পাতের ভেদাভেদ; নেই কোনো বংশগত কৌলীন্যপ্রথা। সব মানুষ চিরুনির দাঁতের মতো সমান ও সমকক্ষ। কেননা সবাইকে একজন স্রষ্টাই সৃষ্টি করেছেন এবং সবাই একই রবের ‘ইবাদত করে। তাই বর্ণ, দেশ ও জাতীয়তা বা অন্যকিছু তাদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। পার্থক্য নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি হলো তাকওয়া ও খোদাভীরুতা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقَاكُمْ অর্থাৎ ‘তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি।’[২৬] রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বিদায় হজের ভাষণে সাম্যের মূলনীতি ঘোষণা করে বলেছেন,

> يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى...
>
> অর্থাৎ ‘হে মানবমণ্ডলী, নিশ্চয় তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতাও এক। জেনে রেখো, অনারবের ওপর কোনো আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব

২২. হুমায়ন আবদুল হাই, *মুসলিম সংস্কার ও সাধক* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৬), পৃ. ২১

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

২৪. আবু ইয়াহইয়া আন-নওশাহরবি, *তারাজিমে উলামায়ে হিন্দ* (ফয়সালাবাদ : জামি‘আ সালাফিয়্যাহ, ১৯৮১), খ.১, পৃ. ২৭৭

২৫. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭-১৩৩

২৬. আল-কুর’আন, ৪৯ : ১৩

নেই। কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের এবং শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হবে কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে... ।'[২৭]

তারপরও সময়ের ব্যবধানে আর্থিক আনুকূল্য, রাজনৈতিক সুবিধাভোগ ও অনুদান গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক জীবনে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। এ পরিবর্তনের ফলে সমাজে অনেক স্তর, শ্রেণি ও বর্ণবৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।[২৮] তখনকার সময়ে গ্রামাঞ্চলে মুসলিমগণের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ছিল এ রকম, সবচেয়ে উপরের স্তরে ছিলেন জমিদারশ্রেণি। তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তারপরের স্তরে ছিলেন বেশ কিছু সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী তালুকদার বা ক্ষুদ্র ভূস্বামী। এরপর ছিলেন ছোটো-খাটো ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শিল্পের কারিগর শ্রেণি। আর সর্বনিম্নে ছিলেন গ্রামীণ জনসাধারণ; যারা মসজিদের ইমামতির সাথে মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। অপর একটি শ্রেণির উল্লেখ করা যেতে পারে, যারা ছিলেন বৈরাগী; যেমন : ফকির, দরবেশ ও বাউল। গ্রামীণ সমাজে তাদের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। এ সকল মানুষ ধর্মীয় আচারানুষ্ঠান পালন করার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন।[২৯]

ভারতীয় উপমহাদেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সূচনাপর্ব থেকে হিন্দু রাজত্ব চলে আসছে। তৎকালীন হিন্দু সমাজ শ্রেণি, বংশ, রক্তগত কৌলীন্যে, জাতিভেদ প্রথায় জর্জরিত ছিল। এ সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের লোকেরা উচ্চবর্ণের লোকদের কাছে কোনো প্রকার মানমর্যাদা পেত না। ভারতীয় সমাজ বর্ণ ভিত্তিক প্রধান চারটি জাতিতে বিভক্ত ছিল; যেমন, ব্রাহ্মণ (গণক ও পুরোহিত বা ঠাকুর), ক্ষত্রিয় (অভিজাত ও সৈনিক বা যোদ্ধা সম্প্রদায়), বৈশ্য (কৃষক ও বণিক সম্প্রদায়) ও শূদ্র (সেবক, দাস ও নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত)। প্রতিটি বর্ণ আবার বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। তাদের পরস্পরের মধ্যে খানাপিনা এবং বিবাহ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল; এমনকি সে সময়ে প্রায় ৮৪ (চুরাশি) প্রকার ধর্ম ও মতে বিশ্বাসী লোক পাওয়া যায়। এ সবের প্রভাবে পরবর্তীকালের মুসলিম সমাজ জর্জরিত হয়েছিল; কারণ ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলিম ছিল ধর্মান্তরিত।[৩০] জে. ডি. কানিংহাম (১৮১৪–১৮৯৩ খ্রি.) মন্তব্য করেছেন যে,

> Mohammedans are divided into four great classes, distinguished by the appellations Syed, Sheikh, Mogol, and Putt'hans.[৩১] 'ভারতীয় মুসলিম সমাজ হিন্দুদের চার বর্ণের সাদৃশ্যে সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান, এ চার শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল।'

আর. লেভি সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভারতের মুসলিমকে আশরাফ, আযলাফ/ আতরাফ ও আরজাল, এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। আশরাফ বা সম্ভ্রান্ত উচ্চশ্রেণির মুসলিম বিদেশাগত 'আরব, পারসিক, আফগানের বংশধর এবং উচ্চবর্ণের হিন্দু উত্তম পুরুষ। আজলাফ/ আতরাফ দ্বিতীয় দেশজ মুসলিম।

---

২৭. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ* (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮), হাদিস নং, ২২৯৭৮, পৃ. ৪৭৮ ; আহমদ ইবনুল হুসাইন বায়হাকি, *শু'আবুল ঈমান* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৯৮৯), খ.৭, হাদিস নং ৪৭৭৪, পৃ. ১৩২

২৮. ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান, *তারীখুল ইসলাম* (কায়রো : মাকতাবাতুন নাহ্‌দাতিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৯১), পৃ. ৫৮৬-৫৮৯; সৈয়দ হাশিম 'আব্দুল 'আযিয আল-গাযুলি, *ইবনুল জাওযি* (দিমাশক : দারুল কলম, ২০০০), পৃ. ৫৯-৬০

২৯. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩), খ.৬, পৃ. ৩৩৫

৩০. কোকা আন্তোনভা ও অন্যান্য, মঙ্গল চারণ চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিজেনশর্মা অনূদিত, *ভারত বর্ষের ইতিহাস* (কলিকাতা : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮২), পৃ. ২৬৩-২৬৪; কে. এম. আশরাফ, *হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্চা* (কলিকাতা : কলিকাতা পাবলিকেশর্স, ১৯৯৪), পৃ. ১২২

৩১. Jaffur Shurreef, Edited by Gerhard Andreas Herklots, *Qanoon-e-Islam, or the Customs of the Moosulmans of India* (London : Parbury, Allen, and Co 1832), p. 4

ভারতবর্ষের স্থানীয় অধিবাসী যারা ধর্মান্তরসূত্রে মুসলিম হন, মূলত তারাই এ শ্রেণিভুক্ত। কৃষক, কলু[৩২], দরজি প্রভৃতি পেশাজীবীরা আজলাফ/ আতরাফ শ্রেণির মুসলিম। আরজাল বা সর্বনিম্ন শ্রেণি হচ্ছে হালালখোর, লালবেগি, আবদাল, বেদিয়া প্রভৃতি নিম্নস্তরের পেশাজীবী মুসলিম। উচ্চতর দু'শ্রেণির সাথে এদের কোনো ধরনের সামাজিক সম্পর্ক ছিল না। সামাজিক অনুষ্ঠানে উপস্থিতি, এমনকি মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত শ্রেণিবৈষম্য কার্যকর ছিল।[৩৩]

আবুল হাসান আলি নদবি (রহ.) (১৯১৩–১৯৯৯ খ্রি.) ভারতের বর্ণবৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে বলেছেন, ভারতের বর্ণবৈষম্যের নীতি পাশবিকভাবে চর্চিত হয়েছিল। পৃথিবীর কোনো মানবগোষ্ঠীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের চেয়ে চরম বর্ণবিদ্বেষ, বর্ণে-বর্ণে বিপুল পার্থক্য এবং মানবমর্যাদার ভয়ানক ভুলুণ্ঠন সম্পর্কে জানা যায়নি।[৩৪] আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নদবি (রহ.)ও বর্ণবৈষম্যের অনুরূপ একটি চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি বলেছেন, তৎকালীন সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার মানুষকেও নানা স্তরে বিভাজিত করে রেখেছিল। মানুষের মধ্যে দুটি শ্রেণি নির্মাণ করেছিল। অভিজাত শ্রেণি ও নিম্নবর্গীয় শ্রেণি। প্রথম শ্রেণি অতি উঁচু স্তরের এবং দ্বিতীয় শ্রেণি অতি নিচু স্তরের। হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় দেবতা ব্রাহ্ম। তার মাথা থেকে অভিজাত শ্রেণির মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা অভিজাত ও মনিব। আর নিম্নবর্গীয় শ্রেণির মানুষকে তার পা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা নীচ ও সেবাদাস। অবশিষ্ট সবাই বড় দেবতার হাতের সৃষ্টি। তারা মধ্যবর্তী স্তরের। স্বাভাবিকভাবেই এমন অপবিশ্বসের পরিণতি ছিল মানুষের বংশ ও গোষ্ঠী অনুযায়ী নানান বর্ণ ও নানান স্তরে বিভক্ত সমাজ। ভারত তখন বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রের আভিজাত্য প্রদর্শনের কুরুক্ষেত্র ছিল।[৩৫]

ইসলাম ধর্মে বর্ণবৈষম্য নিষিদ্ধ হলেও বাঙালি মুসলিমগণের মধ্যেও হিন্দুদের প্রভাবে তা দেখা দেয়। যদিও হিন্দুদের মতো তত কঠোর বর্ণবৈষম্য এবং পুরোহিত শাসন ছিল না, তথাপি কার্যত মুসলিমগণ ভারতের সর্বত্র বংশগৌরবের ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট বৈষম্যবোধ গড়ে তুলেছিল।[৩৬] বিশেষ করে, সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারায় মুসলিমগণের মধ্যেও সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস গড়ে ওঠে। কুলীন ও অকুলীন এই দু'শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যায় তারা। কুলীন বলতে সাধারণত সৈয়দ, শেখ (আরব), পাঠান[৩৭] ও মোল্লাদের বোঝাত।[৩৮] গরিবরা ছিল অকুলীন। কুলীন মুসলিমগণ অকুলীন মুসলিমগণের চেয়ে নিজেদের সভ্য ও শিক্ষিত মনে করত। তাদের অবস্থান, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, বিনোদন

---

৩২. ঘানিতে তৈলবীজ পেষণ করে তেল উৎপাদন যার পেশা। দ্র. জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০১৮), পৃ. ২৭৯

৩৩. মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস* (ঢাকা : আজাদ অফিস, ঢাকেশ্বরী রোড, ১৯৬৫), পৃ. ১২৯

৩৪. আবুল হাসান আলি নদবি, *মাযা খাসিরাল 'আলামু বিইন্‌হিতাতিল মুসলিম* (রিয়াদ : মাকতাবাতুল ঈমান, ২০১৪), পৃ. ৬৮-৭৬

৩৫. সাইয়িদ সুলায়মান নদবি, *আস-সিরাতুল নাবাবিয়্যাহ্* (বৈরুত : দারু ইবনে কাসির, ২০০২), পৃ. ৫২৩; আবুল হাসান আলি নদবি, *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু 'আলাল ইনসানিয়্যাহ* (বৈরুত : দারু ইবনে কাসির, ১৯৯৯), পৃ. ২৪-২৭

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩; মুহাম্মদ আবদুস সালাম, *মাওলানা রুহুল আমীন : জীবন ও কর্ম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ১০

৩৭. পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী। দ্র. জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

৩৮. আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), পৃ. ৬৮

ইত্যাদি পৃথক ছিল। এমনকি বিয়ে-শাদিতেও একসাথে বসে আহার করত না। এদের মধ্যে রাষ্ট্রপ্রধানদের আত্মীয়-স্বজন, মন্ত্রীবর্গ, নেতা, লেখক, বিচারক, 'আলিম-'উলামা, কবি-সাহিত্যিক প্রমুখ ছিলেন। এদের অবস্থান ও চলাফেরা যেমন অন্যান্য সাধারণের তুলনায় উন্নত ছিল, তেমনি এদের পোশাক-পরিচ্ছদেও ছিল শ্রেষ্ঠত্বের ছাপ; যা তাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত করত।

অপরদিকে অকুলীনদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, আনন্দ-বিনোদন ইত্যাদি ছিল একেবারে সাধারণ ও সাদামাটা। এরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। জাতিসত্তার দিক থেকে এরা ছিল মিশ্র জাতিসত্তার অধিকারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসার ঘটায় এবং অর্থনৈতিক কারণে সমাজ বিবর্তনের ধারা পরিবর্তন হওয়ায় কুলীন সমস্যার অনেকটা বিলুপ্তি ঘটে।[৩৯]

১৩২৬ বাংলা/ ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে 'আল-এসলাম'[৪০] মাসিক পত্রিকার ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় মোহাম্মদ ময়জুর রহমান লিখিত 'সমাজ চিত্র' নিবন্ধে তৎকালীন বাঙালি মুসলিমগণের একটি সামাজিক চিত্র ফুটে ওঠে। তিনি লিখেন, ...'শরিফ মোছলমানগণ অশরিফ মোছলমানগণকে সভ্য হইতে ও বিদ্যার্জন করিতে দিতে বড়ই নারাজ, পাছে অশরিফেরা নিজেকে শরিফ বলিয়া ফেলে আর শরিফের সমকক্ষ হয়। শরিফগণ মনে করে যে তাহাদের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, আত্মা যাহা কিছু আছে সবই পৃথক, অশরিফগণের একটার সহিতও মিল নাই। অতএব, শরিফগণ যাহার অধিকারী অশরিফগণ তাহার অধিকারী নহে।'[৪১]

উক্ত পত্রিকার ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ, ১৩২৬ বাংলা/ ১৯১৯ খ্রি.) মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী (১৮৭৫–১৯৫০ খ্রি.) 'সমাজ সংস্কার' প্রবন্ধে লিখেন, 'উত্তর বংগে বাদিয়া, নিকারী ও আসামের মাঠীয়া উপাধি বিশিষ্ট মোছলমানগণ এক সংগে অন্য মোছলমানের সহিত বসিয়া আহার করা দূরে থাকুক, এক মছজেদে, এক ঈদগাহ বা মাঠে নামাজ পড়িতেও পারে না। ছালাম আদান-প্রদানের অধিকারীও নহে। জুমা জমাতে তাহারা শরীক হইতে পারে না। মধ্য বংগে নদীয়া, চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে কোন নীচু জাতীয় হিন্দু মোছলমান হইলে তাহাকে সমাজে নেয়া হয় না, জুমা জামাতে শরিক করা হয় না।'[৪২] ফুরফুরা দরবার শরিফের[৪৩] পীর হযরত আবু বকর ছিদ্দিকী[৪৪] (রহ.)-এর সাথে যে ঘটনাটি ঘটে তাতে তৎকালীন সময়ের কৌলীন্যপ্রথার চিত্রটি আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

---

৩৯. আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩ ও ৮৪

৪০. আল্-এসলাম ১৯১৪/১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে 'আন্জুমানে ওলামায়ে বাঙালা'র মুখপত্র হিসেবে 'আল্-এসলাম' নামক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মওলানা ফখরুদ্দীন আহমদ নিযামপুরী, ফজলুল হক সেলবর্ষী সহকারী হিসেবে সম্পাদনা বিভাগে কাজ করেন। ড. কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, কবি গোলাম মোস্তফা, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, কায়কোবাদ, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রমুখ এ পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। দ্র. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ৩৬৮ (পাদটীকা ৮)

৪১. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৮৩১–১৯৩০)* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭) পৃ. ৬২; মুহাম্মদ আবদুস সালাম, *মাওলানা রুহুল আমীন : জীবন ও কর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৪২. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৮৩১–১৯৩০)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৪৩. ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত বালিয়া ও শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন ফুরফুরা ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন স্থান। এ স্থান অনেক শহিদ ও ওলিকে বুকে ধারণ করে আছে বলে এটি 'গঞ্জে শুহাদা' নামে বিখ্যাত। 'গঞ্জে শুহাদা'র অপর নাম 'পুরফরাহ'। পুর অর্থ পূর্ণ, 'ফরাহ' অর্থ আনন্দ। অত্যাচার, অবিচার, বর্ণবৈষম্য থেকে উদ্ধার পেয়ে এ অঞ্চলের জনগণ

সাতক্ষীরার এক মেথরের মেয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন; দশ পারা কুর'আন শরিফ মুখস্থ করেন। তসির উদ্দিন নামক সেখানকার এক মাতব্বর এই হাফেযা মেথর মেয়েটিকে বিয়ে করেন। এতে সাতক্ষীরার মুসলিম সমাজ মাতব্বরকে একঘরে করে রাখে। তাঁর সাথে সামাজিক আদান-প্রদান বন্ধ করে দেয়; কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়; লেনদেন বন্ধ করে দেয়। এলাকার কেউই তাঁর সাথে কথা বলে না। সামাজিক বয়কটের ফলে বেচারা তসির উদ্দীন মাতব্বরের অবস্থা খুবই শোচনীয় পর্যায়ে চলে যায়। জীবনে নেমে আসে চরম সংকট। লেনদেন করতে না পারার কারণে জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ; এমনকি চুলায় আগুন জ্বলাও বন্ধ হয়ে গেল।

এই বিপন্ন জীবন নিয়ে তিনি একদিন সস্ত্রীক আবু বকর ছিদ্দিকী (রহ.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সবিস্তারে অবগত করেন। তাঁর দুঃখের কাহিনি শুনে পীরসাহেব হুজুর খুবই মর্মাহত হন। তখন পীরসাহেব হুজুর তাঁর স্ত্রীকে সর্দারের স্ত্রীর এঁটো ভাত-তরকারি খাওয়ালেন এবং নিজে তসির উদ্দীন সর্দারের এঁটো ভাত-তরকারি খেলেন; এবং লোকদের সামনে এ-বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা কী, তা তুলে ধরলেন। তখন লোকেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তসির উদ্দীনের পরিবারকে সাদরে গ্রহণ করল।[৪৫]

সমাজের এই অনাচার ও কুসংস্কার মওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর যুগেও প্রকাশ পায়। ধনী ও গরিবের মধ্যে বিস্তর বৈষম্য দেখা দেয়। তিনি সমাজের এই বিভেদ-বৈষম্য দূর করার চেষ্টা চালান। তিনি দেখেন, বিভিন্ন মেজবান-বিয়ে-শাদিতে ধনীদের পাশে বসে গরিবরা আহার করতে লজ্জাবোধ করতেন। ধনীরাও গরিবদের প্রতি মনিবসুলভ আচরণ করতেন। এ সমস্ত খুঁটি-নাটি বিষয়গুলিও দূরীভূত করার জন্য শায়খ মওলানা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সমাজের কৌলীন্যপ্রথা, জাতপাতের বিভেদ, সমাজের নানান অনাচার-দূরাচার দূর করার জন্য স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি সমাজ ও দেশের মানুষকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করার জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। একটি আলোকিত দেশ গড়ার জন্য আলোর মশাল নিয়ে তিনি দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেছেন।

পূর্ণ আনন্দ লাভ করেছিলেন। পুরফরাহ-এর অপভ্রংশ ফুরফুরা। আবার কারো কারো মতে, ফুরফুরা 'ফারে ফারাহ' হতে উৎকলিত; অর্থ, জাঁকজমকময় আনন্দ। আবার কেউ বলেন, ফুরফুরা 'ফরফরা' হতে নিস্পন্ন; অর্থ- দ্রুত। এ অঞ্চল মুসলিমগণের দ্রুত অধিকারভুক্ত হয়েছিল বলে 'ফুরফুরা' বলা হয়। দ্র. ড. মুহাম্মদ আবদুস সালাম, *ফুরফুরা শরীফের তিন পথিকৃৎ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৬), পৃ. ১৭-১৮

৪৪. মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হুগলী জেলার ফুরফুরায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হয়। মাতার তত্ত্বাবধানে সীতাপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন ও পরে 'হুগলী মাদ্‌রাসা' থেকে জামায়াত-এ-উলা (ফাযিল) পাস করেন। হাফেজ মওলানা জামালুদ্দিনের নিকট হাদিস, তাফসির ও ফিক্‌হ এবং সুফি ফতেহ আলি ওয়াইসি (রহ.)-এর নিকট আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। আজীবন তিনি ইসলাম প্রচার, মুসলিম সমাজ থেকে অনাচার ও কুসংস্কার দূরীকরণে এবং নানান প্রকার ইসলাম বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৭ মার্চ, ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ. ৩০০

৪৫. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, 'ফুরফুরার পীর হযরত মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.)', *আল-আছরার* (বিশেষ প্রকাশনা) (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৪), পৃ. ৭১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

সমাজ পরিবর্তন তথা কোনো জাতির উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হলো শিক্ষা। সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ, ক্রমবিকাশ ও গতিশীলতায় এর প্রভাব অনস্বীকার্য। অনাদিকাল হতে সমাজ ও শিক্ষার এ ধারা একই খাতে প্রবহমান এবং পরস্পরের রূপায়ণ ও উন্নয়নে একে অন্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে আসছে। আর তাই কোনো সমাজের উন্নয়ন তথা পরিবর্তনের মূল উপাদান হলো সে সমাজের মানুষের শিক্ষাব্যবস্থা।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির আছে নিজস্ব শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। অবিভক্ত ভারতের মুসলিমগণেরও ছিল নিজস্ব শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি আবর্তিত হতো ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শকে কেন্দ্র করে। মুসলিমগণ চিরকালই জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ঐ সময়ের জ্ঞানচর্চা সম্পর্কে ড. এ. আর. মল্লিক (১৯১৮–১৯৯৭ খ্রি.) লিখেছেন,

> ‘মুসলিমগণ বরাবরই শিক্ষাকে অধিক গুরুত্ব দিতো। এটা তাদের নবি (সা.)-এর নির্দেশ যা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। তা যত কষ্টসাধ্য কিংবা ব্যয়বহুল হউক না কেন।’[৪৬]

মুসলিমগণই একসময় জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে তমসাচ্ছন্ন ইউরোপকে আলোকিত সভ্যতা উপহার দিয়েছিল। ভারতীয় মুসলিমগণের প্রথা ছিল, যখন কোনো সন্তানের বয়স চার বৎসর, চারমাস, চারদিন পূর্ণ হতো তখন তার শিক্ষার সূচনা হতো। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পবিত্র কুর’আনের সবক দেয়া হতো এবং শিশু তা পুনরাবৃত্তি করত। এ ছিল প্রতি মুসলিম পরিবারের অপরিহার্য প্রথা।[৪৭]

অনাদিকাল হতে সমাজ ও শিক্ষার এ ধারা একই খাতে প্রবহমান এবং পরস্পরের রূপায়ণ ও উন্নয়নে একে অন্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে আসছে। উপমহাদেশে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মূলত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার ঘটে ব্রিটিশ আমলে; তবে প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগের অবক্ষয়ের কালেও এদেশে দেশীয় সনাতন শিক্ষার প্রচলন ছিল। প্রাচীন ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় শিক্ষার প্রতি সরকারের সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঐ মনোযোগের কারণে ভারতীয় পণ্ডিতগণ গণিত, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে তদানীন্তন বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ও ইতিহাসবিদ ফ্রিডরিশ ম্যাক্সমুলার (১৮২৩–১৯০০ খ্রি.) সরকারি নথিপত্র ও মিশনারিদের বিবরণ থেকে দাবি করেন যে, ইংরেজরা যখন দেশে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে তখন শুধু বাংলাদেশে ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় (মক্তব) ছিল।[৪৮]

ব্রিটিশ আমলেই এদেশের শিক্ষা পরিস্থিতি জরিপের প্রথম ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়। মিশনারি ও সাংবাদিক উইলিয়াম অ্যাডাম (১৬৮৯–১৭৪৮ খ্রি.) বাংলা ও বিহারে পরপর তিনটি জরিপ

---

৪৬. এম. আর. মল্লিক, *ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ. ৪

৪৭. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০

৪৮. আবদুল ওয়াহিদ, *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি* (ঢাকা : ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০১), পৃ. ৩১-৩২

(১৮৩৫–৩৮) চালিয়েছেন; মূলত এটিই ছিল এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানের ভিত্তি।[৪৯] উক্ত রিপোর্টে জানা যায়, এ সময় শিক্ষাব্যবস্থার স্তর ছিল দু'টি: উচ্চশিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা। উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল টোল,[৫০] চতুষ্পাঠী,[৫১] মক্তব[৫২] ও মাদ্‌রাসা। প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পাঠশালা ও মক্তব নামেই অভিহিত হতো।[৫৩] তবে সে যুগে হিন্দু-মুসলিম উভয় শিক্ষার পাঠ্যসূচি ছিল ধর্মাশ্রয়ী। তবু বাংলা স্কুল বা পাঠশালাসমূহের পাঠ্যসূচি অধিকতর ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। এতে বাংলা লিখন, পঠন-পাঠন, চিঠিপত্র লেখা ও ব্যাবহারিক অঙ্ক শেখানো হতো।[৫৪] প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষার সকল ব্যবস্থা ছিল অবৈতনিক। মুসলিম শাসকমণ্ডলী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন।[৫৫] উইলিয়াম উইলসন হান্টার[৫৬] বলেন,

৪৯. আবদুল্লাহ্ আল-মুতী, *আমাদের শিক্ষা কোন পথে* (ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ১৯৯৬), পৃ. ৫-৬

৫০. ব্রাহ্মণদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য গড়ে তোলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম টোল। এখানে অন্য কোনো সম্প্রদায়ের সন্তানদের লেখাপড়ার কোনো সুযোগ ছিল না। এখানে শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষায় তাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় করত সেটি হলো, 'Vain and empty subtleties, grammatical niceties and metaphysical discourses'. দ্র. উদ্ধৃত : Nemai Sadhan Bose, *Indian Awakening and Bengal* (Calcutta : Anaada Press & Publications Ltd, 3rd Revised Ed., 1976), p. 93

৫১. যে বিদ্যালয়ে চারটি বেদ বা ব্যাকরণ কাব্য স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র পড়ানো হয়। জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৪

৫২. মক্তব আরবি শব্দ; এটি একবচন, বহুবচনে মকাতিব। আভিধানিক অর্থ লিপিভুক্ত করার স্থান। মাদ্‌রাসা, স্কুল এবং প্রশিক্ষণ শিবির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যে প্রতিষ্ঠানে ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা প্রদান করা হয় তাকে মক্তব বলা হয়। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, ১৬শ খণ্ড (২য় ভাগ), পৃ. ৪১২; অন্য কথায় মক্তব হলো, মুসলিম ছেলে-মেয়েদের ইসলামি বুনিয়াদি শিক্ষা প্রদানের প্রাথমিক স্কুল, যেখানে নামায, রোযা সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন, আরবি হরফ পাঠের মাধ্যমে কুর'আন পাঠের শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিষয়ের মাস'আলা-মাসায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। দ্র. Dr. A. K. M. Ayub Ali, *History of Traditional Islamic Education in Bangladesh* (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1983), p. 63; Shamsul Alam, *Islamic Thought* (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1986), p. 133

৫৩. মোহাম্মদ আজহার আলী, *শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬), পৃ. ১১-২১; ড. অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস* (কলিকাতা : মৌলিক লাইব্রেরী, ১৯৮১), খ.২, পৃ. ১২০; ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে সরকারিভাবে প্রকাশিত '*Indian Education Policy*' নামক গ্রন্থের বর্ণনা, 'In former times the higher education of Muhammadans was in the hands of men of learning who devoted themselves to the instruction of youth. Schools were attached to mosques and shrines, and supported by state grants in cash or land, or by private liberality...The course of study in a Muhammadan place of learning included grammar, rhetoric, logic, theology, metaphysics, literature, jurisprudence, and science. The classes of the learned instructors have been replaced by *madrasas* or colleges of a more modern type founded by the liberality of pious persons.' দ্র. *REPORT OF THE COMMISSONER OF EDUCATION FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1906* (WASHINGTON : GOVERNMENT PRINTING OFFICE, 1907), V.1, p. 124; দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *জালালাবাদের কথা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), পৃ. ১৮১

৫৪. ইমরান হোসেন, *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ৩১

৫৫. সাইয়্যিদ আলতাফ আলী, *হায়াতে হাফিজ রহমত খান* (বাদায়ুন : নেযামি প্রেস, তা. বি), পৃ. ১৮৩

৫৬. স্যার উইলিয়াম হান্টার (১৮৪০–১৯০০ খ্রি.) ইংরেজদের ভারতীয় সিভিল-সার্ভিস কর্মচারী ও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আসেন এবং ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে '*Annals of Rural Bengal*' গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্ট্যাটিসটিক বিভাগের মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। '*A Brief History of the Indian Peoples*' ও '*The Indian Musalmans*' তাঁর বিখ্যাত রচনা। তিনি ভারতের গভর্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে মনোনীত আইনসভার

‘কোনো সন্দেহ নেই, এ ভূখণ্ড যখন আমাদের অধিকারে আসে তখন মুসলিমগণই সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে গণ্য ছিল। তারা মনের দৃঢ়তা ও শারীরিক শক্তির দিক থেকেই নয়; মেধা, রাজনীতি ও কর্মকৌশলের দিক থেকেও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। এতৎসত্ত্বেও তাদের জন্য সরকারি কোনো চাকরি প্রাপ্তির সুযোগ ছিল না। জীবিকা নির্বাহের বেসরকারি ক্ষেত্রগুলোতেও তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকার সুযোগ রাখা হয়নি।’[৫৭]

ইংরেজরা এসে মুসলিমগণের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার সাথে-সাথে শিক্ষাদীক্ষার দ্বারও বন্ধ করে দেয়। অধিকন্তু, বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা ও ইউরোপীয় স্বার্থ উপযোগী নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করে। নতুন এ শিক্ষাব্যবস্থা মুসলিম আদর্শের অনুকূলে ছিল না বিধায় মুসলিমগণের পক্ষে এটি গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে মুসলিমগণ শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়ে।[৫৮] মুসলিম সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হিসেবে ইতিপূর্বে বিদ্যোৎসাহী আমির-ওমরা ও নবাবগণ বহু সম্পত্তি লাখেরাজ[৫৯] দিয়ে রেখেছিলেন।

ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী, সে সময়ে বাংলাদেশের মোট জমির এক তৃতীয়াংশ মসজিদভিত্তিক শিক্ষার জন্য লাখেরাজ হিসেবে বরাদ্দ ছিল।[৬০] ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা ঐ সকল সম্পত্তি ক্রোক করে নিলে শিক্ষাব্যবস্থার অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।[৬১] শুধু তা-ই নয়, ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে হাজি মুহাম্মদ মুহসিন (১৭৩৩–১৮১২ খ্রি.) মুসলিম শিক্ষার জন্য যে সম্পত্তি ওয়াক্ফ করে যান, ইংরেজ সরকার তা থেকেও মুসলিমগণকে বঞ্চিত করে। অধিকন্তু, হুগলীর ইসলামি কলেজকে ইংরেজি কলেজে পরিণত করা হয়।[৬২]

অতিরিক্ত সদস্য, শিক্ষা কমিশনের সভাপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। ভারতীয় মুসলিম সম্পর্কে লিখিত তাঁর গ্রন্থে ১৮শ শতাব্দীর গোড়া থেকে ভারতীয় মুসলিমগণের ধর্মীয় আবেগ, জাতীয় চেতনা ও ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রকৃতি এবং উত্থান-পতনের ইতিহাস পাওয়া যায়। স্যার সায়্যিদ আহমদ ‘*The Indian Musalmans*’-এর সমালোচনা করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ড. সাদিক হুসাইন ‘ہمارے ہندوستانی مسلمان’ শিরোনামে উইলিয়াম হান্টার রচিত ‘*The Indian Musalmans*’ গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন। বইটি বাংলায়ও অনূদিত হয়। দ্র. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত, *বাংলা বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ৭৬৩

৫৭. উইলিয়াম হান্টার, আবদুল মওদুদ অনূদিত, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬) পৃ. ৩৩৭

৫৮. অধ্যাপক আবদুল গফুর, *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৭২

৫৯. লাখেরাজ অর্থ নিষ্কর জমি। মুসলিম শাসনামলে ইসলামি শিক্ষা প্রচারের নিমিত্তে নিয়োজিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারিভাবে শুল্ক-করমুক্ত জমি দান করা হতো। এগুলো লাখেরাজ সম্পত্তি হিসেবে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের নামে ওয়াক্ফকৃত ছিল। এ সমস্ত সম্পত্তি ছিল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান উৎস। দ্র. এস. এস. এম. আবদুল কাদের রহমানী, *বাংলাদেশে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমের সমস্যা ও সম্ভাবনা : একটি সমীক্ষা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২), পৃ. ১৬ (পাদটীকা ১২)

৬০. মুহাম্মদ লুতফুল হক, *ফোরকানিয়া মকতব পরিচালনা পদ্ধতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি. ২০০০), পৃ. ৮১; ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দীন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ২৭

৬১. ছদরুদ্দীন, *বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ৪; মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ‘বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য’, *অগ্রপথিক*, ১৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ. ৭৯

৬২. এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৬), পৃ. ১০৯-১১০; Abdul Karim, *Muhammadan Education in Bengal* (Calcutta : Metealfe Press, 1900), pp. 13-14

উইলিয়াম উইলসন হান্টার (১৮৪০–১৯০০ খ্রি.)-এর মতে, তখন ঐ কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩০০ জন। তাদের মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিল মুসলিম।[৬৩] পণ্ডিত লালা লাজপৎ রায় (১৮৬৫–১৯২৮ খ্রি.)-এর মতে, 'তৎকালে ভারতবর্ষে শিক্ষিতের হার ছিল ৫১%; যা ইংরেজ শাসনামলে অবনত হয়ে ২% এ নেমে আসে।'[৬৪] ফলে ছিটকে পড়ে তারা সমাজের মূলধারা থেকে। মুসলিমগণের সেই স্থানটা দখল করে হিন্দুরা। মুসলিমগণ দীর্ঘদিন সমাজ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু একসময় তাদের বোধোদয় হয়; জেগে ওঠে তারা ধীরে ধীরে। এ প্রসঙ্গে জনৈক ইংরেজ লিখেছেন,

> 'ইংরেজ শাসনের পূর্বে বঙ্গদেশেই ৮০ হাজার মাদ্রাসা ছিল। এর অর্থ হলো, তখন প্রতি ৪শত মানুষের জনপদে ১টি করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এখনও ভারতের ঐ সকল স্থান, যেখানে পুরাতন নিয়মের শিক্ষাব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে, সেখানকার শিশুদের প্রায় সকলে লিখতে ও পড়তে পারে; কিন্তু বঙ্গদেশসহ যে সকল স্থানে আমরা পুরাতন শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছি, সেখানকার গ্রামীণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।'[৬৫]

ড. আবদুল মুন'ইম আল-নমর (১৯১৩–১৯৯১ খ্রি.) বলেন,

> 'সর্বদায় ভারতবর্ষে অসংখ্য মাদ্রাসা ছিল। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই মাদ্রাসার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইংরেজগণ ক্ষমতা গ্রহণ করেই এসব মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়। আস্তে আস্তে তারা বিদ্যার্জন থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।'[৬৬]

ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্পর্কে ইংরেজরা কী ধরনের মানসিকতা পোষণ করত স্যার উইলিয়াম ডিগবি (১৮৪৯–১৯০৪ খ্রি.)-এর মন্তব্য থেকে তার অনুমান মেলে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছেন,

> 'আমার ধারণায় ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণে স্বাধীনতার এই যুগে ৬ কোটি মানুষের ভূখণ্ডে হাতেগোনা কয়েকজন বিদেশির রাজ্য শাসন করে যাওয়ার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। কাজেই যখনই শাসিত লোকজন শিক্ষার আলো লাভ করবে তখন তাদের মধ্যকার সেই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা–যেই কৌশলের ওপর নির্ভর করে আমরা আজও টিকে আছি–সেটি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাদের মননশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তারা নিজেদের অন্তর্নিহিত মহাসম্ভাবনার অনুধাবন করে ফেলবে।'[৬৭]

---

৬৩. সাইয়্যিদ তোফাইল আহমদ মোঙ্গলরি, *মুসলিমু কা রওশন মুস্তাক্‌বিল* (লাহোর : হাম্মাদ আলকুতবি, তা. বি.), পৃ. ১৯১

৬৪. সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানি, *নক্‌শে হায়াত* (করাচি : দারুল ইশা'আত, তা. বি.), খ.১, পৃ. ১৮৩

৬৫. আবদুর রহমান, *তাহরিকে রেশমি রুমাল* (লাহোর : ক্লাসিক উর্দু প্রেস, ১৯৬০), পৃ. ৭৭

৬৬. ড. আব্দুল মুন'ইম আল-নমর, *তারিখুল ইসলাম ফিল হিন্দ* (কায়রো : দারুল 'আহ্‌দিল জদিদ লিত-তাবা'আতি, ১৯৫৯), পৃ. ৩৭০

৬৭. আবদুর রহমান, *তাহরিকে রেশমি রুমাল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮; ভারতের শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এ. হাওয়েল লিখিত '*Education in British India*' নামক গ্রন্থে তার মন্তব্য হলো, 'Education in India under the British Government was first ignored, then violently and successfully opposed, then conducted on a system now universally admitted to be erroneous and finally placed on its present footing.' দ্র. A. Howell, *Education in British India prior to 1854 and in 1870-71* (Calcutta : Superintendent

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করা এবং জ্ঞানচর্চার পথ রুদ্ধ রাখা ছিল ইংরেজদের জঘন্য মানবতাবিরোধী কাজ। খোদ ব্রিটেন থেকেও এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে। এরই প্রেক্ষিতে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হওয়ার দীর্ঘ ৭৭ বছর পর ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষা উন্নয়ন বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি মনোনীত হন টমাস ব্যাবিংটন এডওয়ার্ড ম্যাকলে (১৮০০–১৮৫৯ খ্রি.)। তিনি নৈতিকতার দাবি ও কোম্পানি কর্তৃপক্ষের অসম্মতি–দু'য়ের মধ্যে সমন্বয়পূর্বক ক্লীব ধরনের একটি শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেন।[৬৮] ঐ শিক্ষা কমিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ম্যাকলে নিজে বলেছেন,

> 'আমাদেরকে এমন একটি দল গড়ে তুলতে হবে যারা বস্তুত আমাদের ও আমাদের কোটি কোটি প্রজার মধ্যে অনুবাদকের ভূমিকা পালন করবে। এ দলটি এমন হতে হবে যেন তারা রক্ত ও বর্ণের দিক থেকে থাকবে ভারতীয়; কিন্তু রুচি, চিন্তাধারা, কথাবার্তা, চালচলন ও অনুভূতির দিক থেকে হবে ইংরেজ।'[৬৯]

এ শিক্ষাব্যবস্থার সৃষ্ট ফলাফল সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার (১৮৪০–১৯০০ খ্রি.) বলেন,

> 'হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে যে সব তরুণ ভারতীয় আমাদের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্কুলগুলো থেকে লেখাপড়া শেষ করে বের হয়েছে, তারা সবাই তাদের বাপ-দাদাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। এশিয়ার বহুল সমাদৃত ও ব্যাপক বিস্তৃত ধর্মগুলোকে যখন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার মোকাবেলায় দাঁড় করানো হলো, তখন সেগুলো শুকিয়ে কাষ্ঠে পরিণত হয়ে গেল।'[৭০]

শিক্ষার পর সরকারি চাকরি প্রাপ্তির কোনো সুযোগ না থাকার বিষয়টিও মুসলিমগণকে শিক্ষা গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে। কোনো কোনো স্থানে সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেও চাকরি শুধু হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছিল। এ মর্মে উইলিয়াম হান্টার বলেন,

> 'মুসলিমগণের এখন এতটা নিচে ঠেলে দেয়া হয়েছে যে, সরকারি চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এটা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তাদের

---

of Government Printing), p. 3; মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ* (ঢাকা : জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১০

৬৮. সাইয়্যিদ তোফাইল আহমদ মোঙ্গলরি, *মুসলিমু কা রওশন মুস্তাক্‌বিল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮

৬৯. মেজর বি. ডি বসু, *হিস্ট্রি অব এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া* (কলিকাতা : নাবু প্রেস, ২০১৩), পৃ. ১০৫; আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), পৃ. ৯৭; ম্যাকলের ভাষায়, A class of person Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect. দ্র. মোহাম্মদ ইলিয়াছ আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭

৭০. উইলিয়াম হান্টার, আবদুল মওদুদ অনূদিত, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২; পিতার নিকট লিখিত এক পত্রে ম্যাকলে লিখেছেন, It is my firm belief that, if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence. And this will be effected without any efforts to proselytise. অর্থাৎ 'আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বাঙালিরা ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খ্রিষ্টধর্ম ভাবাপন্ন হয়ে ওঠবে, তাদের মধ্যে পৃথকভাবে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের আবশ্যকতা থাকবে না। পরবর্তী ত্রিশ বছরের মধ্যে এদেশে একজনও মূর্তিপূজক থাকবে না।' দ্র. মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী, *যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

জন্য কোনো চাকরি খালি নেই। তাদের অসহায়ত্বের প্রতি কারো সুদৃষ্টি পড়ছে না এবং এমনকি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের অস্তিত্ব মেনে নিতেও যেন নারাজ।'[৭১]

১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজ সরকার স্বীকার করেছে যে, শিক্ষাদানে তাদের গৃহীত পদ্ধতি হিন্দুদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের নিরিখে তৈরি। এ ব্যবস্থাপনায় মুসলিমদের এতটা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে যে, স্কুলগুলোতে মুসলিমগণের সংখ্যা নগণ্য হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এহেন পরিস্থিতিতে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা।[৭২]

ইংরেজ পূর্বকাল প্রশাসনের সকল পদে প্রধানত ছিলেন মুসলিমগণই। ইংরেজ আমলে সেটার আমূল পরিবর্তন ঘটে। সরকারি পদে তাদের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সরকারি ২১১১টি পদের মধ্যে ইংরেজদের ছিল ১৩৩৮টি, হিন্দুদের ৬৮১টি আর মুসলিমগণের মাত্র ৯২টি।[৭৩] এর অর্থ হলো, এক শতাব্দী যারা প্রশাসনের সর্বত্র বিরাজিত ছিল, ইংরেজ আমলে তাদেরকে মোট চাকরিজীবীদের ২০ ভাগের এক ভাগও প্রদান করা হয়নি।

অফিস-আদালতে প্রচলিত ভাষা পরিবর্তনের কারণেও মুসলিমগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্বে অফিস আদালতের ভাষা ছিল ফারসি। বাংলার প্রতিটি মসজিদ ও মক্তবে ফারসি শিক্ষা দেয়া হতো। গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ, সেকান্দরনামা ইত্যাদি ছিল পাঠ্য পুস্তক।[৭৪] উপমহাদেশের হিন্দুরাও এ ভাষায় শিক্ষা লাভ করত; এমনকি শেখ সা'দির কবিতা[৭৫], কবি হাফিজের গজল ও রুমির মসনবি কথাবার্তায় উদ্ধৃত করতে না পারলে কোনো হিন্দু বা মুসলিমের সন্তান শিক্ষিত হিসেবে গণ্য হতো না। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি সম্রাটের সাথে ইংরেজদের কৃত চুক্তিতে অফিস-আদালতের প্রচলিত ফারসি ভাষা অপরিবর্তিত রাখার অঙ্গীকার ছিল। ইংরেজরা এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ফারসি ভাষা তুলে দেয় এবং সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি চালু করে। মি. মিয়ো বলেন, এ পরিবর্তন সাধন আপাতদৃষ্টিতে একান্ত স্বাভাবিক হলেও তার পরিণতি ছিল সুগভীর। পরিবর্তনের কারণে মুসলিম সমাজ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়।[৭৬]

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পর মুসলিমগণের চিন্তাধারায় পরিবর্তন শুরু হয়। ধীরে ধীরে তারা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। এক্ষেত্রে মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলিমগণের চিরাচরিত ধ্যানধারণায় পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মুসলিম লেখক, সাংবাদিক

---

৭১. উইলিয়াম হান্টার, আবদুল মওদুদ অনূদিত, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

৭২. সাইয়্যিদ মাহমুদুল হাসান, *তারিখুত্‌ তালিম* (বাদায়ুন : নেযামি প্রেস, তা. বি), পৃ. ১৫০

৭৩. মেসবাহুল হক, *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৭৪. ড. অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ২৯৫

৭৫. কবিতার সংজ্ঞা প্রদানে খ্যাতনামা সাহিত্যিক আহমদ হাসান যায়্যাত বলেন, **الشعر هو الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلة البديعة والصور المؤثرة البيعة وقد يكون نثرا كما يكون نظما.** অর্থাৎ 'কবিতা সেই ছন্দোবদ্ধ ও মিলযুক্ত বাক্যকে বলে, যা বিরল চিন্তা, নতুন কল্পনা এবং অর্থপূর্ণ ছবি ও দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে। আর এটা কখনো কখনো গদ্যের মাধ্যমে হয়। আবার কখনো পদ্যের মাধ্যমে হয়।' দ্র. আহমদ হাসান আয-যায়্যাত, *তারিখুল আদাবিল 'আরবি* (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৯৮৭), পৃ. ২৮; ওয়র্ডসওয়ার্থ বলেন, Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge; it is the impassioned expression which is in the countenance of all science.' অর্থাৎ 'কবিতা হলো সকল জ্ঞানের সুকুমার প্রাণশক্তি ও বিশ্বাস বিশেষ। কবিতা এক আবেগময় ভাবের প্রকাশ যা সকল বিজ্ঞান সম্মত।' W. H. Hudson, *An introduction of the study of literature* (London : Harrap and Co. 1949), p. 64

৭৬. সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানি, *নক্‌শে হায়াত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯২

এবং রাজনীতিবিদগণ আরবি ও ফারসি ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলিমগণকে উৎসাহিত করেন।[৭৭] অবশ্য এর কিছু দিন পূর্বে ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম শিক্ষার অগ্রদূত নওয়াব আবদুল লতীফ (১৮২৬–১৮৯৩ খ্রি.) কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ইংরেজি শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেন।[৭৮] ধীরে-ধীরে মুসলিমগণের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের একটি অংশ ইংরেজি শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে। ফলে মুসলিমগণের শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বড়ো রকমের পরিবর্তন সূচিত হয়।[৭৯]

উল্লেখ্য যে, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সময়কার ভারত উপমহাদেশে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। সেগুলো হলো : (ক) পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা (খ) ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা ও (গ) সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ[৮০] আমলে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত কমিশন ও কমিটির প্রস্তাব, সুপারিশ ও সরকারের গৃহীত নীতির সাথে একজন শিক্ষানুরাগী হিসেবে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সচেতন ছিলেন; প্রয়োজন এবং সুযোগমতো এসব বিষয়ে সমালোচনা ও পরামর্শ দিতে এগিয়ে আসতেন। সর্বোপরি, সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সংক্রান্ত ইস্যু দ্বারা তাঁর চিন্তাদর্শন প্রভাবিত ছিল। এদিকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের যে সব আলিম প্রত্যাশিত ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে শাসকবর্গের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে তীব্র দীনি দায়িত্বের অনুভূতি থেকে নিজেদের উদ্যোগে বহু দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তাদের মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) অন্যতম। এসব দীনি প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী দীন[৮১] ও দুনিয়ার সমন্বিত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুদায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

---

৭৭. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.৩, পৃ. ৭৩১; মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৮৩০–১৯৩১)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৭৮. এম. এ. রহীম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫-১৪৬

৭৯. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.) এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান* (চট্টগ্রাম : হোমল্যান্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৪), পৃ. ৭

৮০. বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা বলতে আমরা যা বুঝি প্রাচীন যুগে সে সব এলাকা বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। এক সময় বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গের সবটুকু নিয়ে বাংলাদেশ বোঝাত। আবার কখনও বাংলাদেশ বলতে সমতট, রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ), পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড়, বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ) ও তাম্রলিপ্তি রাজ্য বোঝাত। মোগল আমলে সুবে বাংলা সাতগাঁ, খিলাফাতাবাদ, মাহমুদাবাদ, ফতেহাবাদ প্রভৃতি আঠারোটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার আগে বঙ্গদেশ বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম এ-পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। তখন মোট ২৭টি জেলা ছিল। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গে কুচবিহার ও পূর্ববাংলার সীমান্তে ত্রিপুরা, এ দুটি দেশীয় রাজ্য ছিল। এ সময়ে বর্তমান ভারতের আসাম ও বিহার প্রদেশের সাথে বঙ্গদেশের কিছু কিছু অংশ, যেমন : সিলেট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, মানভূম জেলা ও সিংহভূমের ধলভূম পরগনা সংযুক্ত ছিল। ১৯৪৭-এর আগে বঙ্গদেশ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের একটি প্রদেশ। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেলে বঙ্গদেশ দুভাগে বিভক্ত। পশ্চিমভাগ আজকের পশ্চিমবঙ্গ (ভারত); পূর্বভাগ আজকের বাংলাদেশ (পাকিস্তান)। তখন এর নাম হয় পূর্ব বাংলা, পরে পূর্ব পাকিস্তান। এই পূর্ববাংলাই ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে হয় বাংলাদেশ। দ্র. ফজলুল হাসান ইউসুফ, *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ. ১-২; ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দীন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯-৬০

৮১. দীন শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, আনুগত্য ও বশ্যতা, হিসাবনিকাশ, ও প্রতিদান। যেহেতু একজন মুসলিমকে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং তা বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হয়, তাই ‘দীন’ শব্দটি আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা অর্থেও ব্যবহার করা হয়। অধিকন্তু, এ অর্থেই শব্দটি বহুল প্রচলিত। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ আলি আশ-শরিফ আল-জুরজানি (রহ.) (১৩৩৯–১৪১৩ খ্রি.) বলেন, **إن الشريعة من حيث إنها تطاع تسمى دينا** অর্থাৎ

সাংস্কৃতিক অবস্থা

সংস্কৃতি, ধর্ম এবং শিক্ষা একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই একটি দেশের ধর্মীয় অবস্থা জানার পূর্বে সে দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। একটি দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নতির মানদণ্ডে সে-দেশের অস্তিত্ব বহুলাংশে নির্ভর করে। জীবনের অস্তিত্ব যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসায় তেমনই দেশের অস্তিত্ব শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। এ বিষয়গুলোর প্রতি প্রাধান্য দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসে সততা, নৈতিকতা, মহানুভবতা ও স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি। মুসলিম বিজেতা সালাউদ্দীন আইয়ুবি (১১৩৮–১১৯৩ খ্রি.) বলেন,

> If you want to destroy any nation without war, make adultery or nudity common in the young generation. 'তুমি যদি যুদ্ধ না-করেই কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে চাও তাহলে সে জাতির যুবকদের মাঝে অপসংস্কৃতি তথা অশ্লীলতা ছড়িয়ে দাও।'[৮২]

তাই একটি দেশের সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেলে দেশটির অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যায়। তাইতো বিজ্ঞজনদের অভিমত হলো, যে জাতির সংস্কৃতি যত বেশি সমৃদ্ধ সে জাতি তত বেশি উন্নত।

পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের সংস্কৃতি ছিল ভিন্ন। পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামি ঐতিহ্য এবং হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির গভীর প্রভাবে বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে 'ইসলামের নিরাভরণ অথচ অনমনীয়' নীতিশুদ্ধ আদলে এবং হিন্দুধর্মের উদার ও গ্রহণযোগ্যতার তীর ঘেঁষে। এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে প্রধানত সুফি-সাধক, পীর-আওলিয়াগণের মাধ্যমে। ইসলাম প্রচারের সূচনা হয় কার্যত তেরো শতক থেকে; কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতি ছিল অনেকটা গোঁড়া ও একত্ববাদী। এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের সূচনাও হয় অনেক আগে তথা নবম শতক থেকেই।[৮৩]

মুসলিমগণ যখন ভারতে আসেন তখন এখানে প্রাচীন বিদ্যা ও দর্শনের প্রচলন ছিল। খাদ্য, শষ্য, কাঁচামাল ব্যাপকভাবে উৎপন্ন হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এ দেশের জনগোষ্ঠী সভ্য ও উন্নত বিশ্ব থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ ছিল বিচ্ছিন্ন। একদিকে সুউচ্চ পর্বতমালা, অপরদিকে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগর এই দেশকে বাহিরের জগতের সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আলেকজান্ডারই (৩৫৬–৩২৩ খ্রিষ্টপূর্ব) হচ্ছেন সর্বশেষ সম্রাট যিনি বাহিরের সভ্য জগৎ থেকে এখানে এসেছিলেন। মুসলিমগণের আগমন পর্যন্ত বাহিরের জগতের সাথে ভারতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বহির্বিশ্বের চিন্তা-চেতনা, নিয়মকানুন, শিক্ষা-সংস্কৃতির নতুন পদ্ধতি যেমন এ দেশে আসেনি, তেমনি এ দেশের প্রাচীন কলা ও জ্ঞানভাণ্ডারও বাহিরে যায়নি।[৮৪]

এমতাবস্থায় মুসলিমগণ (যারা সে সময় প্রাচ্যের সবচেয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি ছিল) ভারতে আগমন করেন। তাদের সাথে ছিল এক নতুন সংস্কৃতি, সুগভীর প্রজ্ঞা, বাস্তব ধর্ম ও পরিপক্ক জ্ঞান। তারা সাথে

'শরি'আতের আনুগত্য করা হয় বলে একে দীন নামে অভিহিত করা হয়। দ্র. আলি আশ-শরিফ আল-জুরজানি, *আত-তারিফাত* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবি, ১৯৮৪), পৃ. ১৪১

৮২. https://quotefancy.com/quote/1763296/Saladin, Visited on : 12.04.2021

৮৩. এমাজ উদ্দিন আহমদ ও হারুন-অর-রশিদ, *রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), খ.৩, পৃ. ৮০

৮৪. আবুল হাসান আলী নদভী, আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন অনূদিত, *ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবদান* (চট্টগ্রাম : সেন্টার ফর রিসার্চ দ্যা কুর'আন এন্ড সুন্নাহ, ২০০৪), পৃ. ১০-১৩

আরও বহন করে আনেন সংস্কৃতিমান ও সমৃদ্ধ জাতির মূল্যবান অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর প্রখর মেধাবী ও মননশীল মানুষের চিন্তার ফসল।

এককথায়, মুসলিমগণ এ দেশে আরবদের সহজাত শিল্পিত রুচিবোধ, ইরানিদের মার্জিত সংস্কৃতি এবং তুর্কিদের রূঢ় সরলতার প্রতিনিধিত্ব করেন। এ ছাড়া মুসলিমগণ ভারতীয়দের জন্য নিয়ে আসেন আরও বহু অমূল্য সম্পদ, উপঢৌকন ও নৈতিক গুণাবলি। মূলত ভারতবর্ষের সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, কারিগরি তথা মানুষের জীবনধারায় মুসলিমগণের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ভারবর্ষের ঐতিহাসিক যুগ সূচিত হয় ভারতে মুসলিমগণের সেনা অভিযানের পরেই। তাই মুসলিমগণই ভারতবর্ষের প্রথম ইতিহাসবিদ।[৮৫]

কোনো একটি সমাজে ধর্মীয় রীতিনীতি, ভাষা, জীবনযাপন প্রণালি, চলাফেরা, ঘরবাড়ির ধরন, খাদ্যাভ্যাস, আদবকায়দা, উপাসনা পদ্ধতি, আচরানুষ্ঠান, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সুকুমার বৃত্তি, পোশাক-পরিচ্ছদ, সর্বোপরি মূল্যবোধই হলো সংস্কৃতি। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে প্রকৃতি ও ধর্ম মানবজীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছে। হাজার বছর পূর্বের সংস্কৃতি আজও বহমান আছে। মোগল আমলে এ দেশে দরবারি ও সরকারি ভাষা ছিল ফারসি, কূটনৈতিকদের ভাষা ছিল ফারসি, শিক্ষিত ও মার্জিত সমাজের ভাষা ছিল ফারসি। কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, চারুকলা ও সাধারণ আদবকায়দা ছিল ইসলামি সংস্কৃতির অনুসারী।

মুসলিম সমাজের ছেলে-মেয়েরা আরবি ও ফারসি ভাষার সাথে ইসলামি আদবকায়দা শিক্ষা লাভ করত। শেখ সা'দির কবিতা, কবি হাফিজের গজল ও রুমির মসনবি কথাবার্তায় উদ্ধৃত করতে না পারলে কোনো হিন্দু বা মুসলিমের সন্তান শিক্ষিত হিসেবে গণ্য হতো না। মোগলাই ভাষা, মোগলাই খানা, মোগলাই পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, আদবকায়দা সমভাবে সর্বত্র প্রচলিত ছিল। অভিজাত সমাজে সুখাদ্য হিসেবে বিবেচিত হতো ইরানি পোলাও, বিরিয়ানি ও নানাবিধ খাবার। আজও আমাদের সমাজে প্রসিদ্ধ খাবার হিসেবে শাহজাদি পোলাও, জাহাঙ্গিরি কাবাব, মোগলাই কাবাব প্রভৃতির কদর অপরিসীম।[৮৬]

খেলাধুলা ও বিনোদন–শব্দ দু'টি একে অপরের পরিপূরক। খেলাধুলা যেমন মানুষের শরীর ও মনকে সুস্থ রাখে, তেমনি এটি সুস্থ বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম। প্রাচীনকালে মানুষের একমাত্র বিনোদনের মাধ্যম ছিল এই খেলাধুলা। তারই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীতে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেশ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। ঐ সময় অনেক খেলাধুলার প্রচলন ছিল। ঘরোয়া খেলাধুলার মধ্যে দাবা এবং পাশা ছিল প্রধান। রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ দাবা খেলতেন এবং দাবা খেলতে উৎসাহিত করতেন। ফলে অভিজাত শ্রেণির মধ্যে পাশার পরিবর্তে দাবা দ্রুত প্রসার লাভ করে। বহিরঙ্গণ খেলাধুলার মধ্যে হকি, ভলিবল, ফুটবল, হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্ধা, বর্শা নিক্ষেপ, লাঠিখেলা, ঘোড়দৌড়, মল্লযুদ্ধ, পদব্রজে ও ঘোড়ায় চড়ে অসি চালনা ছিল প্রধান। অবশ্যই পরবর্তীকালে ক্রিকেট এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ক্রিকেট খেলতে এবং দেখতে পছন্দ করে।

---

৮৫. আবুল হাসান আলী নদভী, আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন অনূদিত, *ভারতবর্ষের মুসলমানদের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০-১৩

৮৬. ড. খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য, সমাজ চিন্তা ও সাহিত্যিক কর্ম* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ২৪

এ দেশে হাম্‌দ-না'ত, ইসলামি গযল ও আধ্যাত্মিক গান মুসলিম সংস্কৃতির বাহক। এ সময় সংগীত চর্চাও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। গ্রামাঞ্চলে সংগীত চর্চায় যেমন জড়িত আছে জারি, ভাটিয়ারি, কাওয়ালি, পালাগান, যাত্রা-সিনেমা, সার্কাস ও আঞ্চলিক গান, তেমনি সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে পুথিপাঠ। পুথিপাঠের মধ্যে থাকত জ্ঞানের কথা, থাকত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আদর-সোহাগের কথা। জারিগানেরও প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে এ সংস্কৃতিতে স্যাটেলাইট টিভি, ভিডিয়ো, সিডি ও ইন্টারনেট যুক্ত হয়েছে। এ দেশে বিভিন্ন মাস ও ঋতু অনুসারে সামাজিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তাতে কাঠের আসবাবপত্র, চারুকারু শিল্প ও লোকশিল্পের বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যায়। এ সব মেলার জিনিসপত্র শিশু-কিশোরসহ সব বয়সের মানুষের কাছে আকর্ষণীয়; বিশেষ করে মসজিদ, মিনার, আযান, দাঁড়ি, টুপি, আতর, সুরমা, বোরকা, কাবুলি ও স্কার্ফ, ইসলামি সাহিত্য, নামায, রোযা, কুরবানি, যাকাত-ফিতরা ও দান-সাদাকাহ ইত্যাদি মুসলিম সংস্কৃতির অংশ।

ঈদ অনুষ্ঠান মুসলিম সংস্কৃতির সবচেয়ে বড়ো উপাদান। ঈদের দিন সকলে সাধ্যমতো নতুন পোশাক পরিধান করে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যায়; সুরুচিপূর্ণ খাবারের আয়োজন করে। কুরবানির ঈদে যার যার সাধ্যমতো গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, উট ও দুম্বা জবাই করা হয়। ফকির-মিসকিন, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদেরকে কুরবানির পশুর গোশত দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এসব ঈদে মুসলিমগণের প্রায় সকলেই পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরিধান করে থাকে। সারা বছর যে সব মুসলিম সাধারণত নামায পড়ে না, তারাও ঈদগাহে নামায পড়তে যায়। এ দেশে হালকায়ে যিকির অনুষ্ঠান, ওয়ায-মাহফিল, তাবলিগ ও ইজতেমা অনুষ্ঠানসহ অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। সেগুলো আমাদের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।[৮৭]

বাঙালি ভাত-মাছ খায়। এ কারণে তাদেরকে 'মাছে-ভাতে বাঙালি' বলা হয়। লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরিধান করে; তবে সচ্ছল পরিবারের লোকেরা ধুতি পরিধান করত। হিন্দু আমলে সেলাইবিহীন জামার ব্যবহার থাকলেও পুরুষদের কুর্তার ব্যবহার শুরু হয় মূলত অষ্টাদশ শতকে। মোগল আমলে পোশাক-পরিচ্ছদে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। তখন থেকে জামা, পায়জামা, আলখাল্লা, পাগড়ি ইত্যাদির প্রচলন হয়। লুঙ্গির প্রচলন শুরু হয় মূলত ফরায়েজি আন্দোলনের সময় থেকে। ব্রিটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষ ধুতিজাতীয় পোশাক পরিধান করতেন। বর্তমানে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু সামান্যই এই পোশাক চোখে পরে। এ যুগে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পুরুষেরা লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, শার্ট পরে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারা শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, সালোয়ার কামিজ পরিধান করে; তবে মুসলিম মেয়ে বা মহিলারা শাড়ি বা সালোয়ার কামিজের ওপর বোরকা পরে। সকলেই জুতা, স্যান্ডেল পায়ে দেয়।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ/ শ্রাবণ ১৩২৭ বাংলা 'আল-এছলাম' মাসিক পত্রিকায় ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। আর তা হলো : '...শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ অনুকরণে জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ কোট, প্যান্ট, শার্ট ব্যবহার করা, ইংরেজি ফ্যাশনে কলার, নেকটাই পরিধান করা, হুক্কা, তামাক ছাড়িয়া সিগারেটের ধূমোদ্‌গার করা, আহারের সময় চেয়ার টেবিল ব্যবহার, হাতের

৮৭. গোপাল হালদার, *বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ* (ঢাকা : স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৫), পৃ. ৬-৮

পরিবর্তে কাঁটাচামচ, ছুরি ব্যবহার। হিন্দুর অনুকরণে আচকান, পায়জামার পরিবর্তে ধুতি, চাদর, টুপির স্থলে নগ্নমস্তক ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।'[৮৮] সমাজের গুটিকয়েক ব্যক্তি ও পরিবারে এ ধরনের চিত্র সাধারণত দেখা যায় কিন্তু সমাজের সম্ভ্রান্ত মুসলিম সম্প্রদায় তাদের সনাতন সভ্যতা থেকে পুরোপুরি বিচ্যুত হয়নি।

এককালে সকলেই বৌলাওয়ালা খড়ম পায়ে দিতো। মুসলিম পুরুষ কেউ-কেউ মাথায় নানান রঙের টুপি ও পাগড়ি পরিধান করত। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক গামছা, তাওয়েল, চাদর, রুমাল, স্যুয়েটার, মাফলার, জ্যাকেট, কোট, প্যান্ট, টাই ইত্যাদি ব্যবহার করত। মহিলারাও চাদর, জ্যাকেট, প্যান্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবি, ফতুয়া ধরনের পোশাক ছাড়াও টি-শার্ট পরিধান করত।

আর্থিক সামর্থ্যের ওপর স্বর্ণালংকার, রৌপ্যালংকার, বিকল্প স্বর্ণের গয়না (সিটিগোল্ড), প্লাস্টিক, কাচের চুড়ি ও ঘড়ি ব্যবহার করত। গ্রামের মেয়েদের মাঝে এখনও নাকের নথ, নোলক, কানের দুল, কড়ি, ঝুমকা, মারি, কানপাশা, মাকড়ি, গলার হাঁসুলি, তাবিজ-কবজ, পুতি, পুতির মালা, হাতের বাওটি, বয়লা, চুড়ি, বাজু, হিন্দু মহিলারা শুধু বিবাহিত হলে হাতে শাঁখা, অন্যরা কোমরের বিছা, গলার হার, পায়ের খাড়ু, নূপুর ও মল ইত্যাদি ব্যবহার করত। বিয়ে অর্থাৎ বিবাহ-শাদি বা অন্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মহিলারা সজ্জিত হয়ে বেড়াতে বের হতো। সোনা ও রুপা প্রভৃতি দ্বারা তৈরি বিছার হার ছিল মেয়েদের প্রিয় অলংকার। এটা সবরকম মেয়েদের কোমরের নিচে কাপড়ের উপরে থাকত।

পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলেই চুলের প্রসাধনী ব্যবহার করত। পুরুষদের অনেকেই বাবরি চুল রাখত। তারা পরিপাটি করে চুল আঁচড়াত এবং চুলে নানান রকম গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করত। চুলের প্রসাধন এবং চুল বাঁধার কারুকাজেও বৈচিত্র্য ছিল। মেয়েদের চুলে বেণি বাঁধতে অনেক কুশলতা ছিল। নানারকম ছাঁদে বেণি বা কবরী করে নারীদের চুল বাঁধার প্রথা ছিল। এক থেকে সাত পর্যন্ত গুছি দিয়ে বেণি বাঁধা হতো। নানা রকম মনোহর খোঁপা তৈরি করে চুল বাঁধার রীতি ছিল। দুপুরের আহারাদি সমাপ্ত হওয়ার পর পাড়ার মহিলারা একত্রে সমবেত হয়ে তাম্বুল (পান) চর্বণ ও গল্পগুজবের অবসরে চুল বাঁধত। কারও কারও চুল বাঁধা, বিনুনি করা এবং কবরী (খোঁপা, বেণী) নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা ছিল। ফুল দিয়ে ফিতা জড়িয়ে যারা চুল বাঁধতে পারত, মেয়েমহলে তাদের কদর ছিল খুব বেশি। বিয়ের প্রাক্কালে কনে সাজানোতে তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রণী।[৮৯]

সংগীতের ন্যায় নৃত্যশিল্পও বাংলা-অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তারা নৃত্য পরিবেশনের সময় বিশেষ পোশাকে সজ্জিত হতো। মহিলা ও পুরুষ শিল্পীরা বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করত। এসব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র[৯০]; যেমন : ঢোল, তবলা, দফ (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ),

৮৮. মুস্তফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৮৩০-১৯৩১)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

৮৯. কামরুজ্জামান খান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ৪০১

৯০. বাধ্যযন্ত্র সঙ্গীতপযোগী শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র। এগুলো কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে খনন কার্য ও প্রাচীন সাহিত্য থেকে অতি উন্নতমানের এক সঙ্গীত সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় মেলে। দ্র. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.৭, পৃ. ৯

বেহালা,[৯১] হারমোনিয়াম ও সারিন্দা[৯২] প্রভৃতি ব্যবহৃত হতো। যন্ত্রশিল্পীরা যে যে ধরনের যন্ত্র বাজাত সে সে যন্ত্রের নামে পরিচিতি লাভ করত; যেমন : তবলা, ঢুলি ও বেহালা প্রভৃতি। পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও সংগীত জগতে সফলতা লাভ করেছিল। সাধারণ লোকেরাও এসব সংগীত ও নৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করত এবং দুঃসহ কর্মময় জীবনের ক্লেশ ভুলে গিয়ে আমোদ-প্রমোদে ডুবে যেত।

মুসলিম সমাজের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য হলো বিয়ে। দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ইজাব-কবুলের মাধ্যমে একজন নারী অন্য একজন পুরুষের জীবনসাথি হয়ে যায়। বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে ঢোল-তবলা বাজিয়ে, নৃত্য ও গান পরিবেশন এবং উন্নতমানের খাবারের আয়োজন করা হয়। প্রত্যেক শহরের মানুষ নিজ-নিজ মান-মর্যাদা অনুযায়ী এ অনুষ্ঠান করত। রমযান মাস এলে রাতে কুর'আন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তারাবির নামায আদায় করা হতো। এভাবে অন্যান্য বাৎসরিক অনুষ্ঠান, সমাবেশ ইত্যাদি যথাযোগ্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জাঁকজমকের সাথে উদ্‌যাপন করা হতো।[৯৩] এগুলো বাঙালির প্রাণ এবং বাঙালি সংস্কৃতির উপাদান।

মানুষের সামাজিক কর্মকাণ্ড ও সংস্কৃতি সেই সমাজের ঐতিহ্য ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে; মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর ছাপ সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে; এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা না থাকার কারণে নানান অপসংস্কৃতি মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ ঘটে। অধিকন্তু, ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতি-উপজাতি এবং ধর্ম-বর্ণের বসবাসস্থল হওয়ায় মুসলিমগণের সংস্কৃতির সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে, অনেক মুসলিমের পক্ষে নিজেদের সংস্কৃতি এবং অন্য জাতির সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে এসব অপসংস্কৃতিকে মুসলিমগণ নিজেদের সংস্কৃতি মনে করে যুগ-যুগ ধরে লালন ও চর্চা করে।[৯৪]

মওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সমাজ ও দেশে বিরাজমান এসব অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয় সংস্কৃতি দূর করার চিন্তা করতেন। সমাজ ও দেশের মানুষদের এই অপসংস্কৃতির কালো থাবা থেকে উদ্ধার করা পথ ও পন্থা সম্পর্কেও ভাবতে থাকেন। তিনি উপলব্ধি করলেন, মানুষের মাঝে এই অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয় সংস্কৃতি গেড়ে বসার মূল কারণ হলো প্রকৃত ইসলামি শিক্ষার অভাব। তাই প্রথমে মানুষের মাঝে দীনের প্রকৃত শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালানোর জন্য বহু দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিজাতীয় সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি দূর করে সুন্দর, নির্মল ও সুস্থ ধারার সংস্কৃতি উপহার দিলেন।

---

৯১. বেহলা ছড় দিয়ে বাজানো হয় এমন চারটি তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। দ্র. জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২৪

৯২. সারিন্দা কণ্ঠ সংগীতের অনুগামী বাদ্যরূপে ছড় দিয়ে বাজানো হয় তারযন্ত্রবিশেষ। দ্র. জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২৪

৯৩. ডক্টর হাসান ইব্রাহিম হাসান, *তারিখুল ইসলাম* (কায়রো : মাক্‌তাবাতুন নাহ্‌দাতিল মিস্‌রিয়্যাহ, ১৯৯১), খ.৪, পৃ. ৬০৩

৯৪. আবদুল করিম, মোকাদ্দেসুর রহমান অনূদিত, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ২০৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
অর্থনৈতিক অবস্থা

২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে মুসলিমগণের বিপর্যয়ের ফলে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়। বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল হিসেবে ভারতের মুসলিমগণ শাসনকার্যের আওতার বাইরে এসে পড়ে। তারা হয়ে পড়ে অবহেলিত। ইংরেজদের শোষণে মুসলিমগণের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় দেখা দেয় নিদারুণ অবক্ষয়।[৯৫]

মুসলিমগণের বিরুদ্ধে শঠতা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অত্যাচার ও দমননীতির মাধ্যমে শুরু হয় বেনিয়া ইংরেজ শাসনের যাত্রা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ সময়ে এদেশের রাজস্ব ব্যবস্থায় সংস্কারের ফলে মুসলিমগণ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৩৮–১৮০৫ খ্রি.)-এর জারিকৃত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'[৯৬] প্রথার দরুন বহু মুসলিম জমিদার তাদের জমিদারি হারান। অন্যদিকে, ইংরেজদের কৃপাধন্য হয়ে অনেক নতুন-নতুন হিন্দু জমিদারের উত্থান হয়।[৯৭] ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের 'লাখেরাজ' সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ঘোষণা (যা ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে কার্যকর হয়) মুসলিমগণের আর্থিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে।[৯৮]

নীল কুঠিয়ালদের অত্যাচারও মুসলিমগণের আর্থিক দুর্গতির অন্যতম কারণ। নীলচাষ কৃষকদের জন্য মোটেই লাভজনক ছিল না; বরং আর্থিক ক্ষতির কারণ ছিল। হিন্দু জমিদার ও ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী জোর করে, ভয় দেখিয়ে বাংলার নিরীহ মুসলিম চাষিদেরকে ভালো-ভালো জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করত; যার পরিণতিতে ১৮৫৯–১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে নীল কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে বাঙালি চাষিদের বিদ্রোহ সংগঠিত হয়।[৯৯] কৃষিপ্রধান পূর্ববাংলা ছিল কলিকাতা কেন্দ্রিক শিল্পের পশ্চাদ্‌ভূমি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব, রাস্তাঘাট, রেলপথ ও কলকারখানা না থাকায় পূর্ববাংলায় কোনো উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। ব্রিটিশদের ব্যাপক কাঁচামাল লুণ্ঠনের ফলে বাংলা তথা ভারত ইংল্যান্ডের পণ্যের কাঁচাবাজারে পরিণত হয়। এজন্য প্রথমেই তারা এ দেশীয় শিল্পধ্বংসের কাজে হাত দেয়। এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮–১৯০৯ খ্রি.) বলেন,

---

৯৫. আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-৪৪; মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ১৫৫; ছদরুদ্দীন, *বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ৪; মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, 'ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য', *অগ্রপথিক*, ১৭ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০২, পৃ. ৭৯

৯৬. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে কর্নওয়ালিস প্রশাসন কর্তৃক 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' সরকার ও বাংলার ভূমি মালিকদের (সকল শ্রেণির জমিদার ও স্বতন্ত্র তালুকদারদের) মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। দ্র. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩), পৃ. ১৬৪-১৬৫

৯৭. উইলিয়াম হান্টার, আবদুল মওদূদ অনূদিত, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২

৯৮. গোলাম মঈনুদ্দীন, *কবি ফররুখ : ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫), পৃ. ৪

৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

‘আঠারো শতকে ভারত ছিল একটি বিশাল শিল্প উৎপাদক ও সেই সঙ্গে কৃষিভিত্তিক দেশ। ভারতের তাঁতজাত দ্রব্যাদি তখন সরবরাহ হতো এশিয়া ও ইউরোপের বাজারে। একথা দুঃখজনকভাবে সত্য যে, শতবর্ষ আগে স্বার্থপর বাণিজ্যের নীতি অনুযায়ী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকেই ইংল্যান্ডের উঠতি শিল্প উৎপাদকদেরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় শিল্প উৎপাদকদেরকে নিরুৎসাহিত করত। তাদের অপরিবর্তনীয় নীতি, যা আঠারো শতকের শেষ দশকগুলিতে এবং উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে অনুসরণ করা হত, তা ছিল ভারতকে গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পের অধীনস্থ করা এবং ভারতীয় জনগণকে শুধু সেই সব কাঁচামাল উৎপাদন করতে বাধ্য করা, যা গ্রেট ব্রিটেনের তাঁত কারখানাগুলিতে সরবরাহ করা যেতে পারে।’[১০০]

এদেশীয় বয়নশিল্প ধ্বংস করার ফল যে কতদূর শোচনীয় হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় জি. এম. ট্রেভেলিয়ানের (১৮৭৬–১৯৬২ খ্রি.) প্রদত্ত তথ্যে। তিনি বলেন,

‘একসময় এ দেশের মসলিন শিল্পের ক্রমবিলোপের ফলে ঢাকার জনসংখ্যা দেড় লাখ থেকে কমে ত্রিশ-চল্লিশ হাজারে এসে দাঁড়ায়।’[১০১]

ব্রিটিশ শাসকেরা প্রথমে ইংল্যান্ডে ভারতীয় পণ্য রপ্তানির ওপর অধিক হারে করারোপ করে এবং সেখানে কোনো পণ্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেয়; এমনকি ভারতের অভ্যন্তরেও ভারতীয় পণ্যের ওপর নানারকম শুল্ক বসানো হয়। ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো ভারতীয় পণ্যের ওপর ৮০% ট্যাক্স বসানো হয়। অপরদিকে, ব্রিটিশ পণ্যের শুল্ক মওকুফ করে দেওয়া হয়; যার ফলে প্রচুর বিলেতি পণ্য আসতে থাকে ভারতবর্ষে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে সারা ভারতবর্ষই বিলেতি পণ্যে ছেয়ে যায়। ফলে ভারতের হস্তচালিত শিল্প ধ্বংস হতে থাকে। অসংখ্য কারিগর বেকার হয়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ায় এদেশের গ্রামগুলো জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে। সিরাজুদ্দৌল্লা (১৭৩৩–১৭৫৭ খ্রি.)-কে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য উর্মিচাঁদ ও মীর জাফরের (১৬৯১–১৭৬৫ খ্রি.) সাথে কোম্পানির যে ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি হয়, তার অর্থনৈতিক দাবি পূরণ করতে গিয়ে বাংলার রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে।[১০২] ফলে বাংলা ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রি.) বাংলা অঞ্চলে ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’[১০৩] দেখা দেয়।[১০৪]

আশ্চর্যের বিষয় হলো, দুর্ভিক্ষের পরের বছর ইংরেজরা আগের তুলনায় শতকরা দশভাগ বর্ধিত খাজনা আদায় করেছিল।[১০৫] অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু জমিদারদের সন্তানের জন্মোৎসব, বিবাহোৎসব ও মৃত্যুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রণামি দিতে হতো মুসলিম প্রজাদেরও। কথিত আছে যে, জনৈক হিন্দু জমিদার এই

---

১০০. বদরুদ্দীন উমর, *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭), পৃ. ২৩

১০১. Romesh Chunder Dutta, *The Economic of Indian in the Victorian Age : An Economic History of the People* (London : Forgotten Books, 3rd Ed. 1908), p. 107

১০২. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

১০৩. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রি.) এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে একে ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ বলা হয়। ব্রিটিশদের দুঃশাসনে এতে ১ কোটি লোক প্রাণ হারায়। দ্র. আকবর আলি খান, *দারিদ্র্যের অর্থনীতি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* (ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০২০), পৃ. ৮৬

১০৪. বদরুদ্দীন উমর, *ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১০৫. নিতাই দাস, *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ২

সেলামিতে তুষ্ট ছিলেন না; বরং নিজ মেয়ে-জামাইয়ের ভরণ-পোষণের জন্য জামাই খরচাও দাবি করত।[১০৬] অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের কারণে প্রজারা যখন ক্ষুৎপিপাসা ও মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল, তখন তাদের শোষণ করে উল্লাস করেছিল ইংরেজ ও তাদের রাজস্ব আদায়কারীরা।[১০৭] কোম্পানির এমনই শোষণ বঞ্চনার এক শতাব্দী শাসনের রাজস্বনীতির ফলে উপমহাদেশের অর্থনীতিতে যে করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে উত্তর ভারতের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭–১৮৯৮ খ্রি.) বলেন,

> 'দারিদ্র্যভারে জর্জরিত সাধারণ মানুষকে রোজ এক আনা, দেড় আনা বা এক সের খোরাকের জন্যও 'বিদ্রোহীদের' অধীনে চাকরি নিতে হয়েছে।'[১০৮]

মুসলিম আমলে এ দেশের শাসন, দেওয়ানি, বিচার, সৈন্য, পুলিশ প্রভৃতি বিভাগের চাকরির ক্ষেত্রে মুসলিমগণের প্রাধান্য ছিল। নিজেদের সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতা হারিয়ে মুসলিমগণ একে-একে এসব কিছু হারায়। ছোটো বড়ো সব রকম চাকরি ক্রমে-ক্রমে মুসলিমগণের থেকে ছিনিয়ে অন্য সম্প্রদায় বিশেষত হিন্দুদের দেয়া হয়। স্যার জন শোর (১৭৯৩–১৭৯৮ খ্রি.)-এর মতে, তখন নিম্ন থেকে নিম্নতর এমন কোনো পদ, যেটি গ্রহণের জন্য কোনো ইংরেজকে পাওয়া গেছে, সেটিও মুসলিমগণের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।'[১০৯] ব্যাবসা-বাণিজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সকল ক্ষেত্রে মুসলিমগণ নিমজ্জিত হয় এক মহাদুর্দশায়। মাঝে মাঝে মুসলিমগণ তীক্ষ্ণ জাতীয়তার মনোভাব ও যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রচণ্ড ক্ষমতা প্রদর্শন করলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্রিটিশ শাসনে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।[১১০]

শ্রী অমলেন্দু দে (১৯২৯–২০১৪ খ্রি.)-এর লেখা থেকেই বোঝা যায় যে, ইংরেজ শাসনামলে মুসলিমগণের দ্রুত অধোগতি হয়েছিল। আর সে অধোগতি ছিল এককথায় সার্বিক ও সামগ্রিক। একটি সমৃদ্ধ জাতিকে মাত্র একশ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও ভিখারির জাতিতে পরিণত করা হয়েছিল। ইংরেজ আমল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মুসলিমগণের জন্য সরকারি চাকরি ও প্রশাসনের মর্যাদাপূর্ণ পদের দরজাই শুধু বন্ধ হয়ে গেল না; তাদের আয়মা-জমিদারি-জায়গিরদারি থেকেও সুপরিকল্পিতভাবে উৎখাত করা হলো।[১১১] কোনো-কোনো স্থানে সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেও চাকরি শুধু হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছিল। এ মর্মে উইলিয়াম উইলসন হান্টার (১৮৪০–১৯০০ খ্রি.) বলেন,

> 'মুসলিমগণকে এখন এতটা নীচে ঠেলে দেয়া হয়েছে যে, সরকারি চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা সত্ত্বেও সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এটা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তাদের জন্য কোনো চাকরি খালি নেই। তাদের অসহায়ত্বের প্রতি কারো সুদৃষ্টি পড়ছে না এবং এমনকি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের অস্তিত্ব মেনে নিতেও যেন নারাজ।'[১১২]

---

১০৬. হুমায়ন আবদুল হাই, *মুসলিম সংস্কার ও সাধক*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

১০৭. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১০৮. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২), পৃ. ১৫

১০৯. মেসবাহুল হক, *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১৬-১৭

১১০. ড. এমাজ উদ্দীন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা* (ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি., ১৯৬৪), পৃ. ৬০২

১১১. আবদুল গফুর, *আমার কালের কথা* (চট্টগ্রাম-ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০০০), পৃ. ৯১

১১২. উইলিয়াম হান্টার, আবদুল মওদুদ অনূদিত, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

ইংরেজ পূর্বকালে প্রশাসনের প্রায় সব পদে প্রধানত মুসলিমগণই ছিলেন। ইংরেজ আমলে সেটার আমূল পরিবর্তন ঘটে। সরকারি পদ থেকে তাদের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, তখন সরকারি পদের সংখ্যা ছিল ২১১১টি। তন্মধ্যে ইংরেজদের দখলে ১৩৩৮টি পদ, হিন্দুদের ৬৮১টি আর মুসলিমগণের জন্য মাত্র ৯২টি।[১১৩] এর অর্থ হলো : এক শতাব্দী যারা প্রশাসনের সর্বত্র বিরাজিত ছিল, ইংরেজ আমলে তাদেরকে মোট চাকরিজীবীদের ২০ ভাগের এক ভাগও প্রদান করা হয়নি। ব্রিটিশদের অনুসৃত নীতির ফলে মুসলিমগণের অবস্থার এমনই অবনতি ঘটে, যা ইংরেজদের মুখপাত্র মিস্টার হান্টার নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন,

> A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well-born Mussalman in Bengal to become poor; at present it is almost impossible for him to continue rich.[১১৪] 'একশ' সত্তর (১৭০) বছর আগে বাংলার কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তানের দরিদ্র হয়ে পড়া ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার; কিন্তু বর্তমানে তার পক্ষে ধনী হওয়াটাই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।'

প্রসঙ্গত, এখানে উড়িষ্যার মুসলিমগণের অবস্থা প্রণিধানযোগ্য। চাকরিবাকরি থেকে বঞ্চিত, অর্থনৈতিকভাবে নিষ্পেষিত উড়িষ্যার মুসলিমগণের পক্ষ থেকে সেখানকার কমিশনের কাছে পেশকৃত আবেদনপত্রের কিয়দংশ উইলিয়াম হান্টার তাঁর '*The Indian Musalmans*' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ আবেদনপত্রে বলা হয়,

> 'মহামান্যা দয়াবতী রানির অনুগত প্রজা হিসেবে দেশের সরকারি চাকরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার আমাদেরও আছে বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, উড়িষ্যার মুসলিমগণের ক্রমাগত নীচে চেপে রাখা হচ্ছে এবং তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার আর কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণকারী এসব মুসলিম বর্তমানে চাকরির অভাবে দরিদ্র হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের অবস্থা ঠিক ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো করুণ হয়ে উঠেছে। মুসলিমগণের এই করুণ অবস্থার কথা আপনার কাছে এই আশায় তুলে ধরছি যে, উড়িষ্যা বিভাগে মহামান্যা রানির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে আপনি জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল শ্রেণির প্রজার প্রতি সুবিচার করবেন। সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত হবার কারণেই আমরা আজ কপর্দকহীন হয়ে পড়েছি। আমাদের অবস্থা আজ এতই শোচনীয় যে, আমরা দুনিয়ার যে কোনো প্রত্যন্তাঞ্চলে যেতে রাজি আছি; তা সে হিমালয়ের বরফাচ্ছাদিত চূড়াই হোক কিংবা সাইবেরিয়ার জনমানবহীন প্রান্তরই হোক–যদি জানতে পারি যে, অনুরূপ ভ্রমণের ফলে সপ্তাহে মাত্র দশ শিপিং বেতনের কোনো চাকরিতে আমাদের নিয়োগ করা হবে।'[১১৫]

বাংলা-অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্রমবিকাশ ঘটে মোগল শাসনামলে। বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিক হলো তাদের অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মকাণ্ড। উনিশ শতকের বাংলা-অঞ্চলের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য কৃষি সম্প্রসারণ। মধ্যবিত্তদের পুঁজি বিনিয়োগ ও নানান

---

১১৩. আবদুল গফুর সম্পাদিত, *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৭১

১১৪. উইলিয়াম হান্টার, আবদুল মওদুদ অনূদিত, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭; Dr. K. M. Mohsin, `Banladesh under British Rule', *Islam in Bangladesh Through Ages,* p. 83; এম.এ. রহীম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

১১৫. উইলিয়াম হান্টার, আবদুল মওদুদ অনূদিত, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

উদ্যোগ নেওয়ার ফলে উনিশ শতকে কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। দেশের অর্থনীতির অন্য কোনো খাতে এত বিস্তার, এত সম্প্রসারণ দেখা যায়নি। জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদের কাজ পরিচালনা ছিল দেশের কৃষি অর্থনীতির বড়ো দিক।[১১৬]

কৃষিযোগ্য পতিত জঙ্গল ভূমি আবাদ করার জন্য অনেক জমিদার আবাদ তালুক সৃষ্টি করে নামেমাত্র খাজনার মাধ্যমে মধ্যবিত্তদের কাছে তা বন্দোবস্ত দেন। বস্তুত, নগদ সালামি দিয়ে মধ্যবিত্তরা তালুক কিনে নেন এবং বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করে ঐসব পতিত জমি কৃষিযোগ্য করে তোলেন। মধ্যবিত্তদের পুঁজি বিনিয়োগ ও উদ্যোগের ফলে উনিশ শতকে কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। প্রধান প্রধান আবাদি এলাকাগুলোর মধ্যে ছিল চট্টগ্রামের সমগ্র উপকূল অঞ্চল, নোয়াখালীর উপকূল অঞ্চল, মেঘনা ব-দ্বীপ এলাকা, সুন্দরবন এলাকা, বরেন্দ্র এলাকার অনেক অংশ এবং উত্তর-পূর্ব বাংলার হাওড় অঞ্চল। বাংলার কৃষি অর্থনীতির ইতিহাসে তুলা, আফিম, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি অর্থকরী ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। এসব ফসলের সঙ্গে জড়িত ছিল বাংলার কৃষককুল ও অন্য মধ্যবিত্তদের ভাগ্য।[১১৭]

প্রাক-উপনিবেশ যুগে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবৎসর বিপুল পরিমাণ সুতি, রেশম, বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হতো। চট্টগ্রাম থেকে পূর্ণিয়া পর্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন মানের তুলা উৎপন্ন হতো। সর্বোৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হতো ঢাকায়। আঠার শতকের শেষ দশক থেকে তাঁতজাত পণ্য রপ্তানি হ্রাস পেতে থাকায় তুলা আবাদও কমতে থাকে। বিশেষভাবে যোগাযোগের উন্নয়ন ও বিশ্ববাজারের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উনিশ শতকের প্রথম থেকে নীলের আবাদ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে; কিন্তু ১৮৫০-এর দশক থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলা-অঞ্চলের নীলের চাহিদা হ্রাস পেতে থাকে। তখন নীল উৎপাদনে অনিচ্ছুক চাষিদের সংগঠিত প্রতিরোধের মুখে অবশেষে ইউরোপীয় নীলকরেরা নীলচাষে বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে নেয়। ১৮৬০-এর দশকে বাংলার নীলচাষ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।

পরবর্তীকালে নীলের স্থান দখল করে নেয় আরেকটি অর্থকরী ফসল পাট। পাট দেশে উৎপন্ন হতো সুপ্রাচীনকাল থেকেই। কিন্তু এর ব্যাপ্তি গৃহস্থালি প্রয়োজন মেটানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইউরোপীয় বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পাট উৎপাদন শুরু হয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে। ব্যাপক হারে পাট চাষ এবং পাট আঁশের বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হয় ১৮৭০-এর দশক থেকে। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে পাট বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে নেয়। কৃষি আয়ের উৎস হিসেবে পাটকে তখন তুলনা করা হয় স্বর্ণের সাথে। কিন্তু এই স্বর্ণ-আঁশের স্বর্ণযুগ শেষ হয় ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে পাট-অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে।[১১৮]

পাকিস্তানি শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) অর্থনৈতিক অবস্থা (১৯৪৭–১৯৭১ খ্রি.)

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে নতুন আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ইংরেজ আধিপত্য থেকে মুক্ত হলো পাকিস্তান। সবাই ভেবেছিল, প্রায় দু'শ বছরের গ্লানি ও ভয়াবহতা ভুলে গিয়ে প্রগতি ও

---

১১৬. ড. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)* (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), খ.২, পৃ. ১৯

১১৭. পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ২১

১১৮. ড. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ২০-২১

সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে, মানুষ সুখের মুখ দেখবে; কিন্তু খুবই আফসোসের বিষয় : পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাস মূলত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের ইতিহাস। তাদের ২৪ বছরের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় : সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি নীতি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে। এ ভূখণ্ডে তথা পূর্বপাকিস্তানে পাট, তুলাসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সবই উৎপাদিত হতো। রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসস্থল ছিল এ অঞ্চল তথা পূর্বপাকিস্তান। কিন্তু শিল্পের উন্নয়ন ও উৎপাদন সবই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ব্রিটিশ শাসনামলের মতো পাকিস্তানিরাও এদেশ থেকে শিল্পের কাঁচামাল সস্তায় ক্রয় করে শিল্পোৎপাদিত দ্রব্য চড়া দামে এখানে বিক্রি করত। ফলে ২৪ বছরেও এদেশের মানুষ শোষণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। নিচে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো:

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ নীতির ফলে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৯৪৯-৫০ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ৩০৫ ও ৩৩০ টাকা। ১৯৬৪-১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩২৭ ও ৪৬৪ টাকা। এভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সারণি নং : ১

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জিডিপি ও মাথাপিছু আয়[১১৯]

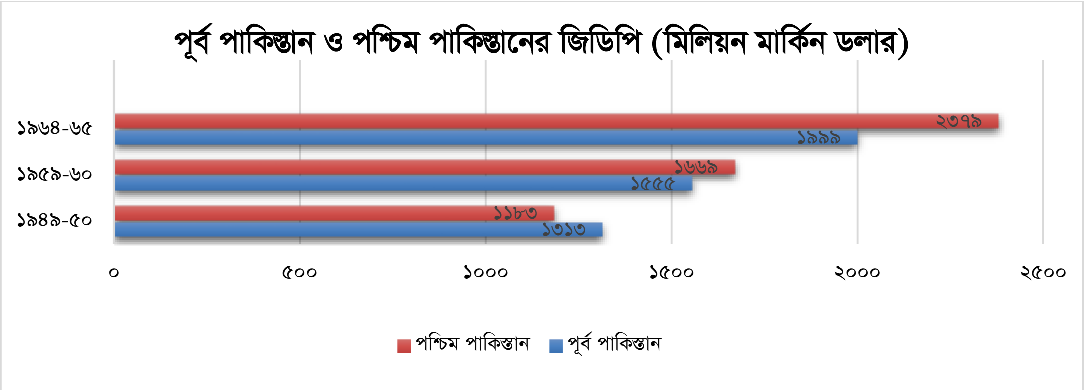

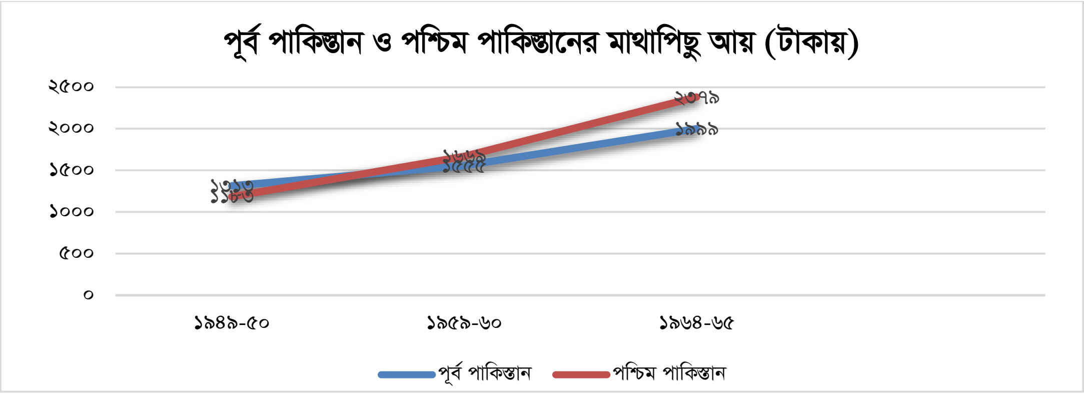

১১৯. S. U. Khan, *A Measure of Economic Growth in East and in West Pakistan* (Islamabad : Pakistan Institute of Development Economics, 1961), Vol. 1, p. 35

বৈদেশিক সাহায্য বণ্টনে বৈষম্য

বৈদেশিক সাহায্য বণ্টনের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান বৈষম্যের শিকার হয়। পাকিস্তানি আমলে যে বৈদেশিক সাহায্য এসেছে তার সিংহভাগই ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে।

সারণি নং : ২

বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণের চিত্র (১৯৪৭–১৯৬০ খ্রি.)[১২০]

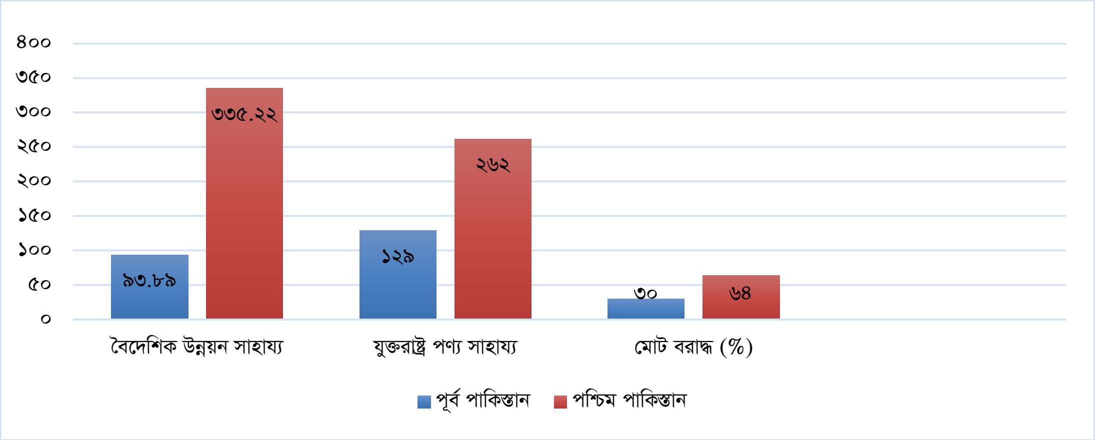

চাকরি-বাকরিতে বৈষম্য

পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে অর্থ ও প্রতিরক্ষাখাতে উচ্চপদসমূহ, পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান, কর্পোরেশনের প্রধান পদসমূহ প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানের দখলে ছিল; এমনকি পূর্বপাকিস্তান অংশেরও এই পদসমূহ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

সারণি নং : ৩

পকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে বৈষম্যমূলক আচরণের চিত্র[১২১]

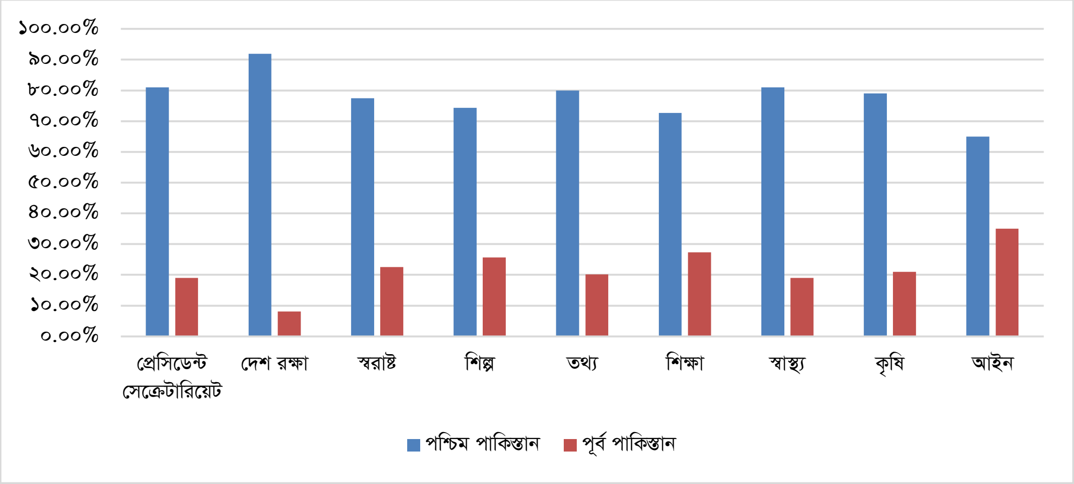

---

১২০. Alburuj Razzaq Rahman, *Bangladesh Liberation War, 1971*, 9th Grade, Metro High School, Columbus, Ohio, p. 1

১২১. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), খ.২৬, পৃ. ৬৭১-৬৭২

সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ে বৈষম্য

১৯৫৫–১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে তদানীন্তন পাকিস্তানে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ নীতির ফলে মোট উন্নয়ন ব্যয়ের বেশিরভাগই পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়।

সারণি নং : ৪

পাকিস্তান আমলে গৃহীত তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৈষম্যের চিত্র[১২২]

উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ (১৯৫৫–১৯৭০) **(কোটি টাকা)**

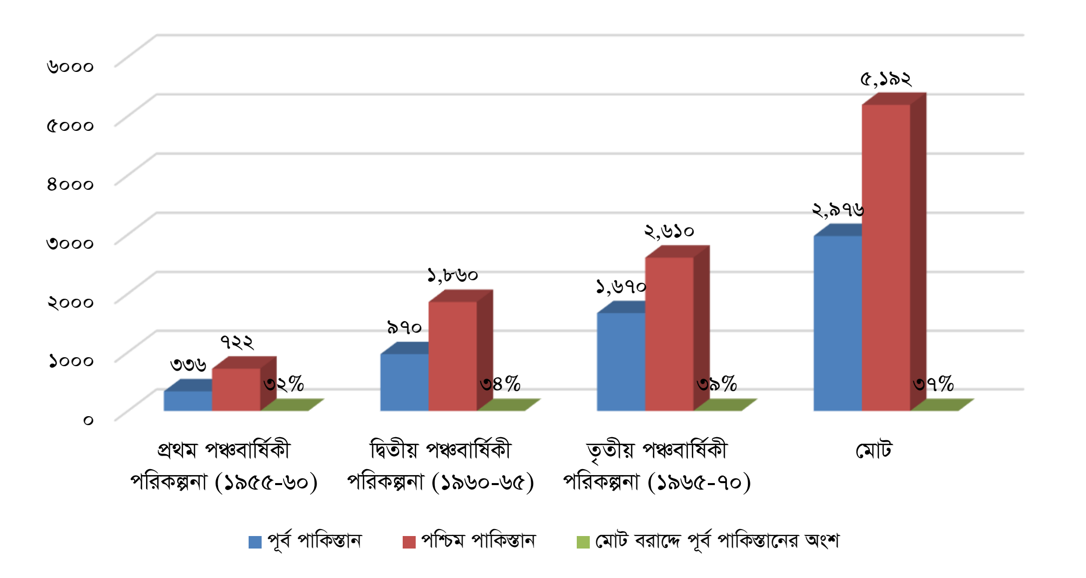

পরিশেষে বলা যায়, ২০০ বছরের ব্রিটিশ এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ এবং পাকিস্তান আমলের প্রায় ২৫ বছরের শাসন ও শোষণ এবং তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ ও বৈষম্যমূলক নীতিই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার জন্য মূল দায়ী।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা (১৯৭১ খ্রি. থেকে বর্তমান)

পাকিস্তান শাসনামলের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে এ ভূখণ্ডের মানুষ আন্দোলন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয় এবং দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করার পর ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত এবং লুণ্ঠিত অর্থনীতি, ক্রমাগত রাজনৈতিক অস্থিরতা, লাগামহীন দুর্নীতি, বিপুল জনসংখ্যার চাপ, সম্পদ ব্যবহারে অদক্ষতার কারণে যদিও বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি, তারপরও অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী এদেশের কৃষকের উৎপাদন ক্ষমতা, স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত নারী শ্রমিকদের কল্যাণে পোশাক শিল্পের প্রসার, মানবসম্পদ রপ্তানি এবং বর্তমানে অগ্রসরমাণ বেসরকারি খাতের প্রসার ও তথ্য প্রযুক্তির সহজ ব্যবহার বাংলাদেশের

১২২. Planning Commision of Pakistan, *Reports of the Advisory Panels for the Fourth Five Year Plan 1955-70*, Vol. 1, p. 33

অর্থনীতিকে করেছে সমৃদ্ধ। দারিদ্র্য বিমোচনসহ জাতিসংঘ ঘোষিত SDG (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) অর্জনে বর্তমানে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে বিশ্বসভায় সমাদৃত।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হতে থাকে। ক্রমাগত কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কৃষি ও শিল্পখাতের আওতা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষি অপেক্ষা শিল্পখাতের অবদান পূর্বাপেক্ষা অনেক বেড়েছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, বেকারত্বের হার হ্রাস পেয়েছে। উন্নয়ন বাজেটে পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় দৃশ্যমানভাবে দেশীয় পরিকল্পনাকারীদের গুরুত্ব এবং দেশীয় অর্থায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতি হিসেবে এখন ‘বাঙালি জাতি’ বিশ্বসভায় অনেক অনেক বেশি সমাদৃত হচ্ছে। নিম্নে অর্থনৈতিক অগ্রগতির কয়েকটি তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরা হলো:[১২৩]

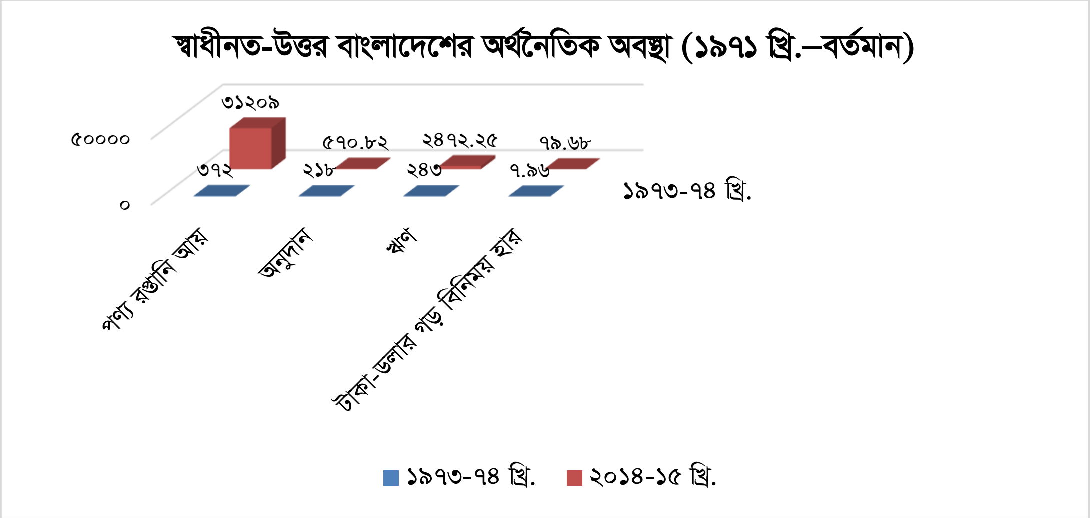

১৯৮০-১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল সর্বমোট ১৪৯.৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৪-২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে উৎপাদিত হয়েছে ৩৮৪.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৭৩-১৯৭৪ অর্থবছরে GDP তে শিল্প (ম্যানুফ্যাকচারিং) খাতের অবদান ১১.৭ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩০.৪২ শতাংশে উন্নীত হয়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) অভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর নির্ভরতা ২৩ ভাগ হলেও পরবর্তীকালে পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২), ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) ও সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) অভ্যন্তরীণ সম্পদের আহরণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে গ্রামীণ ও শহুরে দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ৮২.৯ ও ৮১.৪ শতাংশ হলেও ২০১০-২০১১ অর্থবছরে তা যথাক্রমে ৩৫.২ এবং ২১.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা শেষে (২০১৫) চরম দারিদ্র্য হার ১২.৯ শতাংশে দাঁড়ায়। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে চরম দারিদ্র্যের হার হ্রাস করে ৮.৯ শতাংশে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়।[১২৪]

---

১২৩. *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, ১৯৯৭, ২০১৬ ও ২০১৭, পৃ. ৫-১০

১২৪. অধ্যাপক ইসমাঈল হোসেন ও অন্যান্য, *অর্থনীতি* (গাজীপুর : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯), খ.২, পৃ. ৭

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙে পড়েছিল; সৃষ্টি হয়েছিল খুবই নাজুক পরিস্থিতির। নানান রকম সমস্যা ও সংকটে বিপন্ন দেশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) স্বদেশের অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যা খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সে সব সংকট ও সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন; যেমন : ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, অসহায় এতিমদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, কৃষিখামার, মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি ফার্ম, বনায়ন, মধুর জন্য মৌমাছি চাষ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও হাসপাতাল স্থাপন; দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
রাজনৈতিক অবস্থা

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) তিন পর্যায়ের শাসন পর্যবেক্ষণ করেন। ১৯৩৩ (জন্ম)–১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অবিভক্ত ভারতে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন, ১৯৪৭–১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসন এবং ১৯৭১–১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ (মৃত্যু) পর্যন্ত বাংলাদেশি শাসন প্রত্যক্ষ করেন। তিন ধরনের শাসনামলে তিনি ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন স্বাদের রাজনৈতিক পরিবেশ উপভোগ করেন। তিন ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব তাঁর কর্ম ও চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে তাঁর সমসাময়িক রাজনীতির ত্রি-অবস্থা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

[এক] ঔপনিবেশিক শাসনামল (১৭৫৭–১৯৪৭ খ্রি.)

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশির আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হওয়ার মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। ফলে উপমহাদেশের মুসলিমগণের ওপর এক ঘোর দুর্দিন নেমে আসে। অপরদিকে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ খ্রিষ্ট-শক্তির অপশাসন এদেশের বুকে জগদ্দল পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেড়ে বসে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারপর ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের (১৭২৮–১৮০৬ খ্রি.) সাথে 'এলাহাবাদ চুক্তি'[১২৫] সম্পাদন করে ইংরেজগণ এ দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে। এতে তাদের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর নানান কূটকৌশলের মাধ্যমে তারা ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকা নিজেদের করতলগত করে। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে অযোধ্যা বিজয় করার পর সমগ্র ভারতে ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১লা নভেম্বর, ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মহারানি ভিক্টোরিয়া (১৮১৯–১৯০১ খ্রি.) ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। সে সময় হতে ভারতে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১২৬]

মুসলিমগণ তাদের রাজ্য হারিয়েছিল আর হিন্দুদের হয়েছিল প্রভু বদল। তখন মুসলিমগণ পড়ে শাসক সম্প্রদায় ও তাদের অনুগ্রহপুষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের যৌথ ষড়যন্ত্রের কবলে। ফলে ইংরেজদের হাতে তারা শুধু তাদের রাজ্য হারাল না; হারাল তাদের সর্বস্ব। একদিন যাদের দরিদ্র হওয়া অসম্ভব ছিল, সেই মুসলিমগণ কাঠুরিয়া ও ভিস্তিওয়ালায় পরিণত হলো। বাদশাহ জাতি পরিণত হলো পথের ভিক্ষুকে। একশ বছর আগে যেখানে কোনো অশিক্ষিত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ছিল অসম্ভব, একশ বছর পরে সেই মুসলিমগণের মধ্যে কোনো বিদ্বান ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া হলো দুষ্কর।[১২৭] পক্ষান্তরে, হিন্দুরা ইংরেজ

---

১২৫. এলাহাবাদের প্রথম সন্ধি হয় ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এবং এ সময়ে দ্বিতীয় সন্ধি দ্বারা লর্ড ক্লাইভ বাদশাহ শাহ আলমের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন। দ্র. মুহাম্মদ আবদুল হাই, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৪), পৃ. ৩-১০

১২৬. এম. এ. রহীম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১-১৭

১২৭. W. W. Hunter, *The Indian Musalmans* (London : Trubner and Company, 1876), p. 38

শাসকদের যাবতীয় সাহায্য-সহযোগিতা ও সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে জাতীয় সমৃদ্ধি ও জাতি গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল অতি দ্রুতগতিতে।[১২৮]

মুসলিমগণ প্রত্যাখান করল ইংরেজ শাসন এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও অধিকার আদায়ের জন্য তারা হাতে তুলে নিল অস্ত্র; শুরু করল সশস্ত্র সংগ্রাম। ইংরেজরা মুসলিমগণের এই সংগ্রামকে ধ্বংস করল তাদের পেশিশক্তি দ্বারা। এক্ষেত্রে ইংরেজদের সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিল হিন্দুরা। মুসলিমগণ যখন ইংরেজদের হাতে জীবন দিচ্ছিল তখন হিন্দুরা বলছিল, 'আমাদের যদি বলা হয় ব্রিটিশ শাসন কিংবা কার শাসন চাও? উত্তরে আমরা একবাক্যে বলব ব্রিটিশ শাসন; এমনকি হিন্দু শাসনও নয়।'[১২৯]

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পলাশি যুদ্ধ থেকে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অসংখ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।[১৩০] তন্মধ্যে রয়েছে ফকির সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ (১৭৬০–১৮০০ খ্রি.), আবদুল ওহাবের ওহাবি আন্দোলন (১৮২৪–১৮৩১ খ্রি.), হাজি শরীয়ত উল্লাহ্‌র[১৩১] ফরায়েজি আন্দোলন (১৮১৮–১৯০৬ খ্রি.), মীর নিসার আলী তিতুমীরের[১৩২] নীল বিদ্রোহ (১৮২৭–১৮৩১ খ্রি.) প্রভৃতি। এসব আন্দোলনের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকলেও সবগুলোর মৌলিক উদ্দেশ্য এসে দাঁড়ায় উপমহাদেশের স্বাধীনতা পাগল মুসলিমগণের মুক্তির সংগ্রাম এবং স্বদেশের ভূমি থেকে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন আবাসভূমি তথা 'পাকিস্তান' লাভ করা।[১৩৩] এসব সংগ্রামে যাঁরা পরবর্তীকালে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুনশী মোহাম্মদ মেহের

---

১২৮. আবুল আসাদ, *একশ বছরের রাজনীতি* (ঢাকা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪), পৃ. ৯

১২৯. Prasanna Kumar Tagor, *Daily Reference of the Hon'ble*, July, 1831, p. 8

১৩০. মেসবাহুল হক, *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১২

১৩১. ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজি শরীয়ত উল্লাহ্ ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) শামাইল গ্রামে এক মধ্যবিত্ত তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আঠারো বছর বয়সে শিক্ষক বাশারত আলীর সঙ্গে ১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা শরিফে হজ করতে যান। প্রায় বিশ বছর মক্কা শরিফে অবস্থানের পর ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরে এসে 'ফারাইযীয়া' দল গঠন করেন। তিনি এ দেশকে 'দারুল হারব' মনে করে জুমু'আর নামায ও দু'ঈদের নামায পড়া বন্ধ ঘোষণা করেন। শিরক-বিদ'আত ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ পরিহার করার জন্য মুসলিমগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে ৫৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), খ.২, পৃ. ২৯-৩০; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.৯, পৃ. ২৬৭; সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ৩৬৪; কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭১-৫৭৪

১৩২. মীর নিসার আলী তিতুমীর ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় স্কুল ও মাদ্‌রাসা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে হাদিসশাস্ত্র, আরবি, ফারসি ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে হজের উদ্দেশ্যে মক্কা শরিফ গমন করে সায়্যিদ আহমদ শহিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সংস্কার অভিযান, উপমহাদেশের আযাদি সংগ্রাম ও জিহাদি প্রেরণা লাভ করেন। ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি শিরক ও বিদ'আতের উৎখাত এবং সুন্নাতের পূর্ণ অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন। নীলকর, জমিদার ও ইংরেজ বিতাড়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ১৯ই নভেম্বর, ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ৫১-৫২; আবদুল্লাহ্ আল-মুতী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *শিশু বিশ্বকোষ* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ১৯৯৭), খ.৩, পৃ. ৮৬; ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী, *শহীদ তিতুমীর* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৩৭৫), পৃ. ৭৫; কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৭-৫৭৯

১৩৩. আবুল আসাদ, *একশ বছরের রাজনীতি* (ঢাকা : বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৪), পৃ. ১৬৭

উল্লাহ্, ইসলামি ব্যক্তিত্ব অগ্নিপুরুষ কবি ইসমাঈল হোসেন সিরাজী[১৩৪] ও নবাব আব্দুল লতিফ[১৩৫] অন্যতম।[১৩৬] বাংলার মুসলিমগণের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণে আরো দু'জন মনীষী দিকপালের ভূমিকা পালন করেন; তাঁরা হলেন সৈয়দ আহমদ শহিদ[১৩৭] ও সৈয়দ আমীর আলী[১৩৮]। মুসলিম নেতাদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯–১৯২৮ খ্রি.) সর্বপ্রথম মুসলিমগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন

---

১৩৪. ইসমাইল হোসেন সিরাজি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিম সমাজের গৌরব, ইতিহাস ও বর্তমান অধঃপতনের বিষয়ে 'অনলপ্রবাহ' নামক একখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইংরেজ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে এবং তাঁকে দু'বৎসর কারাদণ্ড দেয়। কারামুক্তির পর তিনি সব ধরনের আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও পুরোদমে সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৭ই জুলাই, ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিরাজগঞ্জে ইন্তিকাল করেন। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ১৮৫; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৪২৬; সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯; ড. মো. শহীদুল ইসলাম নুরী, *বাংলার মুসলিম জাগরণ* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৭৮-৭৯

১৩৫. নবাব আব্দুল লতিফ ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 'কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা' থেকে তিনি সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। তিনি কৃষকদের ওপর ইংরেজ নীলকরদের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 'বঙ্গীয় আইন পরিষদে'র সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলার মুসলিমগণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাবিস্তার ও মুসলিম পুনর্জাগরণে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ মহান ব্যক্তিত্ব ১০শে জুলাই, ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় ইন্তিকাল করেন। দ্র. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২; কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮০-৫৮৫; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৩২-৩৩; সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

১৩৬. ডক্টর বদিউজ্জামান, *ইসমাঈল হোসেন সিরাজী : জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮), পৃ. ৪৩

১৩৭. সৈয়দ আহমদ শহিদ বেরেলবি অযোধ্যার অন্তর্গত রায় বেরেলিতে ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বেরেলিতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি শাহ্ আবদুল আযিযের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম সমাজে বিরাজমান শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম চালাতে থাকেন। অল্প সময়ে ভারতবর্ষে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং অগণিত মুসলিম তাঁর অনুসারী হয়। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উৎসাহী অনুচরদের বিরাট মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে পেশাওয়ার প্রবেশ করেন; কিন্তু ইয়ার মুহাম্মদ খান দুররানি ও দুররানির আরেক ভ্রাতার দল-ত্যাগের দরুন 'শায়দোর' যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে তিনি কাশ্মীর গমনে মনস্থ করেন। পথিমধ্যে শিখবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৯৬; খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত, *বাংলা বিশ্বকোষ* (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২), খ.৪, পৃ. ৫৫৬-৫৭

১৩৮. সৈয়দ আমীর আলী ৬/৮ই এপ্রিল, ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' হতে তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলিম এম.এ.। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। তিনি ছিলেন 'কলিকাতা হাইকোর্টে'র প্রথম মুসলিম বিচারপতি। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো *'দি স্পিরিট অব ইসলাম'* (১৮৯১ খ্রি.) নামক গ্রন্থ রচনা। মুসলিম শিক্ষার উন্নতির জন্য আমীর আলী আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। তিনি ৩রা আগস্ট, ১৯২৮/২৯ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ২৪৯-৫০; সৈয়দ আমীর আলী, মুহাম্মদ দরবেশ আলী খাঁন অনূদিত, *দি স্পিরিট অব ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৩; সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৮; আবদুল্লাহ্ আল-মুতী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *শিশু বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ১৪১; কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৫-৫৮৯

উপলব্ধি করেন এবং ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মুসলিমগণের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'[১৩৯] প্রতিষ্ঠা করেন।[১৪০]

এসব আন্দোলনে মুসলিমগণকে বহু মূল্য দিতে হয়েছে। মুসলিমগণের প্রতি ইংরেজদের কঠোর বৈরিতা ও বিদ্বেষের নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময়ে। অনেককে ফাঁসিতে জীবন দিতে হয়েছে।[১৪১] বিচারের নামে প্রহসন চালিয়ে অন্দামানে নির্বাসন দেওয়ায় হারিয়ে গেছেন শত-শত আলিম, ইংরেজের জেলে ধুকে-ধুকে মরেছেন হাজার-হাজার মুক্তিসংগ্রামী। আর ইংরেজদের বিদ্বেষ ও বৈষম্যনীতির শিকার হয়ে গোটা মুসলিম জাতির জীবন কাঠামোর সব দিক থেকে ধ্বংস হয়ে যায়।[১৪২] সবচেয়ে বেশি হত্যালীলার শিকার হন ওহাবি আন্দোলন চিহ্নিত আলিম সমাজ। সাতশ আলিম ফাঁসিতে জীবন দেন।[১৪৩] কবি মির্জা গালিব (১৭৯৭–১৮৬৯ খ্রি.) লিখেছেন,

'মুসলিমগণের অবস্থা দেখে কাঁদবে, এমন একজন মুসলিমও দিল্লিতে অবশিষ্ট ছিল না।'

অ্যাডওয়ার্ড জন থম্পসন (১৮৮৬–১৯৪৬ খ্রি.) মুসলমানের প্রতি ইংরেজ নিপীড়নের হৃদয়বিদারক চিত্র তুলে ধরে 'History of British Rule in India' শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন। হোসামুদ্দীন বি. এ. সেটি '*তাসবীহ কা দোসরা রোখ*' শিরোনামে অনুবাদ করেন। ঐ গ্রন্থের কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন,

> 'জীবন্ত মুসলিমকে নাপাক শূকরের চামড়ায় ঢুকিয়ে সেলাই করে দেওয়া, ফাঁসিতে ঝুলানোর পূর্বে তাদের শরীরে শূকরের চর্বি মাখিয়ে দেওয়া, তাদেরকে জীবন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা কিংবা ভারতীয়দেরকে একে অন্যের সঙ্গে গর্হিত কুকর্ম করতে বাধ্য করা ইত্যাদি প্রতিশোধ গ্রহণের এমন নিন্দিত ব্যবস্থা, যেগুলোকে পৃথিবীর কোনো সভ্যতা অনুমোদন করেনি। এসব কারণে আমাদের চেহারা লজ্জায় অবনত হয়ে যাচ্ছে এবং নিঃসন্দেহে এটি এমন কর্ম যা আমাদের খ্রিষ্ট ধর্মমতকেও প্রকারান্তরে কলুষিত করেছে। এ কর্মের অনিবার্য পরিণতি অবশ্যই আমাদের ভুগতে হবে।'[১৪৪]

---

১৩৯. মুসলিমগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও শিক্ষার অভাব পূরণের লক্ষ্যে সৈয়দ আমীর আলী ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে 'ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাদ্রাজ থেকে পাঞ্জাব এবং চট্টগ্রাম থেকে করাচি সমগ্র ভারতে ৩৪টি শাখা বিস্তার লাভ করে। দ্র. আবুল কাসেম হায়দার ও সোহেল মাহমুদ, *বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস (নওয়াব সলীমুল্লাহ থেকে খালেদা জিয়া)* (ঢাকা : প্যানোরমা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯), পৃ. ৭৫

১৪০. ড. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ২৮৭; এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০

১৪১. ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে প্রায় ২০ লক্ষ মুসলিম অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে দুই লক্ষ শহিদ হয়। ইংরেজরা দিল্লির ক্ষমতা পুনর্দখলের ২ সপ্তাহের ভেতরে ৫০ হাজার আলিমকে হত্যা করে। দ্র. মুহাম্মদ ইদরীস হুশিয়ারপুরী, *খুতবাতে মাদানী* (দেওবন্দ : যম্‌যম বুক ডিপো, ১৯৯৭), পৃ. ৪২০

১৪২. আবুল আসাদ, *একশ বছরের রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

১৪৩. বাহাদুর শাহ্ পার্ক নামে পরিচিত ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে একযোগে ৬০ জন মুসলিমকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তাদের লাশগুলো মাসের পর মাস বৃক্ষশাখায় ঝুলন্ত ছিল। দ্র. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ও আবদুল গফুর সম্পাদিত, *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮; আবুল বাশার মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, 'উপমহাদেশে উলামায়ে কেরামের অবদান', *ইনকিলাব স্মারক সংখ্যা* (ঢাকা : লাজনাতুত তালাবা বাংলাদেশ, ১৯৮৪), পৃ. ১৭-১৮

১৪৪. সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মিয়া, *উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযি* (দিল্লি : কিতাবিস্তান এম. ব্রাদার্স, ১৯৮৫), পৃ. ৪৮৯

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহি বিপ্লবের[১৪৫] পর মুসলিম সমাজ ইংরেজদের রোষানলে পড়ে। তারা ভেদনীতির (Divide and Rule policy) শাসন চালিয়ে এদেশের প্রধান দু'টি সম্প্রদায় (হিন্দু-মুসলিম)-কে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বিদ্বিষ্ট করে রাখে; যার ফল হয় সুদূরপ্রসারী। শাসক শ্রেণির পরিচালিত এ ভেদনীতির শাসনে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্পর্ক তিক্ত ও দ্বন্দ্বমুখর হয়ে ওঠে। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সরকার বঙ্গভঙ্গ আদেশ[১৪৬] বাস্তবায়িত করার ফলে উক্ত বিদ্বেষ আরও ঘনীভূত হয়। বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে; কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। হিন্দুদের বিরোধিতার ফলে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে মুসলিমগণ রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।[১৪৭] ফলশ্রুতিতে, এদেশের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের তিক্ততা এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, উভয় সম্প্রদায়ের ব্যবধান বেড়ে যায়।[১৪৮]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অধ্যায় থেকেই ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ দেশের মুসলিমগণের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং উন্নতির জন্য একটি উপযুক্ত রাজনৈতিক মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আসছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আদেশ (১৯০৫ খ্রি.) বাস্তবায়িত হওয়ার পর হিন্দুপ্রধান কংগ্রেসের[১৪৯] (১৮৮৫ খ্রি.) বৈমাত্রেয় ও বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ মুসলিম নেতাদের মনে এ ধারণার যৌক্তিকতা আরও দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়। উক্ত ধারণাকে

---

১৪৫. সিপাহি বিদ্রোহ ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসন ও ব্রিটিশ সরকারের শাসন যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণ সুখে ছিল না। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অত্যাচার, নিপীড়ন তাদের নিত্যসঙ্গী ছিল। একশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যৌথ শাসনের কুশাসনজনিত ব্যবস্থা জনগণকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। কৃষক, জমিদার, চাকরিজীবী, কারও জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা ছিল না। তারই নিঃসৃত ফল হিসেবে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে যে অসন্তোষ দাবানলের মতো ইংরেজদের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেছিল তা ভারত বাংলার ইতিহাসে '১ম স্বাধীনতা সংগ্রাম' হিসেবে পরিচতি। এতে বিভিন্ন স্তরের জনতা ও সামরিক, আধা-সামরিক লোকজন অংশ নিয়েছিল। দ্র. হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০১

১৪৬. এ আদেশের মাধ্যমে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত বৃহৎ ভূখণ্ড বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গাসাম এ'দুটি প্রশাসনিক প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন (১৮৯৯–১৯০৫ খ্রি.) এ আদেশ ঘোষণা করেন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে বঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে পূর্ব-বঙ্গাসাম প্রদেশ গঠিত হয়। নবগঠিত প্রদেশ দু'টির আয়তন ও লোকসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৪১,৫৮০০ বর্গমাইল ও ৫,৪০,০০০০০ জন এবং ১০,৬৫০০ বর্গমাইল ও ১,৪১,৫৮০০ জন। কলিকাতাকে রাজধানী করে বড়োলাটের অধীনে এবং ঢাকাকে রাজধানী করে ছোটলাটের অধীনে যথাক্রমে বঙ্গ ও পূর্ব-বঙ্গাসাম প্রদেশ ন্যস্ত করা হয়। উভয় বাংলার বিচার বিভাগ পূর্ববৎ 'কলিকাতা হাইকোর্টে'র অধীন রাখা হয়।

১৪৭. Dr. Azizul Hoque, *History and Problems of Muslim Education in Bengal* (Culcutta : Tacker Apink and Co. 1917), pp.1-45; নূরুল ইসলাম চৌধুরী, *ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাস* (ঢাকা : মালিক ব্রাদার্স, ১৯৭৫), পৃ. ৪৭৬-৪৭৭

১৪৮. উক্ত বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত এতদূর গড়ায় যে, হিন্দু ও মুসলিমের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিকতাপূর্ণ মেলামেশার রীতিনীতি নিঃশেষ হয়ে যায়। এমনকি রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, দোকানপাট ও বিদ্যালয় সর্বত্রই এ বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্ররা মুসলিম সতীর্থের পাশে বসতে অসম্মতি জানায়। তাই একই শ্রেণিতে হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রের জন্য স্বতন্ত্র শাখা খোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে বাংলার প্রধান দু'টি সম্প্রদায় পরস্পর হতে ক্রমশ দূরে ছিটকে পড়ে; যার কারণে তাদের মাঝে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ক্রমান্বয়ে মাথাচাড়া দেয়। দ্র. *মুহাম্মদী*, কলিকাতা, বৈশাখ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২

১৪৯. অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউমের প্রচেষ্টায় ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের' জন্ম হয়। ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণ ও স্থায়িত্বের অভিপ্রায়ে যে কংগ্রেস গঠিত হয় তা ভারতীয় সব ধর্মের অনুসারীদের সংগঠন বলে দাবি করা হলেও মূলত তা হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনে পরিণত হয়। দ্র. Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal* (London : Oxfrod University press, 1974), pp.11-99

বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে নওয়াব সলিমুল্লাহ্[১৫০] (১৮৭১–১৯৯৫ খ্রি.), ভিকারুল মুলক (১৮৪১–১৯১৭ খ্রি.) ও এ. কে. ফজলুল হকের[১৫১] (১৮৭৩–১৯৬১ খ্রি.) মতো নেতাদের নেতৃত্বে ঢাকায় ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'[১৫২] প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথমে তৎকালীন সরকারের সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এ দল গঠিত হয়। পরে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় তা সরকার বিরোধী এক বিপ্লবী সংগঠনে পরিণত হয়। সংগঠনটি ভারতব্যাপী মুসলিমগণের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রচার ও প্রসারে ব্রত গ্রহণ করে। তাঁরা এ উদ্দেশ্যে দেশের হিন্দু-মুসলিম মিলনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। তাদের এ মিলনধর্মী রাজনীতির ধারা ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে লখনউ চুক্তি থেকে আরম্ভ করে মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থি 'নেহেরু রিপোর্ট' প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ১০-১২ বছর পর্যন্ত চলছিল।[১৫৩] নেহেরু রিপোর্টে মুসলিমগণের সব দাবি-দাওয়াকেই অস্বীকার করা হয়। হতাশা নেমে এল মুসলিম লীগ মহলে, মুসলিমগণের মধ্যে। জিন্নাহ ঘোষণা দিলেন, 'নেহেরু রিপোর্ট হিন্দুর রিপোর্ট ছাড়া আর কিছু নয়।' ফলে পুনরায় মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের রাজনীতি ভিন্ন পথ ধরে এগুতে থাকে। রাজনীতির এ দু'টি স্বতন্ত্র প্রবাহে শেষপর্যন্ত উপমহাদেশের মানচিত্র বদলে দিয়ে দু'টি সার্বভৌম রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করে।

---

১৫০. নবাব সলিমুল্লাহ্ ভারতবর্ষের প্রখ্যাত মুসলিম রাজনীতিবিদ ও একজন সমাজসেবক ছিলেন। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কুর'আন, হাদিস ছাড়াও তিনি ইংরেজি, আরবি ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি শিক্ষাবিস্তারে যথেষ্ট অবদান রাখেন। মুসলিম সমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্য বহু মক্তব, মাদ্‌রাসা, স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এতিম ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে আজিমপুরে ২৮ বিঘা জমি দান করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'নবাব সলিমুল্লাহ্ মুসলিম এতিমখানা'। ১৬ই জানুয়ারি, ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁকে পুরনো ঢাকার বেগম বাজার জামে' মসজিদের গোরস্থানে দাফন করা হয়। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ৪০৩-৪০৪; সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৭

১৫১. শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক উপমহাদেশের প্রখ্যাত জননেতা, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, জনদরদী ও সংগ্রামী পুরুষ হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি ২৬শে অক্টোবর, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বরিশাল জেলার (বর্তমানে ঝালকাটি) রাজপুর থানার, সাতুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে বি. এ. অনার্সসহ এম. এ. ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে পাস করেন। আইন পাশ করেন ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি 'ভারতীয় কংগ্রেসে'র সাধারণ সম্পাদক এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন। ২৭শে এপ্রিল, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ৬১-৬৪; আবদুল্লাহ্ আল-মুতী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *শিশু বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ২; G. Mawla, *Poet of Politics* (Bangla Version) (Dhaka : Green Publishers, 2nd publishers, 2016), p. 29

১৫২. মুসলিম লীগ ভারত উপমহাদেশের মুসলিম আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষের উদ্দেশ্যে মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সের প্রতিনিধিবৃন্দের উদ্যোগে ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯০৬ খ্রি. ঢাকায় এটি গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাদের মধ্যে ছিলেন নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্, নওয়াব ভিকরুল মুলক ও মহমিনুল মুলক প্রমুখ। প্রতিষ্ঠলগ্নে দলটির নাম ছিল 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'। ১৯৩৯ খ্রি. মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলিমগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার আন্দোলন শুরু করে। ২৩শে মার্চ, ১৯৪০ খ্রি. লাহোরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে 'পাকিস্তান' নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। যা লাহোর প্রস্তাব নামে পরিচিতি। দ্র. আবদুল্লাহ্ আল-মুতী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *শিশু বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৫৩; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.৬, পৃ. ২৭৬

১৫৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় ওলামাদের ভূমিকা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫), পৃ. ১৫

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে ইতালি বিনা অজুহাতে তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ত্রিপলি আক্রমণ করে শেষপর্যন্ত তা গ্রাস করে নেয়। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে বলকানের খ্রিষ্টানরা তুর্কি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের বিরুদ্ধে যুধ্যমান পশ্চিমা শক্তিকে সমর্থন করে। উপমহাদেশের মুসলিমগণ তুরস্কের খিলাফতকে তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মনে করতেন এবং তুর্কি খলিফাকে মনে করতেন বিশ্বমুসলিম জাতির ঐক্যের প্রতীক। তাই তুরস্ক সাম্রাজ্যকে অমুসলিম সাম্রাজ্যের কবলে আপতিত দেখে তারা উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ভারতের মুসলিমগণ তুর্কি খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। বলকান যুদ্ধের সময় ভারতের মুসলিমগণ দলগত কোন্দল ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হন এবং ব্রিটিশদের তুরস্ক বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে মওলানা আবুল কালাম আযাদ,[১৫৪] মওলানা যফর আলী খান,[১৫৫] মওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার,[১৫৬] শওকত আলী[১৫৭] (১৮৭৩–১৯৩৮ খ্রি.), ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি,[১৫৮] এবং এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩–১৯৬২ খ্রি.)

---

১৫৪. মওলানা আবুল কালাম আযাদ ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র মক্কা নগরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১০ বছর বয়সে পিতা মুহাম্মদ খায়রুদ্দীনের সাথে কলকাতায় আগমন করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। ভারতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধির সাথে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। 'জমিইয়তে উলামায়ে হিন্দ' ও 'খিলাফত আন্দোলনে'ও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তিনি তিনবার ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং পবিত্র কুরআনের একটি উর্দু অনুবাদ ও ভাষ্য তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। দ্র. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত, *বাংলা বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ১৭৩; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ২৯৬-২৯৮

১৫৫. মওলানা যফর আলি খান পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার কোটমর্থ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলীগড় থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভের পর নওয়াব মুহসিনুল মুল্‌কের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। পরে হায়দারাবাদ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় রাজনীতিতে অতিবাহিত করেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। পরে মুসলিম লীগের সদস্য হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে পাকিস্তান পার্লামেন্টের সদস্যও নির্বাচিত হন। তিনি কবি, সাহিত্যিক ও অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। *'মারিফাতে মাযহাব ওয়া সায়িন্স'* তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। দ্র. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত, *বাংলা বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ৪২৩

১৫৬. মওলানা মুহাম্মদ আলি জাওহার ভারতের উত্তর প্রদেশের রামপুর রাজ্যে ১৮৭৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। আলীগড় কলেজ থেকে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ভারতীয় মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে একাধিকবার কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল। তিনি খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯১৩ খ্রি. জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। কিন্তু পরে 'নেহেরু রিপোর্ট' প্রকাশিত হলে কংগ্রেসের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯৩১ খ্রি. 'লন্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে' যোগদান করেন। ঐ বছরই তিনি ইংল্যান্ডে মৃত্যুবরণ করেন। জেরুজালেমের 'মসজিদুল আক্‌সা'র পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। দ্র. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত, *বাংলা বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ৯৬

১৫৭. মওলানা শওকত আলি উপমহাদেশের মুসলিমগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। রামপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বেরেলি ও আলিগড়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি মুসলিমগণের স্বার্থের প্রতি ব্রিটিশদের উপেক্ষা, বঙ্গভঙ্গ রদ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখান, দেশবাসীদের হাতে ক্ষমতা ত্যাগে অস্বীকৃতি এবং ব্রিটিশদের মুসলিম বিরোধী পররাষ্ট্রনীতির কারণে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে চাকুরি হতে ইস্তফা দেন। তিনি ইউরোপীয় প্রীতি বর্জন করে আযাদি আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। মুসলিমগণের প্রতিটি দাবির প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন জানান। খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে রাজরোষে পতিত হন এবং কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ হন। দ্র. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত, *বাংলা বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ৪২৩

১৫৮. মওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি পূর্ব পাঞ্জাবের শিয়ালকোর্ট জেলার অন্তর্গত মিয়াঁওয়ালী গ্রামের এক সম্ভান্ত পরিবারে ১০ই মার্চ, ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে 'দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা'য় ভর্তি হন। সেখান থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি টানেন। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল শ্রেষ্ঠ আলিম ও বিপ্লবী চিন্তার অধিকারী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং

এর নেতৃত্বে উপমহাদেশব্যাপী ব্রিটিশ বিরোধী 'খিলাফত আন্দোলন' শুরু করেন। এ আন্দোলন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেশের সর্বত্র খিলাফত কমিটি গঠিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাজনৈতিক নিপীড়ন শুরু করে। তারা নানাভাবে দমন নীতি চালায়; ফলে দেশে বিক্ষোভের দাবানল জ্বলে ওঠে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানকারী সংস্থা ও সংগঠনসমূহ যৌথভাবে ব্রিটিশ সরকারের সাথে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। ভারতবাসীর স্বরাজ লাভকে এ অহিংস অসহযোগ অন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এ সময় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন একসাথে চলে। জনমনে এ আন্দোলন বেশ সাড়া জোগায়। বিলেতি দ্রব্য বর্জন, সরকারি চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগসহ আনুষঙ্গিক কর্মসূচি পালনের দেশব্যাপী হিড়িক পড়ে যায়। এ অহিংস অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের একপর্যায়ে চৌরিচোর নামক স্থানে এক সহিংস ঘটনা সংগঠিত হওয়ার কারণে কংগ্রেস নেতা গান্ধি মর্মাহত হন। তাই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পূর্বেই অসহযোগ আন্দোলন পরিহার করেন। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে তুরস্কে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মুস্তফা কামাল পাশা (১৮৮১–১৯৩৮ খ্রি.) ক্ষমতা দখল করে নেন। ফলে খিলাফত আন্দোলনও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তাই এ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়; তবে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জিত না হলেও খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এদেশবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের শক্তিসঞ্চয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে।

ইংরেজ শাসনের এই সময় (১৯২০–১৯৪৭ খ্রি.) এ দেশের মুসলিম 'আলিমগণের রাজনীতিতে দু'টি জাতীয়তাবাদী স্রোতোধারা প্রবাহিত হয়; যেমন : এক. জমি'আতে 'উলামায়ে হিন্দ এর অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদী দর্শন এবং দুই. জমি'আতে 'উলামায়ে ইসলাম এর দ্বি-জাতিতত্ত্ব সমর্থিত রাজনৈতিক দর্শন।

[এক] জমি'আতে 'উলামায়ে হিন্দ : 'অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদে' বিশ্বাসী 'জমি'আতে 'উলামায়ে হিন্দ' ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত হয়। দারুল 'উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসার প্রধান শিক্ষক (সদরুল মুদার্‌রেসীন) মওলানা হোছাইন আহমদ মাদানী (১৮৭৯–১৯৫৭ খ্রি.) এর নেতৃত্ব দেন। তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন এবং 'ভারতীয় এক জাতি তত্ত্ব দর্শনে'র বিশ্বাসী ছিলেন। এ দলটি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে।[১৫৯] পরবর্তীকালে (১৯৩০ খ্রি.) কংগ্রেস ও জমি'আতে 'উলামায়ে হিন্দ যুগপৎ আন্দোলন করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করে।[১৬০] এদেশের অনেক প্রসিদ্ধ 'আলিম-'উলামা এবং জ্ঞানী-গুণী এ দলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

[দুই] জমি'আতে 'উলামায়ে ইসলাম : 'জমি'আতে 'উলামায়ে ইসলাম' গঠিত হয় ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে। 'দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা' থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শীর্ষস্থানীয় 'আলিম মওলানা আশরাফ আলি থানভির

ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুঃসাহসী সিপাহসালার। তাঁর রচিত *'শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ থিয়োলজিক্যাল কলেজ'*, ও *'শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ আওর উনকা ফালসাফা'* শীর্ষক গ্রন্থদ্বয় সুপ্রসিদ্ধ। ২১শে আগস্ট, ১৯৪৪ খ্রি. তিনি ইন্তিকাল করেন। দ্র. মুহাম্মদ ইসহাক ফরীদী, *আযাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি* (ঢাকা : চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা, ১৯৯২, পৃ. ৫-৪৫; সায়্যিদ মাহবুব রেযবি, *তারিখে দারুল উলুম দেওবন্দ*, খ.২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

১৫৯. মাওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৭৭

১৬০. Ishtiaq Husain Qureshi, *ULEMA IN POLITICS* (Delhi : Renaissance Publishing House, 1985), pp. 339-370

(১৮৬৩–১৯৪৩ খ্রি.) অনুপ্রেরণা ও নির্দেশে[১৬১] আল্লামা শাব্বির আহমদ 'উসমানির (১৮৮৭–১৯৪৯ খ্রি.) সহযোগিতায় স্বাতন্ত্র্যবাদী কতিপয় 'আলিমকে নিয়ে ১১ই জুলাই, ১৯৪৫ খ্রি, কলিকাতায় এটি গঠিত হয়।[১৬২] কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র (১৮৭৬–১৯৪৮ খ্রি.) 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব (Theory of two nations) রাজনৈতিক দর্শনে' বিশ্বাসী মওলানা আশরাফ আলি থানভির (১৮৬৩–১৯৪৩ খ্রি.) এ সংগঠনটির মাধ্যমে ভারতীয় মুসলিমগণের জন্য পৃথক আবাসভূমির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। জমি'আতের সমর্থন লাভ করার কারণে মুসলিম লীগের শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। দলে-দলে লোক দলটির সমর্থনে এগিয়ে আসে। এমন পরিস্থিতিতে একপর্যায়ে ইংরেজ শাসকরা ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারের কতিপয় প্রস্তাব করে। অতঃপর ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সে প্রস্তাব অনুসারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হয় 'ভারত শাসন আইন'। এই আইনের প্রধান দু'টি বিধান হলো : (১) ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি 'সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করা এবং (২) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।[১৬৩]

'ভারত শাসন আইনে'র শর্তগুলো মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। মুসলিম লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অংশটি গ্রহণ করলেও কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রের অংশটি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যায়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও এই আইনকে দাসত্বের নতুন সনদ বলে অভিহিত করেন।[১৬৪] উভয় দল স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার করার পাশাপাশি 'ভারত শাসন আইন' অনুযায়ী ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলিম লীগের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দু মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। অতঃপর পরিলক্ষিত হয়ে যে, কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলিমগণের ওপর অমানুষিক অত্যাচার নেমে আসে। মুসলিমগণের ধন-সম্পদ, জান-মাল, তাহযিব-তামাদ্দুন কোনো কিছুই নিরাপদ ছিল না। অধিকন্তু, হিন্দু সংগঠনগুলোর উসকানিমূলক আচরণের ফলে দেশব্যাপী শুরু হয় দাঙ্গা।[১৬৫] এ. কে. ফজলুল হক সে সময় *'Muslim Suffering Under Congress Rule'* নামক গ্রন্থে এ নির্যাতনের চিত্র এভাবে তুলে ধরেছিলেন,

> It spoke how cow sacrifice was prevented in villages, butchers were assaulted and pork was thrown into mosques. Muslim prayers were interrupted by music and hullabaloo of the Hindu incendies.......[১৬৬]
>
> অর্থাৎ 'তাতে গ্রামে কুরবারি গরু জবাইয়ে বাধা প্রদান, কসাইদের ওপর নির্মম নির্যাতন এবং মসজিদে শূকরের মাংস ছিটানোর নিদারুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। হিন্দুরা গানবাজনা এবং শোরগোল করেও নামাযের বিঘ্ন ঘটাত।...'

---

১৬১. মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক শেরকুঠি, *হায়াত-এ 'উসমানি* (করাচি : মাকতাবা-এ দারুল উলুম, ১৯৮৫), পৃ. ৪৯৭

১৬২. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় ওলামাদের ভূমিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০-১২০

১৬৩. অধ্যাপক কে. আলী, *ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৭০), পৃ. ৩২৬

১৬৪. বিক্রমাদিত্য, *স্বাধীনতার অজানা কথা* (কলিকাতা : দেজ পাবলিশিং, ১৯৮৭), পৃ. ১২০

১৬৫. আবুল আসাদ, *একশ বছরের রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৩; এক হিসেবে ১৯২০ থেকে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১২৭টি দাঙ্গা সংগঠিত হয়। সুভাষ বসু একটি পরিসংখ্যানে বলেছেন, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মহরম উপলক্ষ্যে দাঙ্গায় ৩০ জন মারা যায়। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৮টি দাঙ্গা হয়। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হয় ৩৭টি দাঙ্গা; নিহত হয় ১,০০০ জন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি দাঙ্গায় ১,৬০০ জন নিহত হয়। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে কানপুর দাঙ্গা সমগ্র ভারতকে কাঁপিয়ে তোলে। দ্র. Subhash Chandra Bose, *The Indian Struggle (1920–1942)* (New York : Asia Publishing House, 1964) p. 135

১৬৬. A. B. Rajput, *Muslim League Yeasterday And Today* (Lahore: M. Ashraf, 1948), p. 70

১৯৩৭-১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ (১৮৭৬–১৯৪৮ খ্রি.), মহাত্মা গান্ধি (১৮৬৯–১৯৪৮ খ্রি.) ও কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর[১৬৭] সঙ্গে পত্র-বিনিময় করেও সমাধান হয়নি। হিন্দু নেতাদের অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মুসলিমগণের আলাদা আবাসভূমির দাবি অবধারিত হয়ে যায়।[১৬৮] এছাড়া অতীতের বিভিন্ন ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে মুসলিম নেতৃবৃন্দ বুঝতে সক্ষম হন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলন সম্ভব নয়। মুসলিমগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি আবশ্যক।

এদিকে খ্যাতিমান মুসলিম দার্শনিক কবি ড. আল্লামা মুহাম্মদ ইকবালও (১৮৭৭–১৯৩৮ খ্রি.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলিমগণের জীবনদর্শন, রাজনীতি, আদবকায়দা ও চিন্তাধারার সাথে হিন্দুদের কোনো মিল নেই। তিনি অনুভব করলেন যে, ভারতের দশ কোটি মুসলিমকে নিজস্ব আদর্শ নিয়ে বাঁচতে হলে তাদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রয়োজন। তাই ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে তিনি পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও কাশ্মীর নিয়ে মুসলিমগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন। পরবর্তীকালে এ দাবিটি ভারতীয় মুসলিমগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়।[১৬৯]

মুসলিমগণের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমান্বয়ে জোরদার হতে থাকে। এই লক্ষ্যে মুসলিম নেতৃবৃন্দ কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ (১৮৭৬–১৯৪৮ খ্রি)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগে যোগদান করলেন। ২৩শে মার্চ, ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের লাহোরে মুসলিম লীগের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ (১৮৭৬–১৯৪৮ খ্রি.)। বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩–১৯৬২ খ্রি.) এই সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এটি 'লাহোর প্রস্তাব' নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবে উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহের মুসলিমগণের জন্য একাধিক পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লির মুসলিম কনভেনশনে একাধিক রাষ্ট্রের স্থলে 'পাকিস্তান' নামক একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। লাহোর প্রস্তাবের পর হতে মুসলিমগণ কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ (১৮৭৬–১৯৪৮ খ্রি.)-এর নেতৃত্বে পাকিস্তান অর্জন করার জন্য সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োগ করেন।[১৭০]

'লাহোর প্রস্তাবে' হিন্দুরা অত্যন্ত নাখোশ হন। তারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অর্থাৎ স্বাধীন অখণ্ড ভারতের দাবিতে আন্দোলন আরম্ভ করে দেয়। অপরপক্ষে, সে প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ মুসলিমগণের জন্য স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের জন্য জোর তৎপরতা চালাতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের

---

১৬৭. সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনত্যম নেতা ছিলেন। তিনি ১৮৯৭ খ্রি. ভারতের অন্তর্গত কটকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩১ খ্রি. ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে বৃটিশদের হাতে একাধিকবার গ্রেফতার হন। ১৯৩৯ খ্রি. তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারতের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য তিনি 'ভারত মুক্তি ফউজ' নামে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করেন। ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনে এই মনীষীর অবদান অপরিসীম। দ্র. সৈয়দ মকসুদ আলী, *রাজনীতি ও রাষ্ট্র চিন্তায় উপমহাদেশ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ১৭৬; হাবীবুর রহমান সম্পাদিত, *নেতাজী সুবাস বসু* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং, ১৯৮৬), পৃ. ৩৫-৫৯

১৬৮. এলাহী নেওয়াজ খান, 'একশ বছরের ঘটনাবহুল রাজনীতি ও বর্তমান বাংলাদেশ', *দৈনিক ইনকিলাব*, ১লা জানুয়ারি, ২০০০, পৃ. ৪

১৬৯. অধ্যাপক কে. আলী, *ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮

১৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬

নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি (১৮৮৩–১৯৬৭ খ্রি.) ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। নির্বাচনের পর লর্ড পেথিক লরেন্স (১৮৭১–১৯৬১ খ্রি.)-এর নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একটি প্রতিনিধি দল ভারতে আসেন। এটাই 'কেবিনেট মিশন' হিসেবে পরিচিত।

'কেবিনেট মিশনে'র পরিকল্পনার আলোকে তিন গ্রুপে বিন্যস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলো নিয়ে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এ প্রস্তাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত পোষণ করতে পারেনি। ফলে কলিকাতায় এক রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। এ দাঙ্গায় প্রাণ হারায় হাজার-হাজার মানুষ। ফলে কেবিনেট মিশনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। অবশেষে, ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পারল যে, দেশবিভাগ ছাড়া ভারতের হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড মাউন্টব্যাটেন (১৯০০–১৯৭৯ খ্রি.)-কে গভর্নর জেনারেল করে ভারতবর্ষে পাঠায়। গর্ভনর জেনারেল ভারতের পরিস্থিতি লক্ষ করে ৩ জুন এক পরিকল্পনায় ভারত বিভাগের সুপারিশ করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।

সে পরিকল্পনার ভিত্তিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৮ই জুলাই, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারত স্বাধীন আইন' প্রণয়ন করে। ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান গণপরিষদের হাতে এবং ১৫ই আগস্ট ভারতীয় গণপরিষদের হাতে মাউন্টব্যাটেন আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ[১৭১] পাকিস্তানের বড়ো লাট নিযুক্ত হন। আর লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের প্রথম বড়ো লাটের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ফলে ১৯০ বছর ইংরেজ শাসনের পর উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ করে।[১৭২]

[দুই] পাকিস্তানি শাসনামল (১৯৪৭–১৯৭১ খ্রি.)

রাজনৈতিক আন্দোলন, দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের মাধ্যমেই পাকিস্তানের সৃষ্টি। ভারতের মুসলিমগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থে ভারতবর্ষে মুসলিমগণের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হলো। তাই পাকিস্তানের জন্মকে ইতিহাসবেত্তাগণ 'একটি জাতির জন্ম' বলে অভিহিত করেন।[১৭৩] মুসলিম জাতিভিত্তিক গঠিত 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রটি পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান– এ দু'টি অংশ নিয়ে গঠিত

---

১৭১. মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ একজন গুজরাটি বংশোদ্ভূত একজন আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৩ খ্রি. থেকে শুরু করে ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের স্বাধীনতা পর্যন্ত তিনি 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগে'র নেতা ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন এবং আমৃত্যু এ পদে বহাল ছিলেন। পাকিস্তানে তাঁকে কায়েদে আজম (মহান নেতা) ও বাবায়ে কওম (জাতির পিতা) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্ব*কোষ, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ২৭০; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.৮, ৬৯২-৬৯৪

১৭২. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.৮, পৃ. ৫২১; এম. এ. রহীম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭-২২৩

১৭৩. আবুল আসাদ, *একশ বছরের রাজনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫

ছিল। সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববাংলা ও আসামের সিলেট জেলা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান।[১৭৪]

স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম গর্ভনর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ (১৮৭৬–১৯৪৮ খ্রি.)। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকার গঠনের তাগিদে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ লিয়াকত আলি খান (১৮৯৬–১৯৫১ খ্রি.)-কে প্রধানমন্ত্রী করে পাকিস্তানের নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পূর্ব পাকিস্তানকে প্রদেশের মর্যাদা দিয়ে তাতে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয় খাজা নাজিম উদ্দিনকে।[১৭৫] করাচিকে পশ্চিম পাকিস্তানের এবং ঢাকাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী নির্বাচিত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান একই শাসন ব্যবস্থার অধীনে ১৯৪৭–১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ২৪ বছর টিকে থাকে। এ সময় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই নাজুক ও অস্থিতিশীল। তার পিছনে অনেক কারণ ছিল। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

❖ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়ার আগেই এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ্ মারা যান। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন (১৮৯৪–১৯৬৪ খ্রি.) গভর্নর জেনারেল মনোনীত হয়ে ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত বহাল ছিলেন। তাছাড়া মধ্যবর্তী একটি পরাক্রান্ত বিরোধী রাষ্ট্রের বিদ্যমানতায় প্রায় বারোশ মাইল দূরবর্তী দু'টি ভূখণ্ডের এ অখণ্ড জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থিতি বিশ্ব ইতিহাসে অভূতপূর্ব ব্যাপার।[১৭৬] কারণ রাষ্ট্রের দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির মিল নেই। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা একই বাংলা ভাষায় কথা বলে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা উর্দুসহ কয়েকটি ভাষায় কথা বলে।[১৭৭]

❖ পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বড়ো ধরনের বিরোধ সৃষ্টি হয় ভাষাগত প্রশ্নে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত এক ভাষণে এবং পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। ছাত্রনেতৃবৃন্দ তাৎক্ষণিকভাবে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। পরবর্তীকালে সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে এক বিরাট আন্দোলন সংঘটিত হয়, যা 'ভাষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। মূলত তখন থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত।[১৭৮]

---

১৭৪. অধ্যাপক কে. আলী, *ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৪; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১৪, পৃ. ২৫৪

১৭৫. খাজা নাজিমুদ্দিন একজন রাজনীতিবিদ, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের দ্বিতীয় গভর্নর জেনারেল ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধিতা করেন। এছাড়া তিনি বাংলার শিক্ষামন্ত্রী এবং এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে গঠিত 'বঙ্গীয় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা'র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন। দ্র. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), পৃ. ৩০৯; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.৩, পৃ. ৪২-৪৩

১৭৬. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *পলাশী থেকে পাকিস্তান* (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৬৮), পৃ. ১৫৫

১৭৭. সিরাজ উদ্দিন আহমেদ, *শেখ মুজিবুর রহমান* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০), পৃ. ৬০-৭০

১৭৮. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫–১৯৭৫* (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব বিতান, ১৯৯৭), পৃ. ৩৮-৪০

❖ ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনই ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য। পাকিস্তান কায়েমের পর স্বাধীন মুসলিম দেশটিতে ইসলামি আইন, ইসলামি শিক্ষা, অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা ইসলামি মূল্যবোধ অনুযায়ী চালু করার কোনো পরিকল্পানাই আন্দোলনের নেতারা পরবর্তীকালে করেনি। তারা এ প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাওয়ায় ইসলামপ্রিয় জনগণ তাদের ওপর রুষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই নেতারা জনপ্রিয়তা হারান। এদিকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র পাঁচ মাস পর থেকে ইসলামি শাসনতন্ত্র বাস্তবায়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদুদীর (১৯০৩–১৯৭৯ খ্রি.) নেতৃত্বে 'জামা'আতে ইসলামি পাকিস্তান' আন্দোলন শুরু করে। এ দাবিতে সমগ্র দেশে সভা-সমাবেশে মওলানা মওদুদীসহ ইসলামি ব্যক্তিত্বগণ বক্তব্য প্রদান করেন এবং জনমত সৃষ্টি করেন; কিন্তু জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে পাকিস্তান সরকার একটি সেক্যুলার সংবিধান চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পরবর্তীকালে সরকার ইসলামি জনতার সর্বাত্মক আন্দোলনের মুখে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান গণপরিষদ কর্তৃক উপস্থাপিত ২২ দফা মূলনীতির ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে।[১৭৯]

❖ ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম সংবিধানে পাকিস্তানকে 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। একই বছর ৯ই মার্চ জেনারেল ইসকান্দার মির্জা (১৮৯৯–১৯৬৯ খ্রি.) পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। রাজনৈতিক কোন্দলে তৎকালীন গণপরিষদের ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী (১৮৯৯–১৯৫৮ খ্রি.) বিরোধীদের হাতে প্রাণ হারান। এ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দর মির্জা দেশের সংবিধান বাতিল করে ৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে রাতে প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংবিধান বাতিল করে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। মাত্র বিশ দিন পর জেনারেল আইয়ুব খান (১৯০৭–১৯৭৪ খ্রি.) ইসকান্দর মির্জাকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন।[১৮০] তাঁর দীর্ঘ শাসন ব্যবস্থায় সামরিক কর্তৃপক্ষের চণ্ডনীতি, আমলাতন্ত্রের একপেশে শাসননীতি এবং রাজনৈতিক সুবিধাভোগী মৌলিক গণতন্ত্রীদের দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্যের এক পাহাড় সৃষ্টি হয়।[১৮১]

❖ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভের পর ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদায় উন্নীত হলেও করাচি বা রাওয়ালপিণ্ডির তুলনায় এ অঞ্চলে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন ও আমলাদের বৈষম্যনীতি, তাদের শোষণ ও বঞ্চিতকরণের কূটকৌশলের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করার অঙ্গীকার করে এ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ জনপ্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ বাঙালিদের অধিকার আদায়ের নিমিত্ত ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করে। পরবর্তীকালে এ ছয় দফার ভিত্তিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত হয়ে আওয়ামী লীগ সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সকল শ্রেণির পেশাজীবী লোকেরা এ ছয় দফার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করে। একে 'বাঙালিদের মুক্তির সনদ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। আওয়ামী লীগের আন্দোলন বানচাল

---

১৭৯. মুহাম্মদ শফি উল্লাহ্ ও মাওলানা হুসাইন আহমদ, *মাওলানা মওদূদী : একটি দুর্লভ সংগ্রহ* (ঢাকা : নছর প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ১২-১৫

১৮০. নূর হোসেন মজিদী, *মাওলানা আবদুর রহীম একটি বিপ্লবী জীবন* (ঢাকা : মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ৮১-৮৫

১৮১. মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, *বাংলাদেশ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯২), পৃ. ১৩

করার জন্য শাসকদল ৮ই মে, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা বিচারে কারাগারে পাঠান। ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে এক সরকারি প্রেসনোটের মাধ্যমে তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়[১৮২] গ্রেফতারের কথা ঘোষণা করে।[১৮৩]

ইতোমধ্যে ৬ই জানুয়ারি, ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ১১ দফা দাবি নিয়ে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় এবং ৮ই জানুয়ারি, ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ৮টি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয় 'ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি বা ডাক'। ডাক ৮ দফা[১৮৪] কর্মসূচি ঘোষণা করে। ছাত্র ঐক্যের ১১ দফা ও ডাকের ৮ দফা একপর্যায়ে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া ২৮ই মার্চ, ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে, দেশবাসীকে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহিয়া খানের সামরিক সরকারের অধীনে বহুলপ্রত্যাশিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে এককভাবে বিজয়ী হন।[১৮৫] পার্লামেন্টারি বিধান অনুযায়ী শেখ মুজিব পাকিস্তানের সরকার গঠনের ন্যায্য দাবিদার হলেও ভুট্টো তা অস্বীকার করলেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করেন।

এই গড়িমসির প্রতিবাদে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চে শুরু হয় অসহযোগ অন্দোলন। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের[১৮৬] বিশাল সমাবেশে শেখ মুজিব রহমান (১৯২১–১৯৭৫ খ্রি.) স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণকে স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল চাবিকাঠি হিসেবে মনে করা হয়। এ ভাষণের বিখ্যাত উক্তি ছিল,

'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।'[১৮৭]

৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ কোনো দলীয় নেতার নির্দেশ ছিল না; ছিল একজন জাতীয় নেতার নির্দেশ। এই নির্দেশ দেশের সর্বস্তরের ছাত্র, জনতা ও বুদ্ধিজীবীদের সাথে বাঙালি সামরিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলকেই সচেতন করে তোলে। ২রা মার্চ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে থেকে পূর্ব বাংলার সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম চলতে থাকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। অবশেষে ২৫ই মার্চ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে গভীর রাতে

---

১৮২. আগরতলা নামক স্থানে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে লিপ্ত থাকার মিথ্যা অভিযোগ এনে পাকিস্তান সরকার এই মামলা দায়ের করে। দ্র. আব্দুল আউয়াল ঠাকুর, *প্রতিরোধ দুরন্ত দুর্বার*, ১৯৯৩, পৃ. ৬৯

১৮৩. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫–১৯৭৫*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২

১৮৪. উক্ত ৮ দফা নিম্নরূপ : (১) ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার; (২) প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন; (৩) অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার; (৪) সকল কালাকানুন বাতিল; (৫) সকল রাজবন্দিদের মুক্তি; (৬) ১৪৪ ধারা মোতাবেক সর্বপ্রকার আদেশ প্রত্যাহার; (৭) শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহাল; (৮) সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি। দ্র. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫–১৯৭৫*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৪

১৮৫. ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টিতে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। ১৭ ডিসেম্বরে প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসনে বিজয়ী হয়।

১৮৬. রেসকোর্স ময়দান ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত, যা বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের দক্ষিণে পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এই তিন নেতার সমাধি, পশ্চিমে বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) এবং পূর্বে রমনা পার্ক অবস্থিত। দ্র. G. Mawla, *Poet of Politics* (Bangla Version), Ibid, p. 36

১৮৭. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫–১৯৭৫*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৩-৩৮৬

নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনী সশস্ত্র হামলা চালায়। বাঙালি জাতির ওপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর এই কুখ্যাত হত্যাযজ্ঞের নির্দেশনামা 'অপারেশন সার্চ লাইট'[১৮৮] নামে পরিচিতি। এরপর চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা হয়। ফলে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধশেষে ভারতের সহযোগিতায় ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়; স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। পৃথিবীর বুকে অভ্যুদয় ঘটে আরেকটি পতাকার, আরেকটি মানচিত্রের।

[তিন] বাংলাদেশ শাসনামল (১৯৭১–১৯৯৮ খ্রি., মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের মৃত্যু)

অন্তবর্তীকালীন সরকার ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম সরকার। প্রধানমন্ত্রী হলেন তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫–১৯৭৫ খ্রি.)। ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত হন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।[১৮৯] তিনি স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির পিতা এবং বঙ্গবন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি (১৯১৭–১৯৮৪ খ্রি.) ২৫ বছর মেয়াদি ইন্দো-বাংলাদেশি বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লি চুক্তিতে বাংলাদেশ-ভারত ও পাকিস্তান আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং শান্তির জন্য কাজ করার অঙ্গীকার করে। এই চুক্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়।

২৫ই জানুয়ারি, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি একদলীয় প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার কায়েম করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের সার্বিক অবকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাঁর গৃহীত নানান বৈপ্লবিক ও গণমুখী কর্মসূচির ফলে দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে থাকে; কিন্তু ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার পূর্বেই তিনি ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে অতি প্রত্যুষে আততীয়দের হাতে সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেন।

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহি জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান[১৯০] প্রথমে সামরিক শাসক, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১লা সেপ্টেম্বর,

---

১৮৮. অপারেশন সার্চলাইট (Operation Searchlight) ২৫ই মার্চ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে থেকে শুরু হওয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত পরিকল্পিত গণহত্যা, যার মাধ্যমে তারা ১৯৭১ এর মার্চ ও এর পূর্ববর্তী সময়ে সংঘটিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দমন করতে চেয়েছিল। দ্র. কে. এম. রাইছউদ্দিন, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭৫

১৮৯. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে ১৭ই মার্চ, ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুল থেকে মেট্রিক এবং ১৯৪৪ ও ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে যথাক্রমে আই. এ. ও বি. এ. পাস করেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে নবগঠিত 'পাকিস্তান মুসলিম লীগে'র যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিনি ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ছয় দফা দাবি উত্থাপন, ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন ও ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রনায়ক ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিজয়ের পতাকাকে ছিনিয়ে আনে। ১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক বাহিনীর কতিপয় অবসরপ্রাপ্ত ও চাকরিরত বিপথগামী অফিসার ও তাদের অনুসারীদের হাতে সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেন। দ্র. ভবেশ রায়, *বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা*(ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশন, ১৯৯৮), পৃ. ১৭; শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১-১৩৫

১৯০. মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বগুড়া জেলার বাগবাড়ির এক মুসলিম পরিবারে ১৯ই জানুয়ারি, ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 'বগুড়া হাই স্কুল' থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কমিশন অফিসার হিসেবে সেনাবাহিনীতে যোগদান

১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)' গঠন করেন। তিনি সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ্' সংযোজন করেন এবং বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। ৩০শে মে, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে বিপথগামী কতিপয় সেনা সদস্যদের বিদ্রোহের ফলে তিনি শাহাদাত বরণ করলে তৎকালীন সেনা অফিসার হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ[১৯১] ক্ষমতা দখল করেন। সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর[১৯২] মাধ্যমে তিনি ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করেন; কিন্তু কার্যত বাংলাদেশ এখনও ইসলামি রাষ্ট্র হয়নি এবং বাংলাদেশের রাজনীতিও ইসলামভিত্তিক নয়। তিনি দীর্ঘ আট বছর স্বৈরাচার কায়দায় দেশ শাসন করেন। ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এরপর ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' (বিএনপি) সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ২৩ই জুন, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রক্ষমতার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় বহু শাসকগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। তাতে প্রতিটি শাসকগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়ন হলেও সাধারণ জনগণের ভাগ্যের তেমন পরিবর্তন হয়নি; বরং এ রাজনৈতিক উত্থান-পতন এদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে সবচেয়ে বেশি। ফলে স্বাধীনতার পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর অতিবাহিত হলেও জনগণ তার আশানুরূপ সুফল এখনও লাভ করতে পারেনি। মওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এসব ঘটনাপ্রবাহ গভীরভাবে লক্ষ করেন। তিনি দেশের সচেতন একজন নাগরিক হিসেবে নিজ অবস্থান থেকে দেশ গড়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। আমৃত্যু তিনি অবিচলতার সাথে দেশের জন্য, দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কাজ করে গেছেন। আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়নে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করেন।

করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি ৯ নং সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহি জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে তিনি প্রথমে সামরিক শাসক, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং পরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ৩০ই মে, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে একদল বিপথগামী সেনাকর্মকর্তার হাতে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে শাহাদাত বরণ করেন। দ্র. *দৈনিক মিল্লাত*, ২৫ই ডিসেম্বর, ১৯৮২, পৃ. ৪; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ৪৯-৫১

১৯১. হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের কোচবিহারের দিনহাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 'অফিসার্স ট্রেনিং স্কুলে' যোগ দেন এবং ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে কমিশন প্রাপ্ত হন। সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন পদে চাকরি করে সর্বশেষ ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি ২৪ই মার্চ, ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। ১লা জানুয়ারি, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে 'জাতীয় পার্টি' গঠন করে নানান কৌশলে তিনি দীর্ঘ ৯ বছর স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ শাসন করেন। তিনি ১৪ই জুলাই ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় ৮৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। , দ্র. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.১০, পৃ. ৫০৮-৫০৯

১৯২. ৭ই জুন, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে সংশোধনীর মাধ্যমে ৩০ নং আইনের ২ ধারায় রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা হয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধর্মীয় অবস্থা

বিংশ শতাব্দীতে মুসলিমগণ তাহযিব-তামাদ্দুন, ‘আকিদাহ-বিশ্বাস, ‘আমল-আখলাক সকল দিক দিয়ে নিমজ্জিত ছিল ঘোর অন্ধকারে। শিরক-বিদ‘আত, কুসংস্কারের পঙ্কে তারা হাবুডুবু খেতে থাকে।[১৯৩] মুসলিমগণের এমন পরিস্থিতির মূল কারণ ছিল দু’টি।

প্রথমত : কোনো ধর্ম যখন এক দেশে উদ্ভূত হয়ে অন্য দেশে প্রচারিত হয়, তখন স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে তাতে নানান পরিবর্তন ঘটে থাকে। ইসলামের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। এজন্যই বাংলাদেশের ইসলামকে ড. এনামুল হক ‘লৌকিক ইসলাম’ বলেছেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশে কেউ ইসলামের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করে ইসলাম গ্রহণ করেনি; বরং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের চেয়ে দরবেশি কারামত ও বুযুর্গির দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে;[১৯৪] অর্থাৎ একজন পৌত্তলিক ইসলামকে না বুঝেই মুসলিম হয়েছেন। পরে তার কোনো ইসলামি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে পৌত্তলিকতার অসারতা এবং তার বিপরীতে ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সুযোগ তার হয়নি। ইসলামি পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করে আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ও মনমানসিকতার পরিবর্তন ও সংশোধন সম্ভব হয়নি। তাছাড়া ধর্মান্তরিতদের মধ্যে অধিকাংশই এসেছিল সাধারণ শ্রেণি থেকে।[১৯৫] এদের মধ্যে ইসলামের ব্যাবহারিক জ্ঞান গভীরভাবে স্থান লাভ না করায় তাদের পূর্বপরিচিত রীতিনীতি, ধর্মীয় কুসংস্কার, বিশ্বাস ও দেবতার প্রতি ভিত্তিহীন মোহ, অনুরাগ ত্যাগ করতে পারেনি।[১৯৬] এতে ভারতীয় নওমুসলিমগণ পৌত্তলিক থেকে অর্ধমুসলিম (Half-Conversion) হয়েছে। ফলে পার্শ্ববর্তী হিন্দু ও বৌদ্ধদের অনেক বিশ্বাস ও আচরণ মুসলিমগণের মধ্যে প্রবেশ করেছিল।[১৯৭]

দ্বিতীয়ত : পলাশির পর মোগল আমলে মুসলিম জনসাধারণের ধর্মীয় জীবন শরি‘আত মোতাবেক হচ্ছে কি না তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং শিক্ষা-কালচার উন্নয়নের জন্য সৃষ্ট কাযি, মুফতি ও মুহ্‌তাসিব পদগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। মুসলিম জনগণের ধর্মীয় জীবনের খবরদারি করার মহৎ কর্তব্যটা বিস্মৃত হলো। তাতে মুসলিমগণের ধর্মীয় জীবনে বহু বিদ‘আতের অনুপ্রবেশ ঘটল; এবং প্রতিবেশী হিন্দুদের প্রভাবে ও অনুকরণে মুসলিমগণ বহু কুসংস্কার ও শরি‘আত বিরুদ্ধ প্রথার অনুসারী হয়ে পড়ল।[১৯৮] ইসলামের ওপর হিন্দুধর্মের এই প্রভাবকে লক্ষ করে একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন,

> ‘যদিও হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের সাথে মুসলিমগণের ধর্মবিশ্বাসের তফা রাত-দিনের মতো, তবু হিন্দুধর্ম অন্য যে ধর্মের সংস্পর্শে এসেছে সেটিকে আশ্চর্যভাবে নিজের রঙে রাঙিয়ে তুলেছে।’[১৯৯]

---

১৯৩. কবি রুহুল আমিন খান, *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০০, পৃ. ৪

১৯৪. ড. এনামুল হক, *বঙ্গে সুফী প্রভাব* (ঢাকা : র‍্যামন পাবলিশার্স, ২০০৬), পৃ. ১৩৫

১৯৫. ড. আব্দুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ২০৭-২০৮

১৯৬. J. C. Jock, *Bengal District Gazetters : Bakargong* (Bengal District Gazetteer Vol 36) (Calcutta : Bengal Secretariat Book Depot, 1918), p. 32

১৯৭. আবু ইয়াহইয়া আন-নওশাহরবি, *তারাজিমে উলামায়ে হিন্দ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ২৭৭

১৯৮. আব্দুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ২৬৫

১৯৯. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, ১৬

আল্লামা ইকবাল (১৮৮৭–১৯৩৮ খ্রি.) এ ব্যাপারে বলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা হিন্দুয়ানিতে হিন্দুদের ছাড়িয়ে গিয়েছি।'[২০০] মুসলিমগণের গর্হিত এমন আচরণ দেখে অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে তিনি আরো বলেন,

وضع میں تم ہو نصاریٰ، تو تمدن میں ہنود- یہ مسلماں ہیں! جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود

> অর্থাৎ 'চালচলনে হিন্দু তুমি, বেশভূষাতে খ্রিষ্টান, মুসলিম এই যারে দেখে, ইয়াহুদ করে লজ্জা জ্ঞান।'[২০১]

প্রকৃতপক্ষে, বাঙলার মুসলিমগণের 'আকিদা-বিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতিতে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে বাংলার শাসক আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (মৃ. ১৫১৯ খ্রি.)-এর সময়। হিন্দু রেনেসাঁস্ আন্দোলনের ধারক ও বাহকদের দ্বারা পরিপূর্ণ ও পরিবেষ্টিত মন্ত্রিসভার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি শ্রী চৈতন্যের (১৪৮৬–১৫৩৪ খ্রি.) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[২০২] আর শ্রী চৈতন্যের প্রেম ও ভক্তির ধর্ম দু'দিক দিয়ে বাংলার মুসলিমগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।[২০৩]

অনুরূপভাবে, জৈন ধর্ম, হোলি উৎসব পালন, ভণ্ড ফকিরের লীলা, আর্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যবাদ, দ্রাবিড়ীয় ধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও পড়েছে এ দেশের মুসলিম সমাজে। সাথে সাথে নাড়ার ফকিরদের সাধন পদ্ধতি ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমগণের তাহযিব-তামাদ্দুন নষ্ট হওয়ার পিছনে বিশেষভাবে দায়ী। কাজেই মুসলিমগণের ধর্মীয় ব্যবস্থায় যে সকল শিরক-বিদ'আত ও পৌত্তলিক চিন্তা-চেতনার প্রবেশ ঘটেছিল তা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

ভণ্ড ও নাড়ার পীর-ফকির সম্প্রদায়ের উদ্ভব

মুসলিম নামধারী একশ্রেণির নাড়ার পীর-ফকিরের উদ্ভব হয়। তারা মা'রিফতকে শরি'আত থেকে আলাদা করে নেয় এবং শরি'আতের বিভিন্ন ব্যাপারে আরেকটি অন্তর্নিহিত বা মা'রিফত অর্থ বের করে আনে। এ ভণ্ড ফকিরের দল বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল; যথা : আউল, বাউল, কর্তাভজা, মহাজিয়া প্রভৃতি। এগুলো হচ্ছে হিন্দু বৈষ্ণব বা শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের মুসলিম সংস্করণ, যাতে করে সাধারণ অজ্ঞ মুসলিমগণকে বিপদগামী করা যায়।

নাড়ার ফকিরের সাধন পদ্ধতি

বাউল সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও যৌনপ্রবণ। হিন্দু বাউল সন্ন্যাসীদের চারিচন্দ্র ভেদের[২০৪] ন্যায় মুসলিম বাউল ফকিরেরা 'পঞ্চরস' নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করত। এ পঞ্চরস হচ্ছে, কালো, সাদা, লাল, হলুদ ও মুর্শিদ বা গুরুর বাক্য। কালো অর্থ মদ, সাদা অর্থ বীর্য, লাল অর্থ ঋতুবতী নারীর ঋতুস্রাব, হলুদ অর্থ মদ। নিজের স্ত্রী অথবা পরস্ত্রীর সাথে যৌনমিলনের মাধ্যমে তারা 'রতি সাধন', 'রস

---

২০০. Beverly Nichols, *Verdict on India* (Hong Kong : Hesperides Press, 2008), p. 65

২০১. উদ্ধৃত : ড. আহমদ আলী, *যুবদাতুল বায়ান ফী ঈদাহিল কুরআন* (ঢাকা : প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০১৯), খ.১, পৃ. ২৩৯

২০২. আব্বাস আলী খান, 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস', *মাসিক পৃথিবী*, মার্চ, ১৯৯০, পৃ. ২২

২০৩. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪), পৃ. ২৮৬

২০৪. হিন্দু বাউল সন্ন্যাসীরা যৌনসঙ্গমের মাধ্যমে যৌনপূজার একটি অনুষ্ঠান পালন করত। এতে তারা 'চারিচন্দ্র ভেদ' অর্থাৎ ঋতুবর্তী নারীর রক্ত, বীর্য, মল ও মূত্র সেবন করে। দ্র. অক্ষয় কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়* (কলিকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৮৭০), পৃ. ২৩৬

সাধন' বা 'গুটি সাধন' করত।[২০৫] শরি'আতের নিষিদ্ধ মদ ও গাঁজা সেবন করাকে তারা মা'রিফতে ইসলামি তথা আল্লাহ্ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করার উপায় হিসেবে গণ্য করত।[২০৬]

নাড়ার ফকিরের দল কুর'আনের শব্দের নিজেদের মনমাফিক একটি কুৎসিত অর্থ গ্রহণ করত; যেমন : 'হাউজে কাওসার' অর্থ তারা বেহেশতি সঞ্জীবনী সুধার পরিবর্তে নারীদের ঋতুস্রাব বোঝে। তারা ঋতুস্রাব ও বীর্য পান করে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমে বিভোর হয়। বীর্য পান করার সময় তারা বীজ মে আল্লাহ্ (মায়াযাল্লাহ) অর্থাৎ বীর্যে আল্লাহ্ অবস্থান করেন—এই অর্থে 'বিসমিল্লাহ্' শব্দ উচ্চারণ করে।[২০৭] শরি'আতের ৩০ পারা কুর'আন তারা মানে না। নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাদের মনের মদিনায় সব সময় দশ পারা কুর'আন তরতাজা থাকে।[২০৮]

একদল মুসলিম ভিক্ষোপজীবী নাড়ার ফকিরের দলের পুরোহিতরা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপিনীদের বস্ত্র হরণের অনুরূপ এক অভিনয়ের অনুষ্ঠান করে থাকে। এরা যখন মুরিদের বাড়িতে তাশরিফ আনতেন তখন যুবতিরা উত্তম বসনে সজ্জিত হয়ে বৃন্দাবনের গোপিনীদের অনুকরণে একটি গৃহকক্ষে পীরের সাথে মিলিত হতো। মেয়েরা নাচ-গান করতে করতে উলঙ্গ হয়ে যেত এবং মুর্শিদ তাদের পোশাকগুলো গৃহের কোনো উঁচু স্থানে লুকিয়ে রাখত। এরপর যৌন উত্তেজনাপূর্ণ গান দ্বারা পীর-মুর্শিদের সাথে যৌন মিলনে উদ্বুদ্ধ করা হতো এবং বলা হতো, 'হে যুবতীগণ! তোমাদের মোক্ষের পথ ভক্তকুলের পুরোহিতকে অর্ঘ্যস্বরূপ দেহদান করো।'[২০৯]

বাউল ফকিরেরা তাদের বিবাহিত স্ত্রীদের সাথে সীমিত যৌন সম্পর্ককে তাদের নিগূঢ় সাধন পদ্ধতির পথে অন্তরায় মনে করত। এজন্য তারা সর্বাধিক সংখ্যক পরস্ত্রী বা বীরাঙ্গনার সাথে যৌনমিলন করত।[২১০] 'ইচ্ছা পূরণ ভজন' হলো ফকিরদের মা'রিফত লাভের একটি পদ্ধতি। এজন্য তারা নারী-পুরুষ 'আখড়া' নামক স্থানে মিলিত হতো। নানান ধরনের মাদকদ্রব্য সেবন করে অতঃপর প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামতো একজনের সাথে যৌনমিলন করে নিজেদের নিগূঢ় সাধনকার্য চালিয়ে যেতো।[২১১]

হোলি উৎসব পালন

হোলি হলো শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব। শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণববাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের পূজা অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দোল উৎসব অন্যতম। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নবাব আলিবর্দি খান (১৬৭১–১৭৫৬ খ্রি.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র শাহামত জংগ এবং সাওলাত জংগ মতিঝিল রাজপ্রাসাদে সাত দিন ধরে হোলি পূজার অনুষ্ঠান পালন করেন। এ অনুষ্ঠানে আবির ও কুমকুম স্তূপীকৃত করা হয়। মির জাফর (১৬৯১–১৭৬৫ খ্রি.) ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হোলির অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। কথিত আছে যে,

---

২০৫. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭

২০৬. মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মুসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

২০৭. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭

২০৮. মুহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মুসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

২০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭; ড. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৮-৫১০

২১০. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮

২১১. ড. এ. আর. মল্লিক, *ব্রিটিশ পলিসি ও বাঙলার মুসলমান (১৭৫৭–১৮৫৬)* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭), পৃ. ৮২; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (কলিকাতা : দিব্য প্রকাশ, ১৩৮১ বাংলা), খ.৪, পৃ. ২৬৩

মির জাফর মৃত্যুকালে কীর্তিশ্বরী দেবীর পাদোদক (মূর্তি ধোয়া পানি) পান করেন।[২১২] এভাবে বৈষ্ণবদের এই অনুষ্ঠান মুসলিমগণের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। আর এভাবে চলতে থাকে বিংশ শতাব্দীতেও।

মুহার্‌রম ও শবে বরা'ত পালন

হিন্দুদের ন্যায় মুসলিমগণেরও উৎসব পালনের প্রবণতা মোগল আমল থেকেই শুরু হয়। মুসলিমগণ হিন্দুদের দুর্গোৎসবের অনুকরণে মুহার্‌রমের অনুষ্ঠান পালন করত। দেওয়ালি বা কালিপূজার অনুসরণে আলোকসজ্জা এবং বাজি পোড়ানোর মাধ্যমে শবে বরা'ত পালন তার মধ্যে অন্যতম।[২১৩] ইতিহাসবিদ এম. গ্রাসিন ডি. ট্যাসিন বলেন,

> 'মুহার্‌রমের তাযিয়া অবিকল হিন্দুদের দুর্গাপূজার অনুকরণ। দুর্গাপূজা যেমন দশ দিন ধরে চলে এবং শেষ দিন যেমন ঢাক-ঢোল, বাদ্য-বাজনাসহ পূজারিগণ প্রতিমাসহ মিছিল করে তাকে নদী অথবা পুকুরে বিসর্জন দেয়, মুসলিমগণও অনুরূপভাবে দশ দিন ধরে অনুষ্ঠান করে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মিছিল করে তাজিয়া পানিতে বিসর্জন দেয়।'[২১৪]

ড. জেমস ওয়াইজ (১৮৩৫–১৮৮৬ খ্রি.) মুহার্‌রমের উৎসবকে হিন্দুদের রথযাত্রার অনুরূপ বলে বর্ণনা করেছেন।'[২১৫]

মিসেস এইচ আলী (জন্ম ১৯৩৯ খ্রি.) বলেন,

> 'দীর্ঘদিন হিন্দুদের সংস্পর্শে থেকে মুসলিমগণ তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলিকে হিন্দুদের অনুকরণে মিছিলের আকারে বাহ্যিক জাঁক-জমকপূর্ণ করে তুলেছে। ইউরোপীয়দের ন্যায় বিদেশী মুসলিমগণ বাংলার মুসলিমগণের এ ধরনের ধর্মীয় উৎসবাদিকে ইসলামের বিকৃতকরণ ও অপবিত্রকরণ বলে মনে করেছেন।'[২১৬]

হিন্দুয়ানি নীতি গ্রহণ

হিন্দুদের ন্যায় মুসলিম মেয়েদের মধ্যে সিঁথিতে 'সিঁদুর' লাগাবার প্রচলন ছিল।[২১৭] দৈনন্দিন কাজ কারবারের ক্ষেত্রেও সাধারণ মুসলিমগণ হিন্দুদের ন্যায় দিনের বাছবিচার করত।[২১৮] বন্ধ্যা মুসলিম মেয়েরা সন্তান লাভের জন্য নানান অনুষ্ঠান করত। কুমিরের কৃপায় সন্তান লাভ হলে প্রথম সন্তানটিকে কুমিরকে দান, মাদারিকে ভোজ্য দান, বৃক্ষে সুতা বাঁধা ইত্যাদি হিন্দুদের কুসংস্কার মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে।[২১৯]

---

২১২. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

২১৩. ড. এ. আর. মল্লিক, *ব্রিটিশ পলিসি ও বাঙলার মুসলমান (১৭৫৭–১৮৫৬)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

২১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

২১৫. Mahbub Karim Khandakar, *The Provinces of Bihar and Bengal under Shajahan* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh Publication, 1974), p. 196

২১৬. ড. এ. আর. মল্লিক, *ব্রিটিশ পলিসি ও বাঙলার মুসলমান (১৭৫৭–১৮৫৬)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

২১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

২১৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ২৬৩

২১৯. Murry T. Titus, *Islam in India and Pakistan : A Religious History of Islam in India and Pakistan*, Ibid, p. 56

পীরপূজা ও কবরপূজা

ইতিহাসবিদ এম. টি. টিটাসের মতে, 'মুসলিম সমাজে আফগানিস্তান, পারস্য ও ইরাক থেকে আমদানি করা পীরপূজা ও কবরপূজার ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুদের প্রাচীন গুরু-চেলা পদ্ধতি এবং স্থানীয় বহু দেব-দেবীর পূজা মুসলিম সমাজকে এ কুসংস্কারে লিপ্ত হতে প্রেরণা জোগায়।' তিনি আরও বলেন, 'ইসলামের বাধ্যতামূলক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অপেক্ষা বহু উৎসাহ সহকারে পীর পূজা করা হতো।[২২০] অতীতে যে সমস্ত ওলি-দরবেশ[২২১] ইসলামের মহাবাণী প্রচার করে গেছেন, পরবর্তীকালে অজ্ঞ মুসলিমগণ মনস্কামনা পূরণের জন্য তাদের মাজারে ফুল, শিরনি ও নজর-নেওয়াজ দিত।'[২২২]

পরবর্তীকালে এসে গরু, ছাগল, মহিষ, মুরগি ইত্যাদি নজর-নেওয়াজ হিসেবে দেয়ার প্রথা শুরু হয়। তার সংখ্যা সম্পর্কে ডা. জেমস ওয়াইজ বলেন, (১) সিলেটের শাহজালাল (২) পাঁচ পীর মুন্নাশাহ্ দরবেশ (৩) সোনারগাঁয়ের খন্দকার মোহাম্মদ ইউসুফ (৪) মীরপুরের শাহ্আলী বাগদাদী (৫) চট্টগ্রামের পীর বদর (৬) ঢাকার শাহজালাল (৭) বিক্রমপুরের শহিদ (৮) চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামির দরগাহ ইত্যাদি। তবে এ সংখ্যা পরবর্তীকালে কয়েকশ'তে গিয়ে দাঁড়ায়।[২২৩]

উল্লেখ্য যে, সোনারগাঁয়ের দরগায় হিন্দু মুসলিম উভয়ে পূজা করত বলে কথিত আছে। কৃষক ভালো ফসল লাভ করলে কয়েক আঁটি ধান দরগায় দিয়ে আসত। সকল প্রকার ব্যাধি ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দরগায়ে চাউল ও বাতাসা[২২৪] দেয়া হতো। অনুরূপভাবে, ঢাকা শহরের পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে কদম রাসুল মাযারে কালো রঙের একটি প্রস্তর ছিল; যাকে বলা হতো কদম রাসুল বা নবির (সা.) এর পদচিহ্ন। অদ্যাবধি তা বিদ্যমান আছে। ড. জেমসের ভাষায় : গয়ার ব্রাহ্মণগণ তীর্থযাত্রীদের বিষ্ণুপদ (বিষ্ণুর পদচিহ্ন) দেখিয়ে প্রচুর অর্থ রোজগার করত। অনুরূপভাবে, দরগার মুতাওয়াল্লি গ্রামের অজ্ঞ ও বিশ্বাসপ্রবণ লোকদেরকে কদমরাসুল দেখিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। এমনিভাবে সত্য পীর, কুমির পীর, ঘোড়া পীর, মাদারি পীর প্রভৃতি পীরপূজা চলে।[২২৫] এভাবে পীর-দরবেশের মাযারকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে শির্ক ও বিদ'আতের বিস্তার ঘটে।

অন্যান্য প্রচলিত কুসংস্কার

মুহাম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯–১৯৬৯ খ্রি.) মুসলিম সমাজে হিন্দুদের অনুকরণে প্রচলিত দেবদেবী পূজা, আচার-অনুষ্ঠানের একটি চমৎকার চিত্র প্রকাশ করেছিলেন। সেগুলো হলো : মুসলিমগণের শি'য়া

---

২২০. *মাসিক পৃথিবী*, মার্চ, ১৯৯০, পৃ. ২৪

২২১. দরবেশ ফারসি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দরজা অনুসন্ধান করা; অর্থাৎ সংসার বিরাগী ধর্মানুসন্ধানী। যেসব লোক ব্যক্তিগত জীবনে জাগতিক ব্যাপারে বীতস্পৃহ থেকে অথবা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে আত্মার মুক্তির জন্য সাধনা করতেন, তারা ছাড়াও একদল শিক্ষাদীক্ষার গুরু ছিলেন এবং তারা শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন, তারা দরবেশ নামে পরিচিত। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ২

২২২. সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬-৯

২২৩. *মাসিক পৃথিবী*, মার্চ, ১৯৯০, পৃ. ২৫

২২৪. চিনি বা গুড় দিয়ে তৈরি মিষ্টি দ্রব্যবিশেষ। দ্র. জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪৪

২২৫. আবুল কাসেম মো. ফজলুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০

সম্প্রদায়ের তা'জিয়া নির্মাণ হিন্দুদের দশ দিবসে দুর্গার প্রতিমা গঠন এবং দশমীর দিনে বিসর্জনের মতো। হিন্দুদের গুরুপূজার অনুকরণে মুসলিমগণের পীরপূজা, পীরের দরগায় ওরশ এবং ওলি-দরবেশের মাযারে অতিরিক্ত যিয়ারত শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে হিন্দুদের তীর্থস্থানের মতো করে তোলা। বাংলাদেশের অশিক্ষিত ও গ্রাম্য মুসলিম সমাজ হিন্দুদের পৌরাণিক সমুদ্র দেবতার মতো খাজা খিজিরকে মেনে চলে। তাকে লক্ষ করে ফাতিহা পাঠ, হিন্দুদের নামে স্মৃতি অর্পণের ন্যায় নদীতে পয়সা ও মিষ্টান্ন অর্পণ করত।

হিংস্র বন্য পশুদের উপরেও পীরদের মাহাত্ম্য ও প্রভাব স্বীকার করে পীরের সাহায্যে হিংস্র পশুদের শান্ত রাখা এবং তাদের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আত্মপ্রসাদ ইত্যাদি রীতিনীতিও বিদ্যমান ছিল। কলেরা ও বসন্তের কুগ্রহ প্রশান্ত করার জন্য নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ওলা ও শীতলা দেবীর পূজা করত। মুসলিমগণও তা বিশ্বাস করত ও বিপদের সময় এসব কুসংস্কার প্রশ্রয় দিত। অসুখ-বিসুখে এবং চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণে সদকা দিত। গৃহপালিত পশু হারিয়ে গেলে সেগুলো পাওয়ার জন্য মান্নত করত। নদীতে নৌকাযাত্রার সময় দরিয়ার পাঁচ পীর বদরের নাম করত।[২২৬] মুসলিম সমাজের এক শ্রেণির পৌত্তলিকমনা লোক লালন শাহের মতবাদকে মুসলিম সমাজে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় মগ্ন।[২২৭]

ইতিহাসবিদদের মন্তব্য

মুসলিম সমাজের এহেন অধঃপতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইতিহাসবিদগণ মন্তব্য করেন,

> 'পৃথিবীর অন্যান্য বিজয়ী জাতিসমূহ যেমন বিজিত জাতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে তেমনি ভারতীয় মুসলিমগণও বিজিত হিন্দু জাতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। আচার-আচরণ, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এমনকি বিশ্বাসের দিক দিয়েও এ প্রভাব এখনও সুস্পষ্ট। ভারতীয় মুসলিমগণ, বিশেষ করে বাংলা ও বিহারের মুসলিমগণ, তাদের ধর্মবিশ্বাসের সাথে এমন সব কুফরি আচার-আচরণ অবলম্বন করেছে, তা ছিল অন্যান্য দেশের মুসলিমগণের মধ্যে বিরল। বাংলা ও বিহারে মুসলিমগণের সংখ্যা ছিল যেমন বিরাট, তাদের রাজনীতি ও আচার-আচরণও ছিল তেমনি ধর্মহীন ও নীতি-বিগর্হিত।'[২২৮]

উপরে বর্ণিত ভণ্ড পীর-ফকির দলের অপকীর্তি ও অশ্লীল ক্রিয়াকাণ্ড থেকে তৎকালীন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক অধঃপতনের চিত্র সুস্পষ্ট। যদিও গোটা মুসলিম সমাজের অধঃপতন এতটা ছিল না; কিন্তু সমাজে পৌত্তলিক ও বৈষ্ণব মতবাদের প্রবল বন্যা যে মুসলিমগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে ভাসিয়ে নিয়ে তাদের সাথে একাকার করে দিচ্ছিল, তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মুসলিম সমাজের ছিল না। কারণ, তৎকালীন মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছিল পৌত্তলিকতাবাদ ও বৈষ্ণববাদের প্রতি।

বাংলা-অঞ্চলের মুসলিমগণ যখন এসব ইসলাম বিরোধী প্রথা ও অনুষ্ঠানের অনুসারী হয়ে পড়ে, তখন প্রথমে হাজি শরীয়তুল্লাহ্ (১৭৮১–১৮৪০ খ্রি.) ১৮০৪ খ্রিষ্টাব্দে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন।

---

২২৬. হাকিম হাবীবুর রহমান, *আসুদগান-এ ঢাকা* (ঢাকা : ফয়সাল একাডেমি, ১৯৪৬), পৃ. ৩২; ড. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৯-৫১২; রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ৫৬

২২৭. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

২২৮. ড. এ. আর. মল্লিক, *ব্রিটিশ পলিসি ও বাঙলার মুসলমান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

পরে তাঁর পুত্র দুদু মিয়া[২২৯] (১৮১৯–১৮৬২ খ্রি.) পিতার আরব্ধ কাজ আরও বলিষ্ঠ ও সংঘবদ্ধরূপে আরম্ভ করেন। তিতুমীরের বিদ্রোহের পটভূমিকায়ও ছিল ধর্মীয় সংস্কার। তাছাড়া মওলানা কারামত আলি জৌনপুরি[২৩০] (রহ.) (১৮০০–১৮৭৩ খ্রি.)ও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বাংলা-অঞ্চলের মুসলিম সমাজে ইসলাম-বিরুদ্ধ হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানকে নির্মূল করার জন্য 'রদ্দে বিদা' এবং বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়, যারা ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে, তাদের সংশোধনির জন্য 'হেদায়ত ও আল রফিউদ্দীন' নামক দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন।[২৩১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েকটি দশক এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম বাংলার মহান সংস্কারক হিসেবে যারা আবির্ভূত হন তাদের মধ্যে কর্মবীর মুন্সী মেহেরউল্লাহ[২৩২] (১৮৬১–১৯০৭ খ্রি.) ও ইসলামি ব্যক্তিত্ব ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০–১৯৩১ খ্রি.) অন্যতম।[২৩৩] তারা ইসলামের পরিচয় বহনকারী সাহিত্যসেবায় মুসলিমগণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।[২৩৪] তথাপি সব গোমরাহি ও পথভ্রষ্টতার বিষক্রিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত মুসলিম সমাজের একটা অংশকে জর্জরিত করে রেখেছিল; যার প্রমাণ মিলে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারির রিপোর্টে। উক্ত রিপোর্টে বলা হয় যে,

---

২২৯. মুহসিনউদ্দীন দুদু মিয়া ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের মাদারিপুর মহকুমার বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজি শরীয়তুল্লাহ্। মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁকে শিক্ষার জন্য মক্কা শরিফ পাঠানো হয়। ৫ বছর অধ্যয়ন করে ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে পিতা হাজি শরীয়তুল্লাহ্র ইন্তিকালের পর ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তিনি। তিনি ব্রিটিশদের বশংবদ অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের হাত থেকে বাংলা ও আসামের নিপীড়িত রায়ত ও চাষিদের রক্ষা করার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ করেন। বিভিন্ন সময় অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে প্রজাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁর নাম দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে একাধিকবার গ্রেফতার করে। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দ্র. কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৫-৫৭৭; সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৭১; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ৩০-৩১

২৩০. কারামত আলি জৌনপুরি ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত জৌনপুরের মোল্লাটোলায় এক সিদ্দিকী পরিবারে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদ শহীদের সান্নিধ্যে ধন্য হয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও খিলাফত লাভ করেন। তিনি ৪১টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রতিটি রচনাই বাতিলের প্রতিবাদ এবং সমাজ সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জৌনপুর থেকে তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে সফর করেন। ১৮৭৩ খ্রি. তিনি ৭৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। দ্র. মওলানা আব্দুল বাতিন, *সীরাত এ মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী* (এলাহাবাদ : আসরারে করিমী প্রেস, ১৩৬৮), পৃ. ৯-১১; আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৩০৪-৩০৫

২৩১. ড. এ.আর. মল্লিক, *ব্রিটিশ পলিসি ও বাঙলার মুসলমান (১৭৫৭-১৮৫৬)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

২৩২. মুনশী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ্ প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক, সমাজসংস্কারক ও বাগ্মী। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে যশোর জেলার ঘোপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বেশি লেখাপড়ার সুযোগ পাননি। স্থানীয়ভাবে আরবি-ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পত্রপত্রিকায় লিখতেন। বেশ কিছু প্রকাশনাও তাঁর রয়েছে। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ৮৯-৯১; সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪; আবদুল্লাহ্ আল-মুতী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *শিশু বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৪৮-৪৯

২৩৩. ডক্টর বদিউজ্জমান, *ইসমাঈল হোসেন সিরাজী : জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮), পৃ. ৪৩

২৩৪. Bankey Bihari Misra, *The Indian Middle Classes : Their Growth in Modern Times* (Bombay : Oxford University Press, 1961), pp. 376-377

লোকগণনার সময় এমন কিছু সম্প্রদায়ের দেখা পাওয়া গেছে, যারা নিজেরা স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, তারা হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়; বরঞ্চ উভয়ের সংমিশ্রণ।[২৩৫]

বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন অস্থিরতা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যখন পশ্চাৎপদতা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যখন বিজাতীয়দের অনুকরণ করছে প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা, সেই সময়ে মুসলিম জাগরণে যে কয়জন মুসলিম মনীষী সমাজ সংস্কার আন্দোলনে অগ্রসেনানীর ভূমিকা রাখেন, তাদের মধ্যে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) একজন। তিনি বক্তৃতা, লেখনী ও ওয়ায-নসিহত, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা, গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধান, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, শরি'আত বিবর্জিত কার্যাবলির প্রতিবাদ ও সমাজ সংস্কারে আজীবন কর্মতৎপর ছিলেন। এই কর্মবীর আল্লাহওয়ালা মনীষী সম্পর্কে আজ বাংলার মানুষ অতি অল্পই জানে।

---

২৩৫. https://en.wikipedia.org/wiki/1991_Census_of_India, Visited on 12.10.2021; *Cencus of India Report*, 1991 A.D, p. 2

তৃতীয় অধ্যায়

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবনবৃত্তান্ত

- প্রথম পরিচ্ছেদ : জন্ম ও বংশপরিচয়
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষাজীবন
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কর্মজীবন
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক মাধুর্য
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিকতা

তৃতীয় অধ্যায়

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবনবৃত্তান্ত

আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত কাজে চমৎকার এক নিয়ম-শৃঙ্খলা বিদ্যমান রয়েছে। প্রখর রৌদ্রতাপে দগ্ধ হয়ে পৃথিবী পিপাসায় খাঁখাঁ করতে থাকে। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের ঝরনাধারা বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হয়। শুষ্ক পৃথিবী ফুলে-ফলে ও নবপল্লবে সজ্জিত হয়। শীতের আগমনে গাছ-পালা পাতাহীন হয়ে পড়ে। আবার বসন্তের আগমনে নবপল্লবের আবির্ভাব হয়। গাছে গাছে, নতুন করে সৌন্দর্য শোভিত হয় ডালে-ডালে। কোকিল, পাপিয়া, বউ-কথা-কওসহ নানা পাখপাখালি গানের সুরে মাতিয়ে তোলে প্রকৃতি।

মানুষের আধ্যাত্মিক জগতেও এরূপ একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা রয়েছে। মানবসমাজে যখন নানান প্রকার শির্‌ক-বিদ'আত ও কুসংস্কার প্রবেশ করে, মানুষ সততা শুচিতা থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন পাপাচার ও ভ্রষ্টাচারে নিমজ্জিত হয়–এমন প্রেক্ষাপটে কোনো মহামানব ও কামেল অলির আবির্ভাব হয়। তিনি সমস্ত শির্‌ক-বিদ'আত দূর করে মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তাই যুগে যুগে নবির কাজ পরিচালনার জন্য কামেল ওলি ও সত্যনিষ্ঠ আলেমগণের আগমন ঘটে। তারা মানুষদের সরল-সঠিক পথের দিশা দিয়ে ইহজাগতিক ও পরজাগতিক সফলতার চাবি তাদের হাতে তুলে দেন।

হিজরি পঞ্চম শতাব্দীতে পৃথিবীতে ভ্রষ্টতার অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলা বাগদাদ শহরে বড় পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) (১০৭৮–১১৬৬ খ্রি.)-কে যুগের শ্রেষ্ঠ সংস্কারক হিসেবে প্রেরণ করেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনাভাগে বাংলার মুসলিমগণ সৎ পথ ভুলে গিয়ে নানান প্রকার শির্‌ক-বিদ'আত, পীরপূজা ও কবরপূজা প্রভৃতি অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলা বাংলাদেশের ইসলামের প্রবেশদ্বার চট্টগ্রামের লোহাগাড়া থানায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে জাতির যোগ্য পথপ্রদর্শক, সংস্কারক (Reformar) এবং সেবক হিসেবে প্রেরণ করেন। ক্ষণজন্মা এ মহাপুরুষ ও কালজয়ী ব্যক্তি একাধারে প্রথিতযশা হাদিস বিশারদ, ইসলামি চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, বিদগ্ধ গবেষক, প্রাজ্ঞ অনুবাদক এবং বহু গ্রন্থপ্রণেতা। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার-প্রসার, সমাজসংস্কার, মানবসেবা ও সুফিবাদের বিকাশে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও বংশপরিচয়

জন্ম

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে (৫ই শাওয়াল, ১৩৫১ হি.), বৃহস্পতিবার রাত ৮:৩০ মিনিটে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান বার্মার (মায়ানমার) থাংগু জেলার পিনজুলুক রেলস্টেশনের ৩ মাইল পূর্বে কালাবস্তি বাঙালি কলোনি। ঐ সময় তাঁর পিতা ব্যাবসা উপলক্ষ্যে তথায় অবস্থান করতেন।[১] শার'ঈ নিয়ম অনুসারে 'আকিকা[২] সম্পন্ন করে তাঁর নাম রাখা হয় মোহাম্মদ আবদুল জব্বার[৩]।

বংশপরিচয়

কথিত আছে যে, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের পূর্বপুরুষ আরব দেশ থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে বার্মার আরাকানে আগমন করেন; সেখানে সুদীর্ঘকাল বসবাস করেন এবং দীন প্রচার করেন; সেখান থেকে বার আউলিয়ার পীঠস্থান চট্টগ্রাম[৪] জেলার লোহাগাড়া[৫] থানাধীন বড়হাতিয়া গ্রামে

---

১. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই, 'বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব কেবলার পুণ্যময় জীবনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন', *আল-আছরার* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৭), পৃ. ১০৩; মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, 'আধ্যাত্মিক সাধনা ও ইহ-পরকালীন উন্নতির সমন্বিত জীবনধারা দিশারী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)', *দৈনিক আজাদী*, ২৫শে মার্চ, ২০০৯, পৃ. ৪

২. আকিকা শব্দটি عَقُّ থেকে নির্গত। এটি একবচন; বহুবচনে 'আকা'য়িক (عَقَائِقُ)। এর আভিধানিক অর্থ নবজাতকের চুল, বিদীর্ণ করা, ফাঁক, খণ্ডিত করা ও আলাদা করা। পরিভাষায়, العقيقة هي الشاة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته. অর্থাৎ 'সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে নবজাকের পক্ষ থেকে যে পশু যবাই করা হয়, তাকে 'আকিকা বলা হয়।' দ্র. ড. মুহাম্মদ রওয়াস কিলাজি ও অন্যান্য, *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরুত : দারুল নফা'য়িস, ১৯৮৫), পৃ. ৩১৮; এক্ষেত্রে ছেলে হলে দু'টি এবং কন্যা হলে একটি বকরি যবেহ করা সুন্নাত। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً অর্থাৎ 'রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের ছেলে হলে দু'টি এবং মেয়ে হলে একটি বকরি দিয়ে আকিকা করার নির্দেশ দেন।' **দ্র.** আবু 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান* (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফতহি বাংলাদেশ, তা. বি.), বাবুল আকিকাহ্, হা. নং ৩১৫৪, পৃ. ২৫৫

৩. আবদুল জব্বারের নামকরণ হলো 'আব্দ <আব্দু <আব্দুল' মানে বান্দাহ, গোলাম ও দাস। আর 'জব্বার' অর্থ মহানিয়ন্ত্রক ও মহাব্যবস্থাপক। সুতরাং, 'আবদুল জব্বার' অর্থ মহাব্যবস্থাপক আল্লাহ্ তা'আলার গোলাম। বস্তুত পরিণত বয়সে তিনি তরিকতের লাগাম দ্বারা ভোগবাদিতাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছিলেন এবং ইবাদতের দিক দিয়ে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার মাধ্যমে কলবে সলিম অর্জনকারী মহাব্যবস্থাপক আল্লাহ্ তা'আলার খাস গোলামে পরিণত হয়েছিলেন। সুতরাং, কর্মের সাথে এই সাধক পুরুষের নামকরণ যথার্থ। দ্র. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্ভী ও যাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার রহ.: জীবন ও আদর্শ* (চট্টগ্রাম : আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, ২০১২), পৃ. ২২ ও ৭২৪; ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, 'মাওলানা শাহ্ সুফি শেখ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার স্মরণে', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, স্মরণ সংখ্যা ১, মে ১৯৯৮, পৃ. ৪২

৪. সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা ও পাহাড়-পর্বত ঘেরা বার আউলিয়াসহ অসংখ্য ওলি-দরবেশ, সুফি-সাধক ও 'আলিম-'উলামার স্মৃতিবিজড়িত বৈচিত্র্যময় চট্টগ্রামের নামকরণও নানান বৈচিত্র্যে ভরা। একটি উপাখ্যান থেকে জানা যায়, ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আরকান রাজা কর্তৃক 'চেত্তা গৌং' (যুদ্ধ করা সমীচিন নয়) মন্তব্য থেকে চট্টগ্রামের উৎপত্তি হয়েছে। দ্র. ড. আবদুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম* (চট্টগ্রাম : ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বিভাগ, ১৯৮১), পৃ. ১৯; ইতিহাসবিদ, ভৌগোলিক, পরিব্রাজক ও পণ্ডিতগণের বিভিন্ন বিবরণীতে, অঙ্কিত মানচিত্রে, আবিষ্কৃত শিলালিপিতে এবং তখনকার সুলতান ও রাজাগণের বিভিন্ন মুদ্রায় চট্টগ্রামকে নানান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মোগলদের

স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বংশগত উপাধি ছিল মিয়াজি[৬]। তাদের বংশীয় নামানুসারে পাড়ার নাম রাখা হয় 'মিয়াজি পাড়া'। তাঁর পিতার নাম মৌলবি ওয়াছি উদ্দিন মিয়াজি (মৃ. ১৯৩৬ খ্রি.)। তিনি বার্মার (মায়ানমার) থাংগু জেলার রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে বাঙালি কলোনিতে বসবাস ও ব্যাবসা-বাণিজ্য করতেন।

তাঁর গায়ের রং ছিল শ্যামলা। তিনি উঁচু লম্বা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। বুক পর্যন্ত চাপদাড়ি, বুকে হালকা পশম, চোখে মোটা ভ্রু ছিল। তিনি পায়জামা, শেরওয়ানি, সাদা টুপি ও পাগড়ি পরিধান করতেন এবং তিলের বাঁধাই করা সোজা মাথার ছড়ি ব্যবহার করতেন।[৭] তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরাগী। তিনি আলিম-'উলামা, পীর-আউলিয়া ও দরবেশদের অত্যধিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। বার্মিজ-বাঙালিনির্বিশেষে বিপদগ্রস্ত লোকজনের থাকা খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেন। টাকার অভাবে মেয়ে বিয়ে দিতে পারছেন না, এমন অনেক পিতাকে টাকা-পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করে বিবাহের ব্যবস্থা করে দেন। তিনি নিয়মিত কুর'আন তিলাওয়াত ও তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি হাস্যোজ্জ্বল, উদার, দানশীল, আমানতদার, ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহ্‌ভীরু এবং শৌখিন ঘোড়সওয়ারি ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারতেন। আরবি ভাষায়ও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল।[৮]

কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজিত হলে মোগল সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ (শাসনকাল ১৬৮৯–১৬৯৮ খ্রি.) এর নামকরণ করেন ইসলামাবাদ। দ্র. এস. কে. ইসলামাবাদী, *চট্টগ্রাম না ইসলামাবাদ* (চট্টগ্রাম : ইসলাম মঞ্জিল, ১৯৮৭), পৃ. ২১; অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ হামীদুল্লাহ্ খাঁন বলেছেন, সুলতান নাসির উদ্দিন নসরত শাহ্ (শাসনকাল ১৫১৯–১৫৩৩ খ্রি.) চট্টগ্রাম জয় করে ফতেহাবাদ নাম রাখেন। দ্র. ড. আবদুল করিম, *চট্টগ্রামে ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৯; অবশ্য বর্তমানে বাংলায় চট্টগ্রাম ও চট্টলা, উর্দুতে চাটগাম, ইংরেজিতে চিটাগাং/ চট্টগ্রাম এবং আরবিতে শিতাগোঁওগ বহুলপরিচিত ও ব্যবহৃত।

৫. ইতিহাসবিদদের মতে, সাতকানিয়া অঞ্চলে সোনাকানিয়া, রূপকানিয়া, লোহাগাড়া ও চুনতিসহ সাতটি খনি ছিল; লোহাগাড়াতে লোহার খনি ও চুনতিতে চুনাপাথরের খনি। অন্যান্য তিনটি অঞ্চলে তিনটি খনি ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। লোহাগাড়ার খনি থেকে লোহা উত্তোলন করার কারণে 'লোহাগাড়া' নামকরণ বলে ধারণা করা হয়। দ্র. মোহাম্মদ ইলিয়াছ, *লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (চট্টগ্রাম : মোহাম্মদ ফিজনূর রহমান, ২০১৫), পৃ. ৩৯

❖ সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্ সুজা ১৬৬০ খ্রি. নিজেকে বাংলার সুলতান হিসেবে ঘোষণা দেন; কিন্তু সুজার এ ঘোষণা পিতা সম্রাট শাহ্জাহান ও ভ্রাতা দারা শিকো মেনে নিতে পারেননি। ফলে তারা তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে রাজকীয় বাহিনী প্রেরণ করেন। ফলশ্রুতিতে, সুজা ১২ই মে, ১৬৬০ খ্রি.-এ নিজ পরিবারের সদস্যবর্গ, ৩ হাজার সৈন্য এবং ২০০ জন একান্ত অনুচর নিয়ে চট্টগ্রাম তথা ইসলামাবাদ হয়ে আরকানের অভিমুখে যাত্রা করেন। চারিদিকে জঙ্গল সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক মনোরম স্থান লক্ষ করে 'লোহার দিঘি' নামক স্থানে যাত্রাবিরতির নির্দেশ দেন। সেখানে তারা লোহার তৈরি উপকরণ দিয়ে পথিমধ্যে দিঘি খনন করে আস্তাবলে বিশ্রাম নেন এবং লোহার দণ্ড গেড়ে সীমানা নির্ধারণ করে দেন। লোহা গেড়ে সীমানা নির্ধারণ ও বসতি স্থাপনের ফলে 'লোহাগাড়া' নামকরণ হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। দ্র. মোহাম্মদ ইলিয়াছ, *লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

৬. মিয়াজি ফারসি শব্দ; যার অর্থ মধ্যস্থতাকারী। তদানীন্তন সময়ে মিয়াজি বলা হতো এমন শিক্ষককে যিনি ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতেন এবং ধর্মীয় বিধান পালনে বিশেষ যত্নবান থাকতেন। দ্র. মো. লোকমান হাকিম, *মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রহ.) তফসীর সাহিত্যে তাঁর অবদান* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২), পৃ. ১৫

৭. মোহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রাহ. এর জীবন ও অবদান* (চট্টগ্রাম : আলহাজ তাহের সোবহান, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১২), পৃ. ২০-২১

৮. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার রহ. : জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি বার্মার রেঙ্গুন (ইয়াংঙ্গুন) হাসাপাতালে ভর্তি হন। রেঙ্গুন (ইয়াংঙ্গুন) হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার অগ্রগতি না হওয়ায় তিনি চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার মিয়াজি পাড়ায় নিজ বাড়িতে চলে আসেন। দীর্ঘ তিন মাস কঠিন রোগভোগের পর জীবনসায়াহ্নে স্ত্রী, পুত্রদের দেখার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। অতঃপর শিশু আবদুল জব্বারের মামা বার্মা প্রবাসী বাঁচা মিয়া তাদের চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। তারা পৌঁছার এক দিন পরেই ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে আনুমানিক ফেব্রুয়ারি/ মার্চ মাসের কোনো এক সোমবার সকাল নয়টায় ৯০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচবছর বয়সি জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল কুদ্দুস, আড়াই বৎসর বয়সি মোহাম্মদ আবদুল জব্বার এবং তিন মাসের শিশু সুলায়মানকে রেখে যান।[৯]

মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের পুণ্যময়ী জননীর নাম ফিরোজা খাতুন (মৃ. ১৯৯৪ খ্রি.)। তিনি বড়ো হাতিয়ার আমতলি গ্রামের ইয়াসিন পাড়ানিবাসী ফকির আবদুল বারীর কন্যা ছিলেন। তাঁর পিতা অত্যন্ত দীনদার-পরহেযগার এবং সমাজের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। মাতা ফিরোজা খাতুন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা, পরহেযগার, দানশীলা ও পর্দানশিন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদত-বন্দিগিতে নিমগ্ন থাকা, স্বামীর খেদমত ও সন্তুষ্টি এবং নিজ সংসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। তিনি গারাংগিয়ার বড়ো হুজুর মওলানা আবদুল মজীদ (রহ.) (১৮৯৪–১৯৭৭ খ্রি.)-এর মুরিদ ছিলেন। পীরের দেয়া সকল ওযিফা[১০] 'আমল করতেন এবং বৃদ্ধ বয়সে চশমা ব্যতীত কুর'আন শরিফ তিলাওয়াত করতেন। তিনি ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে জুমা'আর রাত দশটায় ৮২ বৎসর বয়সে 'চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতালে' ইন্তিকাল করেন।[১১]

---

৯. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.) এর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অবদান* (চট্টগ্রাম : হোমল্যান্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৪), পৃ. ২৯

১০. ওযিফা আরবি শব্দ। এটি একবচন, বহুবচনে ওযা'য়িফ (وظائف)। চাকুরি, পদ, কাজ, কর্ম, কর্তব্য, দায়িত্ব ও ভাতা ইত্যাদি। দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ২০০৯), পৃ. ১১৩৩; মু'মিনের জীবনে ফরয ও নফল সকল নিয়মিত ও নির্ধারিত কর্মই ওযিফা। তবে সাধারণভাবে 'ওযিফা' বলতে 'সুন্নাত-নফল' 'ইবাদতকে বোঝানো হয়ে থাকে। হাদিসে ওযিফাকে 'হিযব' বলা হয়েছে। সুফিয়ায়ে কিরামের দৃষ্টিতে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দৈনন্দিন পঠনীয় যিকির ও দু'আকে ওযিফা বলা হয়। দ্র. শায়খ মো. আনোয়ারুল হক আল-আয্হারী সম্পাদিত, *তাজবীদ কালার সহীহ্ ওয়াজ্বীফাহ্* (চট্টগ্রাম : নিভাদ ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০২০), পৃ. ৪

১১. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)* (চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ্ শরফ একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১২৯, ১৫১-১৬০

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর বংশলতিকা[১২]

পিতার দিক দিয়ে তাঁর বংশলতিকা

আসহাব উদ্দিন মিয়াজি (পরদাদা)

↓

আলিম উদ্দিন মিয়াজি (দাদা)

↓

মৌলবি ওয়াছি উদ্দিন মিয়াজি (পিতা)
ফিরোজা খাতুন (মাতা)

মওলানা আমিন উল্লাহ্ (চাচা)

↓

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার
মনছুরা বেগম (সহধর্মিণী), ঠাণ্ডা মিয়া (শ্বশুর), আলমাছ খাতুন (শাশুড়ি)

মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

মুহাম্মদ সুলায়মান

↓

কন্যাগণ

পুত্রগণ

↓

জাকেরা বেগম   তাহেরা বেগম   রাজিয়া বেগম   রাবিয়া বেগম   রহিমা বেগম

↓

মওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী   হাফিজ মুহাম্মদ আবদুর রহিম   মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম

মাতার দিক দিয়ে তাঁর বংশলতিকা

হাসন আলী শিকদার

↓

নেজামত আলী শিকদার (পরনানা)

↓

আবদুল বারী ফকির (নানা)
দিলআরা বেগম (নানি)

↓

ফিরোজা খাতুন (মাতা)
মৌলবি ওয়াছি উদ্দিন মিয়াজি (পিতা)

সাহারা খাতুন

নাজিমা খাতুন

আজহার মিয়া

↓

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার
মনছুরা বেগম (সহধর্মিণী)

মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস

মুহাম্মদ সুলায়মান

---

১২. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী, পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

পিতৃহীনতার উত্তরাধিকার

নবির আলোকিত বক্ষ থেকে অন্যান্য নি'আমতের ন্যায় পিতৃহীনতার উত্তরাধিকারও তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। শৈশবকালে এতিম হয়ে যাওয়ার বড়ো ঐতিহ্য ও গৌরব রয়েছে। যুগে যুগে যারা শৈশবে মাতা-পিতা হারিয়ে কোনো রকম কষ্টে জীবনযাপন করেছেন। তাদের অনেকেই পরবর্তী জীবনে প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন; অনবদ্য ও অবিসংবাদিত সব অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন তারা। নবি-রাসুল থেকে শুরু করে অসংখ্য ওলি-বুযর্গ এবং জাগতিক বিষয়ে বড়ো ব্যক্তিবর্গ শৈশবেই এতিম হয়েছিলেন। মোহাম্মদ আবদুল জব্বারও সেসব পুণ্যবানদের একজন। শৈশবে মাত্র আড়াই বৎসর বয়সেই তাঁর পিতা মৌলবি ওয়াছি উদ্দিন মিয়াজি পৃথিবীর স্বপ্নিল জগৎ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ফলে পিতৃস্নেহহারা শিশু আবদুল জব্বার লালিত-পালিত হন মায়ের স্নেহ-কোলে বড়হাতিয়া গ্রামের পৈতৃক নিবাসে।[১৩]

বাল্যজীবন

অন্য সবার মতো সমকালের এ মহামনীষীকেও বাল্যকালের চিরাচরিত নিয়ম পার হয়ে আসতে হয়েছে; তবে সকলের পার হওয়া একরকম নয়। এখানেই সাধারণ-অসাধারণের পার্থক্য সূচিত হয়। বড়োদের ছোটোবেলা সম্পর্কে জানার কৌতূহল মানুষের স্বভাবগত। বড়োদের ছোটোবেলা নিয়ে আলাদা করে গ্রন্থ রচনা করার রীতিও ইতোমধ্যে চালু হয়ে গেছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী নিয়ে *بڑوں کا بچپن* শিরোনামে একটি বই বের হয়েছে। এটি বাংলায়ও অনূদিত হয়েছে *'বড়দের ছোটবেলা'* নামে।

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার জন্মগতভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার ওলি ছিলেন। তাঁর শৈশব ও বাল্যজীবনে আধ্যাত্মিকতার বহু নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল।[১৪] তাঁর বাল্যজীবনের প্রথম থেকে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, কৈশোরের বালকসুলভ চপলতার মোহে তিনি কখনও বিমোহিত হননি। তিনি সাধারণ বালকদের

---

১৩. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯

১৪. তাঁর শ্রদ্ধেয়া মাতা বর্ণনা করেন, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার যখন আমার গর্ভে ছয় মাস পূর্ণ করে, তখন বৃহস্পতিবার রাতের শেষাংশে তাহাজ্জুদের নামাযের সময় স্বপ্ন দেখি ঃ দিগন্তব্যাপী এক ময়দানের মাঝে একটি নীলোজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। আগ্রহের আতিশয্যে বাতিটি ধরতে আগ্রসর হই; তখন বাতিটি সরে নাগালের বাইরে চলে যায়। ধরতে-ছুঁতে পারছিনা। মরিয়া হয়ে চারবার চেষ্টা করেছি। এমন সময় কে যেন আমাকে নিষেধ করলেন বাতিটি ছুয়ো না। নিষেধাজ্ঞা মান্য করে ধরার চেষ্টা থেকে বিরত থাকি। তখন বড়ো ছেলে আবদুল কুদ্দুসের কান্নায় আমার ঘুম ভেঙে যায়। তাছাড়া তাঁর বয়স যখন তিন মাস তখন থেকেই স্পষ্ট করে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' যিকির করত। সুবহানাল্লাহ! এসবই আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত। তবু আমরা বলতে পারি পরবর্তী জীবনে বিখ্যাত ও মানবদরদি শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর শৈশবজীবনে এমন ঘটনা বিস্ময়ের কিছুই নয়; কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছাই ছিল তাঁকে দিয়ে পুরো দেশ ও উম্মাহ্র অভিভাবকত্বের কাজ নেওয়ার। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই তাকে অভিভাবকত্বের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করা হচ্ছিল। আল্লামা ইকবাল (রহ.) কতই না সুন্দর করে বলেছেন,

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی - سکھائے کس نے اسماعیلؑ کو آدابِ فرزندی

অর্থাৎ 'এটা কি ছিল সুনজর, না কোনো মক্তবের কারামাত? ইসমাঈলকে শেখাল কে পুত্রত্বের শিষ্টাচার?'

দ্র. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, ডা. মোহাম্মদ এমদাদুল হক, 'হুজর কেবলা (রহ.)-এর মরহুমা আম্মাজানের একটি দুর্লভ সাক্ষাৎকার', *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৬

ন্যায় খেলাধুলা হইচই পছন্দ করতেন না। খাওয়া-দাওয়া খুঁজে খেতেন না; যা পেতেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। ছোটোবেলায় পাড়ার ছেলেদের সাথে খুব একটা মিশতেন না। তিনি অধিকাংশ সময়ই লেখাপড়ায় ব্যয় করতেন। ছোটোবেলা থেকেই তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করতেন। মায়ের প্রতি তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল অতুলনীয়।[১৫]

আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে ইসলাম তথা মানবতার কল্যাণের জন্য নির্বাচন করলে সাধারণত বাল্যকাল থেকেই তাঁর প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের সুন্দর ব্যবস্থা তৈরি করে দেন। ফলে তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তৈরি হয়ে যায়। মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের ক্ষেত্রেও ঠিক তা-ই হয়েছে। তিনি জন্মের পর থেকে ইসলামি পরিবেশে প্রতিপালিত হতে থাকেন। তাঁর পিতামাতা উভয়ই ছিলেন ধর্মভীরু ও দানশীল। তিনি 'আমল- আখলাকে যুগশ্রেষ্ঠ আলিম-'উলামা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তিনি পীর-বুযুর্গের সাহচর্য লাভ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাদের 'ইলম, 'আমল, তাকওয়া ও পরহেযগারিতে অতুলনীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের ফলে জন্মের পর থেকেই শিশু আবদুল জব্বার ইসলামি আবহে বড়ো হতে থাকেন।

---

১৫. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, 'আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রা.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
শিক্ষাজীবন

মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪ বছর কয়েক মাস। শিক্ষার প্রথম হাতেখড়ি দেন তাঁর বিদুষী জননী। বছরখানেক পর প্রতিবেশী মৌলবি আবদুল করিমের কাছে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তারপর তাকে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় 'গারাংগিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা'য়। সেখানে তিনি ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষাজীবনে ব্যয়িত সময়ের বিন্যাস হলো : স্বীয় জননী ও প্রতিবেশী মৌলবি আবদুল করিমের কাছে তিন বছর, 'গারাংগিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা'য় এগারো বছর এবং 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় দু'বছর। এভাবে ষোলো বছরে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়ন-পর্ব সমাপ্ত হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২০ বছর।

পারিবারিক শিক্ষা

পিতৃহারা হয়ে শিশু মোহাম্মদ আবদুল জব্বার দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন। এতৎসত্ত্বেও তাঁর মাতার উৎসাহ ও নিবিড় তত্ত্বাবধানে এবং নিজের নিরলস অধ্যবসায়ে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষা অর্জনের পথে এগিয়ে যান। পাঁচ বৎসর বয়সে প্রতিবেশী মৌলবি আবদুল করিমের নিকট সর্বপ্রথম সূরা ও ছিপারার সবক নেন। মাত্র এক বৎসরের মধ্যে সহিহ-শুদ্ধভাবে কুর'আন শরিফ খতম করার পাশাপাশি *'উর্দু কি পহিলে কিতাব'* ও শেখ সা'দি (রহ.) (১১৯৩–১২৯৬ খ্রি.) এর প্রসিদ্ধ ফারসি[১৬] কবিতাগ্রন্থ *'করিমা'*, *'গুলিস্তাঁ'* ও *'বুস্তাঁ'* পাঠ শেষ করেন। সূরা ইয়াসিনসহ দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সূরা ও দু'আসমূহ মুখস্থ করেন। মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের সূক্ষ্মদর্শিতা, অন্তর্দৃষ্টি, প্রতিভা ও যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে ওস্তাদ মৌলবি আবদুল করিম তাঁর পুণ্যময়ী মাতার সাথে সাক্ষাৎ করেন; কালের প্রবাহে ছেলে আবদুল জব্বারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার দু'টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সেগুলো হলো:

---

১৬. ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে ইরানে। বর্তমান ইরান যে সভ্যতা ও কৃষ্টির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রধানত ইলামি (Elamite) সভ্যতা। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের প্রথমভাগে দক্ষিণ ইরানে এই সভ্যতার পত্তন হয় বলে মনে করা হয়। ইরানের বর্তমান অধিবাসীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই আর্য বংশোদ্ভূত। আর্যরা খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে মধ্য এশিয়ার সমভূমি থেকে ইরানে অভিবাসন শুরু করে বলে ইতিহাসবিদদের ধারণা। এই এলাকার অধিবাসী এবং অভিবাসিত আর্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও মেলামেশার ফলে একটি নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। এই নতুন ভাষাটিই 'ফারসি ভাষা'। এ ভাষা চারটি পর্যায়ে বিকাশ লাভ করে : অবেস্তা, প্রাচীন ফারসি, পাহলভি ও আধুনিক ফারসি। দ্র. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.৬, পৃ. ১০৫; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১৪, পৃ. ৬৯৯

[এক] গারাংগিয়া সিনিয়র (বর্তমান কামিল) মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন

মাতা ফিরোজা খাতুনের পরামর্শে শিক্ষক মৌলবি আবদুল করিম শিশু আবদুল জব্বারকে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে সাতকানিয়ায় অবস্থিত 'গারাংগিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা'য়[১৭] ৪র্থ শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। দীর্ঘ ৫ বৎসর একই সাথে তাঁকে নিয়ে তিনি মাদ্‌রাসায় যাওয়া-আসা করতেন। উল্লেখ্য, মৌলবি আবদুল করিমও উক্ত মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নরত ছিলেন। ৫ বছরে তাঁর অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে মোহাম্মদ আবদুল জব্বার নিজে-নিজেই মাদ্‌রাসায় যাতায়াত করতেন। প্রখর মেধা ও লেখাপড়ার প্রতি অদম্য আগ্রহের কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর বিস্ময়কর অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি শ্রেণির বর্ষ সমাপনী প্রাতিষ্ঠানিক ও পাবলিক পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল অর্জন করেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্জুম (দাখিল), ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ছিউম (আলিম) এবং ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে উলা (ফাযিল) কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। উলা (ফাযিল) ১ম বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক নম্বর পাওয়ায় মাদ্‌রাসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে রৌপ্য পদকে ভূষিত করে।[১৮]

উল্লেখ্য, আর্থিক অভাব-অনটনের কারণে পরিবারের সদস্যগণ মোহাম্মদ আবদুল জব্বারকে লেখাপড়া না করানোর ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর অদম্য জ্ঞান-পিপাসা পরিবারের বোঝা না-হয়ে লেখাপড়া চালানোর জন্য স্বীয় আগ্রহ ও চেষ্টায় মালপুকুরিয়ায় এনু সওদাগরের বাড়িতে লজিংয়ের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এনু সওদাগরের বাড়িতে লোকজনের চালচলন তাঁর কাছে সন্তোষজনক না হওয়ায় এক বৎসরের মধ্যেই তিনি জায়গির ছেড়ে দেন। অতঃপর বাচা সওদাগরের বাড়িতে ছয় মাস জায়গির থাকেন। পরবর্তী পর্যায়ে মৌলবি ওয়াজি উদ্দিন সওদাগর তাঁকে নিজের ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করেন। অল্প কিছুদিন পরে তিনি বাড়িতে চলে এলেন। তাঁর মমতাময়ী মা আপ্রাণ চেষ্টা করে কোনো প্রকারে পড়ার খরচ জোগাড় করেন। বার্মায় যে সহায়-সম্পদ ছিল তাঁর পিতার ওফাতের পরও সেখান থেকে প্রতিবছর সামান্য পরিমাণ টাকা পাওয়া যেত। সে সব দিয়ে কোনোমতে তাদের চলে যেত; কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ থেকে ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৫ খ্রি.) সময় বোমার আঘাতে বার্মার অধিকাংশ সহায়-সম্পদ ধ্বংস

---

১৭. চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানাধীন গারাংগিয়া গ্রামে এ মাদ্‌রাসা অবস্থিত। গারাংগিয়া নিবাসী প্রখ্যাত পীর ও আলিম শাহ্ মওলানা আবদুল মজীদ (রহ.) (১৮৯০–১৯৭৭ খ্রি.) ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ মাদ্‌রাসা ১৯৩৮, ১৯৪১ ও ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল (হাদিস) এর সরকারি মঞ্জুরি লাভ করে। প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ সুফি মওলানা আবদুল মজীদ (রহ.) ও তাঁর সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বরেণ্য পীর মওলানা আবদুর রশীদ (রহ.) (১৯০০–১৯৯৪ খ্রি.) এ মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থেকে এর সুনাম ও সুখ্যাতি আরও বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। এ প্রতিষ্ঠান থেকে বহু 'আলিম-'উলামা, পীর-মাশায়েখ, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন শ্রেণির পেশাজীবী, ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক, সর্বোপরি, আল্লাহ্ তা'আলার দীনের অগণিত দা'ঈ-মুবাল্লিগ বের হয়েছে। দ্র. ড. আহসান সাইয়েদ, *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* (ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৯), পৃ. ৬০

১৮. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, বিশ্বজিত সেন, 'মানুষ ও মানবতার চির জ্যোতির্ময় বিকশিত আলো হযরত শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)', *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক শাহ্‌সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭; মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রা.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩-৭৪; মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশিদের সম্পদ বার্মা সরকার বাজেয়াপ্ত করলে অবশিষ্ট যা ছিল তাও হাতছাড়া হয়ে যায়।[১৯]

[দুই] দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে গারাংগিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা থেকে ফাযিল পাশ করার পর শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামের 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা'য়[২০] ভর্তি হন। চকবাজারের উত্তর পাশে জনৈক মাস্টার সাহেবের বাড়িতে জায়গির থেকে মাদ্‌রাসার ক্লাস নিয়মিত চালিয়ে যান।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি মুহূর্তে জ্ঞানার্জনের প্রতি মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ছিলেন গভীর অনুরাগী। তিনি ছাত্রজীবনে সকল প্রকার কর্মব্যস্ততা ও চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে 'ইল্‌মের জন্য ওয়াক্‌ফ[২১] করে দিয়েছিলেন। ফলে বহুবিধ জ্ঞানার্জনে তিনি সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ইমাম মালিক (রহ.) (৭১১–৭৮৫ খ্রি.) এর এ বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

العِلْمُ لَا يُعْطِيْكَ بَعْضَهُ حَتَّى لَا تُعْطِيَهُ كُلَّهُ

---

১৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, ডা. মোহাম্মদ এমদাদুল হক, 'হুজুর কেবলা (রাহ.)-এর মরহুমা আম্মাজানের একটি দুর্লভ সাক্ষাৎকার', *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭-১৫৮

২০. চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিক্ষানুরাগী ও দানবীর মরহুম হাজী চাঁদমিয়া সওদাগর ১৯১৩ খ্রি. চট্টগ্রামের 'দারুল উলুম মাদ্‌রাসা'র গোড়াপত্তন করেন। এটি চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র সদর থানা কোতোয়ালীর চন্দনপুরা এলাকায় ২.৪০ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত। ১লা জানুয়ারি, ১৯১৮ খ্রি. কলিকাতা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে তৎকালীন সময়ের পঞ্জুম (বর্তমানে দাখিল) ও সুওয়াম (বর্তমানে আলিম) স্বীকৃতি ও মঞ্জুরি লাভ করে। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে ফাযিল (উলা) এবং ১৯৪৭ খ্রি. টাইটেল বা কামিল হাদিস খোলার অনুমতি লাভ করে। ১৯২০ ও ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে ফাযিল ও কামিল স্বীকৃতি ও মঞ্জুরি লাভ করে। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার অধীনে অধিভুক্ত হয়। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে 'আল-হাদিস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ' বিষয়ে অনার্স খোলার অনুমতি লাভ করে। এ প্রতিষ্ঠানের বহু শিক্ষার্থী দীনি ও জাগতিক শিক্ষা অর্জন করে দেশ ও দশের সেবা করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে *'ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসার অবদান'* শিরোনামের ওপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি প্রদান করা হয়। দ্র. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসার অবদান*, পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১২২-১২৫; *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৫, পৃ. ২; মওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রা.) লি., ২০০৪), পৃ. ২৯৬; ড. আহসান সাইয়েদ, *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ* (ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৯), পৃ. ৬৯

২১. ওয়াক্‌ফ আরবি শব্দ। এটি একবচন. বহুবচনে আওকাফ (أَوْقَافٌ); তবে মাওকূফ (مَوْقُوْفٌ) বা ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি অর্থে শব্দটি সর্বাধিক ব্যবহৃত। ইমাম সারাখসির মতে, এর অর্থ প্রতিরোধ করা বা বিরত রাখা (Prevent or Restrain), নিবৃত্তি বা আটক রাখা (Confinement or Detention), বাধা দেয়া, সংযত করা, দান করা ইত্যাদি। দ্র. শামসুদ্দিন আস্-সারাখ্সি, *আল-মবসুত* (বৈরুত : দারুল মা'রিফ, ১৯৯৮), খ.১২, পৃ. ২৭; শরি'আতের পরিভাষায় ওয়াক্‌ফ হলো, ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় সম্পদ আটক রেখে সম্পদের উপযোগিতা অপরের জন্য দান করা। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, هو في الشرع عند ابي حنيفة حبس العين على ملك অর্থাৎ 'কোনো নির্দিষ্ট বস্তুতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা আবদ্ধ রেখে তার আয় দরিদ্রের জন্য কিংবা অন্য কোনো সৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করাকে ওয়াক্‌ফ বলে।' দ্র. মুহাম্মদ 'উবায়দ 'আবদুল্লাহ্ আল-কুবায়সি, *আহকামুল ওয়াক্‌ফ ফিশ শরি'আতিল ইসলামিয়া* (বাগদাদ : ওয়ারাতুল আওকাফ, ১৯৭৭), খ.১, পৃ. ৬৬; Ahmad Raissouni এর মতে, Waqf means forbidding movement, transport or exchange of something. দ্র. Ahmed Raissouni, *Islamic Waqf Endowment : Scope and Implications* (Rabat, Morocco, 2001), p. 13; শরি'আতের পরিভাষায় ওয়াক্‌ফ হলো, ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় সম্পদ আটক রেখে সম্পদের উপযোগিতা অপরের জন্য দান করা।

অর্থাৎ 'ইল্ম তোমাকে তার সামান্যতম অংশ ততক্ষণ পর্যন্ত দিবে না, যতক্ষণ তুমি তাকে তোমার পুরো সময় না দাও।'[২২]

দীর্ঘ দুই বছর এ মাদ্রাসায় কঠোর পরিশ্রম ও পূর্ণ অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে হাদিস বিভাগ থেকে মমতাজুল মুহাদ্দিসিন[২৩] (এম.এম.) সনদ লাভ করেন। তাঁর শিক্ষাকালে প্রফেসর ড. এ. এম. এম. আবদুল গফুর চৌধুরি (১৯৩৫–২০০৮ খ্রি.), মওলানা সৈয়দ তফজ্জল আহমদ মুনিরী (১৯২১–২০১৬ খ্রি.), মুফতি মুজাফ্ফর আহমদ (১৯২৫–১৯৯৭ খ্রি.), মওলানা ছিদ্দিক আহমদ আযাদ (১৯৩০–১৯৯৭ খ্রি.) ও মওলানা শাহ্ হাবীবুর রহমান (জন্ম ১৯২৬ খ্রি.) প্রমুখ 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা'র কৃতী ছাত্র ছিলেন। মওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহিম (১৯২৯–১৯৯০ খ্রি.), মওলানা মুহাম্মদ দেলাওয়ার হোসাইন (১৯৩৫–২০০১ খ্রি.), মওলানা হাফেয আহমদ (১৯১১–২০১১ খ্রি.) ও মওলানা সাইয়্যেদুল হক (১৯৩৬–২০০০ খ্রি.) তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

হাদিস বর্ণনার অনুমতি (ইজাযত) লাভ

'ইজাযত' বলতে ফাতওয়া বা শিক্ষকতার অনুমতি দেয়াকে বোঝায়।[২৪] মুহাদ্দিসগণ ও অন্যদের কাছে ইজাযতের সংজ্ঞা হলো, হাদিস বা কিতাব বর্ণনার অনুমতি প্রদান।[২৫] ইসলামি সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই ইজাযতের বিষয়টি সুপরিচিত। শুরু দিকে ইজাযতদানের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, নবি করিম (সা.)-এর হাদিসসমূহের মধ্যে যাতে মিশ্রণ না ঘটে এবং তা থেকে বেঁচে থাকা যায়। তাই হাদিস বিশেষজ্ঞগণ ইজাযতদানের পদ্ধতি স্থির করেন। এটা ছিল শিক্ষক ও শিষ্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বস্ততা নিরূপণের একটি প্রকার।[২৬] হাদিস বর্ণনার ইজাযতের এধারা সে যুগ থেকে বর্তমান অবধি অব্যাহত রয়েছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) স্বীয় ওস্তাদ প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল আরকানি (রহ.) (১৮৯৮–১৯৮০ খ্রি.) থেকে হাদিস বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন। নিম্নে তাঁর হাদিসের সনদ উল্লেখ করা হলো:

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)
↓
শায়খুল হাদিস মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল আরকানি
↓

২২. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ রফী' উছমানী, *হায়াতে মুফতী-এ আ'যম*, আল-বালাগ, বিশেষ সংখ্যা, করাচি : দারুল ইশা'আত, ১৩৯৯, পৃ. ১০০

২৩. মমতাজুল মুহাদ্দিসিন দু'টি আরবি শব্দ। এর বাংলা অর্থ হাদিস বিশারদগণের শিরোমণি। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারীদেরকে এ উপাধি দেয়া হতো। সংক্ষেপে ইংরেজিতে 'এম. এম.' ডিগ্রি লেখার প্রচলন এখনও দেখা যায়। বর্তমানে একেই কামিল ডিগ্রি বলা হয়। অবশ্য হাদিস বিভাগের ডিগ্রিধারীদের এখনও এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দ্র. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ৫৫

২৪. মুহাম্মদ আমিন ইব্ন 'উমর আবিদিন, *হাশিয়া ইব্ন আবিদিন* (কায়রো : 'আলিমুল কুতুব, ২০০৩), খ.১, পৃ. ১৪

২৫. মজমু'আতুন মিনাল মুসান্নিফিন, *আল-মাউসূ'আতুল ইসলামিয়্যাতুল 'আম্মাহ* (কায়রো : মজলিসুল আ'লা লিশ শু'উনিল ইসলামিয়্যাহ, ২০১৩), পৃ. ৪৩

২৬. ড. রাগিব সারজানি, আবদুস সাত্তার আইনী অনূদিত, *মুসলিম জাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে* (ঢাকা : মাকতাবাতুল হাসান, ২০২১), খ.২, পৃ. ১০৬

সায়্যিদ হুসাইন আহমদ আল-মাদানি

↓

শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি

↓

হুজ্জাতুল ইসলাম মওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতবি

↓

শায়খ আবদুল গণি আল-মুজাদ্দিদি মুহাজিরে মক্কি

↓

সিরাজুল হিন্দ শাহ্ আবদুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলবি

↓

ইমামুল হিন্দ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবি[২৭]

↓

শায়খ আবুত্ তাহির আল-মাদানি

↓

শায়খ ইবরাহিম আল-কুরদি

↓

শায়খ আল-মাযযাহি

↓

শায়খ শিহাব আহমদ আস-সুবকি

↓

শায়খ নাজম আল-গায়তি

↓

শায়খ যায়ন যাকারিয়্যা

↓

শায়খ আল-ইয্য আবদুর রহিম

↓

শায়খ উমর আল-মুরাগি

↓

শায়খ ফখ্‌র ইবনুল বুখারি

↓

শায়খ উমর ইব্‌ন তাবারযাদ আল-বাগদাদি

↓

শায়খ আবুল ফাতাহ আবদুল মালিক

↓

শায়খ আবু আমির, আবু নসর ও আবু বকর

↓

শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুল জব্বার

↓

২৭. নাজমুদ্দিন ইসলাহি, *সিরতে শায়খুল ইসলাম* (দেওবন্দ : মাকতাবায়ে দীনিয়্যা, ১৯৮৮), পৃ. ১৪৪

শায়খ আবুল আব্বাস মুহাম্মদ

↓

শায়খ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরমিযি রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহিম।[২৮]

ইমাম তিরমিযি (রহ.)-থেকে রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-পর্যন্ত সনদগুলো প্রত্যেক হাদিসের পূর্বে ‘জামি‘ তিরমিযি’ গ্রন্থেই উল্লেখ রয়েছে। এভাবে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর হাদিস বর্ণনার সনদ হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সূত্রপরম্পরার দ্বারা ‘মুত্তাসিল’ (অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত) হয়ে আছে।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকমণ্ডলী

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ‘গারাংগিয়া সিনিয়র (বর্তমান কামিল) মাদ্‌রাসা’ এবং ‘দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা’য় বহু ওস্তাদগণের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেছিলেন। তারা জ্ঞানে-গুণে, ‘আমল-আখলাকের পাশাপাশি খোদাভীরুতা ও দুনিয়া বিমুখতায় জগদ্‌বিখ্যাত। তাদের ক্ষেত্রে কবি ফারাযদাকের[২৯] নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি যথার্থ :

أُولَئِكَ آبائي فَجِئْني بِمِثْلِهِم - إذا جَمَعَتنا يا جَرِيرُ المَجامِعُ

অর্থাৎ ‘এরাই আমাদের পূর্বসুরি, এদের নিয়ে আমরা গর্ব করি। হে জারির! বিশ্বসভায় তাদের জুড়ি দেখাও দেখি।’[৩০] অর্থাৎ তাদের উদাহরণ বিরল। তন্মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

[এক] গারাংগিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (বর্তমান কামিল) মাদ্‌রাসার শিক্ষকগণ

১. শাহ্ সুফি মওলানা আবদুল মজিদ (রহ.) (১৮৯৪–১৯৭৭ খ্রি.)

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন গারাংগিয়া গ্রামের ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত দীনি পরিবারে ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সুফি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মিয়াজি (মৃ. ১৯৩৩ খ্রি.) এবং মাতা রাহাত জান বেগম (মৃ. ১৯৩৮ খ্রি.)। তিনি চট্টগ্রাম ‘দারুল উলুম মাদ্‌রাসা’ থেকে ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল, মুহসেনিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে আলিম এবং ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে হায়ার মাদ্‌রাসা পরীক্ষা (ফাযিল সমমান) কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। ছাত্রজীবন শেষে চট্টগ্রাম ‘দারুল উলুম মাদ্‌রাসা’য় ছয় মাস অবৈতনিক শিক্ষকতা করে নিজ এলাকায় চলে যান। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গারাংগিয়া ইসলামিয়া মাদ্‌রাসা

---

২৮. আবু ‘ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান* (দিল্লি : কুতুবখানা রশিদিয়া, তা. বি.), পৃ. ২

২৯. ফারাযদাক (৬৪১–৭৩১ খ্রি.) বসরার তামিম গোত্রের শাখা বনু দারিমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম হাম্মাদ ইব্‌ন গালিব ইব্‌ন সা‘সা‘আ আদ-দারিমি। ‘ফারাযদাক’ তাঁর উপাধি, যার অর্থ মোটো, শক্ত ও পুরু রুটি। তাঁর চেহারা ছিল বীভৎস ও কঠোর; সেজন্য তাকে উক্ত উপাধি দেয়া হয়। তিনি রাজা বাদশাহ ও অন্যদের প্রশংসা ও নিন্দাবাদে কবিতা রচনা করে জীবন অতিবাহিত করেন; তবে তিনি বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন কবি জারিরের সাথে নিন্দাবাদমূলক কবিতা (نقائض) এ জড়িয়ে পড়ে। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি এ জাতীয় কবিতা রচনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে পাপাচারে আসক্ত থাকলেও তাঁর কবিতায় ইসলামি ভাবধারার ছাপ সুস্পষ্ট। সালাত, তাকওয়া, পুনরুত্থান দিবস, হিসাব-নিকাশ, নবিগণের ঘটনাবলি প্রভৃতির প্রয়োগ তাঁর কবিতায় প্রচুর দেখা যায়। *‘নাকায়েদু জারির ওয়াল ফারাযদাক’* শীর্ষক গ্রন্থেও তাঁর প্রচুর কবিতা স্থান পেয়েছে। দ্র. ড. শওকি দায়ফ, *তারিখুল আদাবিল ‘আরাবি* (কায়রো : দারুল মা‘আরিফ, তা. বি.), খ.২, পৃ. ২৬৫-২৭৬; *আল-মুনজিদ*, আল-আ‘লাম, পৃ. ৩৮৫

৩০. উদ্ধৃত : আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, *আমার জীবনকথা* (চট্টগ্রাম : নদভী প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ৫১

প্রতিষ্ঠা করে ১৯২০ থেকে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় সারা দেশে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্‌রাসা, এতিমখানা ও খানকা[৩১] প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত পীর ও ওলি হাফেয হামেদ হাসান আলভি (রহ.) (১৮৭১–১৯৫৯ খ্রি.) এর হাতে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে বায়'আত হন এবং ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফত[৩২] লাভ করেন। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। অগণিত মানুষ তাঁর হাতে বায়'আত হয়ে তাদের জীবনকে ধন্য করেন। তিনি 'গারাংগিয়ার বড়ো হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। এ মহান ব্যক্তিত্ব ২১শে অক্টোবর, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৩৩]

২. শাহ্ সুফি মওলানা আবদুর রশিদ হামেদী সিদ্দিকী (রহ.) (১৯০০–১৯৯৪ খ্রি.)

তিনি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া উপজেলাধীন গারাংগিয়া গ্রামে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন মিয়াজি এবং মাতা মোছাম্মৎ রাহাতজান বেগম। 'গারাংগিয়া মাদরাসা' থেকে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে পঞ্জুম (দাখিল) ও ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে আলিম এবং চট্টগ্রাম 'দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা' থেকে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে উলা (ফাযিল) পাস করেন। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ১৯২৬ থেকে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত গারাংগিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসায় হেড মওলানা এবং ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত হামেদ হাসান আলভি আজমগড়ি (রহ.) (১৮৭১–১৯৫৯ খ্রি.) এর হাতে বায়'আত হন এবং ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফত লাভ করেন। তিনি 'গারাংগিয়ার ছোটো হুজুর' নামে সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। এ মহান মনীষী ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৩৪]

৩. মুমতাজুল মুহাদ্দিস মওলানা সোলতান আহমদ (মৃ. ১৯৯২ খ্রি.)

তিনি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানাধীন মির্জাখিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা' থেকে প্রথম বিভাগে ফাযিল এবং 'মযাহের-এ-উলুম সাহারনপুর' থেকে দাওরায়ে হাদিস পাস করেন। কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি কিছুকাল কলাউজানের একটি মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি 'গারাংগিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় যোগদান করে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষকতা করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ২৩শে জুন, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৩৫]

---

৩১. খানকা ফারসি শব্দ। 'খান' অর্থ ফকির-দরবেশ, 'কাহ' অর্থ স্থান। সুতরাং খানকা কোনো সুফি তরিকা অবলম্বনকারী মুসলিম সাধকের সাধনার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ। খানকার প্রতিশব্দ রিবাত, তেক্‌কে এবং যাবিয়া প্রভৃতি দ্বারাও একই অর্থ প্রকাশ করে। হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর লেখকগণের রচনায় সর্বপ্রথম 'খানকা' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। পরবর্তীকালে ক্রমে-ক্রমে খানকার ব্যবহার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মূলত, খানকা সুফি সাধকের সাধনা ও 'ইবাদত-বন্দিগি করার এবং মানুষকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের একটি প্রতিষ্ঠান। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.৯, পৃ. ৪৯৯

৩২. খিলাফত আরবি শব্দ; যা 'খলফ' ধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো স্থলাভিষিক্ত, প্রতিনিধি; একের অনুপস্থিতিতে অন্যের দায়িত্ব পালনকে বোঝায়। ইসলামি রাষ্ট্রের আমিরকেও খলিফা বলে। 'ইল্‌মে মা'রিফতের পরিভাষায় শায়খের ধারাবাহিকতা জারি রাখার জন্য পরবর্তী মনোনীত ব্যক্তিকে খলিফা বলে। দ্র. মওলানা মানযুর নোমানী, *দ্বীন ও শরীয়ত* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯), পৃ. ১৮৩

৩৩. মওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭-৬৮

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬-১৬৭

৩৫. ড. আহসান সাইয়েদ, *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০

৪. ফখরুল ওয়ায়েয মওলানা মোবারক আহমদ (১৯২৪–২০০৬ খ্রি.)

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার বারোদোনা গ্রামে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ফখরুল ওয়ায়েয মওলানা মোবারক আহমদ। তিনি 'গারাংগিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (বর্তমান কামিল) মাদ্‌রাসা' থেকে ১৯৪২ ও ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল ও আলিম এবং 'চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমান কামিল) মাদ্‌রাসা' থেকে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাস করেন। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মায়নমারের (বার্মার) ইয়াঙ্গুনের (রেঙ্গুনের) পাঞ্জাবি জামে' মসজিদে ইমাম ও খতিব হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে 'গারাংগিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র (বর্তমান কামিল) মাদ্‌রাসা'য় একজন সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ২২ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১১ই মার্চ, ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তকাল করেন।[৩৬]

[দুই] দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসার শিক্ষকগণ

১. প্রিন্সিপাল মওলানা ফজলুর রহমান (১৮৮৬–১৯৬৪ খ্রি.)

প্রিন্সিপাল মওলানা ফজলুর রহমান চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালি উপজেলাধীন উত্তর জলদি গ্রামে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে 'চট্টগ্রাম মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা'য় তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং প্রত্যেক শ্রেণিতে বৃত্তি লাভ করে ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে উলা (ফাযিল) এবং 'দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা'[৩৭] থেকে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে 'দাওরায়ে হাদিস' পাস করেন। দেশে ফিরে এসে 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সুদীর্ঘ ৪৬ বৎসর তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সুপারিনটেনডেন্ট, প্রধান মুহাদ্দিস,[৩৮] ও প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত থেকে 'ইলমে হাদিস ও তাফসিরের আলো বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হাকিমুল

---

৩৬. সম্পাদনা পরিষদ, *সাতকানিয়ার শ্রেষ্ঠ ১০০ আলেমের জীবন* (চট্টগ্রাম : বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষক পরিষদ, ২০১২), খ.১, পৃ. ৪৩

৩৭. দারুল উলুম দেওবন্দ ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বের আমলে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ের যুগে, ইসলামি ঐতিহ্য সংরক্ষণের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম মওলানা কাসেম নানুতুবি (রহ.) (১২৪৮–১২৯৮ খ্রি.) কর্তৃক দিল্লির ছামাগ্রামের এক ডালিম গাছের নীচে মসজিদ প্রাঙ্গণে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে দেওবন্দ মাদ্‌রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। প্রথমত ইসলামের মৌলিক বুনিয়াদি শিক্ষা প্রচারোদ্দেশ্যে এর কার্যক্রম শুরু হলেও পরে তা ইসলামি উচ্চশিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বর্তমানে তা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকার সুবিশাল পরিধি পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দ্র. মওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ* (ঢাকা : শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৭৭-৭৮; ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বাকী, 'ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে দারুল উলুম দেওবন্দের ভূমিকা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৪, পৃ. ৩৫

৩৮. মুহাদ্দিস অর্থ হাদিস বর্ণনাকারী। যিনি হাদিস নিয়ে গবেষণা করেন তাকেই মুহাদ্দিস বলা হয়। পরিভাষায় মুহাদ্দিস বলা হয়, المحدث من يحمل الحديث رواية والمتن به دراية অর্থাৎ 'যিনি সনদান্-মতনান্ হাদিস বর্ণনা বহন তথা গবেষণা করেন তাকে মুহাদ্দিস বলে।' তাজুদ্দিন সুবুকি (রহ.) বলেন, যিনি হাদিসের সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি, রাবিদের পরিচিতিমূলক অভিজ্ঞতা, উঁচুমানের ও নিচুমানের সনদ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন, সাথে সাথে হাদিসের সঠিক মুখস্থকারী, সিহাহ্ সিত্তাহ, মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), সুনানে বায়হাকি (রহ.) ও তাবরানির মু'জাম গ্রন্থ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলা হয়। দ্র. ড. আলি মুহাম্মদ নাসার, *আন-নাহ্‌জুল হাদিস ফি মুখতাসারি 'উলুমিল হাদিস* (মক্কাতুল মুকাররামাহ : ইদারাতুছ ছাহাফাতি ওয়ান নাশরি, ১৯৮৫), পৃ. ২২

উম্মাহ মওলানা আশরাফ আলি থানভি (রহ.) এর হাতে বায়'আত[৩৯] হন এবং খিলাফত লাভ করেন। এ মহান বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব ৩রা অক্টোবর, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৪০]

২. মওলানা আবদুল মান্নান (১৮৮৯–১৯৭৯ খ্রি.)

তিনি চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁও থানার অন্তর্গত শমসের পাড়ায় এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আলহাজ্ব চাঁন্দমিয়া সওদাগর (মৃ. ১৯৩৩ খ্রি.) চট্টগ্রাম 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা'র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি চট্টগ্রাম 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা' থেকে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে আলিম এবং ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে উলা (ফাযিল) পাস করেন। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা' থেকে দাওরায়ে হাদিস পাস করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করে ১৯২৭ থেকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল মুহাদ্দিস, উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হাকিমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানভি (রহ.) এর মুরিদ এবং 'হাটহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্‌রাসা'র মজলিশে শুরার সদস্য ছিলেন। এ মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৪১]

৩. ফখরুল মুহাদ্দেসিন মওলানা মুফতি আমীন চৌধুরী (১৯০৫–১৯৭৭ খ্রি.)

তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার চরতি ইউনিয়নের দুরদুরি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৌলবি আবুল ফাত্তাহ চৌধুরি এবং মাতা লতিফা খাতুন। তিনি চট্টগ্রাম 'দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা' থেকে ১৯২৪ ও ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে আলিম ও ফাযিল কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। 'দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা' থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে দাওরায়ে হাদিস উত্তীর্ণ হয়ে 'ফখরুল মুহাদ্দিস'[৪২] নামে বিরল স্বীকৃতি লাভ করেন। ছাত্রজীবন

---

৩৯. বায়'আত শব্দের অর্থ অঙ্গীকার। তাসাওউফের পরিভাষায় কোনো পীর-মুর্শিদের হাত ধরে আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে তওবাহ্ করা এবং আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মান্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করাকে বায়'আত বলে। বায়'আত প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানি (রহ.) বলেন, বায়'আত মূলত শরি'আতেরই হুকুম পালনের অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার নাম। দ্র. উদ্ধৃত : মওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪; বায়'আতের গুরুত্ব সম্পর্কে মওলানা কুতুব উদ্দিন (রহ.) বলেন, 'কোনো ব্যক্তি যত বড় 'আলিম-ফাযিলই হোক না কেন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের ভূরি-ভূরি গ্রন্থ পাঠ করে থাকুক; কিন্তু নিয়মিত কোনো হাকিম ও ডাক্তারের নিকট প্রশিক্ষণ গ্রহণ ব্যতীত সে গ্রন্থের পড়া পদ্ধতি অনুসরণ করে চিকিৎসা করে, তবে তা বিপদের কারণ হওয়া ছাড়া আর কী হবে? সুতরাং, ডাক্তারি বইপত্র পড়ে যেমন শরীরের রোগের চিকিৎসা করা যায় না, তদ্রূপ কোনো পীরে কামিলের হাতে বায়'আত ব্যতীত রুহের চিকিৎসা সম্ভব নয়। জালাল উদ্দীন রুমি (রহ.) বলেন,

چوں کہ ذات پیر را کردی قبول - ہم خدا درذاتش آمد ہم رسول

অর্থাৎ 'যদি তুমি কোনো ওলি-বুযর্গের হাতে বায়'আত হও, তবে এটিই হবে তোমার জন্য আল্লাহ্ এবং তার রাসুলকে পাওয়ার সর্বোত্তম উপায়।' দ্র. মওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *নির্বাচিত ভাষণ*(চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০১৭), পৃ. ২৬৫

৪০. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১৪, পৃ. ৪৯৫

৪১. ড. আহসান সাইয়েদ, *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৪

৪২. ফখরুল মুহাদ্দিস দু'টি আরবি শব্দ; এর বাংলা অর্থ হাদিস বিশারদের গৌরব। 'কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা' থেকে তিনবছর মেয়াদি কোর্স সমাপ্ত করে যারা সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করতেন তাদের এ উপাধি দেয়া হতো। দ্র. ড. মওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, অধ্যক্ষ, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রামে থেকে সংগৃহীত তথ্য।

সমাপ্ত করে ৩রা জুলাই, ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ‘দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা’য় শিক্ষকতার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি সহকারী হেড মওলানা, হেড মওলানা ও মুহাদ্দিসসহ একাধিক পদে চাকুরি করেন। এ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে অসংখ্য শিষ্য, ভক্ত ও অনুরক্ত রেখে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৩]

৪. মওলানা মতিউর রহমান নিজামী (১৯২১–১৯৮৬ খ্রি.)

তিনি চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার মঠবাড়িয়া গ্রামে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আবদুল মজিদ মিয়া এবং মাতা উজ্জ্বল বিবি। তিনি ‘মিঠাছড়া ফয়জে আম সিনিয়র (ফাযিল) মাদ্‌রাসা’ থেকে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আলিম, ‘দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা’ থেকে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ১ম শ্রেণিতে ৪র্থ স্থান অধিকার করে ফাযিল এবং ‘কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা’ থেকে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করে কামিল (ফিকহ্)[৪৪] পাস করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ‘মিঠাছড়া ফয়জে আম সিনিয়র মাদ্‌রাসা’, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ‘সীতাকুণ্ড আলিয়া মাদ্‌রাসা’ এবং ১৯৫২ থেকে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আমৃত্যু চট্টগ্রাম ‘দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা’র শায়খুল হাদিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। হাদিসের এ মহান কৃতী পুরুষ ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৫]

৫. মওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল আরকানি (১৮৯৮–১৯৮০ খ্রি.)

তিনি মায়ানমারের (বার্মা) আকিয়াব জেলাধীন সুয়াতলীর কেয়েত্তে গ্রামে ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কালা মিয়া। মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে তিনি কক্সবাজারের ঈদগাহ নামক জায়গায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি; তবে তিনি ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা থেকে দাওরায়ে হাদিস পাস করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে ১৯৫২ থেকে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ‘দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস’ হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অসংখ্য শিষ্য রেখে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৪৬]

৬. মওলানা আবুল ফছিহ মুহাম্মদ ফোরকান (১৯১০–১৯৭৭ খ্রি.)

---

৪৩. প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ, ‘দারুল উলুমের কৃতী ছাত্র যুগকাল শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুফতি আল্লামা মুহাম্মদ আমীন’, *আয্-যিকরা বার্ষিকী ২০০৮*(চট্টগ্রাম : দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা, ২০০৮), পৃ. ৩৭-৩৮; মোহাম্মদ হেলাল হুমায়ূন, ‘মুফতি মোহাম্মদ আমীন (রহ.) এক অসাধারণ প্রতিভা’, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ১৯ জুন, ২০০৯, পৃ. ৪

৪৪. ফিক্‌হ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, الشق (বিদীর্ণ করা) ও الفتح (উন্মোচন করা)। দ্র. আবুস সা‘আদাত আল-মুবারক ইবনুল আছির, *আন-নিহায়াহ ফি গরিবিল আছার* (বৈরুত : দারুল কতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯), খ.৩, পৃ. ৭৭৪; মাহমুদ যামাখশারি, *আল-ফা’য়িক ফি গরিবিল হাদিস* (বৈরুত : দারুল মা‘রিফাহ, তা. বি.), খ. ৩, পৃ. ১৩৪; তাছাড়া ‘ফিকহ’ শব্দটি জানা (العلم), বোঝা, উপলব্ধি (الفهم), অন্তর্দৃষ্টি (الفطنة), তীক্ষ্ণ উপলব্ধি (الإدراك الدقيق) ও গভীর বোধ (الفهم العميق) প্রভৃতি অর্থেও বহুলপ্রচলিত। ফিকহের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ইমাম জামালুদ্দিন ইবনুল হাজিব (৫৭০–৬৪৬ হি.), কাযি নাসিরুদ্দিন আল-বায়দাভি (মৃ. ৬৮৫ হি.) ও নাজমুদ্দীন আত-তুফী (৬৫৭–৭১৬ হি.) (রহ.) প্রমুখের মতে, الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال অর্থাৎ ‘শরি‘আতের বিস্তারিত দলিলসমূহ থেকে প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে অর্জিত উপজাত বিধিবিধান সংক্রান্ত জ্ঞান।’ দ্র. আবুল হাসান ‘আলি মিরদাভি, *আত-তাহবির শারহুত তাহরির* (রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০০), খ.১, পৃ. ১৬৩

৪৫. মুহাম্মদ নিজামুদ্দীন, ‘মাওলানা নিযামী : জীবনের জ্যোতির্ময়তায়’, *মাসিক দ্বীন-দুনিয়া*, অক্টোবর, ১৯৯৭, পৃ. ১৯

৪৬. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসার অবদান* (চট্টগ্রাম : আলহাজ্ব আবুল কালাম, ২০১৭), পৃ. ২১৯-২২০

তিনি কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলাধীন কুতুবজুম গ্রামের খোন্দকার পাড়া গ্রামে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা' থেকে ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আলিম ও ফাযিল এবং 'কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা' থেকে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে কামিল (ফিকহ্) ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি ভারতের 'ফুরফুরা মাদ্‌রাসা', পিরোজপুরের 'ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। অতঃপর দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় ১৯৬৭/৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হেড মওলানা ও মুহাদ্দিস পদে কর্মরত ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ছোবহানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা এবং ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে 'জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় মুহাদ্দিস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১লা জানুয়ারি, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৪৭]

অধ্যয়নকালে তামাদ্দুনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠে কির'আত ও গযল পরিবেশন সবাইকে মোহিত করত। তিনি মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে বিভিন্ন তামাদ্দুনিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন; বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মজলিশে উর্দু, ফার্সি হামদ, না'ত ও গযল পরিবেশন করে অত্যধিক সুনাম অর্জন করেন। মওলানা হাফেয আহমদ (১৯১১–২০১১ খ্রি.) ও মওলানা নুরুদ্দীন ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহপাঠী। তিনি তাদের সাথে উর্দু ও ফারসি ভাষায় এসব কবিতা লিখতেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তা পরিবেশন করতেন। তাতে তিনি পুরস্কৃত হতেন এবং হাদিয়া-তোহফা লাভ করতেন। এই টাকা দিয়ে তিনি লেখাপড়ার খরচ চালাতেন।[৪৮]

আধ্যাত্মিক দীক্ষা

প্রকৃত আলিম ও বুযুর্গের সংশ্রবে সাধারণ মানুষের জীবন ধন্য হয়; তাদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। এরূপ সত্যনিষ্ঠ আলিম ও বুযুর্গানে দীনের পরিবেশে ও তাদের ছত্রছায়ায় তিনি প্রতিপালিত হন। পিতা-মাতা উভয়ই গারাংগিয়ার বড়ো হুজুর শাহ্ সুফি মওলানা আবদুল মজিদ (রহ.)-এর বিশেষ মুরিদ ছিলেন। বস্তুত, এখান থেকেই বালক আবদুল জব্বারের মাঝে আধ্যাত্মিকতার বীজ রোপিত হয়; যা পরবর্তীকালে ফুলে-ফলে সুশোভিত হওয়ার সুযোগ পায়। গারাংগিয়া মাদ্‌রাসার বড় হুজুর পীরে কামিল হযরত মওলানা আবদুল মজীদ (রহ.) (১৮৯৪–১৯৭৭ খ্রি.) এবং ছোটো হুজুর শাহ্ সুফি মওলানা আবদুর রশীদ হামেদী সিদ্দিকী (রহ.) (১৯০০–১৯৯৪ খ্রি.) উভয়ই সরাসরি তাঁর ওস্তাদ ছিলেন। তারা তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। অনুরূপভাবে, 'আন্দরকিল্লা শাহী জামে' মসজিদে'র তৎকালীন পেশ ইমাম আওলাদে রাসুল (সা.) সায়্যিদ আবদুল করিম মাদানি (রহ.) এবং শহরের পীর মওলানা মোহাম্মদ আখতর (রহ.) (১৯০৮–১৯৭১ খ্রি.)ও তাঁকে আন্তরিকভাবে স্নেহ করতেন। উল্লেখ্য, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর আধ্যাত্মিক দীক্ষা কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। যথা : মুর্শিদের সাথে শুভসাক্ষাৎ, মুর্শিদের সান্নিধ্য লাভ, বায়'আত গ্রহণ, আধ্যাত্মিকতার চর্চা ও খিলাফত লাভ ইত্যাদি। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

---

৪৭. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসার অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮-১৯

৪৮. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.)-এর ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৯০

মুর্শিদের সাথে শুভসাক্ষাৎ

বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) (১৯০৮–১৯৭১ খ্রি.) ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে লোহাগাড়া থানাধীন কুমিরাঘোনা নিবাসী নুরুদ্দীন মুন্সির বাড়িতে গমন করেন। তাঁর আগমনের সংবাদে মোহাম্মদ আবদুল জব্বার কয়েকজন সাথিসহ মাদ্‌রাসার ছুটির পর তথায় উপস্থিত হন। পীর সাহেবের অনুরোধে তিনি একটি না'ত পরিবেশন করেন। তাঁর পরিবেশিত না'ত শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। এরপর গারাংগিয়া মাদ্‌রাসার আলিম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে বার্ষিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে পীর সাহেব আগমন করলে তাঁর সাথে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। ঐ সভায়ও তিনি একাধিক গযল ও না'তে রাসুল (সা.) পরিবেশন করেন। তাতেও তিনি পীর সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন; ফলে পীর সাহেব তাঁর প্রতি স্নেহদৃষ্টি দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য দু'আ করেন।[৪৯]

অন্য একদিন লোহাগাড়া থানার আমিরাবাদ বটতলী স্টেশনের উত্তর-পূর্ব পাশে চেয়ারম্যান জালাল মিস্ত্রির বাড়িতে শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) আগমন করেন। পীর সাহেব মোহাম্মদ আবদুল জব্বারকে তাতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন। মাগরিবের নামাজের পর পীর সাহেব তাঁকে না'তে রাসুল (সা.) পরিবেশন করতে বলেন। তাঁর না'ত শোনার পর পীর সাহেব আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি জযবার (প্রেমাস্পদ) হালতে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে কোথাও চলে যাচ্ছিলেন। পথে একটি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে বেহুঁশ হয়ে পড়েন। অনুরূপভাবে, কুমিরাঘোনায়ও (আখতারাবাদ) এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।[৫০] তাঁর আল্লাহ্ ও রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রশস্তিমূলক গযল পরিবেশনে শ্রোতৃগণ ভাবাবেগে অনন্য তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত। কবির ভাষায়,

آنکس کہ تراشناخت جاں راچہ کند - فرزند وعیال وخانماں راچہ کند

دیوانہ کنی وہر دوجہاں رابہ بخشی - دیوانہ تو ہر دوجہاں راچہ کند

> অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তোমার পরিচয় পেয়েছে, তার জন্য জানটাই বা কী! সন্তান-পরিবার ও ঘরের সজ্জা দিয়ে তার কী হবে? তুমি তো পাগল বানিয়েছ, দান করেছ পুরো জগৎ। তোমার যারা পাগল, সমগ্র জগৎ দিয়েও তাদের কী হবে?'[৫১]

মুর্শিদের সান্নিধ্য লাভ

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) একজন যোগ্য পীরের অনুসন্ধান করতে থাকেন। এমতাবস্থায় তিনি একরাতে স্বপ্ন দেখলেন যে, চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকানন স্কুলের মোড়ে চৌরাস্তার ওপর পটিয়া থানাধীন জিরি মাদ্‌রাসার মুহ্‌তামিম মওলানা আহমদ হাছন[৫২] (রহ.) (১৮৮২–১৯৬৭ খ্রি.), গারাংগিয়ার

---

৪৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, ডা. মোহাম্মদ এমদাদুল হক, 'হুজুর কেবলা (রহ.)-এর অপ্রকাশিত একটি দুর্লভ সাক্ষাৎকার', আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

৫০. পূর্বোক্ত, ১৪৫-৪৬ ও ১৫৮

৫১. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ সম্পাদিত, *কুতবে জমান*, *শাইখুল আরব ওয়াল-আজম আল্লামা শাহ্ হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রহ. ঃ জীবন*, *কর্ম ও অবদান* (চট্টগ্রাম : আল্লামা শাহ্ ইউনুস রহ. একাডেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫), পৃ. ৩৬

৫২. মওলানা আহমদ হাছন (রহ.) চট্টগ্রামের পটিয়া থানাধীন জিরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অসিউর রহমান। পারিবারিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৮৯৭ থেকে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রামের 'মুহসিনিয়া মাদ্‌রাসা'য় পড়ার পর 'দারুল 'উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী'তে ভর্তি হন। এ মাদ্‌রাসায় তিনি দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

বড় হুজুর শাহ্ সুফি মওলানা আবদুল মজীদ (রহ.) (১৮৯৪–১৯৭৭ খ্রি.) ও 'আন্দরকিল্লা শাহী জামে' মসজিদে'র পেশ ইমাম সায়্যিদ আবদুল করিম মাদানি (রহ.) হাতের ইশারায় তাঁকে ডাকছেন। এদিকে শহরের পীর মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) টর্চের আলোর মতো একটি উজ্জ্বল আলোর ছটা দিয়ে ইশারা করলেন। এরূপ দেখে তাঁর দিকে অগ্রসর হতেই তাঁর মনে হলো তা মাদারবাড়ীর রেললাইনের পাশে কোনো একটি জায়গা। তথায় বায়তুশ শরফের পীর মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) নিজ হাতে পেয়ালা ভরে মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার মুহাব্বতের শরাব বিতরণ করছেন। এই স্বপ্ন দেখার পর মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং অনেকটা অস্থির হয়ে পড়লেন। কোথাও মন বসছিল না তাঁর। অস্থির এক ঘোরের ভেতর যাচ্ছিল তাঁর দিন-রাত। এ প্রেম থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো পথ ছিল না। এ প্রেম ঢুকে গিয়েছিল তাঁর রগে-রক্তে, শিরায়-উপশিরায়; কারণ,

آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عِشق - شاخِ گُل میں جِس طرح بادِ سحر گاہی کا نَم

অর্থাৎ 'মানুষের শিরা-উপশিরায় ও অস্থিমজ্জায় সঞ্চালিত হয় প্রেম, ফুলের পরতে-পরতে যেমন ঢুকে পড়ে ভোরের সমীরণ।'[৫৩]

সেই বিহ্বল অবস্থার অবসান ঘটে শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.)-এর সুহবতে। রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুহবতে সান্নিধ্যে যেভাবে সাহাবিগণের জীবন বদলে দিয়েছিল; পালটে দিয়েছিল তাদের জীবনের গতিপথ; অনেকটা যেন সেভাবে মওলানা আবদুল জব্বারের জীবন পালটে গিয়েছিল শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.)-এর সুহবতে ও সান্নিধ্যে। যেদিকেই তাঁর দৃষ্টি পড়েছে পথের ধূলিও আকাশের সেতারায় পরিণত হয়েছিল। কবি কতই না চমৎকার করে বলেছেন,

جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوگئے - جِتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہوگئے ﷺ

অর্থাৎ 'যে দিকেই হয়েছে মুহাম্মদের আঁখির ইশারা, ছিল যত ধূলিকণা, হয়ে গেছে সেতারা।'[৫৪]

আলিমে দীন ও আল্লাহ্ তা'আলার ওলিগণই পৃথিবীতে নবির একমাত্র উত্তরাধিকারী। নবিগণের সুদৃষ্টির ও সান্নিধ্য লাভের বরকতধারা আল্লাহ্ তা'আলা ওলিগণকেই দান করেছেন। এ কারণেই তাঁদের সুদৃষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ পালটে দিতে পারে একজন মানুষের মন-মগজ ও জীবন চলার গতিধারা। শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.)-এর সুদৃষ্টিও পালটে দিয়েছিল মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের জীবন চলার গতিধারা।

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তিনি 'আল-জামি'আ আল-'আরবিয়া জিরি মাদ্রাসা'র মুহতামিম হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করে যান। তিনি একজন বিজ্ঞ আলিম, ইসলাম প্রচারক ও সুবক্তা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই শাওয়াল তিনি ইন্তিকাল করেন। দ্র. ড. আহসান সাইয়েদ, *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯-১৭০

৫৩. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ সম্পাদিত, *কুতবে জমান*, *শাইখুল আরব ওয়াল-আজম আল্লামা শাহ্ হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রহ. : জীবন*, *কর্ম ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

বায়'আত গ্রহণ

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র বরাতের রাতে দু'আর জন্য শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.)[৫৫] এর দরবারে উপস্থিত হন। তখন তিনি 'চট্টগ্রাম স্টেশন রোড জামে' মসজিদে'র স্বীয় হুজরায় ছিলেন। পীর সাহেব হুজুর তাঁর লেখাপড়ার সার্বিক খোঁজ-খবর নেন; অতঃপর কাদেরিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরিকার নিয়ম অনুযায়ী তাওবাহ্-ইস্তিগফারের মাধ্যমে তাঁকে বায়'আত করান। বায়'আতের পর 'ইল্‌মে তরিকতের ওযিফা (যিকির-আযকারের নিয়ম-কানুন) শিক্ষা দেন। এ বায়'আতের মাধ্যমে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের জীবনের গতিধারা পালটে যেতে থাকে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি 'পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় 'ইলমে হাদিসের দর্‌স দানের পাশাপাশি স্বীয় মুর্শিদ থেকে 'ইলমে তরিকতের সবক গ্রহণ করে তাসাওউফ চর্চা অব্যাহত রাখেন।[৫৬]

আধ্যাত্মিকতা চর্চা

'পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় শিক্ষক থাকাকালে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার হাটহাজারী থানার খন্দকীয়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা সংলগ্ন 'আসগর আলী সওদাগরের মসজিদে'র হুজরায় থাকতেন; হাজি নূরুজ্জামান মিস্ত্রীর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতেন। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারে চট্টগ্রামের 'স্টেশন রোড জামে' মসজিদে' স্বীয় মুর্শিদের সান্নিধ্যে আসতেন এবং যিকির মাহফিলে যোগ দিতেন। শনিবার সকালে অথবা মাদ্‌রাসায় সঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারবেন, এমন এক সময় দেখে মুর্শিদ তাঁকে ছুটি দিতেন। এ সময়ে তাঁর পীর-মুর্শিদ সকাল-বিকাল তরিকতের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আধ্যাত্মিক আলোচনা করতেন।[৫৭] এভাবে বায়'আত গ্রহণের পর থেকেই তিনি নিবিষ্ট চিত্তে তরিকতের

---

৫৫. মওলানা মীর মুহাম্মদ আখতর (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনীয়া উপজেলাধীন ব্রহ্মোত্তর গ্রামে ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে মাতুতালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মওলানা মীর মসউদ আলী এবং মাতা উম্মে সালমা। তিনি দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা থেকে আলিম ও ফাযিল এবং ভারতের 'দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা' থেকে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদিসের সনদ লাভ করেন। দারুল উলুমে অধ্যয়নকালে আজমির শরিফের শাহজাহানি মসজিদে মাওলানা সৈয়দ মোনছরম শাহ খোরাসানি (রহ.) (মৃ. ১৯৫২/ ৫৩ খ্রি.)-এর নিকট বায়'আত গ্রহণ ও খেলাফত লাভ করেন। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে বটতলী স্টেশন রোড জামে' মসজিদে তিনি ইমাম হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৫৮ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘদিন ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। ২রা অক্টোবর, ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ডবলমুরিং থানার অন্তর্গত ধনিয়ালাপাড়ায় 'মসজিদে বায়তুশ শরফ' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ হিসেবে পরিচিত। তিনি লোহাগাড়া উপজেলাধীন বড়হাতিয়া ইউনিয়নের কুমিরাঘোনায় (আখতারাবাদ) ঐতিহাসিক বার্ষিক ইছালে সওয়াব মাহফিল প্রবর্তন করেন। কুমিরাঘোনা (আখতরাবাদ) আখতরুল উলুম মাদরাসাসহ বেশ কয়েকটি মাদ্‌রাসা, মসজিদ ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ২৯তম হজ পালন করা অবস্থায় মিনা হাসপাতালে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মোতাবিক ১৩৯০ হিজরির ৯ই জিলহজ, রোজ জুমা'বার ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে পবিত্র কা'বাশরিফে জানাযা শেষে জান্নাতুল মু'আল্লাতে দাফন করা হয়। দ্র. মোহাম্মদ আমান উল্লাহ খান, *মহিমাময় জীবন* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ২০০৩) পৃ. ১০-৮৭; মওলানা মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১২৭; রায়হান আযাদ, 'বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠা কুতুবুল আল শাহছুফী মাওলানা মীর মুহাম্মদ আখতর রহ. স্মরণে', *দৈনিক কর্ণফুলী*, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩, পৃ. ২

৫৬. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.)-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

৫৭. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবাদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯

কাজ চালিয়ে যান। তার বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে কক্সবাজার বায়তুশ শরফ[৫৮] মসজিদের সাবেক ইমাম ও খতিব মওলানা তাহেরুল ইসলাম (১৯৪৭–২০২১ খ্রি.) এর বর্ণনায়; তিনি বলেন,

> ‘আমি শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সাথে সুদীর্ঘ এগারো বছর খন্দকীয়ায় ছিলাম। এ সময়ে তাঁর থেকে শরি‘আত-বিরোধী কোনো কিছু প্রকাশ হতে দেখিনি। তিনি কোনো দিন তাহাজ্জুদের নামায এবং যিকির বাদ দেননি। শেষ রাতে তিনি আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে কান্নাকাটি করতেন। তিনি তাঁর পীর-মুর্শিদের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। তাঁর নির্দেশের বাইরে এক কদমও তিনি এদিক-সেদিক যেতেন না।’[৫৯]

খন্দকীয়ায় আসগর আলী মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালনের সময় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বারকে তাঁর মুর্শিদ অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন; এমনকি কোনো সময় রাত তিনটায় তাঁর বাস্তব অবস্থা দেখার জন্য মাদারবাড়ী থেকে কাউকে পাঠাতেন। তারা তাঁকে হয়তো নামাযে নতুবা যিকিরে পেতেন। তিনি রুটিন অনুযায়ী কাজ করতেন। তিনি রাত তিনটায় নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেন। ফজরের নামাজের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ও যিকিরে মশগুল থাকতেন। ফজরের নামায নিয়মিত জামা‘আতের সাথে আদায় করতেন। মুনাজাতের পর তরিকতের নির্দিষ্ট ওযিফাসমূহ আদায় করতেন। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উদিত হলে ইশরাকের নামায আদায় করতেন। অতঃপর সকাল আটটা পর্যন্ত ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসায় ছেলে-মেয়েদের পবিত্র কুর’আন শিক্ষা দিতেন। তারপর গোসল ও খাওয়া-দাওয়া সেরে মাদ্‌রাসায় চলে যেতেন। মাদ্‌রাসা থেকে বিকাল পাঁচটায় খন্দকীয়ায় চলে আসতেন।

মাগরিব পর্যন্ত নীরবে বসে দু‘আ-দরুদ পাঠ এবং যিকির-আযকার করতেন। মাগরিবের নামাযের পর তিনি দীর্ঘ সময় নফল ইবাদতে মশগুল থাকতেন। অতঃপর স্বীয় হুজরায় এসে এশার নামায পর্যন্ত কিতাবাদি অধ্যয়ন করতেন। এশার নামায আদায়পূর্বক রাতের খাবার শেষ করে রাত ১২টা পর্যন্ত পুনরায় কিতাব দেখতেন। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। আবার রাত ৩টায় উঠে তাহাজ্জুদ ও যিকিরে মশগুল থাকতেন। এভাবে ১৯৪০ থেকে ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৪ বছর তিনি ‘ইলমে শরি‘আতের জ্ঞানার্জন এবং ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ‘ইলমে হাদিসের পাঠদানের পাশাপাশি ‘ইলমে তরিকতের সবক গ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর মুর্শিদ ‘ইলমে শরি‘আত ও ‘ইলমে তরিকতের সমন্বয়ে

---

৫৮. বায়তুশ শরফ নামের কয়েকটি তাৎপর্য রয়েছে : **প্রথমত,** সম্মানের ঘর, অতিসম্মানিত ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ তা‘আলার ঘর। মসজিদের চাইতে সম্মানিত ঘর দ্বিতীয়টি হতে পারে না। **দ্বিতীয়ত,** এ ঘরে এলে মানুষ সম্মানিত হয়। তাকওয়া অর্জন করার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে সম্মানিত হয়। বায়তুশ শরফের বহুমুখী কর্মসূচির আওতায় আধ্যাত্মিক সাধনা ও মানবসেবার পথ ধরে মানুষ আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে যেমন সম্মানিত হয় তেমনি মানুষের কাছেও। **তৃতীয়ত,** বায়তুশ শরফ মানুষকে সম্মান দেয়, যারা বায়তুশ শরফের পীর ছাহেবের মেহমান হয়েছেন অথবা তাঁর মুরিদের সাথে মিশেছেন তারা এ অর্থের তাৎপর্য বুঝতে পারবেন। বিশেষতঃ ‘আলিম সমাজ (অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়)। দ্র. মওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, ‘যেখানে আমার স্বপ্নেরা ভিড় জমায়’, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩-৯৪

৫৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মাওলানা তাহেরুল ইসলাম, ‘স্মৃতির মণিকোঠায় হুজুর কেবলা (রহ.)’, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮

জ্ঞানের বিশেষ স্তরের অধিকারী করার নিমিত্তে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ তিন বছর তাকে স্বীয় তত্ত্বাবধানে রেখে উচ্চতর 'ইলমে তাসাওউফ ও 'ইলমে হাকিকতের তা'লিম দেন।[৬০]

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার স্বীয় মুর্শিদের সাথে ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত নবি-রাসুল, সাহাবি, তাবি'ঈ ও প্রসিদ্ধ আউলিয়া কিরামের মাযার যিয়ারতে ধন্য হন। তাছাড়া পীর মুর্শিদ তাঁকে বিভিন্ন স্থানে সফরসঙ্গী হিসেবে নিয়ে যেতেন। মুর্শিদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তিনি ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে পানির জাহাজে করে জীবনের প্রথম হজ আদায় করেন। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় মুর্শিদের সাথে আকাশপথে করাচি হয়ে দ্বিতীয়বার হজে গমন করেন। এ সময় মুর্শিদ মক্কাশরিফ ও মদিনাশরিফের দু'আ কবুল হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ স্থান, বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন জায়গা, ঘটনা ও ইতিহাস সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন।[৬১] এভাবে তাঁর পীর-মুর্শিদ ধীরে-ধীরে তরিকতের প্রশিক্ষণ দিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বারকে খিলাফতের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন।

খিলাফত লাভ

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বায়'আত ও আধ্যাত্মিকতা চর্চার মাধ্যমে ইনসানে কামিলে পরিণত হয়েছিলেন; ফলে পীর-মুর্শিদ তাঁকে দিয়ে বিভিন্ন সময় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আ করাতেন; আর বলতেন মওলানা আবদুল জব্বার 'মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত'[৬২]। তিনি যেভাবে দু'আ করেন তাঁর দু'আ হুবহু আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন। সুন্নাতে রাসুলের প্রতি নিখাদ আনুগত্য দেখে তাঁর মুর্শিদ তাঁকে 'ফানা ফির রাসুল'[৬৩] এবং আধ্যাত্মিকভাবে উচ্চস্তর লাভ করায় 'কুতুবুল আকতাব' উপাধিতে ভূষিত করেন। মুর্শিদের জীবনের শেষ কয়েকটি ইসালে সাওয়াব মাহফিলে তাঁকে দিয়ে পুনরায় মুনাজাত করিয়েছিলেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম দিকে মুর্শিদ মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) তাঁকে নিয়ে 'উমরাহ্ পালনের জন্য পবিত্র মক্কায় গমন করেন। সেখানে মুলতাজিম ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে কা'বাশরিফের গিলাফ স্পর্শ করে মুর্শিদ তাঁর প্রিয়তম অনুসারী মওলানা আবদুল জব্বার (রহ.)-কে পরবর্তী প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে উপস্থাপন করে দু'আ করেন,

৬০. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, 'বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.)-এর পবিত্র জীবনধারা, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১-১৫২

৬২. মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত'কে আরবিতে দা'ওয়াতুন মুস্তাজাবাতুন (دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ) বলা হয়। অর্থ কবুলকৃত বা মাকবুল দু'আ। পরিভাষায়, যাদের দু'আ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় তাদের মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত বলা হয়। দ্র. আহমদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাজর 'আসকালানি, *ফতহুল বারি বি শরহি সহিহিল বুখারি* (কায়রো : মাকতাবাতুস সাফা, ২০০৩), খ.১১, পৃ. ১১১-১১২; এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন, لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُوْ بِهَا অর্থাৎ 'প্রত্যেক নবির কবুলকৃত দু'আ রয়েছে। যেগুলো দিয়ে তারা প্রার্থনা করে।' দ্র. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি'আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, খ.২, হাদিস নং ৫৯৪৫, পৃ. ৪৯৫

৬৩. ফানা ফিশ শায়েখ লাভের পর ফানা ফির রাসুলের স্তর শুরু হয়। এ স্তরে সালিক রসুলের সর্বপ্রকার গুণাবলি লাভ ও তাঁর মহব্বত লাভ করার জন্য সাধনা শুরু করেন। ধ্যানের মাধ্যমে তিনি এ সময় রাসুল (সা.)-এর চেহারা বা নূর-উ-মুহাম্মদির সাক্ষাত লাভ করেন। মুরাকাবা বা ধ্যানের মাধ্যমে সাধক এ স্তরে আপন অস্তিত্বকে রাসুল (সা.)-এর নুর-ই-মুহাম্মদিতে বিলীন করে দিয়ে 'ফানা ফির রাসুল' লাভ করেন। দ্র. ফকির আব্দুর রশীদ, *সূফী দর্শন* (ঢাকা : হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ১৬১

> 'ইয়া আল্লাহ্ তা'আলা! আমি আমার আবদুল জব্বারকে আপনার দরবারে সোপর্দ করতে এসেছি। আমি তাকে আপনার দরবারে পেশ করলাম। আপনি দয়া করে তাঁকে কবুল করে নিন। আমিন!'[৬৪]

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদের শেষ হজে অন্যান্য বারের মতো মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)ও একান্ত সাথি ছিলেন। মুর্শিদের অসুস্থতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে গেলে একদিন মুর্শিদ তাঁকে একান্তে রুমে ডেকে নেন; কলম আর নোট বই বের করতে বলেন। আর মুর্শিদ স্বীয় বাক্স খুলে নিজ হাতে লেখা খাস ওযিফাটি বের করলেন। সেখান থেকে কিছু জিনিস তাঁকে নোট করিয়ে দিয়ে বললেন, 'সম্পদ কারো নিকট রাখতে হবে।' অতঃপর মুর্শিদ তাঁর প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন; তারপর বললেন,

> 'আমি দু'আ করছি আল্লাহ্ আপনাকে আরও তরক্কি (উন্নতি) দান করুন। তুমি আমার মুখের দিকে দৃষ্টি দেবে না, অন্তরের দিকে লক্ষ রাখবে, কলবের দিকে নজর রাখবে।'[৬৫]

পরবর্তীকালে সবার উপস্থিতিতে মুর্শিদ বললেন,

> 'আজ বহু বছর থেকেই মাহফিলের ইছালে সাওয়াবের আধ্যাত্মিক দায়িত্ব আমি মওলানা আবদুল জব্বার দ্বারা সম্পাদন করাচ্ছি। শবে বরাত ও শবে কদরের মুনাজাত তিনি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অনেক তরক্কি (উন্নতি) দান করেছেন, আরও দান করুন। আমি এতদিন তাঁর পরিচয় মানুষের নিকট প্রকাশ করিনি; কারণ, সময় হয়নি। লোকজন তাঁর আসল পরিচয় পেলে তাঁকে সময়ে-অসময়ে বিরক্ত করত। তাঁর কর্তব্য পালনে অসুবিধা হয়ে যেত এবং তাতে আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আমি দু'আ করছি, সময়মতো আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মানুষের নিকট পরিচয় করিয়ে দেবেন। তখন এমনভাবে মানুষ তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়বে যে তাঁর আহার-নিদ্রার সময় করা কঠিন হয়ে যাবে।'[৬৬]

তারপর মুর্শিদ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বারকে মুনাজাত করতে বললেন; উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে বললেন, 'যাও! তাঁর পেছনে গিয়ে মুনাজাত করো। ভবিষ্যতে সবাইকে তাঁর পিছনেই থাকতে হবে।' অতঃপর মুর্শিদ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর প্রতি এমন এক রুহানি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, যার ফলে তাঁর অন্তরের সুপ্ত প্রতিভা ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে। ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে, ৯ই যিলহজ পবিত্র মিনায় যোহরের নামাযের কিছুক্ষণ পর তিনি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে পুনরায় ডাকলেন। শেষবারের মতো সবাইকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, 'তাঁর পেছনে বসো, মুনাজাত করো। ভবিষ্যতে সবসময় তাঁর পেছনে থাকতে হবে।'[৬৭]

এমনিভাবে স্বীয় মুর্শিদ মৃত্যুর আগে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কে একমাত্র খলিফা[৬৮] নির্বাচন করে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে চলে গেলেন। পবিত্র ভূমিতে মহান আধ্যাত্মিক গুরুর পক্ষ

---

৬৪. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, মোহাম্মদ আমান উল্লাহ্ খান, 'মহামান্য হযরত কেবলা (রাঃ) এর দৃষ্টিতে শ্রদ্ধেয় হুজুর কেবলা (রাহ.)', *জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ৭৪

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৬৬. পূর্বোক্ত।

৬৭. রায়হান আযাদ, 'বায়তুশ শরফের রূপকার শাহসূফী হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) স্মরণে', *দৈনিক কর্ণফুলী*, ২৫ মার্চ, ২০১২, পৃ. ২

৬৮. খলিফা আরবি শব্দ; এটি একবচন, বহুবচনে খালা'য়িফ (خلائف) ও খুলাফা (خلفاء)। এর অর্থ প্রতিনিধি, নায়েব, প্রতিভু, স্থলাভিষিক্ত, স্থলবর্তী, শীর্ষ মুসলিম শাসক, খলিফা ও উত্তারাধিকারী ইত্যাদি। দ্র. মওলানা হাবীবুর রহমান মুনির নদভী,

হতে অনাগত দিনের কান্ডারি হওয়ার উপদেশ তাঁকে আরও বেশি আমানতদার, দীনি তা'লিম, এতিমের অভিভাবক ও আধ্যাত্মিক সাধনায় বলিষ্ঠ করে তোলে। তিনি পীর-মুর্শিদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে বায়তুশ শরফের বহুমুখী কার্যক্রম শুরু করেন।[৬৯]

স্মর্তব্য যে, স্বীয় মুর্শিদের সাথে তাঁর কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না। স্বীয় জ্ঞান-গরিমা, চারিত্রিক গুণাবলি ও আধ্যাত্মিক সাধনার বলে স্বীয় মুর্শিদের ইন্তিকালের পর তিনি বায়তুশ শরফের পীর হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[৭০] এ প্রসঙ্গে 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা'র সম্মানিত শিক্ষক মওলানা সৈয়দ নুর বলেন,

انتھائی محنتوں سے بن گئیں خلف الرشید - ثمرة ھے اخلاص کی یہ باعث صد افتخار

> অর্থাৎ 'অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি খেলাফতের পেলেন আসন, নিষ্ঠার প্রতিদান আর গর্বের শত কারণ।'[৭১]

মোহাম্মদ আবদুল জব্বার শৈশবকাল থেকেই লেখাপড়ার প্রতি খুবই অনুরাগী ছিলেন। এজন্য আর্থিক দৈন্যদশা ও শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চর্চার প্রতিও তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিল; ফলে একজন কামিল পীরের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ দিন আধ্যাত্মিকতার চর্চা করেছিলেন এবং এক্ষেত্রেও তিনি চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করেছিলেন।

মিসবাহুল লুগাত (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০০০), পৃ. ২০৮; ইবরাহিম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত* (কায়রো : মাজ'মাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১১), পৃ. ২৫১; খলিফার সংজ্ঞা প্রদানে আল্লামা ইব্‌ন মানজুর বলেন, الخليفة الذي يستخلف ممن قبله অর্থাৎ 'খলিফা হলো যে ব্যক্তি তাঁর পূর্ববর্তী ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি হয়।' দ্র. ইব্‌ন মানযুর, *লিসানুল 'আরব*, পূর্বোক্ত, খ.৯, পৃ. ৮২; সুফি সম্প্রদায়গুলোর বিশেষত কাদেরিয়া সম্প্রদায়ের মতে শায়খের (সুফি সম্প্রদায়ের নেতা) প্রতিনিধিকে খলিফা বলা হয়। তাকে শায়খের কতগুলি বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয় এবং মূল কেন্দ্র হতে দূরবর্তী দেশসমূহে প্রতিনিধিত্ব করার ভারও তাকে দেয়া হয়। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৩৪৪; ইমাম রাগিবের মতে, কারও অনুপস্থিতি, মৃত্যু, অক্ষমতা, এমনকি খাঁটি প্রতিনিধিত্বের মর্যাদাদানের প্রয়োজনেও এটি ব্যবহৃত হতে পারে। 'ইল্‌মে মা'রিফতের পরিভাষায় শায়খের ধারাবাহিকতা জারি রাখার জন্য পরবর্তী মনোনীত ব্যক্তিকে খলিফা বলে। দ্র. মওলানা মানযুর নোমানী, *দ্বীন ও শরি'আত* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯), পৃ. ১৮৩

৬৯. মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরে কদমতলীর ধনিয়ালাপাড়ায় বায়তুশ শরফ মসজিদ সংলগ্ন হুজরা নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তা উদ্বোধন করা হয়। কালক্রমে বায়তুশ শরফ নামে এ খানকা বহুলপরিচিতি লাভ করে। দ্র. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, মোহাম্মদ আমান উল্লাহ খান, 'মসজিদ বায়তুশ শরফ প্রতিষ্ঠার ইতিকথা', *আল-আছরার* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ১৯৯৩), পৃ. ৫৭

৭০. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, 'জান্নাতের পথে পাড়ি দিয়েছেন বায়তুশ শরফের পরম শ্রদ্ধেয় পীর ছাহেব কেবলা হাদীয়ে যামান শাহ্ সূফী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ছাহেব (রহ.)', *জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৮), পৃ. ১০

৭১. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *আল-আছরার* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৬), পৃ. ৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
কর্মজীবন

ভাগ্য সাহসী ব্যক্তির প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে থাকে। বাস্তবিকই মওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর দৃঢ় মনোবল, সৎসাহস ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিই তাকে শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে ছাত্রজীবন সমাপ্ত করতে সহায়তা করে। শুরু হলো জীবন সংগ্রামের আরেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। আরম্ভ হলো আরেক কণ্টাকাকীর্ণ বিপৎসংকুল সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়। সূচিত হলো বাধাবিঘ্নের এক বন্ধুর পথচলা। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের 'দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা' থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজীবনের দিকনির্দেশনার দায়িত্ব স্বীয় মুর্শিদের পবিত্র হস্তে সমর্পণ করেন। তাঁর মুর্শিদ বললেন,

> 'অর্থকড়ি চাইলে মসজিদের ইমামতি আর জ্ঞানচর্চা করতে চাইলে মাদ্‌রাসার শিক্ষকতা করো; তুমি যেটা পছন্দ করো।'[৭২]

আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত বান্দাদের অন্তরাত্মা-বিবেক সদাজাগ্রত ও সদাচঞ্চল থাকে। তাই তিনি মুর্শিদের উদ্দেশে স্মিতহাস্যে দ্বিধাহীনচিত্তে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করে বলেন,

> 'জ্ঞানচর্চার প্রাণকেন্দ্র মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতাকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করি।'[৭৩]

তাঁর বিজ্ঞোচিত জবাব শুনে পীর-মুর্শিদ আনন্দচিত্তে তাঁকে প্রাণভরে দু'আ করেন। তাঁর শিক্ষকতা জীবন ছিল গোটা শিক্ষক সমাজের জন্য এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। শিক্ষকতাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি; বরং তা দীনের খিদমত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

অধ্যাপনা জীবন

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) দু'টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাঁর অধ্যাপনা জীবন অতিবাহিত করেন; সেগুলো হলো:

[এক] পাঁচলাইশ ওয়াজেদীয় আলিয়া মাদ্‌রাসা

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর 'ইলমে তরিকতের শিক্ষক ও পীর মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ সফর করেন। গমনকালে চট্টগ্রামের মনসুরাবাদস্থ হাজি মসজিদের ইমাম মওলানা ইদ্রিসকে সফরসঙ্গী করেন। তাঁর অনুপস্থিতিকালে মওলানা আবদুল জব্বারকে উক্ত মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করেন। এ মসজিদে দায়িত্ব পালনকালে চট্টগ্রামের আনোয়ার থানাধীন এক মসজিদের ইমামের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি তাঁকে মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। চট্টগ্রামের 'পাঁচলাইশ ওয়াজেদীয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় শিক্ষকের একটি পদ খালি আছে বলে জানান। তিনি স্বীয় মুর্শিদের ইশারায় ঐ ইমাম সাহেবের সাথে 'পাঁচলাইশ

---

৭২. রায়হান আজাদ, 'বায়তুশ শরফের রূপকার শাহসূফী হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) স্মরণে', *দৈনিক কর্ণফুলী*, ২৫ মার্চ, ২০১২, পৃ. ২

৭৩. পূর্বোক্ত।

ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদরাসা'য় যান। তৎকালীন অধ্যক্ষ মওলানা আতিকুল্লাহ্ খানের সাথে তিনি পরিচিত হন এবং সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হন এবং মাদ্‌রাসায় যোগদান করার পরামর্শ প্রদান করেন। এভাবে তাঁর কর্মবহুল শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মবহুল জীবনের শুভসূচনা হয়।

তিনি ১লা জানুয়ারি, ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে 'ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা' চট্টগ্রাম[৭৪]-এ সহকারী মওলানা হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে তাঁর নিষ্ঠা, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুহাদ্দিস পদে পদায়ন করে। সেখানে তিনি 'সিহাহ সিত্তাহ'সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কিতাবের দার্‌স দিতেন। এখানে তিনি ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত একটানা ১৪ বৎসর 'ইলম ও 'আমলের আলোয় আলোকিত হয়ে সোনার মানুষ গড়ার কারিগরের ভূমিকা পালন করেন। এসময় যারা তাঁর সহকর্মী ছিলেন, তারা হলেন, অবিভক্ত বাংলায় ইসলামি শিক্ষার পুরোধা চট্টগ্রাম 'ওয়াজেদিয়া কামিল মাদরাসা'র প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ পীরে কামিল মওলানা আতিকুল্লাহ্ খান (১৯০৬–২০০৫ খ্রি.), ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (১৯২৮–২০২০ খ্রি.)।

এছাড়াও মওলানা আজিজুর রহমান, মুফতি রশীদ আহমদ, বাংলা বুখারি শরিফের ভাষ্যকার প্রধান মুহাদ্দিস আল্লামা ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ (১৯৪৭–২০১১ খ্রি.), হাফেযুল হাদিস মুহাদ্দিস মওলানা বজল আহমদ, মুহাদ্দিস মওলানা আবদুল মালেক, মুফতি মওলানা এনামুল হক, মুহাদ্দিস মওলানা আবদুল মালিক, মুহাদ্দিস হাদিস আহমদ, মুফতি আবদুর রহমান, মুহাদ্দিস মওলানা কবির আহমদ (১৯৪৬–১৯৯৫ খ্রি.), মওলানা হাফেয আহমদ (১৯১১–২০১১ খ্রি.), মওলানা ওবায়দুল হক, মওলানা তফাজ্জল আহমদ, মওলানা ইয়াকুব, মওলানা ফজলুর রহমান প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

[দুই] বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা

১লা জানুয়ারি, ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সরকারি বিধি মোতাবেক অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ এবং ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মৃত্যু অবধি অবৈতনিকভাবে রেক্টর[৭৫] হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারি (রহ.) (৮১০–৮৭০ খ্রি.) সংকলিত *'সহিহ বুখারি'* ও ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযি (রহ.) (৮২১–৮৯২ খ্রি.) সংকলিত *'জামি' তিরমিযি'*সহ গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদির পাঠদান করতেন। মৃত্যুর আগেও তিনি কামিলের ছাত্রদের বুখারি শরিফের দার্‌স দিয়েছিলেন। অধ্যাপনার উক্ত হাদিস গ্রন্থদ্বয় নির্বাচিত করার

৭৪. চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে পাঁচলাইশ থানাধীন ওয়াজেদিয়ায় এ মাদ্‌রাসা অবস্থিত। চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ নিবাসী শাহ্ সুফি মওলানা ওয়াজেদ আলি খান ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসায় দাখিল, আলিম ও ফাযিল একসাথে সরকারি মঞ্জুরি লাভ করে। ১৯৫৫ ও ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে কামিল হাদিস ও ফিক্‌হের সরকারি মঞ্জুরি লাভ করে। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসা দাখিল, আলিম ও ফাযিল এবং ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কামিল (হাদিস)-এর স্থায়ী মঞ্জুরি লাভ করে। এটি বাংলাদেশের একক স্থায়ী মঞ্জুরিপ্রাপ্ত মাদ্‌রাসা। এ মাদ্‌রাসা থেকে বহু আলিম, মুহাদ্দিস, মুফতি, অধ্যক্ষ, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও পীর-আউলিয়া বের হয়ে দেশের সেবায় নিয়োজিত আছেন। দ্র. ড. আহসান সাইয়েদ, *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৭৫. কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, প্রশাসনিক দফতর বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে রেক্টর বলা হয়। দ্র. Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bangali Dictionary* (Dhaka : Bangla Academy, Sixth Reprint, 2012), p. 635

কারণ সম্পর্কে 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা'র তৎকালীন কৃতী ছাত্র, 'গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা'র প্রধান মুহাদ্দিস মওলানা আবদুল কাদের নিজামী (জন্ম ১৯৭৬ খ্রি.) বলেন,

> 'মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার সমকালীন মানুষের ধর্মীয় মনোভাব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি লক্ষ করে দেখলেন যে, মানুষ ফিক্‌হ তথা ইসলামি জীবন বিধানের যথার্থ অনুসরণ করা থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছে। তাই নিজের শিক্ষাদান কর্মসূচিকে তিনি এমন পদ্ধতিতে সাজিয়েছিলেন, যেন হাদিসের আলোকে ফিক্‌হের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং ফিক্‌হ যে মূলত হাদিসেরই সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত এ কথা প্রতীয়মান হয়। তাঁর দৃষ্টিতে মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধিচর্চার এ যুগে তাকলিদ তথা প্রশ্নাতীতভাবে ফিক্‌হের অনুসরণ ব্যতিরেকে ধর্মীয় শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব নয়। আর এ লক্ষ্যেই তিনি অধ্যাপনার জন্য সহিহ্ বুখারির পাশাপাশি জামি' তিরমিযিকেও মনোনীত করেছিলেন।'[৭৬]

অধিকন্তু, সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে জামি' তিরমিযির ব্যতিক্রমধর্মী মর্যাদা রয়েছে। তিরমিযি শরিফ গ্রন্থটি ফিক্‌হের অধ্যায় বিন্যাসের আলোকে বিন্যস্ত। ইমাম তিরমিযি (রহ.) প্রতিটি অনুচ্ছেদে যথাসম্ভব সকল ফকিহের মতামত, দলিল, ব্যাখ্যা ও ফত্‌ওয়া উল্লেখ করেছেন। হযরত শাহ্ আবদুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলবি (রহ.) (১৭৪৫–১৮২৩ খ্রি.) এর মতে জামি' তিরমিযি বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য গ্রন্থের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।[৭৭] জামি' তিরমিযির এ বৈশিষ্ট্য মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলনে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

এসময় যারা তাঁর সহকর্মী ছিলেন, তারা হলেন উপাধ্যক্ষ মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, শায়খুল হাদিস মওলানা নেছারুল হক, শায়খুল হাদিস মওলানা ফজলুল করিম, মুহাদ্দিস ফজলুর রহমান, মওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, হাফেয মওলানা মোস্তাক আহমদ, মওলানা নাঈমুল ইসলাম, মওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, মওলানা ফরহাত আলম, মওলানা আমীর উদ্দিন, মওলানা কারি সৈয়দ নূর, মওলানা কারি আবদুল হক, মওলানা কারি লোকমান, মওলানা হাফেয ইবরাহিম, মওলানা মুহাম্মদ কবির আহমদ প্রমুখ।[৭৮]

উল্লেখ্য, তাঁর জীবনী পর্যালোচনায় একটি বিষয়ে অপূর্ব মিল লক্ষ করা যায়। তা হলো, মাত্র ১৪ বছর (১৯৩৩–১৯৪৬ খ্রি.) বয়সে তিনি বায়'আত হন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তথা 'ইলমে শরি'আত জ্ঞানার্জনে ১৪ বছর (১৯৪০–১৯৫৩ খ্রি.) ব্যয় করেন। মুহাদ্দিস হিসেবে হাদিসের দর্‌স দেন ১৪ বছর (১৯৫৪–১৯৬৮ খ্রি.)। তাসাওউফ চর্চা তথা আধ্যাত্মিক সাধনা করেন ১৪ বছর (১৯৬৮–১৯৮১ খ্রি.)। 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা'র অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৪ বছর (১৯৮২–১৯৯৭ খ্রি.)। তাঁর জীবনে ১৪ এর কোনো প্রভাব ছিল কি না তা হয়তো একদিন প্রকাশ পাবে।

---

৭৬. ড. মওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাদের নিজামী, মুহাদ্দিস, গারাংগিয়া ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭৭. মুহাম্মদ তাকি উসমানি, *দরসে তিরমিযি* (করাচি : মাকতাবায়ে দারুল উলুম, ১৯৮৮), পৃ. ১৩৫-১৩৬

৭৮. মওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের, সহকারি অধ্যাপক (আরবি), বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

হাদিসের দার্স (পাঠ) দান পদ্ধতি

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকতেন। হাদিসের দরস দিতে যাওয়ার সময় তিনি অত্যন্ত পরিপাটি হয়ে যেতেন, কাপড়ে সুগন্ধি লাগাতেন এবং নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতেন:

১. প্রত্যেক বছর পাঠদানের শুরুতে তিনি রাসুলুল্লাহ্ (সা.) থেকে নিজ পর্যন্ত পূর্ণ সনদ[৭৯] পেশ করতেন।[৮০]

২. পাঠদানের সময় তিনি আসমাউর রিজাল (সনদে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের জীবনী বিষয়ক পর্যালোচনা) ও মতনের বিশ্লেষণ করতেন।

৩. তিনি মতন[৮১] থেকে বিভিন্ন মাসা'ইলের উদ্ভাবন ও প্রমাণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকতেন না; বরং আলোচ্য হাদিসের ভিত্তিতে সমকালীন প্রেক্ষাপট অনুসারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনযাত্রার পথনির্দেশ আলোচনা করতেন।

৪. তিনি যে কোনো দুর্বোধ্য বিষয় এত সহজ ও সরলভাবে উপস্থাপন করতেন যে, ছাত্ররা অনায়াসে তা বুঝে নিতে পারত। ফলে তারা শ্রেণিকক্ষেই পাঠ প্রস্তুত করতে সক্ষম হতো।

৫. তিনি সর্বদা অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা পরিহার করতেন। কিতাবের মূল 'ইবারত (মূল শব্দাবলি) ও এর মর্মবাণীর প্রতিই থাকত তাঁর গভীর মনোনিবেশ; ছাত্রদেরও তিনি এদিকেই মনোযোগী করে রাখতেন।

৬. তাঁর পাঠদানে ছাত্ররা একদিকে যেমন মূল কিতাব ও টীকা-টিপ্পনীর 'ইবারত হৃদয়ঙ্গম করতে পারত, অপরদিকে তেমনি জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখা সম্পর্কেও সম্যক ধারণা লাভ করতে পারত।

৭. মধ্যপন্থায় পাঠদান করে বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তিনি কিতাবের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনায়াসেই সমাপ্ত করতে পারতেন।

৮. তাঁর পড়ানোর পদ্ধতির প্রভাব ছাত্রদের ব্যাবহারিক জীবনে প্রতিফলিত হতো এবং তাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনের সাথে গভীর সম্পর্ক খুঁজে পেত।

৯. পাঠদানের মাঝে সহায়ক গ্রন্থের প্রসঙ্গ এলে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে উক্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থাকার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করতেন, যাতে ছাত্ররা সে সকল গ্রন্থ অধ্যয়নের ব্যাপারে আগ্রহী হয়।

---

৭৯. সনদ একবচন, বহুবচনে আসানিদ (أسانيد); শাব্দিক অর্থ বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা ও হাদিস বর্ণনার ক্রমধারা ইত্যাদি। দ্র. ড. হাশেম জামিল 'আবদুল্লাহ্, *আসারু 'ইলালিল হাদিস ফি ইখতিলাফিল ফুকাহা* (ইরাক : সাদ্দাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯), খ.১, পৃ. ৩৪; পরিভাষায়, হাদিসের মতনের পূর্বে বর্ণনাকারীদের ক্রমধারাকেই সনদ বলা হয়। দ্র. ড. মুহাম্মদ 'উজাজ আল-খতিব, *উলুমুল হাদিস* (বৈরুত : দারুল ফিক্হ, ২০০১), পৃ. ২২; ইব্‌ন হাজার, *নুযহাতুন নাযার ফি তাওহিদে নুখবাতিল ফিক্র* (ঢাকা : নাদিয়াতুল কুরআন, তা. বি.), পৃ. ০৬

৮০. উল্লেখ্য যে, সনদের উপস্থাপন হাদিস সংকলিত হওয়ার পূর্বে আবশ্যিক ছিল। সংকলিত হয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের বরাত দেয়াই যথেষ্ট। ধারাবাহিক সনদের উপস্থাপন জরুরি নয়। তবুও হাদিস বিশারদগণ পূর্বেকার নিয়মানুসারে সনদ সংরক্ষণ করাকে বরকতের কারণ মনে করে থাকেন। উপমহাদেশে হাদিসচর্চা সুলতান মাহমুদ গযনবির ভারত বিজয়ের পর থেকে শুরু হলেও এটি নিয়মতান্ত্রিকতা লাভ করে হযরত শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবি (রহ.)-এর যুগে। উপমহাদেশে তিনিই সর্বপ্রথম 'সিহাহ্ সিত্তা'র শিক্ষাদান করেন এবং অধ্যাপনার পূর্বে ধারাবাহিক সনদ বর্ণনার নিয়ম প্রবর্তন করেন। দ্র. সায়্যিদ মুফতি মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্‌সান, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস* (ঢাকা : কুতুবখানায়ে রশিদিয়া, ১৪১১), পৃ. ১৪৫

৮১. মতন একবচন, বহুবচনে مُتُوْنٌ، مِتَانٌ; শাব্দিক অর্থ পিঠ, পৃষ্ঠ, মূল পাঠ (text), মূল অংশ ইত্যাদি। পরিভাষায়, হাদিসের মূল বক্তব্যকে মতন বলা হয়। দ্র. জামাল উদ্দিন আল-কাসেমি, *কাওয়াইদুত তাহ্‌দিস মিন ফুনুনি মুসতালাহিল হাদিস* (বৈরুত : দারুল নাফায়েস, ২০০১), পৃ. ১৩২

১০. তাঁর পাঠদানের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ছাত্রদের হৃদয়ে নবি-রাসুল, সাহাবা কিরাম, সলফে সালিহীন (পূর্বসূরিগণ) ও আ'ইম্মায়ে মুজতাহিদিনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে পারতেন।

১১. তিনি ছাত্রদের প্রশ্ন মনোযোগের সাথে শুনতেন এবং প্রশ্ন করার জন্য তাদের উৎসাহ প্রদান করতেন। তারা কোনো ন্যায়সংগত আভিযোগ উত্থাপন করলে তিনি তা উড়িয়ে না দিয়ে খুশিমনে সেটি মেনে নিতেন। কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে ভালোভাবে তা জেনে নিয়ে পরে জানিয়ে দিতেন।

১২. ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি হাদিস পড়াতেন। তিনি হানাফি ফিক্‌হের প্রত্যেকটি মাস'আলা 'সিহাহ সিত্তার' হাদিস দ্বারা এমনভাবে প্রমাণ করতেন যে, শিক্ষার্থীদের মনে হতো যেন হানাফি ফিক্‌হই হাদিসের অধিক অনুকূলে অবস্থিত।[৮২]

তাঁর কীর্তিমান ছাত্রবৃন্দ

একজন শিক্ষকের পাণ্ডিত্য অনেকাংশে তাঁর ছাত্রদের পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে পরিচয় মেলে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর কতিপয় মেধাবী ছাত্রের পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হলো, যারা সমসাময়িক আলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারা হলেন,

'ছিপাতলী জামেয়া মুঈনীয়া কামিল মাদ্‌রাসা'র প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল মওলানা আজিজুল হক আল-কাদেরী (১৯৪০–২০১৯ খ্রি.), 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা'র সাবেক উপাধ্যক্ষ মওলানা ছগীর আহমদ উসমানী, শায়খুল হাদিস শেরে মিল্লাত মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী (১৯৪৩–২০২০ খ্রি.), 'ওয়াজেদীয়া কামিল মাদ্‌রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ মুফতি ইনামুল হক, সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা জিয়াউল হক খান (১৯৪৩–১৯৯২ খ্রি.), সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা আবদুস সত্তার আনওয়ারী (১৯৫১–২০১৪ খ্রি.), সাবেক মুহাদ্দিস মওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ মুফিজুল হক আল-কাদেরী (জন্ম ১৯৫৬ খ্রি.), 'আহ্‌ছানুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা'র সাবেক মুহাদ্দিস মুফতি আহমদ নজির, 'আশেকানে আউলিয়া মাদ্‌রাসা'র প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আল্লামা খায়রুল বশর হক্কানি, 'রাণীর হাট আল-আমিন হামেদিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা মুয়াজ্জম হোসেন চৌধুরী, 'নাঙ্গলমোড়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা হাফেয আবুল হায়াত, 'দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা আবু নছর মুহাম্মদ ছালাহউদ্দীন আল-ইমামী (১৯৩৯–২০১৮ খ্রি.)।

এছাড়া 'রাঙ্গুনীয়া আলমশাহপাড়া কামিল মাদ্‌রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা আ. ন. ম. শামসুল আলম চৌধুরি (জন্ম ১৯৫১ খ্রি.), সাবেক উপাধ্যক্ষ মওলানা জাফর আহমদ জাহানাবাদী, সাবেক মুহাদ্দিস মওলানা আবুল ওফা মুহাম্মদ হোসেন তৈয়ব (জন্ম ১৯৫২ খ্রি.), সাবেক মুফাস্‌সির মওলানা আ. ন. ম. নূরুন্নবী, 'কুমিল্লা হলারপার ওয়াজেদিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা ইউনুস, 'ফেনী আলিয়া মাদ্‌রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ হাফেয মওলানা মুবিনুল হক, 'মীর্জাপুর যয়নুল উলুম মোমেনিয়া আলিম মাদ্‌রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা শফিকুল আনোয়ার (জন্ম ১৯৪৫ খ্রি.), 'বাঁশখালী হামেদিয়া রহিমীয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা কবির আহমদ, 'শাহারবিল আনোয়ারুল উলুম কামিল

৮২. মওলানা আ. ন. ম. শামসুল আলম চৌধুরি, সাবেক অধ্যক্ষ, রাঙ্গুনীয়া আলমশাহ্‌পাড়া কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

মাদ্‌রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা জাকের উল্লাহ্, মুহাদ্দিস মওলানা শামসুল হক পাবনাবী, 'বায়তুশ শরফ কেন্দ্রীয় জামে' মসজিদে'র সাবেক খতিব মওলানা নূরুল ইসলাম (১৯৫৩–২০২০ খ্রি.), 'গারাংগিয়া কামিল মাদ্‌রাসা'র মুহাদ্দিস মওলানা আবদুল কাদের নেজামী (জন্ম ১৯৭৬ খ্রি.), 'খলিলুর রহমান কামিল মাদ্‌রাসা'র উপাধ্যক্ষ মওলানা আব্দুর রউফ (জন্ম ১৯৭৩ খ্রি.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর কীর্তিমান ছাত্রদের আরেকটি ধারা তরিকত তথা আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তারা মুরিদদের চরিত্র সংশোধন, আত্মার পরিশুদ্ধি ও সমাজসংস্কারে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। এদের মধ্যে ঢাকার সদরঘাট ও পটুয়াখালীর 'বদরপুর দরবার শরীফে'র পীর আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আবদুর রব চিশতী (মৃ. ২০১২ খ্রি.), 'রাঙ্গুনীয়া দরবার-এ বেতাগী আস্তানা শরীফে'র সাজ্জাদানশিন পীর মওলানা মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান আলী শাহ্ (১৯৩৩–২০০৯ খ্রি.), 'সাতকানিয়া মির্জাখীল দরবার শরীফে'র গদ্দিনশিন মওলানা মুহাম্মদ আরেফ বিল্লাহ্, 'বোয়ালখালী চরণদ্বীপ দরবার শরীফে'র পীর মওলানা জাফর আহমদ চরণদ্বীপী প্রমুখ।

পারিবারিক জীবন

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার যখন ২০ বছরের তাগড়া যুবক তখনই তাঁর মাতা তাকে বিবাহ দেন। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন আমিরাবাদ ইউনিয়নের মল্লিক সোবহান গ্রামের জনাব ঠাণ্ডা মিঞার কন্যা মোছাম্মৎ মনছুরা বেগমের সাথে ১০ই মার্চ, ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাতে মধ্যস্থতা করেন তাঁর মুর্শিদ শাহ্ সুফি মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) (১৯০৮–১৯৭১ খ্রি.)। 'আকদ পড়ান লোহাগাড়ার কলাউজান নিবাসী শায়খুল হাদিস মওলানা মাহমুদুল হক খতিবি[৮৩] (রহ.)।

পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা এবং আদর্শ গৃহকর্তা। পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ইসলামি আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন। তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত সুমধুর। কখনও তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোনো কলহ-বিবাদ হয়নি। স্ত্রীর কথাকে তিনি খুব মূল্যায়ন করতেন। গৃহস্থালি কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করতেন। পারিবারিক জীবনে তিনি তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যাসন্তানের জনক ছিলেন। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হলো:

সন্তানগণ

১. মওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী : তিনি শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তান। তিনি 'বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডে'র অধীনে সর্বোচ্চ ডিগ্রি তথা কামিল (হাদিস) সমাপ্ত করে ভারতের উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌর 'দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা'য় ভর্তি হয়ে

---

৮৩. মওলানা মাহমুদুল হক খতিবী (১৯০৭–১৯৮৬ খ্রি.) চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন কলাউজান ইউনিয়নের এক সম্ভ্রান্ত খতিব বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় ভর্তি হয়ে ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে উলা (ফাযিল) পাস করেন। অতঃপর 'কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা' থেকে টাইটেল (কামিল) পাস করেন। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে মায়নমারের (তৎকালীন বার্মা) রাজধানী ইয়াঙ্গুনের (রেঙ্গুন) বিখ্যাত আরকান জামে' মসজিদের খতিব ও মুফ্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে দেশে ফিরে এসে কিছুকাল চট্টগ্রামস্থ হাটহাজারী উপজেলার 'মেখল হামীউস্ সুন্নাহ মাদ্‌রাসা'য় শিক্ষকতা করেন। তারপর তিনি চট্টগ্রাম মহানগরীর আলকরণ জামে' মসজিদের খতিব হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন। দ্র. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসার অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯

'উলুমে শরি'আহ ওয়া উসুলুদ্দিন' বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে তিনি 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা'য় শিক্ষকতার পাশাপাশি ইসলামি সাহিত্যচর্চার প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি বহু গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেন। বর্তমানে তিনি 'বায়তুশ শরফ দরবারে'র রাহ্‌বারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

২. **হাফেয মুহাম্মদ আবদুর রহিম** : তিনি ১লা মে, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর নিজ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে 'চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা' সংলগ্ন 'দারুত তাহ্‌ফীজিল কুর'আন হেফজখানা' থেকে হেফ্‌য সমাপ্ত করেন।'কুমিরাঘোনা আখতারুল উলুম মাদ্‌রাসা'য় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা'য় ভর্তি হন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল পরীক্ষায় 'বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডে'র সম্মিলিত মেধাতালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে একটি মিছিলে অংশ নিয়ে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লাহ্ জেনারেল হাসপাতালের সামনে বোমার আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।[৮৪]

৩. **মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম** : তিনি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। তিনি স্বীয় পিত্রালয়ে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পিতামাতার কাছে এবং স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা' থেকে ১৯৯৯, ২০০১, ২০০৩ ও ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল পাশ করেন। তিনি মননশীল সাহিত্যানুরাগী। ছাত্রজীবনে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে তিনি ব্যক্তিগত ব্যাবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং দরবারের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন।[৮৫]

কন্যাগণ

১. **মোছাম্মৎ জাকেরা বেগম** : তিনি পিতা-মাতার প্রথম সন্তান এবং প্রথম মেয়ে। তিনি নিজ পিত্রালয়ে ১লা জানুয়ারি, ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতার কাছে তিনি কুর'আনুল কারিম শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় মক্তব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তাছাড়া পারিবারিকভাবে দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সূরা-কিরা'আত ও মাস'আলা-মাসা'য়িল আয়ত্ত করে নেন। চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন কুমিরাঘোনা (আখতরাবাদ) নিবাসী জনাব মওলানা আবদুর রশীদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশিষ্ট আলেমে দীন জনাব মওলানা নুরুল ইসলাম (১৯৫৩–২০২০ খ্রি.) প্রকাশ খতিব সাহেবের সাথে ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি একজন দীনদার-পরহেযগার রমণী এবং আদর্শ গৃহিণী। দাম্পত্য জীবনে তিনি দুই ছেলে ও পাঁচ মেয়ের জননী।

২. **মোছাম্মৎ তাহেরা বেগম** : পিতা-মাতার দ্বিতীয় সন্তান এবং মেয়ের দিক থেকে দ্বিতীয় মেয়ে। স্বীয় পিত্রালয়ে ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতার কাছে তিনি কুর'আনুল কারিম শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় মক্তব ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তাছাড়া পারিবারিকভাবে দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সূরা-কিরা'আত ও মাস'আলা-মাসা'য়িল আয়ত্ত করে নেন।

---

৮৪. মোহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রাহ. এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন আধুনগর নিবাসী জনাব মওলানা আবদুল আলিমের পুত্র ঐতিহ্যবাহী ‘চুনতি হাকিমিয়া কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা’র আরবি প্রভাষক বিশিষ্ট আলেমে দীন মওলানা আশরাফ আলী (১৯৫১–২০০৭ খ্রি.) এর সাথে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা রমণী এবং আদর্শ গৃহিণী। পারিবারিক জীবনে তিনি পাঁচ ছেলে ও দুই কন্যার জননী।

৩. **মোছাম্মৎ রাজিয়া বেগম :** পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান এবং তৃতীয় কন্যা। স্বীয় পিত্রালয়ে তিনি ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য বোনের ন্যায় নিজেদের পারিবারিক পরিসরে কুর’আনুল কারিম ও ফুরকানিয়া মক্তবের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ফেনীর মাস্টারপাড়া নিবাসী জনাব আনওয়ার উল্লাহ্ চৌধুরির পুত্র আনওয়ারুল আজিম আজাদের সাথে ১৯ই মার্চ, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ হয়। তিনি একজন দীনদার-পরহেযগার রমণী এবং আদর্শ গৃহিণী। পারিবারিক জীবনে তিনি এক পুত্র এবং এক কন্যার জননী।

৪. **মোছাম্মৎ রাবিয়া বেগম :** পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান এবং চতুর্থ কন্যা। স্বীয় পিত্রালয়ে তিনি ৬ই মে, ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য বোনের ন্যায় নিজেদের পারিবারিক পরিসরে কুর’আনুল কারিম ও ফুরকানিয়া মক্তবের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। মীরসরাই উপজেলার সুফিয়া মিঠাছড়া মওলানা মঞ্জিল নিবাসী মরহুম মওলানা নুরুল ইসলাম নিজামীর পুত্র মওলানা ফখরুল ইসলাম নিজামীর সাথে ৮ই মার্চ, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে বিবাহ হয়। তিনি একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা রমণী এবং আদর্শ গৃহিণী। পারিবারিক জীবনে তিনি তিন পুত্র এবং দুই কন্যার জননী।

৫. **মোছাম্মৎ রহিমা বেগম :** পিতা-মাতার সপ্তম সন্তান এবং পঞ্চম কন্যা। স্বীয় পিত্রালয়ে তিনি ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য বোনের ন্যায় নিজেদের পারিবারিক পরিসরে কুর’আনুল কারিম ও ফুরকানিয়া মক্তবের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সাতকানিয়া উপজেলার গারাঙ্গিয়ার হাতিয়ারকুল নিবাসী জনাব সিদ্দিক আহমদের পুত্র, বিশিষ্ট শিল্পপতি, মারসা ট্রান্সপোর্টের চেয়ারম্যান জনাব মর্তুজা সিদ্দিক চৌধুরীর সাথে ৩১শে জানুয়ারি, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বিবাহ হয়। তিনি একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা রমণী এবং আদর্শ গৃহিণী। দাম্পত্য জীবনে তিনি চার পুত্র এবং এক কন্যাসন্তানের জননী।

রাজনৈতিক চিন্তাধারা

ইসলাম আল্লাহ্ তা‘আলা মনোনীত ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ফরয। পবিত্র কুর’আনে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ অর্থাৎ ‘তোমরা দীন কায়েম করো। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।’[৮৬] ইসলামে রাজনীতির মূলসুর হলো সমাজসংস্কার ও মানবসেবা। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ছিলেন একজন যুগ সচেতন ইসলামি ব্যক্তিত্ব। আধ্যাত্মিক সাধনা ও চেতনাবোধে মানুষকে উদবুদ্ধ করে ইসলামি তাহযিব ও তামাদ্দুনের পথে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে ইসলামি সমাজব্যবস্থা[৮৭] গড়ার পদ্ধতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য তিনি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামি অনুশাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হিকমতের সাথে গঠনমূলক কর্মতৎপরতা

---

৮৬. আল-কুর’আন, ৪২ : ১৩

৮৭. ইসলামি রীতি-নীতি, আইন-কানুন ও বিধি-বিধান দ্বারা যে সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তা-ই ইসলামি সমাজব্যবস্থা। দ্র. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ* (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রশাসন, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১৫), পৃ. ২৩

চালিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের পূর্বে সামাজিক বিপ্লবের কাজ শুরু করেন। সামাজিক সংশোধন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। অধিকন্তু, ইসলামি আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করাকে তিনি ইসলামের অন্যতম সেবা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

> 'রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার কাজ আমাদের নবি (সা.) ও তাঁর খলিফাগণ করেছেন। তাছাড়া অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলা মানে আমাদের দেশের প্রচলিত রাজনীতি নয়; বরং ইসলামের খেদমত।'[৮৮]

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। তবে ইসলামি শাসনতন্ত্র কায়েম অন্দোলনে যারা বদ্ধপরিকর তিনি ছিলেন তাদের নিকটতম অভিভাবক। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে না জড়ালেও পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর পরোক্ষ সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাছাড়া পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭–১৯৭১) সংগঠিত ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি সক্রিয় কর্মী ছিলেন। মওলানা আতহার আলী (রহ.) (১৮৯১–১৯৭৬ খ্রি.), মওলানা মুসলেহ উদ্দীন (রহ.) ও খতিবে আ'জম মওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) (১৯০৩–১৯৮৭ খ্রি.) ছিলেন তাঁর রাজনৈতিক গুরু।[৮৯]

তাঁর বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। তিনি সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ইসলামি অর্থনীতি, দারিদ্র্য বিমোচন, অসহায়, বিধবা ও এতিমদের পুনর্বাসনসহ আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন পূর্ণমাত্রায়। তিনি 'বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' নামের অরাজনৈতিক ও মসজিদভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে সারা দেশে একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল মিশনারি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ সংগঠনের পরিচালনায় দশটি প্রকল্পের অধীনে মোট ৭৪৬টি কর্মসূচি বর্তমানেও চলমান রয়েছে।[৯০] তাঁর একনিষ্ঠতা ও এখলাছের বরকতে এর তালিকা দিন-দিন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। প্রখ্যাত কবি আবু ফিরাস আল-হামদানি (৯৩২–৯৬৮ খ্রি.) বলেন,

صَنَائِعُ فَاقَ صَانِعُهَا فَفَاقَتْ - وغَرْسٌ طَابَ غَارِسُهُ فَطَابَا
وكُنَّا كَالسِّهَامِ إِذَا أَصَابَتْ - مُرَامِيْهَا فَرَامِيْهَا أَصَابَا

> অর্থাৎ 'এ সব কারখানা শ্রেষ্ঠত্বের মহিমায় ভাস্বর; কারণ, কারখানাসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। যেহেতু চারাগাছগুলো যিনি বপন করেছেন তিনি ভালো লোক, তাই চারাগুলোও চমৎকার হয়েছে; যেন তিরগুলো লক্ষ্য ভেদ করল। সুতরাং, বলতে হয়, তিরন্দাজ নিশ্চয়ই সঠিক ছিলেন।'[৯১]

---

৮৮. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, 'বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.)-এর পবিত্র জীবনধারা, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

৯০. নজরুল ইসলাম, *দৈনিক সাঙ্গু*, ৫ম বর্ষ, ২৯৫ সংখ্যা, ২২ এপ্রিল, ২০১৬, পৃ. ০৮

৯১. উদ্ধৃত : আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, *আমার জীবন কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর বিচরণ

দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার পদচারণা লক্ষণীয়। তিনি বেশ ক'টি আন্তর্জাতিক সেমিনার ও বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাতে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। ১১ই নভেম্বর, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক সফর করেন। সেখানে 'Thai Women Foundation of Thailand' কর্তৃক আয়োজিত 'Development of Muslim Women Education' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। তাতে তিনি প্রবন্ধও উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ইসলামে নারীর সামাজিক মর্যাদা এবং নারীশিক্ষার প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত চমৎকারভাবে তুলে ধরেন।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার আন্তর্জাতিক সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০ই ডিসেম্বর ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থান করেন। তাতে সকাল-বিকাল-সন্ধ্যায় বিভিন্ন ওয়ায মাহফিল ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মূল্যবান ওয়ায-নসিহত শুনে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে কয়েকটি যিকির মাহফিলে তা'লিম প্রদান করেন। ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনে অবস্থান করেন। সেখানে তিনি দু'টি মসজিদ ও একটি ইসলামিক সেন্টার উদ্‌বোধন করেন। বেশ কয়েকটি ঘরোয়া মাহফিলে বক্তব্য প্রদান করেন। সে সময় 'আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ লন্ডন শাখা' গঠিত হয়। উচ্চশিক্ষিত বেশ কিছু লোক তাঁর হাতে বায়'আত হন।

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, ডেট্রয়িট, মিশিগান, ফ্লোরিডা, ওয়াশিংটন প্রভৃতি জায়গায় সফর করেন। সেখানে অনুষ্ঠিত কয়েকটি ধর্মীয় মাহফিল সার্থকভাবে সম্পন্ন করেন। 'বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদে'র শাখাও গঠন করা হয়। ১৩ই জানুয়ারি, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সময় রাত দশটায় 'Voice of America' থেকে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ও তাঁর সফরসঙ্গীদের একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। তাতে তারা 'বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশে'র বহুমুখী কার্যক্রম এবং মানবসেবায় এ সংগঠনের অবদান সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন।[৯২] এ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তিনি বায়তুশ শরফকে একটি আন্তর্জাতিক মানের সংগঠন হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচয় করিয়ে দেন।

আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎ

দেশ-বিদেশে অনেক আন্তর্জাতিক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেন। তন্মধ্যে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামি স্কলার, প্রখ্যাত লেখক ও নন্দিত বক্তা সৈয়দ আবুল হাসান আলি নদ্‌ভি,[৯৩] সৈয়দ সালমান

---

৯২. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) : জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০; মুহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রহ.-এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩

৯৩. আবুল হাসান আলি নদ্‌ভি জগদ্‌বিখ্যাত আলেমে দীন, সংগ্রামী সাধক ও বিশিষ্ট আরবি সাহিত্যিক আবুল হাসান আলি নদবি ৫ই ডিসেম্বর ১৯১৪ খ্রি. ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলিতে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনের সব স্তর তিনি কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করে। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে লখনউ নদওয়াতুল 'উলামার মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্বপালনের পাশাপাশি তিনি ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের অসংখ্য শিক্ষা, সাহিত্য ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। দুইশতাধিক গ্রন্থপ্রণেতা আল্লামা নদবির ৩ খণ্ডে প্রকাশিত আত্মজীবনী *'কারওয়ানে যিন্দেগি'* এখন গোটা মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত। তিনি একাধারে আধ্যাত্মিক নেতা, উচ্চপর্যায়ের চিন্তাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক ও আন্তর্জাতিক মানের সংগঠক

হোসাইনি নদ্‌ভি,[৯৪] ফিলিস্তিনের সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত,[৯৫] কা'বাশরিফের ইমাম ড. শেখ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল আজিজ আস-সুদাইস,[৯৬] মসজিদে নববির ইমাম ড. শেখ আলি বিন আবদুর রহমান আল-হুযাইফি,[৯৭] ভারতের প্রখ্যাত ধর্মগুরু নওমুসলিম ড. ইসলামুল হক,[৯৮] ইংল্যান্ডের

হিসেবে সমকালীন বিশ্বে অভূতপূর্ব স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৯৪ খ্রি. দুবার বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় তিনি বায়তুশ শরফেও আগমন করেন। এ মহান গুণী ব্যক্তিত্ব ১৯৯৯ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান, *আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) : জীবন ও কর্ম* (ঢাকা : আল-ইরফান পাবলিকেশান্স, ২০০২), পৃ. ৪৮-৪৪৮

৯৪. সৈয়দ সালমান হোসাইনি নদ্‌ভি ভারতের উত্তর প্রদেশের লখনউ শহরে ১৯৫৪ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় 'দারুল উলুম নদওয়াতুল 'উলুম মাদ্‌রাসা'য়। অল্প সময়ে তিনি পবিত্র কুর'আন মুখস্থ করেন। অতঃপর সেখান থেকেই 'উলুমে শরি'আত ও 'উসুলে দীন বিষয়ে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এবং 'উলুমে হাদিস বিষয়ে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮০ খ্রি. তিনি 'ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে 'উলুমুদ দীন বিভাগ থেকে হাদিস বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তিনি 'দারুল 'উলুম নদওয়াতুল 'উলুম মাদ্‌রাসা'র দা'ওয়া বিভাগের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি জীবনঘনিষ্ঠ বিষয় নিয়ে আরবি ও উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থরচনা করেন। বর্তমান তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলামের একজন নিবিষ্ট দা'ঈ হিসেবে সমধিক পরিচিত। দ্র. https://wikigbn.icu/wiki/Salman_Husaini_Nadwi, Visited on : 25.02.2022

৯৫. ইয়াসির আরাফাত মিসরের রাজধানী কায়রোতে ২৪ই আগস্ট, ১৯২৯ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম মুহাম্মদ ইয়াসির আবদুর রহমান আবদুর রউফ আরাফাত আল-কুদওয়া আল-হুসাইনি। তবে তিনি 'ইয়াসির আরাফাত' নামে সমধিক পরিচিত। তিনি Palestine Liberation Organisation (PLO) চেয়ারম্যান হিসেবে ইসরাইলি দখলদারির বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেন। জীবনের শেষভাগে তিনি ইসরাইলের সাথে কয়েক দফা শান্তি আলোচনার মাধ্যমে কয়েক দশক ধরে চলমান সংঘাতের অবসান ঘটানোর প্রয়াস নেন। ফলে ১৯৯৪ খ্রি. তাঁকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১১ই নভেম্বর, ২০০৪ খ্রি. প্যারিসে চিকিৎসারত অবস্থায় ৭৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। দ্র. https://bn.wikipedia.org/wiki/ইয়াসির_আরাফাত, Visited on : 01,03.2021

৯৬. ড. শেখ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল আজিজ আস-সুদাইস সৌদি আরবের আল-কাসিম এলাকার বুকাইরিয়া শহরে ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। বারো বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুর'আনের হিফ্‌য সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৮৭ খ্রি. উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরি'আ ফ্যাকাল্টির অধীনে মাস্টার্স এবং ১৯৯৫ খ্রি. পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৮৩ খ্রি. থেকে কা'বাশরিফের প্রধান ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি 'উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে' অধ্যাপনা ও শরি'আহ্ কোর্টের বিচারপতির দায়িত্বও পালন করছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা নয়টি। আরও ছয়টি গ্রন্থ ও গবেষণাপত্র প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি মুসলিম জাতির ধর্মীয় রাহবার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সুললিত ও আবেগঘন কণ্ঠে পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াতের জন্য মুসলিম বিশ্বের কাছে তিনি সমধিক পরিচিত। দ্র. https://barta24.com/details/islam/86843/haram-imam-in-the-mosque, Visited on : 03,01.2021

৯৭. ড. শেখ আলি বিন আবদুর রহমান আল-হুযাইফি মক্কাতুল মুকার্‌রমার দক্ষিণাঞ্চলিয় এলাকার কারনুল মুস্তাকিম গ্রামে ২২ই মে, ১৯৪৭ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। শায়খ মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম হুযাইফির কাছে পবিত্র কুর'আনের হিফয সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৬১ খ্রি. ইসলামিক স্কুলে ভর্তি হন। এরপর মা'আহদুল 'ইলমিতে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন। ১৯৭২ খ্রি. রিয়াদস্থ 'ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে'র শরি'আ অনুষদ থেকে ফিকহশাস্ত্রে বি. এ. (অনার্স), ১৯৭৫ খ্রি. মিশরের 'আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে'র ইসলামি আইনের ওপর মাস্টার্স এবং পরবর্তীকালে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭৭ খ্রি. তিনি 'মদিনা ইসলামি বিশ্বদ্যিালয়ে'র শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৭৯ খ্রি. মসজিদে নববির প্রধান ইমাম পদে নিযুক্ত হয়ে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ও মসজিদে নববির ইমাম-খতিবের দায়িত্বের পাশাপাশি তিনি আরও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। দ্র. https://www.banglanews24.com/islam/news/bd/746921.details, Visited on : 02,05.2021

৯৮. ড. ইসলামুল হক (ড. শিবশক্তি স্বরূপজি) উত্তর ভারতের মথুরা জেলার বৃন্দাবনে ১৯৩৬ খ্রি. ঐতিহ্যবাহী মহন্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল ড. শিবশক্তি স্বরূপজি; মহারাজ উদাসেন নামেও পরিচতি ছিলেন। পিতা প্রিতমদাস উদাসেন এবং মা ভানুমতি কর। পিতার আশ্রমেই তিনি প্রাথিমিক শিক্ষাজীবন শুরু করেন। পরে 'এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে অরিয়ান্টালিজম এ মাস্টার্স করেন। গুরু কুল কাংড়ি থেকে 'আচারিয়া' পদবি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে বিশ্বের দশটি প্রধান ধর্মের ওপর ডক্টরেট অব ডিভাইটিটি এবং অরিয়ান্টালিজমের ওপর আরেকটি

নওমুসলিম ইউসুফ ইসলাম[৯৯] এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রখ্যাত ইসলামি স্কলার শেখ আহমদ হোসেন দীদাত[১০০] প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১০১]

স্বীকৃতি ও পরস্কার লাভ

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার পুরোজীবন মানবকল্যাণে উৎসর্গ করে গেছেন। শিক্ষা, মানবসেবা ও সুফিবাদের বিকাশে অহর্নিশ কাজ করেছেন। এসব কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তা'আলার

পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। পৃথিবীর বারোটি ভাষায় তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ছিলেন ভারতের বিখ্যাত হিন্দু পণ্ডিত। তাঁর প্রধান পেশা ছিল মহন্তগিরি। ভারতের বিভিন্ন শহরে তাঁর বেশ কয়েকটি আশ্রম ছিল। তিনি জানুয়ারি, ১৯৮৪ খ্রি. স্বপ্নে রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে কালিমাতুশ শাহাদত পাঠ করেন। পরবর্তীকালে ১০ই মে, ১৯৮৪ খ্রি. তিনি সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম ইসলামুল হক, স্ত্রীর নাম খাদিজা হক (শ্রীমতী শ্রদ্ধা দেবী) এবং মেয়ের নাম আয়েশা হক (শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী) রাখা হয়। দ্র. আবদুল হালীম খাঁ, *আধুনিক বিশ্বের একশত সেরা নওমুসলিম কীভাবে মুসলমান হলেন?* (ঢাকা : রিমঝিম প্রকামনী, ২০১৭), খ.১, পৃ. ১৫-৩৬

৯৯. ইউসুফ ইসলাম ইংল্যন্ডের ম্যারিলেবনে ২১ই জুলাই, ১৯৪৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মনাম ছিল স্টিভেন দিমিত্রি জর্জিও। পিতা Stavros Georgiou (গ্রিক) এবং মাতা Ingrid Wickman (সুইডিস)। পড়ালেখার শুরু রোমান ক্যাথলিক প্রাইমারি স্কুলে। ১৬ বছর বয়সে আর্টস থেকে 'এ' গ্রেড পেয়ে ১৯৬৬ খ্রি. Hammersmith Art Colleges-এ ভর্তি হন। ১৮ বছর বয়সে তাঁর হিট গান 'আই লাভ মাই ডগ' এর মধ্য দিয়ে পপ সংগীতাঙ্গনে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ হয়। তারপর থেকেই একের পর এক হিট অ্যালবাম বের হতে থাকে। একাধিকবার শ্রেষ্ঠ গায়ক ও গীতিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন পপ সংগীতের এক বহুলআলোচিত ব্যক্তিত্ব। গানের জগতে তিনি Cat Stevens নামে পরিচিতি। ডিসেম্বর, ১৯৭৯ খ্রি. তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নতুন নাম গ্রহণ করেন ইউসুফ ইসলাম। আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও এ সময় সংগীত জগৎ থেকে সরে দাঁড়ান তিনি এবং পুরোপুরি ব্রতী হন সমাজসেবায়; বিশেষ করে দরিদ্র মুসলিম শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেন তিনি। ১৯৮১ খ্রি. লন্ডনে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইসলামিয়া প্রাইমারি স্কুল'। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবিক ও সামাজিক সংগঠনের সাথে কাজ করেন তিনি। দ্র. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৯ আগস্ট, ১৯৯৯, পৃ. ৪

১০০. আহমদ হোসেন দিদাত ভারতের গুজরাট প্রদেশের সুরাট জেলায় ১লা জুলাই, ১৯১৮ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। নয় বছর বয়সে পিতার সাথে আফ্রিকায় পাড়ি জমান। সেখানে একটি স্কুলে ভর্তি হয়ে মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে জীবিকার তাগিদে মাত্র পনেরো বছর বয়সে খ্রিষ্টান মিশনারি কার্যালয়ের পাশে এক মুসলিম মালিকের ফার্নিচারের দোকানে চাকুরি নেন। ট্রেইনি খ্রিষ্টান মিশনারিরা প্রায়ই তার দোকানে আসত এবং বিভিন্ন সময় ইসলাম ও রাসুলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে ব্যঙ্গার্থক মন্তব্য করত। এদের অপপ্রচারের মোকাবেলা করার জন্যই মূলত তিনি তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফলে রহমতুল্লাহ্ কিরানবির লিখিত ইযহারুল হক (সত্যের প্রকাশ), বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে থাকেন। ১৯৪২ খ্রি. মাত্র পনেরো জন দর্শকের সামনে ডারবান মুভি থিয়েটার হলে 'Mohammad (S) : The Messenger of Peace' শিরোনামে প্রথম লেকচার প্রদান করেন। ১৯৫৭ খ্রি. তাঁর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে নিয়ে Islamic Propagation Centre (IPC) নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে ১৯৫৮ খ্রি. একজন মুসলিম দাতার অর্থানুকুল্যে As-Salaam Educational Instute নামে আরেকটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এখান থেকে তাঁর লেখা ২০টি গ্রন্থের লক্ষ-লক্ষ কপি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে সারা পৃথিবীতে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ইসলামের দা'ওয়াতি কাজে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৮৬ খ্রি. 'কিং ফয়সাল অ্যাওয়ার্ডে' ভূষিত হন। তিনি সৌদিআরব, পাকিস্তান, মালদ্বীপ, সুইডেন, ডেনমার্ক, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ অসংখ্য দেশ সফর করে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং বিভিন্ন খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের সাথে বিতর্কে অংশ নেন। এ মহান ধর্মপ্রচারক ৮ আগস্ট, ২০০৫ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। দ্র. Ahmad Deear, *CHOICE ISLAM AND CHRISTIANITY* (New Delhi: Isamic Book Service (P.) Ltd, 14th Print, 2014), pp. 04

১০১. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, 'শাহ্সুফী মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর জীবনপঞ্জী', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর সাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪

সন্তুষ্টি। তথাপি পার্থিব রীতি-নীতি অনুসারে এসব সৎকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সেবামূলক সংগঠনের পক্ষ থেকে পেয়েছেন স্বীকৃতি ও বিরল সম্মাননা, যেমন : সমাজসেবা ও মানবকল্যাণে অসামান্য অবদান রাখার জন্য নিউইয়র্কে অবস্থিত 'চট্টগ্রাম অ্যাসোসিয়েশন' এর পক্ষ থেকে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিভাগীয় 'সমাজকল্যাণ ফেডারেশন' ও 'চট্টগ্রাম সমাজ কল্যাণ পরিষদ' এর পক্ষ থেকে তাঁকে '*স্বর্ণপদক*'-এ ভূষিত করা হয়।

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে 'দায়েমী কমপ্লেক্স ঢাক'া কর্তৃক জাতীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় নীতিমালাকে বাস্তবায়ন, প্রচার ও পুনর্জাগরণের জন্য মসজিদ প্রতিষ্ঠা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় তাঁকে '*দায়েমী কমপ্লেক্সের ধর্মীয় পুরস্কার*' প্রদান করা হয়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও মানবকল্যাণে বিশেষ অবদান রাখায় '*কারেন্ট নিউজ পদক*' মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। ২৬শে ডিসেম্বর, ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামের আলোকে সমাজসেবা ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য 'ইসলামি সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম' কর্তৃক 'মরণোত্তর সংবর্ধনা, 'গোল্ডেন ক্রেস্ট' ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। ২২শে অক্টোবর, ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে 'বাংলাদেশ কুর'আন শিক্ষা সোসাইটি' দীনি 'ইল্ম সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য 'কুর'আন শিক্ষা সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড' ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

২৮শে মার্চ, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে'র প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধান ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ 'মরণোত্তর সম্মাননা ও গোল্ডেন ক্রেস্ট' প্রদান করা হয়।[১০২] জাতিধর্মনির্বিশেষে বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিদের জীবনালেখ্য প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান American Biographical Institute এর মহাপরিচালক জে. এম. ইভান্স তাঁর *International Directory of Distinguished Leadership* গ্রন্থে (৮ম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.) তাঁর জীবনী ও অবদান স্থান দিয়েছেন এবং তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেছেন।[১০৩] বাংলাদেশে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় লিখিত নির্ভরযোগ্য তথ্যকোষ তথা *ইসলামী বিশ্বকোষে*ও (২৬শ খণ্ড, ২০০০ খ্রি., পৃ. ২৮৫-২৮৬) তাঁর জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১০৪] মওলানা সুলতান হোছাইন কাশেফী (রহ.) বলেছেন,

ہر کہ با خلاص قدم میزند- عیسےٰ نے کیا خوب وقیمت کہ دم میزند

অর্থাৎ 'যে কেউ নিঃস্বার্থভাবে দীনি কর্মে পদচালনা করেন, তিনি ঐ সময়ের ঈসা (আ.) এর মতো মর্যাদাশীল হন।'[১০৫]

হজে গমন ও বিদেশ সফর

---

১০২. সম্পাদক, 'হুজুর কেবলার ইন্তেকালে প্রদত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠনের শোকবাণী', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, মে ২০০২, তেইশ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃ. ৩৪; মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের আয়না* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ২০১১), পৃ. ৫৫-৫৬

১০৩. রায়হান আজাদ, *চট্টগ্রামের একশ মুসলিম মনীষা*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ৮৪

১০৪. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, 'ইসলামী বিশ্বকোষে শাহ্ সুফি হযরত মওলানা আবদুল জব্বার ছাহেবের জীবনী অন্তর্ভক্ত', *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১০৫. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *আল-আছরার*(চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৫), পৃ. ৩৮

শৈশবকাল হতেই মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের চাল-চলন ও আচার-আচরণের প্রভাবে তাকওয়া পরহেযগারির একটা আভা তাঁর চেহারায় স্ফুরিত হয়ে উঠেছিল। ধাপে ধাপে বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর আবেগ-অনুভূতিরও পরিবর্তন ঘটেছিল। সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁর অনুভূতিতে জোশ সৃষ্টি করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের যে কোনো উপকরণ আয়ত্ত করার জন্য তিনি ছোটোবেলা হতেই উদ্‌গ্রীব থাকতেন। পবিত্র কা'বা, মক্কা ও মদিনা শরিফ এবং আরব-আজমের পবিত্র স্থানসমূহ যিয়ারতের জন্য বাল্যকাল হতেই তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়।

তারই অংশ হিসেবে তিনি জীবনে ৩৩ বার হজ ও বহুবার 'উমরাহ্ পালন উপলক্ষ্যে মক্কায়ে মুয়াজ্জমা এবং মদিনা মুনাওয়ারায় সফর করেন। এছাড়া তিনি দীনের দা'ওয়াত দিতে এবং ভক্ত-অনুরক্তদের আমন্ত্রণে কুয়েত, কাতার, ওমান, আরব আমিরাত, ইরাক, পাকিস্তান, ভারত, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, জর্ডান, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, বুলগেরিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সফর করেন। তিনি বহু নবি-রাসুলের করব যিয়ারত করেন। উপমহাদেশের অসংখ্য ওলির[১০৬] মাযার যিয়ারতেও তিনি ধন্য হয়েছেন।[১০৭]

তাঁর উপদেশমূলক বাণী

মনীষীদের প্রতিটি কথাই মণিমুক্তার মতো মূল্যবান। এতে রয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য পথ চলার পথ নির্দেশনা। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এগুলোকে 'জ্ঞানীদের হারানো সম্পদ' বলে অভিহিত করেছেন। যেখানে বা যার নিকট এই প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা পাওয়া যাবে তা কুড়িয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

> অর্থাৎ 'জ্ঞানের কথা জ্ঞানী লোকের হারানো সম্পদ। কাজেই যেখানে বা যার নিকট এই জ্ঞান পাবে; সে তার অধিক (উত্তরাধিকারী) হকদার।'[১০৮]

মওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর কর্মবহুল বাস্তব জীবনে চলমান ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে তাঁর বহু প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতি বাক্য ও উপদেশমূলক বাণী রয়েছে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উপদেশমূলক বাণী উল্লেখ করা হলো:[১০৯]

---

১০৬. ওলি শব্দটি আরবি একবচন, বহুবচনে আউলিয়া (أَوْلِيَاءٌ); এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, نَاصِرٌ (সাহায্যকারী), مُحِبٌّ (প্রেমিক), مُطِيْعٌ (অনুগত), جَارٌ (প্রতিবেশী), مُتَوَلِّيٌ (অভিভাবক)। দ্র. ইবন মনযুর, *লিসানুল আরব*, পূর্বোক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৪০৬ ; ইবরাহিম মাদকুর, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫৮; তবে এখানে ওলি বলে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাহ্কে বোঝানো হয়েছে; যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ অর্থাৎ 'তিনি (আল্লাহ্) সৎকর্মশীলদের বন্ধু বানিয়ে নেন।' দ্র. আল-কুরআন, ৭ : ১৯৬; আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফ্‌তাযানি (রহ.) বলেন, الولى هو العارف بالله وصفاته المواظف على الطاعات المجتنب عن المعاصى المعرض عن الانهماك في الذات والشهوات অর্থাৎ 'ওলি মানুষের মধ্যে এমন গুণাবলি সম্পন্ন ব্যক্তিকে বলে, যিনি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র যাত ও সিফাত সম্পর্কে যথাসাধ্য অবহিত, যিনি সর্বপ্রকারের নেক 'আমল নিয়মিত সম্পাদনকারী, সর্বপ্রকারের গুনাহ থেকে মুক্ত এবং জাগতিক আমোদ-ফুর্তি ও ভোগবিলাসে মগ্নতা থেকে বিরত।' দ্র. সা'দ উদ্দিন তাফতাযানি, মওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ও অন্যান্য অনূদিত, *শরহে আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ* (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ১৩৭

১০৭. রায়হান আজাদ, *চট্টগ্রামের একশ মুসলিম মনীষা*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ৮৩

১০৮. আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, বাবুন মা জাআ ফি ফযলিল ফিক্‌হি 'আলাল 'ইবাদাতি, হাদিস নং ২৬১১, পৃ. ৩০১; আবু 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, বাবুন আল-হিকমাতু, হাদিস নং ৪১৫৯, পৃ. ২০৫

১০৯. আলহাজ্ব মাওলানা আবু ইউসুফ চৌধুরী সংকলিত, *বায়তুশ শরফের পীর ছাহেবানের অমর বাণী* (চট্টগ্রাম : মাসিক দ্বীন দুনিয়া প্রকাশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৮), পৃ. ১৬-৪১; মওলানা শব্বির আহমদ, *আধুনিক তাজভীদুল কোরআন* (চট্টগ্রাম : চতুর্থ সংস্করণ, ১ নভেম্বর, ২০১৪), পৃ. ১৫১

১. হায়াত এক। দুনিয়াদারির সাথে সাথে আখিরাতের কাজও করতে হবে। একই দিনের ভিতরে দীন ও দুনিয়ার উভয় কাজ সমাধান করতে হবে।

২. যিকির-আযকারের তা'লিম ও আত্মিক পরিশুদ্ধি আমার দায়িত্ব; অনুরূপ সমাজ সংশোধনের জন্য চেষ্টা চালানোও আমার কর্তব্য।

৩. কোনো নেতা বা উপনেতার অভিমত (ফতওয়া[১১০]) আমাদের জন্য দলিল নয়; আমাদের জন্য দলিল হলো কুর'আন-সুন্নাহ্।

৪. মুসলিমগণের আল্লাহ্ এক, রাসুল এক, কা'বা এক, কুর'আনও এক; সুতরাং দলাদলি না করে সবাইকে ইসলাম ও নিজেদের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায়, ইসলামের দুশমনরা সুযোগ নিয়ে ইসলাম, মুসলিম ও মুসলিম দেশসমূহের ওপর আঘাত হানবে।

৫. যারা হক্কানি পীর-বুযুর্গ তাদের কর্মতৎপরতা শুধু ওযিফার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং দেশ, সমাজ ও জনগণের কল্যাণে তাদের সমগ্র জীবন উৎসর্গিত হয়ে থাকে।

৬. পীর-মুর্শিদের ওপর গভীর ভক্তি-বিশ্বাস ও ভালোবাসা থাকতে হবে। তাঁর আদেশ উপদেশসমূহ ভক্তিসহকারে অনুসরণ-অনুকরণ করতে হবে। সবসময় আদব-কায়দার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তা হলেই সাফল্য অর্জিত হবে।

৭. তেল ফুরিয়ে গেলে যেমন বাতির আলো নিভে যায়, তেমনি 'ইবাদত-বন্দিগি না করলে ঈমানের বাতি নিভে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

৮. পীর-মুর্শিদের দামান (অঞ্জলি) শক্ত করে ও ভক্তির সাথে ধরে না থাকলে নফসের ষড়যন্ত্র, ধোঁকা ও মন্দ হতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব।

৯. রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনার কাজ আমাদের প্রিয় নবি (সা.) ও তাঁর প্রিয় খলিফাগণ করেছেন। তাছাড়া অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলা মানে আমাদের দেশের প্রচলিত রাজনীতি নয়; বরং ইসলামের খিদমত।

১০. তোমরা যিকির মাহফিলে অংশগ্রহণ করে যিকিরের অভ্যাস গড়ে তোলো, যাতে তোমাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নাম অঙ্কিত হয়ে যায়।

১১. প্রত্যেক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়; কিন্তু সব শিক্ষার্থী মানুষ হয় না, শিক্ষিত হয় না, ডিগ্রি লাভ করে না; বেশিরভাগই সাফল্য অর্জন করে না। তদ্রূপ, প্রত্যেক কামিল পীর-বুযুর্গের দরবারে অনেক লোক আসা-যাওয়া করে ও বায়'আত মুরিদ হয়; কিন্তু সকল মুরিদ সাফল্য অর্জন করে না। অনেকেই অকৃতকার্য হয়। খুব কমসংখ্যক মুরিদ মঞ্জিলে মকছুদে পৌঁছায়।

---

১১০. ফাতওয়া আরবি শব্দ; ধর্মীয় আইন বিশেষজ্ঞ অথবা মুফতি (Juris Consult) কর্তৃক প্রদত্ত বা প্রকাশিত বিধান। এর উদ্দেশ্য একজন বিচারক বা একজন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দান। যখন একজন মুফতি ফিক্হ সাহিত্যে তাঁর বিশদ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কোনো সংকটপূর্ণ সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হন তখন তাঁর অনুরোধে ফকিহগণ (ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ) কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সমস্যাটির সমাধানের জন্য ইজতিহাদ (সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা) পরিচালনা করেন ও সর্বসম্মতিক্রমে (ইজমা) একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং প্রয়োজনে পূর্ব সিদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে যুক্তি ও সাদৃশ্য (কিয়াস)-ভিত্তিক সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেন। এধরনের সিদ্ধান্তগুলোই 'ফাতওয়া'। এগুলো মাস'আলা নামেও অভিহিত হয়; তবে সব মাস'আলা 'ফাতওয়া' নয়। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১৪, পৃ. ৫৫৪

১২. যে তরিকত শরি'আহ্ ভিত্তিক নয় তা হচ্ছে খোসাবিহীন কলাতুল্য। এর কোনো মূল্য নেই। কেউ তা ক্রয় করবে না।

১৩. মানুষ মানুষের নিকট মোহতাজি করা ও হাত পাতা লজ্জাজনক; কিন্তু রব্বুল আলামিনের নিকট হাত পাতা, মোহতাজি করা ও অনুনয়-বিনয় করা সম্মানজনক ও উত্তম।

১৪. তোমরা দুনিয়াকে বেশি দাম দিচ্ছ অথচ আখেরাতের দাম বেশি ও তা স্থায়ী; দুনিয়া অস্থায়ী।

১৫. তরিকত অবলম্বন করা ও পীর ধরার আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। পীর-মুর্শিদ রাস্তা দেখিয়ে দেন। পীর-মুর্শিদের কথামতো চললে ও আদেশ-উপদেশ মেনে চললে এবং তাঁর খেদমত করলে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ হয়।

১৬. যে কাজের মাধ্যমে সহজেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রেম ও ভালোবাসা লাভ করা যায় তা হলো যিকির। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা।

১৭. শরি'আতের মাধ্যমে আমরা বাহ্যিক কাজকর্ম করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি; আর 'ইলমে মা'রিফতের মাধ্যমে মানবিক উৎকর্ষ সাধনের নির্দেশ লাভ করেছি।

ইন্তিকাল

মুর্শিদের নিকট থেকে খিলাফত লাভের পর থেকে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) দীর্ঘ ২৭ বছর সমাজসংস্কার ও মানুষের আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য সময় ব্যয় করেছেন। জীবনে বিশ্রামের অবকাশ তিনি পাননি। মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে তাঁর শরীরে দেখা দেয় ডায়াবেটিস, চক্ষুরোগ, উচ্চরক্তচাপ এবং হৃদ্‌রোগসহ নানান জটিল রোগ।[১১১] ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে 'আখতরাবাদ ইছালে ছাওয়াবের মাহফিলে' প্রায় ৩ ঘণ্টা মুসলিমগণের আত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছেন। যিকির ও তাহাজ্জুদ নামাযে অংশ নিয়েছেন। ফজর নামাযের পূর্বে লাঠিতে ভর দিয়ে উপস্থিত হাজার-হাজার মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাহাজ্জুদ নামায পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ জনতাকে সাথে নিয়ে মুনাজাত পরিচালনা করেছেন।[১১২] এই মাহফিলের পরপরই তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়।

২৪শে মার্চ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ থাকা সত্ত্বেও দৈনন্দিন কার্যক্রমে শিথিলতা তিনি দেখাননি; সকালে কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে সহিহ বুখারি শরিফ দ্বিতীয় পারার কিতাবুদ্ দা'ওয়াত এর পুরো বাব (অধ্যায়) তাকরির (পাঠদান) করেন।[১১৩] যোহরের নামাযের পর দাখিল পরীক্ষার্থীদের দু'আর মাহফিলে পথ নির্দেশনামূলক উপদেশ দিয়ে অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সোপর্দ করেন। সকালে কামিল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বলেছিলেন, 'আজ তোমাদের ডবল ক্লাস নেবো।' সে অনুযায়ী অন্যদিনের মতো সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাথে দেখা না করে আসরের পর আবার বুখারি শরিফের দর্স দিলেন। মাগরিবের পর 'চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় ঈদ জামা'আত কমিটি'র

১১১. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, 'জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রাহ.)', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৮

১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯

১১৩. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ দেলাওয়ার হোসাইন, 'মরহুম হুজুর কেবলা (রাহ.)-এর সর্বশেষ পাঠদান', *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর*, পৃ. ১১৮-১১৯

তৎকালীন জেনারেল সেক্রেটারি জনাব অ্যাডভোকেট কামাল উদ্দিনের সাথে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ দিলেন। এশারের পর পরবর্তী দিন কামিল শ্রেণির জন্য দার্‌স (পাঠ) দেখে নিলেন।

২৫শে মার্চ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিদিনের মতো সেদিনও তাহাজ্জুদ, যিকির, ফজর নামায ও তরিকতের ওযিফার পাঠ সম্পন্ন করলেন।[১১৪] হালকা নাস্তা করে এশরাকের নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হঠাৎ চেহারাটা একটু ফ্যাকাশে হলো; বুকে হয়তো ব্যথা অথবা রক্তচাপ বেড়ে গেছে। হঠাৎ বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়লেন, মুখে গুন-গুন আওয়াজ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. কামরায় থাকা হেফযখানার দু'জন শিক্ষার্থী ভীত-চকিত হয়ে বড়োদের খবর দিলে খাদেম শহিদ, হেলাল ও শাহজাহান দৌড়ে এসে খুলশীর হলি ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নিয়ে গেল। অল্পক্ষণ পরেই মুখে কালেমা পড়তে পড়তে দেশে বিদেশে লক্ষ লক্ষ শিষ্য, ভক্ত-অনুরক্ত শুভাকাঙ্ক্ষী ও গুণগ্রাহী রেখে এ পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবন সমাপ্ত করে সকাল ৭টা ১৫মিনিটে প্রভুর একান্ত সান্নিধ্যে চলে যান।[১১৫] মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ সমগ্র বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশসহ মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিমা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর ১ মাস ২৪ দিন।

জানাযা নামায

২৬শে মার্চ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে, বৃহস্পতিবার, সকাল সাড়ে দশটায় চট্টগ্রাম রেলওয়ে পলোগ্রাউন্ড ময়দানে লাখো ধর্মপ্রাণ ভক্ত ও মুরিদের উপস্থিতিতে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বায়তুশ শরফের বর্তমান রাহবার, আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভীর ইমামতিতে জানাযাহ্ অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর চেহারা শেষ বারের মতো একটু দেখার জন্য এবং কফিনকে একটু স্পর্শ করার জন্য পাগলপারা হয়েছিল শত সহস্র ভক্ত-অনুরক্ত। তাঁর পবিত্র চেহারা মুবারক দেখে মনে পড়ে গেল আল্লামা ড. ইকবাল (রহ.)-এর অমর কবিতার দু'টি পঙ্‌ক্তি যা তিনি ইন্তিকালের আধঘন্টা পূর্বে বলেছিলেন,

نشان مرد مومن با تو گویم - چو مرگ آید تبسم بر لب اوست

অর্থাৎ 'মু'মিন ব্যক্তির নিশানাটি বলছি আমি সবার তরে, মৃত্যুকালে মরণকে যে হাসিমুখে বরণ করে।'

তাঁর জানাযায় শরিক হয়েছেন আলিম-'উলামা, পীর[১১৬]-মাশায়েখ, এম.পি., মন্ত্রী, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পেশার কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সর্বস্তরের মানুষ। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয়পার্টিসহ অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ তাঁর জানাযায় উপস্থিত হন। 'ইসলামি ব্যাংক শরি'আহ্

---

১১৪. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, 'জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রাহ.), *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯

১১৫. মোহাম্মদ আলী, স্মরণ : বায়তুশ শরফের পীর শাহ্ আবদুল জব্বার রহ., *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ঢাকা, ২৫ মার্চ, ২০১২, পৃ. ৪

১১৬. পীর ফারসি শব্দ; অর্থ বয়োজ্যেষ্ঠ। সুফি বা মরমি তরিকাহ্র পীর হলেন মুর্শিদ বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক। সিরিয়া, পারস্যদেশ, মিশর, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে 'পীর' শব্দটির বিকল্প প্রকাশ হলো ওলি, ইমামজাদা, শায়খ ইত্যাদি। পীর অর্থে এদেশে ফকির, আস্তানা, শাহ্ শব্দগুলি প্রচলিত রয়েছে। কোনো 'ইলমে যিনি পারদর্শিতা ও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, আরবি ভাষায় তাঁকে উক্ত বিষয়ের শায়খ বলা হয়। যেমন 'ইলমে তফসিরে পারদর্শীকে শায়খুত তফসির, 'ইলমে হাদিসে পারদর্শীকে শায়খুল হাদিস এবং 'ইলমে আদবে পারদর্শীকে শায়খুল আদব বলা হয়ে থাকে। এভাবে যারা 'ইলমে যাহির ও 'ইলমে বাতিনে পারদর্শিতা ও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, আরবি ভাষায় তারা শায়খ এবং ফারসি ভাষায় পীর নামে অভিহিত হন। মোদ্দাকথা, যারা 'ইলমে যাহির ও 'ইলমে বাতিনে পারদর্শিতা লাভ করে তা'লিম, তাবলিগ ও ইসলাহে নফসের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন তারাই শায়খ বা পীর। দ্র. মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, *ইসলাম ও তাছাওফ* (ঝালকাঠী : নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ্ দারুত্তাছনীফ, ২০১০), পৃ. ৪২

কাউন্সিলে'র সদস্য সচিব মওলানা কামাল উদ্দিন জাফরী, 'মাসিক মদীনা'র সম্পাদক মওলানা মহিউদ্দিন খান, 'ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদে'র সভাপতি মওলানা মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী এম. এ. মান্নান, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররক হোসেন, কেন্দ্রীয় নেতা আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু, বি.এন.পি.-র কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব.) অলি আহমদ বীরবিক্রম, সাবেক মেয়র মীর মোহম্মদ নাসির উদ্দিন, নুরুল ইসলাম বিএসসি, স্থানীয় সংসদ সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আরও অনেক নেতা জানাযায় উপস্থিত ছিলেন।[১১৭]

এছাড়া 'কক্সবাজার হাশেমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা'র রেক্টর, প্রবীণ আলেমে দীন মওলানা মুজহের আহমদ, 'আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ'র খতিব আওলাদে রাসুল সাইয়্যেদ আনোয়ার হোসেন তাহের জাবের আল-মাদানী, 'দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া'র মহাপরিচালক হযরত মওলানা সুলতান যওক নদভী, 'সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা'র অধ্যক্ষ মওলানা মুসলেহ উদ্দিন। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রামের শায়খুল হাদিস এবং হাটহাজারী মাদ্‌রাসার প্রাক্তন মুহতামিম (প্রিন্সিপাল) হযরত আল্লামা আবদুল ওয়াহাব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলিফা, পীরে কামিল মুফতি মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক গাজী উলামাদের একটি বিরাট জামা'আত নিয়ে তাঁর জানাযায় শরিক হন।[১১৮]

জানাযা পূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বক্তাগণ মওলানা আবদুল জব্বার (রহ.)-কে 'ঐক্য ও সংহতির প্রতীক', 'সাধারণ মানুষের আশ্রয়স্থল', 'ইসলামি আন্দোলনের অকুতোভয় বীর মুজাহিদ' এবং 'আধ্যাত্মিক নেতা ও 'মহান সমাজসংস্কারক' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করেন।[১১৯] ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষের স্মরণাতীত কালের বৃহত্তম জানাযার নামাযের মাধ্যমে তাঁর প্রতি নিবেদিত হয় এদেশের আপামর জনতার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ (১৯৩৮–২০১৬ খ্রি.) বলেছেন,

> His funeral congregation presented here the populations crowd next to none save one of Shahid Zia at Dhaka. অর্থাৎ 'তাঁর জানাযায় এত লোক সমাগম হয়েছিল যে, ঢাকায় শহিদ জিয়ার জানাযা ব্যতীত আর কারও জানাযায় এত বেশি লোক সমাগম হয়নি।'[১২০]

বৃহস্পতিবার ছিল দেশের 'স্বাধীনতা দিবস'; কিন্তু এ মহান ব্যক্তির আকস্মিক ইন্তিকালে বন্দর নগরীতে 'স্বাধীনতা দিবস' 'শোক দিবসে' রূপান্তরিত হয়েছিল; এমনকি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক জানিয়ে সমগ্র

---

১১৭. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, 'জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রাহ.), *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯

১১৮. আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, 'ডুবে গেছে হেদায়তের প্রদীপ্ত সূর্য', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া* (স্মরণ সংখ্যা ১), পূর্বোক্ত, পৃ. ২০; মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, 'যথাযোগ্য মর্যাদায় বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব কেবলার দাফন সম্পন্ন', জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৭

১১৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মনিরুল ইসলাম রফিক, বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব : কাছে থেকে দেখা', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

১২০. প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ, 'A Luminary Gone with A Legacy Left behind', আবু হায়াত মুহাম্মদ তারেক সম্পাদিত, *আশ্-শরফ* (কক্সবাজার : বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ১৯৯৮), পৃ. ৩৭

চট্টগ্রাম মহানগরীতে একটি মাইকও বাজেনি।[১২১] জানাযা শেষে দুপুর ১২টায় যথাযোগ্য মর্যাদায় চট্টগ্রামস্থ বায়তুশ শরফ মসজিদ ও বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (এম. এ.) মাদ্‌রাসা সংলগ্ন তাঁর হাতেগড়া ফুলবাগানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১২২] আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জান্নাতের উচ্চতম স্থানে সমাসীন করুক। আমিন !

বিভিন্ন স্থানে স্মরণসভা ও দু'আ মাহফিল অনুষ্ঠান

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ইন্তিকালের খবর মুহূর্তের মধ্যেই বাংলাদেশসহ সুদূর মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা, ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশসহ যে সব দেশে বাংলাদেশের নাগরিক রয়েছে এবং যে সব অঞ্চলে তিনি সফর করেছেন যেমন ভারত, পাকিস্তান, সৌদিআরব, আরব আমিরাত, দুবাই, কাতার, আমেরিকা, লন্ডন প্রভৃতি দেশে শোকসভা, স্মরণসভা ও দু'আ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।[১২৩]

তাঁর ইন্তিকালে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও সংবাদপত্রের প্রতিক্রয়া

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ইন্তিকালে জাতির বিবেক হিসেবে পরিচিত গণমাধ্যম ও সংবাদকর্মীদের মাঝেও নেমে আসে শোকের ছায়া। 'বাংলাদেশ বেতার' সকাল থেকেই স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদে বারবার তাঁর ইন্তিকালের খবর প্রচার করতে থাকে। 'চট্টগ্রাম টেলিভিশন' সন্ধ্যা ছয়টা এবং 'বাংলাদেশ টেলিভিশন' সন্ধ্যা সাতটার স্থানীয় সংবাদ ও রাত আটটার জাতীয় সংবাদে তাঁর মৃত্যুসংবাদ প্রচার করলে সমগ্র দেশবাসী কান্নায় ভেঙে পড়ে। সংবাদে মরহুমের সচিত্র মৃত্যুসংবাদ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। পরদিন ২৬শে মার্চ স্থানীয় খবরের কাগজ দৈনিক পূর্বকোণ, দৈনিক আজাদী, দৈনিক ঈশান, দৈনিক কর্ণফুলী 'লিড নিউজ' হিসেবে তাঁর সচিত্র মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করে।

'দৈনিক কর্ণফুলী' সাদা কফিনে রাখা হুজরের নুরানি চেহারা মুবারকের চিত্র প্রকাশ করলে শোকাতুর জনতা প্রিয় মুর্শিদের শেষ স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহ করতে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। তাছাড়া দৈনিক ইত্তেফাক, ইনকিলাব, সংগ্রাম, দিনকাল, জনকণ্ঠ, মুক্তকণ্ঠ, মানবজমিন, ভোরের কাগজ, বাংলাবাজার, ডেইলি স্টার, বাংলাদেশ টাইমস, অবজারভার, দি ইন্ডিপেন্ডেন্টসহ সকল জাতীয় দৈনিকও এদিন তাঁর সচিত্র মৃত্যুসংবাদ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। ২৮ তারিখে প্রকাশিত পত্রিকায় 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপনের খবরের সাথে সাথে তাঁর ঐতিহাসিক জানাযার সচিত্র সংবাদ ছিল স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহের লিড নিউজ।

জাতীয় পত্রপত্রিকাসমূহও তাঁর জানাযাকে ঐতিহাসিক জানাযা হিসেবে উল্লেখ করে রিপোর্ট ছাপে। তাছাড়া ৩রা এপ্রিল '৯৮, শুক্রবার দৈনিক ঈশান, ৪ঠা এপ্রিল '৯৮, শনিবার দৈনিক সংগ্রাম ও ৫ই এপ্রিল '৯৮, দৈনিক কর্ণফুলী তাঁর স্মরণে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। এসব ক্রোড়পত্রে তাঁর

---

১২১. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, সিরাজুল হক শাহজাহান, 'বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রবক্তাকে নিয়ে উচ্চতর গবেষণা হওয়া উচিত', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

১২২. আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, 'ডুবে গেছে হেদায়াতের প্রদীপ্ত সূর্য', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া* (স্মরণ সংখ্যা ১), ১৯ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-২১; মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্‌ভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) : জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪০-৪১

১২৩. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ লোকান্তরিত', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫; *মাসিক দ্বীন দুনিয়া* (স্মরণ সংখ্যা ১), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

সম্পর্কে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট শিক্ষক, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, আলিম-‘উলামা, পীর-মাশায়েখ ও বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের হৃদয়ানুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে।[১২৪]

তাঁর ইন্তিকালে শোকবাণী প্রেরণ

তাঁর মৃত্যুতে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে’র তৎকালীন শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আলহাজ্ব এ. বি. এম. মহিউদ্দিন চৌধুরী, জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় হুইপ সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী এম.পি., চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব আখতারুজ্জামান চৌধুরী, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীর মওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম (পীর সাহেব, চরমোনাই), জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর সভাপতি, সাবেক মেয়র আলহাজ্ব মো. মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরীসহ আরও বহু জাতীয় নেতৃবৃন্দ শোকবাণী প্রেরণ করেন।[১২৫]

তাঁর সম্পর্কে সুধীজনদের অভিমত

বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও আধ্যাত্মিক সাধকের পুরোধা, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সংগ্রামী জীবন নিয়ে দেশের জ্ঞানী-গুণী ও সুধীজন বিভিন্ন মন্তব্য পেশ করেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের অভিমত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইমেরিটাস প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম বলেন, জীবনে অনেক পীর বুযুর্গের দরবারে যাওয়ার আমার সুযোগ হয়েছে; কিন্তু এমন একজন বুযুর্গ পীর আমার শত বছরের জীবনে বিরল। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফে তিন দিনব্যাপী একটি জাতীয় সেমিনার উদ্‌বোধন করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তখন আমি তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখে যে উপলব্ধি আমার হয়েছে তা হলো : তিনি মানুষ দেখেই বুঝতে পারতেন ভালো না মন্দ। ভালো গুণিজন হলে আন্তরিক সমাদর করতেন। খারাপ হলে বুঝতে দিতেন না। তিনি বড়োই উদার ও আধুনিক ছিলেন; যাঁর মধ্যে ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা ও আধুনিকতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি একজন বড়ো মাপের বুযুর্গ হওয়া সত্ত্বেও কারামাত প্রকাশ করতেন না।[১২৬]

(খ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. আবদুল করিম বলেন, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মসজিদ কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে দীনের প্রকৃত খাদেম তৈরির দুর্গস্থান গড়ে তুলেছেন। তাদেরকে দিয়ে আধুনিক জাহিলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ব্যবস্থা করে গেছেন।[১২৭]

(গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন বলেন, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) শুধু একজন পীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন

---

১২৪. আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, ‘ডুবে গেছে হেদায়তের প্রদীপ্ত সূর্য’, *মাসিক দ্বীন দুনিয়া* (স্মরণ সংখ্যা ১), পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১২৫. সম্পাদক, ‘হুজুর কেবলার ইন্তিকালে প্রদত্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠনের শোকবাণী’, *মাসিক দ্বীন দুনিয়া* (স্মরণ সংখ্যা ১), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭-৩৪

১২৬. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, ড. সিরাজুল হক, ‘তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও আধুনিকতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল’, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০-৫১

১২৭. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ শাহাদাত হুসাইন, ‘মানবতার বিমূর্ত প্রতীক’, *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

সংস্কারক ও সমাজসেবক। তিনি বিভিন্ন ধরনের বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইখলাস ও ইহসানের অনন্য প্রতীক। সর্বোপরি তিনি ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে সারা জীবন নিরলস কাজ করে গেছেন। যারা দেশ ও সমাজের খিমদত করতে চান তাদের জন্য তিনি অনুকরণীয় আদর্শ।[১২৮]

(ঘ) ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার সাবেক উপাচার্য ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, সত্যিকার অর্থে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন একজন নিখাদ মানুষ এবং মানুষ গড়ার সফল কারিগর। তিনি ইসলামকে মসজিদ কিংবা খানকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। তিনি অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সমাজের মানুষের চাহিদা পূরণ করেছেন। তাই আমি তাকে সুন্নাতে রসুলের একজন নির্ভেজাল নমুনা হিসেবে মনে করি।[১২৯]

(ঙ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ আলী বলেন, 'ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' ও 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম' প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হবে। তিনি ইসলামের সত্যিকারের গণতান্ত্রিকতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। পীরে কামিল নামে আখ্যায়িত ও সম্মানিত এই সাধক পুরুষ কিন্তু কোনো উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে যাননি। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর ও সহকর্মীদের ওপরই তাঁর দায়িত্ব অর্পণ করে গিয়েছেন। নিকট অতীতে এটি একটি বিরল ব্যতিক্রমী ঘটনা, যা বাংলাদেশ তথা সমগ্র উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।[১৩০]

(চ) জামেয়া দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক আল্লামা সুলতান যওক নদ্‌ভী বলেন, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) শুধু পীর ছিলেন না। কবরপূজা ও দরগাহ পূজাসহ তথাকথিত 'ওরশ' এর নামে পুঁজিহীন ব্যাবসার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ। দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অনবদ্য। তিনি বায়তুশ শরফে বিভিন্ন সময় সম্মেলন ও সেমিনারের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের বিজ্ঞজনদের সমাবেশ ঘটাতেন। তাদের সাথে যুগোপযোগী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করতেন। মুসলিমগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির পথ প্রশস্ত করতে প্রক্রিয়া চালাতেন। তিনি কোনো অবস্থাতেই হক্কানি পীর, মাশায়েখ ও আলিম-উলামাদের সমালোনা কিংবা কাদা ছোড়াছুড়ি করতেন না। দরিদ্র, অসহায় ও নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়াতেন তিনি। ইসলামি জ্ঞান প্রচার ও জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত।[১৩১]

(ছ) কবি আল-মাহমুদ বলেন, তিনি দেশের প্রাত্যহিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর চমৎকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে জানতেন; দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডলে অনৈসলামিক তৎপরতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। সমসাময়িক ইসলামি চিন্তাবিদ, বিশ্লেষক, অধ্যাপক ও ইতিহাসবিদদের প্রতি তাঁর সমর্থন ও সহায়তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সাধারণত এসব সদ্‌গুণ তাঁর ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত

---

১২৮. সম্পাদিত, *রাহবার* (ঢাকা : আনজুমনে নওজোয়ান বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ৮

১২৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, ড. মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, 'তিনি ছিলেন সুন্নতে মুহাম্মদীর নির্ভেজাল নমুনা', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

১৩০. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, 'একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

১৩১. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, হযরত মাওলানা সুলতান যওক নদ্‌ভী, 'তিনি খানকায় বসে দেশ ও জাতির সেবা করে গেছেন', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

থাকায় তরিকতপন্থি পীরের পাশাপাশি আধুনিক আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মহান মানুষ বলেই বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রতিভাত হতেন।'[১৩২]

(ঝ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আ. ন. ম. রঈস উদ্দীন বলেন, আমার ক্ষুদ্র জীবনে পৃথিবীর সবক'টি মহাদেশ আমি সফর করেছি। অনেক পীর-বুযর্গের মাযার যিয়ারতের নছিবও আমার হয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পীর-মাশায়খের সাথে সাক্ষাতের সুযোগও আমার হয়েছে। একটি কথা একান্ত এখলাছের সাথে Sincerely বলছি; কোনো অতিরঞ্জন করছি না ঃ শরি'আত, তরিকত, হাকিকত ও মা'রিফতের সবক'টির সমন্বিত মুর্শিদ অতিনগণ্য সংখ্যক ছাড়া আমার চোখে ধরা পড়েনি; কিন্তু বায়তুশ শরফের মুজাদ্দেদ (সংস্কারক) মওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর মধ্যে সবক'টির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল বলে আমার মনে হয়েছে।[১৩৩]

তাঁর স্মরণে প্রকাশিত প্রথম প্রকাশনা

মাসিক 'দ্বীন দুনিয়া'র নির্বাহী সম্পাদক মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্‌র সম্পাদনায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর গৌরবোজ্জ্বল জীবনকর্মের ওপর ১১২ পৃষ্ঠার সুদৃশ্য ও তথ্যবহুল গ্রন্থ *'জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর'* ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মাত্র চার দিনের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত চমৎকার গ্রন্থটি সুধীমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়; পরপর দু'টি সংস্করণ প্রকাশ করে পাঠকদের চাহিদা মেটাতে হয়।[১৩৪]

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনটাকে স্বীয় শ্রম, মেধা ও মনন দিয়ে সাজিয়ে একজন স্বার্থক ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তুলে ছিলেন। তাঁর জীবনাদর্শ বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুপম আদর্শ হিসেবে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

---

১৩২. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, কবি আল মাহমুদ, 'বায়তুশ শরফের পীর ছাহেবের স্মৃতি', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

১৩৩. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, ড. আ. ন. ম. রঈস উদ্দীন, 'রাসূলে করীমের মানবসেবার সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে মোজাদ্দেদ', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

১৩৪. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের আয়না*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক মাধুর্য

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। মানুষের মধ্যে রয়েছে বহুগুণের অফুরন্ত সম্ভাবনাময় শক্তি। এ গুণাবলির স্ফুরণ ও বিকাশের দ্বারা মানুষ 'ইনসানে কামিল' তথা পূর্ণ মানবের মর্যাদায় উপনীত হয়। যুগে-যুগে নবি-রাসুলগণ মৌলিকভাবে মানবতার এ গুণাবলির বিকাশ ও লালনের কাজই করে গেছেন। এ কাজের পূর্ণতা প্রদানের জন্যই রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ অর্থাৎ 'উত্তম চরিত্র[১৩৫] ও নৈতিকতার পূর্ণতাদানের জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।'[১৩৬]

বস্তুতপক্ষে, দীন, ঈমান ও সচ্চরিত্র এগুলো পরস্পর অবিচ্ছেদ্য; একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। যার চরিত্র যত বেশি সুন্দর, তার দীন ও ঈমান তত পূর্ণাঙ্গ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হয়। অনুরূপভাবে, যে যত বড়ো দীনদার হয়, তার চরিত্র তত বেশি সুন্দর ও পবিত্র হয়। বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا অর্থাৎ 'ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ মু'মিন সে ব্যক্তি যার চরিত্র উত্তম।'[১৩৭] এ কারণেই অনেকেই দীন ও ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে সুন্দর চরিত্রের কথা বলেছেন। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম[১৩৮] (রহ.) বলেন,

الدِّيْنُ كُلُّهُ خُلُقٌ، فَمَا زَادَ عَلَيْكَ فِيْ الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فِيْ الدِّيْنِ

---

১৩৫. উত্তম চরিত্রকে আরবিতে حُسْنُ الْخُلُقِ বলা হয়। উত্তম চরিত্র সম্পর্কে ইমাম গাযালি (রহ.) বলেছেন, উত্তম চরিত্র কষ্ট প্রতিহত করা নয়; কষ্ট সহ্য করা। দ্র. ইমাম গাযালি, *ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ২৬৩; উত্তম চরিত্রের নিদর্শন সম্পর্কে হারিস ইব্‌ন মুহাসিবি (রহ.) বলেছেন, এটা হলো আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কষ্টসহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, ক্রোধ সংবরণ করা, সত্যনিষ্ঠদের সত্যের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা, ক্ষমা করা এবং ভুলপথ এড়িয়ে চলা। দ্র. আবু আবদিল্লাহ্ হারিস ইব্‌ন আসাদ আল-মুহাসিবি, *আদাবুন নুফুস* (বৈরুত : মু'আস্‌সাসাতুল কুতুবিছ ছাকাফিয়্যাহ, ১৯৯১), পৃ. ১৫৩

১৩৬. মহিউস সুন্নাহ আল-বাগাভি, *শরহুস সুন্নাহ* (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৯৮৩), খ.১৩, হাদিস নং. ৩৬২২

১৩৭. আবু দাউদ সুলায়মান ইব্‌ন আশ'আশ, *সুনানু আবি দাউদ*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৪০৬২, পৃ. ২৯২; আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ১০৮১, পৃ. ৩৯০

১৩৮. ইবনুল কাইয়্যিম (১২৯২–১৩৫০ খ্রি.) হিজরি সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মুসলিম বিশ্বে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ মনীষী জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের একজন হলেন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর ইব্‌ন আইয়ুব ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন মাক্কি। তবে 'ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ' নামে তিনি সমধিক পরিচিতি ও প্রসিদ্ধ। তিনি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ৮ জানুয়ারি, ১২৯২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পারিবারিক আবহে সমাপ্ত করে ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর থেকে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাশাপাশি 'আকিদাহ বিষয়েও প্রভূত জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর ইখলাস, জ্ঞানগরিমা ও বিনয়ী মনোভাব তাঁকে জগৎখ্যাত করে দেয়। শিক্ষকতা, ফতোয়া দান, দীনের প্রচার ও প্রসার ঘটানো এবং লেখালেখির মাধ্যমেই তিনি তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করেন; অর্থাৎ ইসলামের খেদমতে গোটা জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে زاد المعاد في هدي خير العباد، مدارج السالكين، الفوائد، مفتاح دار السعادة، أعلام الموقعين عن رب العالمين ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ মহান মনীষী ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কে ইন্তিকাল করেন। দ্র. বকর আবদুল্লাহ্ আবু যায়েদ, *ইবনুল কাইয়্যিম আজ-জাওযিয়্যাহ : হায়াতুহু, আসারুহু ওয়া মাওয়ারিদুহু* (রিয়াদ : দারুল 'আসিমাহ, ৬ অক্টোবর, ২০১৭), পৃ. ৩৭-৩৯

অর্থাৎ 'দীন পুরোটাই চরিত্র। কাজেই তোমার চরিত্র যতটা উন্নত হবে, তোমার দীনদারিও ততই উন্নত হবে।'[১৩৯]

মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন ও রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদিসে মু'মিনগণকে মানবিক গুণাবলি অর্জনের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। বস্তুত, ঈমানি জিন্দিগির সফলতা ও ব্যর্থতা এ সকল গুণাবলি অর্জনের মধ্যেই নিহিত। মুসলিম হিসেবে সেই বেশি সফলকাম, যার মধ্যে এ গুণাবলি বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। এ সকল গুণের দিক থেকে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলা যায়; কেননা তাঁর চরিত্রে এত বেশি মানবিক গুণাবলির সমাহার ঘটেছিল যে, সমকালীন কিংবা পরবর্তীকালীন মানুষের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই তাঁর সাথে তুলনীয়। কবি আবু নুয়াস[১৪০] বলেন,

لَيْسَ عَلَى اللهِ بِمُسْتَنْكِرٍ - أَنْ يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِيْ وَاحِدٍ

অর্থাৎ 'দুনিয়ার সবগুণ একই ব্যক্তির মধ্যে সন্নিবেশিত করা আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা বহির্ভূত নয়।'[১৪১]

এ ব্যাপারে মাসিক মদীনার সম্পাদক মওলানা মহিউদ্দীন খান (১৯৩৫–২০১৬ খ্রি.) বলেন,

'বিনয়, নম্রতা, অমায়িকতা, আত্মত্যাগ ও মানবসেবায় শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে তাঁর সাথে সমকালীন কিংবা পরবর্তীকালীন কাউকে তুলনা করা যায় না।'[১৪২]

প্রাচ্যের দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল (রহ.) (১৮৭৩–১৯৩৮ খ্রি.) যথার্থই বলেছেন,

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے - بڑی مشکل سے ھوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

অর্থাৎ 'ফুলের বাগানে আলোহীন চোখ নিয়ে চম্পাকলি হাজার বৎসর রোদন করে। তার প্রার্থনা যেন বাগানে ফোটে একটি চক্ষুষ্মান ফুল; কিন্তু এমনটি খুব সহজে হয় না।'[১৪৩]

---

১৩৯. ইবনুল কাইয়্যিম আজ-জওজিয়্যাহ, *মাদারিজুল সালিকিন* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'আরাবি, ২০০৩), খ.২, পৃ. ৩০৭

১৪০. আবু নুয়াস আরবি কবিতার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তিনি বর্তমান ইরানের অন্তর্গত আহবাজ শহরে ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু নুয়াস আল-হাসান ইবন হানি আল-হাকিম; তবে 'আবু নুয়াস' নামে তিনি সমধিক পরিচিত। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে তিনি প্রতিকূলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবনযুদ্ধ শুরু করেন। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে কিছুদিন স্বীয় মাতুলালয়ে আশ্রয় নেন। পরবর্তীকালে জীবন ধারণকল্পে আতর বিক্রেতার চাকুরি নেন। অবসর সময়ে তিনি স্বীয় প্রতিভাকে বিকশিত করার লক্ষ্যে কাব্যচর্চার পাশাপাশি তৎকালীন প্রচলিত নিয়মমাফিক মসজিদে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মজলিসে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে থাকেন; কিন্তু কালের পরিক্রমায় খারাপ বন্ধুদের প্রভাবে তিনি মাদকাসক্ত ও ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে মদকেই জীবনে আসল উদ্দেশ্য বানিয়ে ফেলে। অবশ্য পরবর্তীকালে কবি ওয়ালিবা ইবন হুবাব আল-আসদির সান্নিধ্যে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেন। তিনি তাওবার মাধ্যমে অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কবিতা রচনা করেন। তিনি ৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. শওকি দাইফ, *আল-ফান্ন ওয়া মাযাহিবুহু ফিশ শি'রিল 'আরবি* (মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৮), পৃ. ১০৫

১৪১. মওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব বাহরুল উলুম হযরত শাহ মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন এর নির্বাচিত ভাষণ* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০১৭), পৃ. ১৯৩

১৪২. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, হযরত মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, 'তাঁর কীর্তির মধ্যেই তিনি শুকতারার মতো জেগে থাকবেন', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

১৪৩. উদ্ধৃত : আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, *আমার জীবন কথা* (চট্টগ্রাম : নদভী প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ৮৭

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাদবিদ প্রফেসর ড. আবদুল করিম (১৯২৮–২০০৭ খ্রি.) তাঁর গুণাবলির অকপট স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর মানবিক বৈশিষ্ট্য ও অনুপম চরিত্র মাধুরী চিত্রায়ণ করতে গিয়ে বলেন,

> 'যে কথাটি সকল দ্বিধা-সংকোচ মুক্ত, যেটি সকল তর্ক-বিতর্কের ঊর্ধ্বে, সেটি হলো, তাঁর সুমহান জীবনচরিত, পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব, নিঃস্বার্থপরায়ণতা, নিষ্কলুষ যিন্দিগি ও উত্তম চরিত্র মাধুরী। মানবীয় এ গুণাবলি তাকে পৌঁছে দিয়েছে নৈতিক ও মানবিক উচ্চাসনের সর্বোচ্চ শিখরে।'[১৪৪]

আল্লামা ইকবাল তাঁর নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিতে এ কথাটিই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے - خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

> অর্থাৎ 'নিজেকে করো সমুন্নত, করো উত্থিত উচ্চস্তরে, তব তাকদির রচিত হবে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে।'[১৪৫]

বস্তুত, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর কাছে অনুসরণীয় আদর্শ ছিল মহানবি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর হাদিস ও তাঁর জীবনচরিত। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) বুযুর্গশোভন গুণাবলি; (খ) সামাজিকতা ও মানবীয় গুণ। নিম্নে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক মাধুর্যের কয়েকটি দিক আলোচনা করা হলো:

[এক] বুযুর্গশোভন গুণাবলি

পোশাক-পরিচ্ছদ : পোশাক মানবজাতির একটি ভূষণ। দীন ইসলাম একটি বিজ্ঞানসম্মত জীবনব্যবস্থা হিসেবে ঈমানের পর গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই সর্বপ্রথম ফরয হিসেবে নির্ধারণ করেছে। উপরন্তু, এতে শালীন, রুচিশীল ও মার্জিত পোশাক পরার জন্যও বিভিন্নভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ অর্থাৎ 'হে বনি আদম, তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় তোমাদের সাজ-সজ্জা গ্রহণ করো।'[১৪৬]

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) অতি সাদাসিধে সুন্নতি পোশাক পরতেন। লম্বা গোল জামা, গোল রঙিন টুপি ও লুঙ্গি পরিধান করতেন। মাঝে-মাঝে সালোয়ারও পরতেন। কাঁধে সাদা কিংবা রঙিন রুমাল ঝুলানো থাকত। জুতা হিসেবে চামড়ার দেশি সেন্ডেল ও জুতাই তাঁর পছন্দের ছিল। তিনি কোনো পোশাকই জৌলুসের সাথে পরতেন না।

'ইবাদত-বন্দিগি : তিনি অত্যন্ত একনিষ্ঠতার সাথে 'ইবাদত-বন্দিগি করতেন। নিয়মিতভাবে ওযিফা, মুরাকাবা-মুশাহাদা এবং যিকির-আযকারে মশগুল থাকতেন। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিমুখ হননি। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ, এশরাক, আওয়াবিন, চাশত, সালাতুল হাজাতসহ অন্যান্য

---

১৪৪. মওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব বাহরুল উলুম হযরত শাহ মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন এর নির্বাচিত ভাষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

১৪৫. উদ্ধৃত : প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ, 'মাওলানা আবদুল জব্বার রাহ. : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২৪ মার্চ, ২০০৯, পৃ. ৪ (উর্দু 'ইবারত সংযুক্ত)

১৪৬. আল-কুর'আন, ৭ : ৩১

নফল নামায আদায় করতেন।[১৪৭] জামা'আতের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জামা'আত ছাড়েননি। মসজিদে আযান হওয়ার সাথে সাথে পার্থিব সব কাজ বাদ দিয়ে মসজিদের দিকে ছুটে চলতেন। মসজিদে আগে যাওয়া ও সবার শেষে বের হওয়া ছিল তাঁর অভ্যাস। মুরিদদেরও এসব ব্যাপারে খুব তাগিদ দিতেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সুন্নাত তরিকার ওপর অবিচল থেকেছেন; কারণ সুন্নাতের অনুসরণ ও রাসুলপ্রেমের সোপান বেয়েই তো পৌঁছতে হয় প্রকৃত প্রেমিকের সকাশে। আল্লামা ইকবাল (১৮৭৭–১৯৩৮ খ্রি.)-এর ভাষায়,

کی محمد ﷺ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں - یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

অর্থাৎ 'তুমি যদি মুহাম্মদের আনুগত্য করো, তাহলে আমরা সকলেই তোমার। এই দুনিয়া কোন্ ছার; লওহে মাহফুজ ও কলম পর্যন্ত যেখানে একমাত্র তোমার।'[১৪৮]

তাকওয়া-পরহেযগারি : মানবজীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। একজন সত্যিকারের মু'মিন ব্যক্তি সকল কাজে তাকওয়া অবলম্বন করেন। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন তাকওয়ার মূর্তপ্রতীক। শরি'আতের বিধানের ক্ষেত্রে তিনি আযিমতের[১৪৯]ওপর 'আমল করতেন। তিনি

---

১৪৭. এ সম্পর্কে 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ মসজিদে'র সাবেক ইমাম মওলানা তাহেরুল ইসলাম থেকে বর্ণিত তিনটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। **এক.** এক শীতের মওসুমে আমাদের শ্রদ্ধেয় হুজুর কেবলা (রহ.)-এর টাইফয়েড জ্বর হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিলেন, ঠান্ডার কারণে তাঁর বারবার জ্বর উঠছে। তাই তিনি যেন শেষরাত্রে না ওঠেন এবং শরীরে ঠান্ডা না লাগান। যদি শেষরাত্রে ওঠা হয় তাহলে শরীরে ঠান্ডা লেগে যাবে যার কারণে রোগ ভালো হবে না। ডাক্তার সাহেব এ কথা বলার পরও এবং শরীরে ভীষণ জ্বর থাকা সত্ত্বেও তিনি রাত তিনটার দিকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন এবং যিকির করতেন।

দুই. আর এক সময় তাঁর ভীষণ ডায়রিয়া হয়েছিল। বেশি পায়খানা এবং বমি হওয়ার কারণে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এবং তিনি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসার জন্য তিনজন ডাক্তার এসেছিলেন। তারা বলেছিলেন, তাঁর ঘুম কম হওয়াতে ডায়রিয়া হয়েছে। তারা তাঁকে ঘুমের ঔষধ ও স্যালাইন দিয়ে ঘুমিয়ে রাখেন। ডাক্তার কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন তিনি যেন দিনের দশটার পূর্বে ঘুম থেকে জাগ্রত না হন। একথা বলে ডাক্তারগণ রাত দু'টোর সময় চলে যান। আমি অধম হুজুর কেবলার পাশে ছিলাম; দেখতে পেলাম, রাত তিনটার দিকে হুজুরের ঘুম ভেঙে গেছে। ঘুম ভাঙার সাথে সাথে তিনি উঠে ওযু করেন এবং বসে-বসে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন। তিনি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েননি; বরং হাতে তাসবিহ নিয়ে শুয়ে শুয়ে যিকির করতে থাকেন।

তিন. ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। এক রাতে সারা রাত ঝড়-তুফান হয়েছিল। সেই তুফানে বাঁশখালী, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, কক্সবাজার সদর, চকরিয়া এবং সন্দ্বীপের হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। সেই রাত্রে আমি ও পীরসাহেব হুজুর (রহ.) লজিংবাড়িতে একই ঘরে অবস্থান করছিলাম। রাত ১২টার দিকে প্রবল বাতাসে আমরা যেই ঘরে অবস্থান করছিলাম সেই ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাই আমি এবং পীরসাহেব হুজুর (রহ.) চৌকির নিচে আশ্রয় নিই। রাত যখন তিনটা বাজে তখন হুজুর কেবলা এই প্রবল তুফানের মধ্যে চৌকির নীচ থেকে বেরিয়ে এসে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন। ঐ সময় প্রবল বাতাস তাঁকে মাটিতে কয়েকবার ফেলে দিয়েছিল; কিন্তু তিনি বারবার মাটি থেকে উঠে যথারীতি তাহাজ্জুদ আদায় করছিলেন। এমন প্রতিকূল পরিবেশে এবং বিপদের সময়েও তিনি তাহাজ্জুদ নামায ছেড়ে দেননি। দ্র. মওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক সম্পাদিত, মওলানা তাহেরুল ইসলাম, 'হুজুর কেবলা (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক সাধনা', *আশ্-শরফ* (কক্সবাজার : বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ১৯৯৯), পৃ. ২০-২১

১৪৮. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ সম্পাদিত, *কুতবে জমান, শাইখুল আরব ওয়াল-আজম আল্লামা শাহ্ হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রহ. : জীবন, কর্ম ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫

১৪৯. আযিমত 'আরবি শব্দ। এটি একবচন, বহুবচনে 'আযা'য়িম (عزائم); আভিধানিক অর্থ সংকল্প, সিদ্ধান্ত ও শরি'আতের আবশ্যিক বিষয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দার ওপর ফরয করেছেন। দ্র. আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দিন ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬), পৃ. ৩৬০; পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে আল্লামা সারাখসি (রহ.) (১০০৯–১০৯০ খ্রি.) বলেন, العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض. অর্থাৎ 'শরি'আতের যেস সব বিধি-বিধান শুরু থেকেই কোনো বিধা-বিপত্তি ছাড়াই

পার্থিব সকল কাজে মানুষের ভয়, ইজ্জতের ভয়কে দূরে রেখে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ভয়কে সামনে রেখে চলতেন; কারণ, যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে অধিক ভয় করেন, তারাই অধিক সম্মানিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা অধিক পরহেযগার তারাই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অধিক সম্মানিত।'[১৫০]

আত্মশুদ্ধি ও আত্মসংশোধন : তিনি 'ইলমে শরি'আত (যাহেরি বিদ্যা) অর্জনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক বিদ্যা ('ইলমে বাতেনি) লাভের প্রতিও অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। তাসাওউফ সমৃদ্ধ উন্নত জীবন–এ তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে লোকদের আত্মশুদ্ধি, আত্মসংশোধন ও আত্মপরিশীলনের প্রতি মনোযোগী হন। এজন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন খানকা, দীনি তা'লিম কেন্দ্র, 'ইবাদতখানা, যিকির-ফিকিরের হালকা ও বৈঠকি আলোচনা। তিনি নিয়মিত যিকির-আযকার, মুরাকাবা-মুশাহাদা ও নফল 'ইবাদত আদায় করতেন। তাঁর প্রাত্যহিক জীবনাচরণে ছিল কুর'আন ও হাদিসের পরিপূর্ণ অনুসরণ। তাই তিনি এত আশাতীত সফলকাম হয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে 'দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা'র প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মওলানা মতিউর রহমান নিযামী (রহ.) (১৯২১–১৯৮৬ খ্রি.) কতই না সুন্দর করে বলেছিলেন,

مقام طریقت میں لب اللباب - مہمات دینی میں ہیں کامیاب

অর্থাৎ 'তিনি তরিকতের সুউচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছিলেন। দীনের মহান কাজের সার্থক রূপকার।'[১৫১]

আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি ছিলেন একজন উচ্চস্তরের সাধক। একটি মুস্তাহাবও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিতেন না। কঠোর সাধনা করে তিনি কুপ্রবৃত্তিকে অপদমন ও বিনাশ করে স্বীয় প্রভুর প্রেমাগ্নিতে নিজেকে জ্বালিয়ে ঝালাই করে নিয়েছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা ছিল অতুলনীয়। কঠোর সাধনার মাধ্যমে তিনি এমন শক্তি অর্জন করেছিলেন যে, কোনো কঠিন হৃদয়ের মানুষও তাঁর সামনে বসলে মোমের মতো গলে যেত। তাঁর পরশপাথরতুল্য চরিত্রের ছোঁয়ায় কর্দমাক্ত মাটি স্বর্ণে পরিণত হতো। তাঁর সহজ-সরল সুন্দর আচরণে এবং তাঁর মুখনিঃসৃত অমিয় সুধা পান করে অনেকেই উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন। মানুষের আত্মিক উন্নয়নের জন্য তিনি তাসাওউফ ভিত্তিক একাধিক গ্রন্থও রচনা করেন।

আমানতদারি : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন (তোমাদের কাছে রাখা প্রাপ্য) আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও।'[১৫২] রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ অর্থাৎ 'আমানত রক্ষার প্রতি যার দায়বদ্ধতা নেই, প্রকৃত অর্থে তার ঈমানও নেই।'[১৫৩] মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

প্রবর্তন করা হয়েছে তাই 'আযিমত। দ্র. আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আস-সারাখসি, *উসুলুস সারাখসি* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩), খ.১, পৃ. ১১৭; ইমাম আশ-শাতিবি (রহ.) বলেন, العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء. অর্থাৎ 'শুরু থেকেই যে সকল সর্বাত্মক বিধান প্রবর্তন করা হয় তা-ই 'আযিমত।' দ্র. ইবরাহিম ইব্‌ন মুসা আশ-শাতিবি, *আল-মুওয়াফাকাত ফি উসুলিশ শরি'আহ্* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩), খ.১, পৃ. ২২৩

১৫০. আল-কুর'আন, ৪৯ : ১৩

১৫১. মওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব বাহরুল উলুম হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন এর নির্বাচিত ভাষণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২

১৫২. আল-কুর'আন, ৪ : ৫৮

১৫৩. আহমদ ইবনুল হাম্বাল, *আল-মুসনাদ*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ১১৯৩৫, পৃ. ২৫৫

(রহ.)-এর মধ্যে আমানতদারিতার এ গুণটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। আমানতের খেয়ানত করেননি বিন্দু-বিসর্গ-পরিমাণ। ইন্তিকালের পর বায়তুশ শরফের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতিটি আমানত দরবারের সংগঠনের মুরুব্বিগণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝে পেয়েছেন। তাঁর আমানতদারি সম্পর্কে প্রয়াত পীর শাহ্ সুফি মওলানা কুতুব উদ্দিন (রহ.) বলেছেন,

> ‘আমার পীর-মুর্শিদ ছিলেন জগৎশ্রেষ্ঠ আমানতদার। তিনি শরি‘আত[১৫৪] ও তরিকতের আমানত যেমন পূর্ণরূপে রক্ষা করেছিলেন, তেমনি দুনিয়াবি আমানতও রক্ষা করেছিলেন পরিপূর্ণভাবে।’[১৫৫]

অনাড়ম্বর জীবন : তাঁর অনাড়ম্বর জীবনাচার সব শ্রেণির মানুষকে মুগ্ধ করত। তিনি কখনও নিজের নামের সাথে ‘শাহ্’ শব্দটি যোগ করেননি। অর্থের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। লক্ষ কোটি টাকা আসত তাঁর হাতে; কিন্তু কোনো লোভ-লালসা ছিল না তাঁর এসব টাকা-পয়সা ও বিত্ত-সম্পদের প্রতি। জীবনের চৌহদ্দিকে তিনি বরাবরই মুক্ত রেখেছেন সম্পদের ছোঁয়াচ থেকে। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ

> অর্থাৎ ‘আল্লাহ্ তা‘আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে নেন, যেমন তোমাদের কেউ নিজের জলাতঙ্ক রোগীকে পানি থেকে দূরে রাখে।’[১৫৬]

তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট থাকতেন। আল্লাহ্ তা‘আলা শুকরিয়া আদায় ও রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর খাঁটি অনুসারী হিসেবে ধর্মপ্রচার ও সমাজসংস্কারমূলক কাজে অধিক সময় ব্যয় করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল ও অটল থেকে দীনের দা‘ওয়াতি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দেশব্যাপী বহু ইমারত তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হলেও পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত কাঁচা পর্ণকুটিরেই পরিবার-পরিজন নিয়ে এ নশ্বর পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবন কাটিয়ে উত্তরণ করেছেন পরকালের অবিনশ্বর আবাসে।[১৫৭]

---

১৫৪. শরি‘আত শব্দটি আরবি شَرْعٌ শব্দ থেকে নির্গত। এটি একবচন, বহুবচনে شَرَائِعُ। শাব্দিক অর্থে ‘শরি‘আ’ শব্দের দ্বারা এমন সহজ, সরল ও মসৃণ পথকে বুঝানো হয়, যার মাধ্যমে পানি প্রবাহিত হয়। দ্র. মুহাম্মদ ইবন মুকার্‌রম ইবন মনযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত : দারু সাদির, তা. বি.), পৃ. ১৯৫; আল্লামা রাগিব আল-ইস্পাহানি (রহ.) বলেন, শরি‘আতকে এ নামে অভিহিত করার কারণ, যে ব্যক্তি যথাযথভাবে শরি‘আত গ্রহণ করবে সে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারীর মত পবিত্র হয়ে যায়। দ্র. আবুল কাসেম রাগিব ইব্‌ন হুসাইন আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাতু ফি গরিবিল কুর’আন*(রিয়াদ : মাকতাবাতু নায্‌যার মুস্তাফা আল-বায, তা. বি.), খ.২, পৃ. ২৪৭; ইবনুল আছির তাঁর ‘*আন-নিহায়া*’ গ্রন্থে বলেন, الشَّرِيْعَةُ مَا سَنَّهُ اللهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الدِّيْنِ وافْتَرَضَه عَلَيْهِمْ অর্থাৎ ‘আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের জন্য যে জীবনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন এবং যেসব বিধিবিধান তাদের ওপর ফরয করেছেন, তা-ই হচ্ছে শরি‘আত। দ্র. মাজিদুদ্দিন ইবনুল আসির, *আল-নিহায়া ফি গরিবিল হাদিস ওয়াল-আসর* (বৈরুত : আল-মকতবাতুল ‘ইলমিয়্যা, ১৯৭৯), পৃ. ৫৫; শরি‘আতের হুকুমগুলো দুই প্রকার : বাহ্যিক ও আত্মিক। শরি‘আতের যে বিধানগুলো বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক সেগুলোকে আহ্‌কামে যাহেরি বা ফিকহ্ বলা হয়। আর যে বিধানগুলো আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সেগুলোকে বলা হয় আহকামে বাতেনি বা তাসাওউফ। দ্র. মওলানা ড. মুশতাক আহমদ, *শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.* (ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৪), পৃ. ৪৪৮

১৫৫. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০১০), পৃ. ৩৪

১৫৬. আবু ‘ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, বাবুন মা জাআ ফিল হামিয়্যাতি, হাদিস নং ১৯৫৯, পৃ. ২৮০

১৫৭. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্‌ভী সম্পাদিত, প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ, ‘হযরত শাহ্‌সুফী মওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব’, *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক শাহ্‌সুফী হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৮

নিরহঙ্কার জীবন : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই (আল্লাহ্ তা'আলা) অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'[১৫৮] রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ অর্থাৎ 'যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[১৫৯] কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ অহংকার ও আত্মম্ভরিতা আজ মুসলিম জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। আত্মপ্রচার ও প্রদর্শনেচ্ছা আজ মানুষের জীবনকে গ্রাস করলে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাঁর কথাবার্তা ও আচার-আচরণে নিজেকে প্রকাশ করার কোনো প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়নি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম দীন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গভীর জ্ঞানের অধিকারী ফকিহ্, হাজার লক্ষ মুরিদ ও ভক্ত পরিবেষ্টিত খ্যাতিমান পীর-মুর্শিদ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে অহংকার ও আত্মম্ভরিতার লেশমাত্র ছিল না। তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন। এখানে মিশরীয় কবি ইসমা'ঈল সাবরির[১৬০] এ চরণটি সত্যিই প্রণিধানযোগ্য,

وما الْمَرْءُ إِلَّا بِخُلُقٍ كَرِيمٍ - وَلَيْسَ بِمَا قَدْ حَوَى مِنْ نَشَبِ

অর্থাৎ 'মানুষ কেবল উত্তম চরিত্রের গুণেই মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয়; সঞ্চিত ধনসম্পদ দিয়ে মানুষের বিবেচনা করা যায় না।'[১৬১]

অল্পে তুষ্ট থাকা : রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ অর্থাৎ 'অধিক সম্পদের নাম প্রাচুর্য নয়; বরং প্রকৃত প্রাচুর্য হচ্ছে আত্মার প্রাচুর্য।'[১৬২] মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কখনও ধন-সম্পদের মোহে বিভোর ছিলেন না। আল্লাহ্ যখন যা তাঁকে দান করেছেন তা নিয়ে তিনি সুখী ছিলেন। তিনি ধনে বড়ো ছিলেন না কিন্তু মনে বড়ো ছিলেন; যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) কামনা করেছেন। তিনি মনে করতেন, মানুষের অভাব অসীম অথচ সম্পদ সসীম। এ সসীম সম্পদ দিয়ে অসীম অভাব পূরণ করতে হলে তাকে পরিকল্পিত ব্যয় ও স্বল্পে তুষ্ট থাকতে হবে। তিনি বলেন,

---

১৫৮. আল-কুর'আন, ১৬ : ২৩

১৫৯. মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, বাবুন তাহরিমুল কিবরি ওয়া বায়ানিহি, হাদিস নং ১৩১, ১৩৩; আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, বাবুন মা জাআ ফি কিবরি, হাদিস নং ১৯২২

১৬০. আধুনিক আরবি কাব্যের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ইসমা'ঈল সাবরি কায়রোর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৫৪ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে আইন কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। ষোলো বছর বয়সে সর্বপ্রথম তিনি روضة المدارس নামক সাময়িকীতে খাদিভ ইসমা'ঈল পাশার প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেন। খাদিভ এটি দেখে অত্যন্ত খুশি হন এবং তাঁকে উচ্চশিক্ষা অর্জনে ফ্রান্সে পাঠান। তিনি এক্স ইউনিভার্সিটি থেকে ১৯৭৮ খ্রি. ল' ডিগ্রি লাভ করেন। মিসরে ফিরে এসে তিনি বিচার বিভাগের সাথে জড়িত হন। বিভিন্ন পদে চাকরি করার পর ১৮৯৬ খ্রি. তাঁকে আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। তিন বছর পর তাঁকে মিসরের এটর্নি জেনারেল নিযুক্ত করা হয়। এ দায়িত্ব পালনকালে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি সকল বৃত্তি ত্যাগ করে কাব্য ও সংগীত চর্চাকেই একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে ৬৯ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. শওকি দায়ফ, *আল-আদাবুল 'আরবি আল-মু'আছিল* (মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৭৮), পৃ. ৯২; হান্না আল-ফাখুরি, *আল-মু'জায ফিল আদাবিল 'আরবি ,তারিখিহি* (বৈরুত : দারুল জায়লি, ১৯৯১), খ.৪, পৃ. ৪৪৬

১৬১. উদ্ধৃত : ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস* (চট্টগ্রাম : আল-'আকিব প্রকাশনী, ২০০৪), খ.১, পৃ. ২৫৯

১৬২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি'আস-সহীহ*, খ.২, পূর্বোক্ত, বাবুন আল-গিনা গিনান নাফস, হাদিস নং ৫৯৬৫, পৃ. ৭৯; মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, খ.১, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ১৭৪১, পৃ. ২৬৮; আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ২২৯৫, পৃ. ৩৩৭; আবু 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৪১২৭, পৃ. ১৬৭

'অল্প আয়ে জীবন অতিবাহিত করার জন্য কার্পণ্য নয়; বরং পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করার এবং স্বল্পে তুষ্ট থাকার মনোভাব প্রয়োজন। যদি আয়ের পরিকল্পিত ব্যয় করা হয়, তাহলে অল্প খরচে জীবন অতিবাহিত করা যায় আর অপরিকল্পিত ব্যয় করা হলে কারুনের বিশাল ধনভান্ডরও নিঃশেষ হয়ে যাবে।'[১৬৩]

তিনি আরও বলতেন,

'অভাব পূরণের লক্ষ্যে মানুষ আয় বৃদ্ধি করার জন্য যত্রতত্র ছোটাছুটি করে; অথচ সে জানে না যে, আয় বৃদ্ধি মানুষের আয়ত্তের বিষয় নয়। অভাব পূরণের জন্য মানুষের আয়ত্তের বিষয় হলো পরিকল্পিত ব্যয় করা এবং স্বল্পে তুষ্ট থাকা; অর্থাৎ আয় অনুপাতে ব্যয় করা।'[১৬৪]

আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা ও সৃষ্টির প্রতি অমুখাপেক্ষিতা : আল্লাহ্র উপর ভরসার ক্ষেত্রে তাঁর মর্যাদা কত সমুন্নত ছিল তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তিনি কোনো বাজেট ছাড়াই বায়তুশ শরফের বড়ো বড়ো প্রজেক্টের কাজ শুরু করে দিতেন। আল্লাহ্র রহমতে তা সম্পন্ন করতেও পারতেন। এরূপ মহৎ ব্যক্তির মহৎ কর্ম সম্পর্কে নিম্নের উক্তিটি প্রয়োজ্য:

إنَّ المقاديرَ إذا ساعدَتْ - ألحقتِ العاجزَ بالحازمِ

অর্থাৎ 'যখন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় তখন অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যায়।'[১৬৫]

এক্ষেত্রে মুরিদরা ফান্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।'[১৬৬] মহাশক্তিধর জীবিকাদাতা মালিকের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস থাকায় জীবিকার চিন্তায় কখনও অস্থিরতায় ভুগতেন না। কোনো ধনাঢ্যের কাছে নিজস্ব প্রয়োজনের কথা তুলে ধরতেন না; এমনকি ধনীদের সংশ্রবও তিনি অপছন্দ করতেন। ভারতীয় কবি 'দাগ' বলেন,

ہم وضع کے پابند ہیں اے داغ تو ایے – جب تک کہ بلانے نہیں آتا نہیں جاتے

অর্থাৎ 'আমরা তো নিজস্ব চেতনাবোধে এত কঠোর যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ডাকতে আসে না কোথাও যায় না।'[১৬৭]

আল-আমরু বিল মা'রুফ ওয়ান নাহ্য়ু 'আনিল মুনকারের মূর্ত প্রতীক : দীনি ওয়ায-নসিহত করতে অনেককে দেখা যায়; কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে খুব কম লোককে পাওয়া যায়। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ছিলেন তার ব্যতিক্রম। একদিকে তিনি আজীবন দীনের ওয়ায-নসিহত করেছেন সাধারণের হেদায়তের উদ্দেশ্যে; অন্যদিকে, অন্যায়, জোর-যুলুম ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনি বরাবর সোচ্চার ছিলেন। দীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও মুসলিম উম্মাহ্র ওপর অত্যাচার-নিপীড়নকে তিনি কখনও চোখ বুঝে মেনে নেননি। সর্বস্তরের ওলামা-মাশায়েখ ও

১৬৩. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ তাহের, 'যাঁর জীবন ও কীর্তি ছিল অসাধারণ', ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

১৬৪. পূর্বোক্ত।

১৬৫. মুফতি মুহাম্মদ শফী' ও অন্যান্য, *আশরাফি মা'আরিফুল কুর'আন* (দেওবন্দ : আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ. ৫৭

১৬৬. আল-কুর'আন, ৬৫ : ৩

১৬৭. উদ্ধৃত : আল্লামা সুলতান যওক নদভী, *আমার জীবন কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫

সর্বসাধারণকে নিয়ে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বিভিন্ন সমাবেশ-মিছিলে প্রতিবাদ করেছেন। আল্লামা ড. ইকবাল (রহ.)-এর ভাষায়,

آئین جوانمرداں، حق گوئی و بیباکی - اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

অর্থাৎ 'খোদা-বীরদের পরিচয় হলো সত্যকথন ও অভয়, খোদায়ি সিংহদের থাকতে পারে কি শিয়ালের মতো ভীতি-ভয়?'[১৬৮]

মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত : মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন মুস্তাজাবুদ দা'ওয়াত। যেকোনো ধরনের পার্থিব বিপদ-আপদ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার জন্য তিনি দু'আ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তা কবুল করেছেন। তাই স্বীয় মুর্শিদ শেষজীবনে প্রায় অনুষ্ঠানে তাঁকে দিয়ে মুনাজাত পরিচালনা করাতেন। মাঝেমধ্যে অন্য কোনো আলিম দিয়ে মুনাজাত করালে পরে তিনি আবার মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার দ্বারা মুনাজাত পরিচালনা করাতেন। এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

গুরুজন ও ওস্তাদ-মাশায়েখদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা : হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮–১৯০৩ খ্রি.) কত মহৎ কথাই না বলে গিয়েছেন,

মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন, হয়েছে প্রাতঃস্মরণীয়
সে পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা করে, আমরাও হব বরণীয়।'[১৬৯]

ছোটোদের আদর এবং বড়োদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মু'মিনের অন্যতম গুণ। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا অর্থাৎ 'যে ছোটোদের স্নেহ করবে না এবং বড়োদের সম্মান করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[১৭০] মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর মাঝে এ গুণটি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তিনি ছোটো-বড়ো সবাইকে সম্মান করতেন; তবে গুরুজন, ওস্তাদ ও স্বীয় মুর্শিদের প্রতি তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল অতুলনীয়।

[দুই] সামাজিকতা ও মানবিকগুণ

বিনয় ও নম্রতা : রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ অর্থাৎ 'যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নম্রতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্মান বাড়িয়ে দেবেন।'[১৭১] মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, মহানুভব, উন্নত চরিত্র ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক মহান আধ্যাত্মিক সাধক। বিনয় ও নম্রতা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম ভূষণ। তাঁর বিনয় ও নম্রতা সম্পর্কে বায়তুশ শরফের মরহুম পীর শাহ্ সুফি মওলানা কুতুব উদ্দিন (রহ.) বলেন,

تواضع اور مروت اگر کوئی شخص مجسم ہو- تو وہ سرتا قدم عبد الجبار باصفا ہوگا

১৬৮. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ সম্পাদিত, *কুতবে জমান*, *শাইখুল আরব ওয়াল-আজম আল্লামা শাহ্ হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রহ. : জীবন*, *কর্ম ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫

১৬৯. https://bn.wikisource.org/wiki/কবিতাবলী_(হেমচন্দ্র_বন্দ্যোপাধ্যায়)/জীবন_সঙ্গীত, Visited on 10.05.2021

১৭০. আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, বাবুন মা জাআ ফি রহমাতিস সিবয়ান, হাদিস নং ১৮৪২, ১৮৪৪, পৃ. ২৮৮

১৭১. মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, খ.২, পূর্বোক্ত, বাবুন ইসতিহবাবুল 'আফবি ওয়াত তাওয়াদু', হাদিস নং ৪৬৮৯, পৃ. ৪৭৪; আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ১৯৫৩, পৃ. ৩৩১

অর্থাৎ 'বিনয় আর মানবতা যদি কোনো সশরীরি ব্যক্তি হন তাহলে তিনি হবেন আমার পীর-মুর্শিদ মওলানা আবদুল জব্বার।'[১৭২]

ইসলামি জ্ঞানে বিশাল পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে অতি সাধারণ মনে করতেন। তাঁর এ নরম-কোমল আচরণ ও অনুপম ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মধুমক্ষিকার ন্যায় মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসত। জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি সকলের কাছে ছিলেন গ্রহণযোগ্য এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় এক বিরল ব্যক্তিত্ব। কবির ভাষায়,

ایک پر مرتا نہیں میں بلکہ دو تین چار پر- ناز پر انداز پر رفتار پر گفتار پر

অর্থাৎ 'নেয়নি কেড়ে হৃদয়-মন একটি বিষয়, কেড়ে নিয়েছে মোর মন দু' চার বিষয়, জানো কি তুমি সে সব বিষয় আমার? বলায়, চলায়, কাজে ও আচরণে গাম্ভীর্যের বলয়।'[১৭৩]

জ্ঞান-তাপস ও সুলেখক : মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বাল্যকাল থেকেই একজন জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের নেশায় তিনি সর্বদা বিভোর থাকতেন। কঠিন দারিদ্র্যও তাঁকে জ্ঞান আহরণ থেকে পিছু হটাতে পারেনি। জ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। খুব অল্প বয়সেই তিনি হয়ে উঠেন বহু জ্ঞানের অধিকারী। আরবি, ফারসি, বাংলা, উর্দু,[১৭৪] দর্শন, তাফসির,[১৭৫] হাদিস, ফিকহসহ জ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর পাণ্ডিত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঠ দিয়ে তাঁর দিন শুরু হতো; আবার পাঠ করতে-করতেই তিনি রাতে ঘুমিয়ে পড়তেন। প্রায় সময় বুকের ওপর বা খাটের একপাশে পড়ে থাকত কোনো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি জ্ঞানচর্চা করে গেছেন। তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্নোক্ত হাদিসের সার্থক প্রতিভূ। রাসুলুল্লাহ্

---

১৭২. মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, *গুলহায়ে 'আকিদত* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০১৩), পৃ. ১০

১৭৩. উদ্ধৃত : আল্লামা সুলতান যওক নদভী, *আমার জীবন কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫

১৭৪. উর্দু ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের অন্তর্গত ইন্দো-ইরানীয় উপগোত্রের একটি ভাষা। দিল্লি ও মিরাটের আশেপাশে যে পশ্চিমা হিন্দি প্রচলিত ছিল উর্দু তারই একটি শাখা। ভারতে মুসলিম শাসক ও তাদের সহযোগীদের আগমনের ফলে দিল্লি ও তার আশেপাশে প্রচলিত হিন্দি ভাষার সঙ্গে প্রায় দুই শতাব্দী (১২০০–১৪০০) ধরে ফারসি শব্দের মিশ্রণের ফলে উর্দু ভাষার জন্ম হয়। আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ. ৬, পৃ. ১০২; আবদুল্লাহ্ আল-মুতী ও অন্যান্য সম্পাদিত, *শিশু-বিশ্বকোষ* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ১৯৯৫), খ.১, পৃ. ২৭৩

১৭৫. তাফসির শব্দটি আরবি فَسْرٌ অথবা سَفْرٌ থেকে নির্গত; যার অর্থ বর্ণনা করা, বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা (إِيْضَاحٌ), প্রকাশ করা (تَبْيِيْنٌ), আবরণমুক্ত করা, যবনিকা অপসারণ করা ও সমস্যা চিহ্নিত করা ইত্যাদি। علم التفسير এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুহাম্মদ আলি সাবনি বলেন, هو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد ﷺ وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه অর্থাৎ 'তাফসির এমন এক শাস্ত্রের নাম, যাতে আল্লাহ্‌র নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাবের অর্থ অনুধাবন ও তা বর্ণনা করা সহজ হয় এবং তা থেকে শরি'আতের আহকাম ও নির্দেশ জানা যায়। দ্র. মুহাম্মদ আলি সাবুনি, *আত্-তিবয়ান ফি 'উলুমিল কুর'আন* (বৈরুত : মুয়াস্‌সসাতু মানাহিলিল 'ইরফান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮১), পৃ. ৬২; অতীতে 'তাফসির' ও 'তা'বিল' শব্দদ্বয় সমার্থক ছিল। পরবর্তীকালে 'তাফসির' শব্দটি আয়াতের শব্দগত ও তাত্ত্বিক টীকাসহ ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর 'তা'বিল' শব্দটি আয়াতের অন্তর্নিহিত সম্ভাব্য বিভিন্ন মর্মের মধ্য থেকে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেয়া অর্থে প্রচলিত হয়। দ্র. মুহাম্মদ আলি সাবুনি, *আত্-তিবয়ান ফি 'উলুমিল কুর'আন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩; আবদুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ুতি, *আল্-ইতকান ফি উলুমিল কুর'আন* (দিল্লি : মাকতাবাতু ইশা'আতিল ইসলাম, তা.বি.), পৃ. খ.২, পৃ. ২২২; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১২, পৃ. ১৮২

(সা.) বলেছেন, لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ অর্থাৎ 'জান্নাতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত জ্ঞানার্জন থেকে ঈমানদারদের তৃপ্তি মিটে না।'[১৭৬]

তাঁর জ্ঞান গভীরতা ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সাদার্ন ইউনিভার্সিটির প্রথম উপাচার্য, খ্যাতিমান গবেষক প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান বলেন,

> 'আমি সর্বপ্রথম হুজুর কেবলার জ্ঞানপিপাসার দ্বারা আকৃষ্ট হই। তিনি বাংলাদেশের পাড়া-গাঁয়ের মাদ্রাসায় শিক্ষিত হয়ে যে বিস্ময়কর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তা সময়ে সময়ে আমাকে হতবাক করত। তাঁর সংস্পর্শে এসে আমি বিদ্যা এবং জ্ঞানের পার্থক্য নিরূপণ করতে সমর্থ হই। তিনি ছিলেন আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র; যার তুলনায় আমাদের শিক্ষাগত বিদ্যা তুচ্ছ মনে হতো। তাঁর ভাবধারা আমাকে এতই আকৃষ্ট করে যে, একপর্যায়ে প্রায় বছরখানিক কামিল ক্লাসের ছাত্রদের সাথে অনিয়মিতভাবে তাঁর হাদীসের দরসে ছাত্র হিসাবে আমি অংশগ্রহণ করি।'[১৭৭]

আদর্শ শিক্ষক : মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) একজন অতুলনীয় আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। একজন আদর্শ শিক্ষকের যত গুণাবলি থাকা আবশ্যক সবগুলো তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। মাদ্রাসায় শিক্ষক থাকাকালীন তিনি কখনও শ্রেণিকক্ষে দেরি করে যেতেন না। তিনি পাঠদানে পূর্ব প্রস্তুতিগ্রহণ এবং নিষ্ঠার সাথে পাঠদানকে অত্যাবশ্যক মনে করতেন। শ্রেণিকক্ষে প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর পাঠদানকে ছাত্ররা প্রাণভরে উপভোগ করত। মাদ্রাসায় নিয়মিত দায়িত্ব পালন না করে মাসশেষে বেতন নেয়াকে তিনি প্রচণ্ড ঘৃণা করতেন।

ওয়ায়েয-বাগ্মী : ওয়ায-নসিহতে তিনি ছিলেন এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জলতায় কুর'আন-হাদিসের মর্মবাণী শ্রোতাদের নিকট উপস্থাপন করতেন। এক্ষেত্রে কুর'আন-হাদিস ও ইসলামি ইতিহাসের উদ্ধৃতির পাশাপাশি মুসলিম মহামনীষীদের আরবি, উর্দু ও ফারসি শ্লোকের মাধ্যমে হৃদয়গ্রাহীভাবে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরতেন।[১৭৮] অধিকন্তু, হৃদয়ের স্বচ্ছতা, দুনিয়াবিমুখতা, পরহেযগারি এবং বিভিন্ন রিয়াজত ও মুজাহাদার মাধ্যমে 'ইলমে লাদুন্নি' (আল্লাহ্প্রদত্ত জ্ঞান) হাসিল করায় তাঁর ওয়ায-নসিহত আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। জনশ্রুতি আছে যে,

---

১৭৬. আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, বাবুন মা জাআ ফি ফযলিল ফিকহি 'আলাল 'ইবাদাতি, হাদিস নং ২৬১০, পৃ. ৩০০

১৭৭. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ সম্পাদিত, ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, 'পীর ছাহেব কেবলার ইন্তেকালে', *জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১৭৮. মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর ওয়াযের কতিপয় বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য হলো : (ক) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই 'ইবাদত করা। 'আমলকে আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে খালিস করা; (খ) আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া; (গ) আল্লাহ্ তা'আলার ওপর অবিচল আস্থা পোষণ করা; (ঘ) নিজেকে দুনিয়ার প্রতি মুখাপেক্ষী না ভাবা; বরং স্রষ্টার মুখাপেক্ষী ভাবা; (ঙ) আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করা, অকৃতজ্ঞতা থেকে দূরে থাকা; (চ) আল্লাহ্ তা'আলা বিধি-নিষেধ পালন করে প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বাবস্থায় তাকে স্মরণ রাখা; (ছ) উম্মাহকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার চেষ্টা করা, অনৈক্য থেকে বাঁচানো; (জ) আল্লাহ্ তা'আলার কালেমা বুলন্দ রাখার নিমিত্তে জিহাদ করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকা এবং ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা; (ঝ) দা'ওয়াত, তাবলিগ, আত্মশুদ্ধি ও শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে আগামী সময়ের জন্য যোগ্য পুরুষ তৈরি করা। আর সাধারণভাবে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক গঠন করা। দ্র. শাহ্ সুফি মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন (রহ.), মরহুম পীর, বায়তুশ শরফ দরবার, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

من عَمِل بما عَلِم، ورَّثَه اللهُ عِلْمَ ما لم يَعْلَم

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করল এবং সে অনুযায়ী 'আমল করল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ঐসব জ্ঞানও শিখিয়ে দেন যা সে জানে না।'[১৭৯]

তিনি ইসলামের শিক্ষা প্রচার ও প্রসারকল্পে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়ায-নসিহত করতেন। সভা-সমাবেশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করে তিনি জাতির জন্য গঠনমূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন। তাঁর মাহফিলসমূহ সর্বস্তরের মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হতো। তাঁর ওয়ায শুনে হাজারো মানুষ হিদায়াতের পথে এসে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছে। তিনি আমৃত্যু ওয়াযের মাধ্যমে জনসমাজে ইসলামের বাণী প্রচার করে গেছেন। আল্লামা ইকবালের এ কবিতাটি তিনি প্রায় সময় সুমধুর সুরে পড়তেন,

یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے - جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্, মুসলিমগণের অন্তরে সেই জীবন্ত আশা সৃষ্টি করে দিন, যা প্রাণকে আন্দোলিত করে এবং অন্তরকে উষ্ণতা দান করে।'[১৮০]

মেহমানদারি : মেহমানদারি করা রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাত। তিনি বলেছেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ অর্থাৎ 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের ওপর ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।'[১৮১] তাঁর জীবনের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল মেহমানদারি করা। তিনি তাঁর খানকার পাশে মেহমানদের থাকা-খাওয়ার জন্য 'মেহমানখানা' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একা খাওয়া পছন্দ করতেন না। প্রায় সময় মেহমানদের নিয়ে একসাথে খাওয়া-দাওয়া করতেন। আবার, অনেক সময় মেহমানদের নিজের হাতেই খানাপিনা পরিবেশন করতেন। মোদ্দাকথা, মেহমানদের আদর-সমাদর ও আপ্যায়ন করা তাঁর স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

দেশপ্রেম : দেশপ্রেম মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ। দেশপ্রেম বলতে সাধারণত দেশের কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মাতৃভাষাকে ভালোবাসা, জাতিধর্মনির্বিশেষে দেশের মানুষকে ভালোবাসা, সর্বোপরি, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাকে বোঝায়। স্বদেশ ও মাতৃভূমিকে ভালোবাসা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা ঈমানের অংশ। বলা হয়ে থাকে, **حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الإِيْمَانِ** 'দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।'[১৮২] রাসুলুল্লাহ্ (সা.) নিজ জন্মভূমি মক্কাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। ৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তাঁর সাহাবিদের হিজরত তথা দেশত্যাগের অনুমতি দিলেও তিনি নিজে প্রাণপ্রিয় স্বদেশে অবস্থান করেন। পরিশেষে, কাফেরদের গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের কারণে, সর্বোপরি, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে তিনি ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। এ সময় তিনি বারবার কা'বার দিকে ফিরে মক্কার পাহাড়-প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেছিলেন,

مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

---

১৭৯. মুহাদ্দিসগণের মতে, এটি সহিহ হাদিস নয়; কারণ রাসুলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত এর নির্ভরযোগ্য কোনো সনদ নেই।

১৮০. উদ্ধৃত : আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, *আমার জীবন কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

১৮১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি'আস-সহীহ*, খ.২, বাবুন মন কানা উ'মিন বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি..., হাদিস নং ৫৫৫৯, পৃ. ৪৩৭; মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, খ.১, পূর্বোক্ত, বাবুন আল-হচ্ছু 'আলা ইকরামিল জার.., হাদিস নং ৬৭, পৃ. ১৬৩; আবু 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৩৬৬২, পৃ. ৬৬

১৮২. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন আবদির রহমান আস্-সাখারভী, *আল-মাকাছিদ আল-হাসানাহ ফীমা ইসতাহারা 'আলাল-সিনাহ* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরবি, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২১৯

'কতই-না পবিত্র শহর তুমি, আমার নিকট তুমি কতই-না প্রিয় শহর; যদি আমার সম্প্রদায় আমাকে বের করে না দিত তাহলে তুমি ছাড়া অন্য কোনো শহরে আমি বসবাস করতাম না।'[১৮৩]

দেশের প্রতি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ছিল অবিচল ভালোবাসা। প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বাংলাদেশের কোনো অর্জনে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। বাংলাদেশ নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র হলে সেটা তিনি কোনোভাবেই সহ্য করতেন না। নিজের সাধ্যমতো জনগণকে সচেতন করতেন; প্রয়োজন হলে সরকার প্রধানের কাছে বার্তা পাঠাতেন। তাঁর কাছে দূর-দুরান্ত থেকে অনেক মানুষ আসত। তিনি তাদের কাছে গ্রাম, থানা, জেলার সার্বিক অবস্থার খোঁজ-খবর নিতেন। দেশের জন্য যারা অবদান রেখেছেন; যেমনঃ

শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক (১৮৭৩–১৯৬২ খ্রি.), মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০–১৯৭৬ খ্রি.), জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০–১৯৭৫ খ্রি.), জিয়াউর রহমান (১৯৩৬–১৯৮১ খ্রি.), কবি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬ খ্রি.), কবি ফররুখ আহমদ (১৯১৮–১৯৭৪ খ্রি.), কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭–১৯৬৪ খ্রি.), কবি জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩–১৯৭৬ খ্রি.), কবি আল-মাহমুদ (১৯৩৬–২০১৯ খ্রি.) সহ সবাইকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তাদের অবদানের কথা স্মরণ করতেন। 'আখতরাবাদ ইছালে সওয়াব মাহফিলে' তিনি কেঁদে-কেঁদে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন থাকার জন্য দু'আ করতেন।

ধৈর্যশীল : আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ অর্থাৎ 'নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।'[১৮৪] রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

> عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ
>
> অর্থাৎ 'মু'মিনের ব্যাপারটি কতই আশ্চর্যজনক! তার সবকিছুই কল্যাণময়। মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। মু'মিন যদি আনন্দিত হয়, তাহলে সে শুকরিয়া করে। আর যদি মুসিবতে পড়ে যায়, তাহলে সে ধৈর্যধারণ করে। প্রত্যেকটা তার জন্য কল্যাণকর।'[১৮৫]

সত্যিই এ হাদিসের বাস্তবায়ন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবনে দেখা যায়। তিনি আনন্দের সময় বেশি-বেশি শুকরিয়া আদায় করতেন এবং মুসিবতে ধৈর্যধারণ করতেন। মসজিদ, মাদ্‌রাসা, এতিমখানা প্রতিষ্ঠা এবং শিরক-বিদ'আত উৎখাত করতে গিয়ে তাঁকে এলাকার জনগণের অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও চরম ধৈর্যের সাথে এসব পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এসব কর্মে সফলতাও দান করেছেন।

অনুরাগ ও ভালোবাসা : মানুষের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলতেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি যতটুকু সম্মান ও ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য তিনি তাকে ততটুকু সম্মান করতেন এবং ভালোবাসতেন। ভালোবাসা

---

১৮৩. আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৩৮৬১

১৮৪. আল-কুর'আন, ৮ : ৪৬

১৮৫. মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, খ.২, পূর্বোক্ত, বাবুন আল-মু'মিনু আমরুহু কুল্লুহু খায়রুন, হাদিস নং ৫৩১৮, পৃ. ২৮০

প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি যেমন কার্পণ্য করতেন না; তেমনি অতিরিক্ত ভালোবাসাও প্রদর্শন করতেন না। তিনি স্বীয় মুর্শিদ শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতার (রহ.)-কে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসতেন; তবে তাঁর এ ভালোবাসারও একটা সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল। বস্তুত, তাঁর জীবন নিম্নলিখিত হাদিসের আলোকে পরিচালিত ছিল:

مَن أحبَّ للّٰهِ وأبغضَ للّٰهِ، وأعطى للّٰهِ ومنعَ للّٰهِ فقدِ استَكْملَ الإيمانَ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্যই কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহ্র জন্যই ঘৃণা করে, আল্লাহ্র জন্য কিছু দান করে এবং আল্লাহ্র জন্যই কিছু দান করা থেকে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি স্বীয় ঈমান পূর্ণ করতে পারে।'[১৮৬]

সহযোগিতা ও বিরোধিতা : সমাজের অধিকাংশ লোক সহযোগিতা ও বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে দোষ-গুণের বিচার-বিশ্লেষণ করে না। তারা যাদের সহযোগিতা করে তাদের দোষ-ক্রটি খতিয়ে দেখে না; অনুরূপভাবে, যাদের বিরোধিতা করে তাদের গুণাগুণও খতিয়ে দেখে না। কিন্তু মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন এক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিত্ব। কারও সহযোগিতা কিংবা বিরোধিতা করার পূর্বে তিনি তার দোষ-গুণ সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতেন। তারপর তিনি ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদীর পক্ষ সমর্থন করতেন এবং দুর্নীতিপরায়ণ ও মিথ্যাবাদীর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করতেন। তিনি অন্যদেরও এ নীতি অনুসরণ করে চলার পরামর্শ দিতেন।

এতিমের অভিভাবক : মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মাত্র আড়াই বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে এতিম হন। এতিম হওয়ার বেদনা হৃদয় দিয়ে তিনি অনুভব করেছেন। তাই এতিমের প্রতি তাঁর স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা থাকাই স্বাভাবিক। তিনি এতিমদের প্রতিপালনের জন্য ১৫টি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এতিমরা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য তিনি কারিগরি শিক্ষাও চালু করেন; ফলে এতিমরা কার্পেটিং, প্যাকেজিং, হেয়ারকাটিং, প্রেস কম্পোজিটর, কাঠমিস্ত্রির মতো বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ লাভ করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে।[১৮৭] আশির দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূইয়া চট্টগ্রাম 'বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা' পরিদর্শনকালে এতিমদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

'এতিম হয়ে তোমরা একবার এখানে এসেছিলে কিন্তু আর কোনো দিন এতিম হবে না। তোমরা পিতৃহীন নও; বরং তোমরা যে পিতা পেয়েছ এদেশে আর কোনো সন্তানের এমন পিতা আছে বলে আমার মনে হয় না।'[১৮৮]

দানশীলতা ও বদান্যতা : হযরত আলি (রা.)-এর বীরত্ব এবং হাতেম তাঈ-এর দানশীলতা, এ দুটি যেমন সন্দেহাতীত ঐতিহাসিক সত্য তেমনি তাঁর দানশীলতা সর্বজনবিদিত। বদান্যতা ছিল তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ অংশ। চেনা-অচেনা, দূর-নিকট, আপন-পর, ইতর-ভদ্র প্রত্যেকের সমস্যার কথা

---

১৮৬. শায়খ ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্, *মিশকাতুল মাসাবিহ* (দিল্লি : কুতুবখানায়ে রশিদিয়া, তা.বি.), পৃ. ১৪

১৮৭. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আলহাজ্ব এ. কে. এম. ছায়েকাতুল ইসলাম, 'তাঁহার গুণ লিখিয়া শেষ করা যাইবে না', *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

১৮৮. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মোহাম্মদ আমান উল্লাহ্ খান, 'অশ্রুর বন্যায় প্লাবিত একটি তিরোধান', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

অবগত হওয়া মাত্রই দানের হস্ত প্রসারিত করতেন। মসজিদ, মাদ্‌রাসা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দান ছিল অবারিত। তা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি কখনও কোনো ভিক্ষুককে বিমুখ করতেন না। প্রয়োজনে ঋণ করে হলেও অভাবীদের অভাব মোচনে সচেষ্ট ছিলেন। এক মাঘের তীব্র শীতের গভীর রজনিতে হঠাৎ ট্যাক্সি থেকে এক যুবক নেমে তাঁর হুজরার সামনে চিৎকার করে কাঁদছিল। ঘুম ভাঙার সাথে-সাথে তিনি খালিপায়ে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় দোতলা থেকে নীচে নেমে আসেন।

লোকটির ভাষ্য : তার পিতা মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে শায়িত, রক্ত ক্রয়ের জন্য অর্থের প্রয়োজন। তিনি তখন রাস্তার দিকে অগ্রসর হয়ে পান দোকানদার আবদুর রহিমকে ঘুম থেকে জাগিয়ে টাকা হাওলাত নিয়ে বিপন্ন যুবকটির হাতে তুলে দেন। পিতাকে বাঁচাতে পারার আশায় যুবকটি দ্রুত গতিতে স্থান ত্যাগ করল। আর তিনি ট্যাক্সি অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত অশ্রুঝরা নয়নে তাকিয়ে রইলেন।[১৮৯] এ ধরনের হাজারো দৃষ্টান্তের কথা তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের মুখে-মুখে এখনও ফেরে। এ ব্যাপারে কবি আল মাহমুদের নিম্নবর্ণিত উক্তটি প্রণিধানযোগ্য,

> ‘মানবকল্যাণে বাংলাদেশে তাঁর ন্যায় উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি আমি খুবই কম দেখেছি। মানবতার উপকার সাধনে প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো তুলনাই নেই।’[১৯০]

কবি নূরুল মোস্তফা রঙ্গসী বলেন,

> ‘অনাথ এতিমের-পিতা তিনি আজ, অন্ধজনের আলো
> দুর্জনে ডেকে মুছে দেন তার রিপুর কালিমা-কালো।
> বন্যা খরায়, ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়, তিনি অসহায়দের পাশে
> নিজ হাতে দেন খাদ্য, বস্ত্র সুবিপুল আশ্বাসে।’[১৯১]

শিশুদের প্রতি ভালোবাসা : শিশুদের প্রতি ছিল মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অফুরন্ত ভালবাসা। এতিম শিশুদের তিনি পিতৃস্নেহের উষ্ণতায় পিতৃহারার বেদনা ভুলিয়ে দিতেন। প্রতিবছর ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের জন্য তিনি ‘পাখপাখালির আসর’ নামে বিশেষ তামাদ্দুনিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। ইন্তিকালের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ‘বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা’র বার্ষিক মাহফিলে এক কিশোরকে দিয়ে মুনাজাত পরিচালনা করিয়েছিলেন। নিজেই প্রার্থনার কথাগুলো শিখিয়ে দিয়ে ‘আমিন’ ‘আমিন’ বলছিলেন।

বয়স মান-মর্যাদা ইত্যাদি পদদলিত করে তিনি শিশুদের সাথে মিশে যেতেন; তাদের নিয়ে আসর জমাতেন। এই কোমলমনা শিশুদের দ্বারা তাঁর সংকলিত *‘চল্লিশ হাদিস ও চল্লিশ বাণী’* মুখস্থ করাতেন। শিশু-প্রীতির ব্যাপারে তিনি প্রায় সময় এই হাদিসটি আওড়াতেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ ‘যে ছোটোদের প্রতি স্নেহ বা দয়া করে না এবং বড়োদের সম্মান করে না সে

---

১৮৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও যাকিয়া সুফিয়ান সম্পাদিত, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) : জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৫

১৯০. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আল-মাহমুদ, ‘মানবতার পীঠস্থান : বায়তুশ শরফ’, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)* , পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

১৯১. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, ‘পীর ছাহেব রহ.-এর জীবনধারা’, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

আমার দলভুক্ত নয়।'[১৯২] এসবই ছিল তাঁর অকৃত্রিম শিশুপ্রীতির বহিঃপ্রকাশ। তাঁর শিশুপ্রীতির ব্যাপারে কবি আল-মাহমুদ (রহ.) কতই না সুন্দর করে বলেছেন,

'যখন তাকে শিশুদের সাথে দেখা যেত মনে হতো তিনি চিরকালের এক শিশু।'[১৯৩]

'আলিম-'উলামাপ্রীতি : সর্বস্তরের 'আলিম-'উলামা, পীর-বুযুর্গদের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি এবং ভালোবাসা। যে কোনো সিলসিলার হকপন্থি পীর-বুযুর্গকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর মজলিসে কোনো 'আলিমের বিরূপ সমালোচনা করা হলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। গরিব 'আলিম-'উলামাদের খোঁজ-খবর নিতেন। গোপনে সাহায্য-সহযোগিতা করার চেষ্টা করতেন। কোনো 'আলিম বা পীর অসুস্থ হলে বা হাসপাতালে থাকলে উপস্থিত হয়ে বিনয়ের সাথে খেদমত করতেন। তাদের কাছ থেকে দু'আ চাইতেন।

আত্মনির্ভরশীলতা : ইসলামে হালাল রুজি অন্বেষণের ব্যাপারে জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) হালাল উপার্জন করাকে ফরয হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ অর্থাৎ 'হালাল রুজি সন্ধান করা ফরযের পর একটি ফরয।'[১৯৪] অপর হাদিসে নিজ হাতে কাজ করা এবং হালাল পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে উপার্জন করাকে সর্বোত্তম উপার্জন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِه، وكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ অর্থাৎ 'নিজ হাতে কাজ করা এবং হালাল পন্থায় ব্যাবসা করে যে উপার্জন করা হয় তা-ই সর্বোত্তম।'[১৯৫]

হালাল রুজি উপার্জনের অন্যতম অবলম্বন আত্মনির্ভরশীল হওয়া; যার অভাব আমাদের সমাজের 'উলামাদের মাঝে দুঃখজনক হলেও পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে 'আন্জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' এর সভাপতি ছিলেন। এ সংগঠনের আওতায় তিনি বহু মানুষকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে আত্মনির্ভরশীল জীবনযাপনে সমর্থ করে তুলেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মধু, আতর ও পুস্তকের ব্যাবসা করতেন। এ ব্যাবসায়ে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহ করতেন। ভক্তদের কাছ থেকে পাওয়া লক্ষ-লক্ষ টাকা তিনি দু'হাতে ইসলামের জন্য খরচ করতেন; এক পয়সাও নিজের জন্য গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন, 'ব্যাবসা সুন্নাত। অতএব, ব্যাবসার মাধ্যমে সুন্নাতে সুন্নাতও আদায় হলো, আবার আয়েরও একটা ব্যবস্থা হলো।'[১৯৬] এভাবেই তিনি বিত্তের সমাজে থেকেও চিত্তের চর্চা করেছেন কিন্তু পরমুখাপেক্ষিতাকে গ্রহণ করেননি।

---

১৯২. আবু দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আশ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, বাবুন ফির রহমাতি, হাদিস নং ৪২৯২, পৃ. ১০৫; আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, খ.১, পূর্বোক্ত, বাবুন মা জাআ ফি রহমাতিছ ছিবইয়ান, হাদিস নং ১৮৪২, পৃ. ১৫৬

১৯৩. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *নিবেদিত কবিতা* (চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ্ শরফ একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৪১

১৯৪. আহমদ ইবনুল হুসাইন বায়হাকি, *শু'আবুল ইমান*, পূর্বোক্ত, বাবুন হুকুকুল আওয়াদ ওয়াল আহলিন, হাদিস নং ৮৩৬৭, পৃ. ২৫১; আহমদ ইবনুল হুসাইন বায়হাকি, *আস-সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাকি*, পূর্বোক্ত, বাবুন কসবুর রাজুলি ওয়া 'আমলিহি বিইয়াদায়হি, হাদিস নং ১১৬৯৫, পৃ. ১২৮

১৯৫. আবু আবদুল্লাহ্ কুরতুবি, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন* (কায়রো : দারুশ শা'ব, ১৯৭২), খ.১৯, পৃ. ৫৬

১৯৬. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভি সম্পাদিত, মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ লোকান্তরিত', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

লেনদেনে স্বচ্ছতা : মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য তাকে অপরের সাথে লেনদেন করতে হয়। এ লেনদেন যখন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে হয় তখন মানুষ সাধারণত কোনো সাক্ষী বা লিখিত প্রমাণ রাখে না; কারণ, এক্ষেত্রে তার মধ্যে অসতর্কতা ও লজ্জাশীলতা কাজ করে থাকে; কিন্তু অনেক সময় তাতে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এ ধরনের লেনদেন পছন্দ করতেন না। তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশমতো প্রতিটি লেনদেন সুস্পষ্টভাবে লিখে রাখতেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

অর্থাৎ 'হে মু'মিনগণ, তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার করো তখন তা লিখে রাখো।'[১৯৭]

তিনি বলতেন,

'সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার। আমার সকল লেনদেন সর্বদা এতটা পরিষ্কার থাকে যে, যদি এখন আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিই, তাহলে আমার উপর এমন কোনো লেনদেনের বোঝা চাপ সৃষ্টি করবে না যা আমি লিখে রাখিনি। আর কারও পক্ষে এটা বোঝা কঠিনও হবে না।'[১৯৮]

বাস্তবে তা-ই হয়েছে। মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া সিন্দুকে প্রায় দশটি খাত পাওয়া যায়। প্রতিটি খাত এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, পাওনাদারদের কাছে পৌঁছে দিতে কোনো অসুবিধা হয়নি।

সময়ানুবর্তিতা : মওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) বিচিত্র কাজে ব্যস্ত একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। ফলে তাঁর জীবনকে সময়ানুবর্তিতার মাপকাঠিতে অনায়াসে মাপা যায়। তাঁর প্রত্যেকটি কাজের জন্য ছকবাঁধা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা ছিল। ফলে তিনি নিজের কাজকর্ম যথাযথভাবে যথাসময় শেষ করতে পারতেন। এ কারণে তাঁকে একজন আদর্শ সময়ানুবর্তী মানুষ বলা যায়। তিনি যেমন নিজ সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতেন তেমনি অন্যদেরও সময় সচেতন হওয়ার জন্য জোর তাগিদ দিতেন; কারণ তিনি জানতেন, জগতে যারা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন তারা সকলেই সময়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছেন। কবির ভাষায়,

'সময়ের মূল্য বুঝে করে যারা কাজ
তারা আজ স্মরণীয় জগতের মাঝ।'[১৯৯]

প্রতিশ্রুতি পালন : প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাধারণ কথাবার্তায় সাধারণ কাজকর্মের প্রতিশ্রুতি পূরণেও তিনি ছিলেন সচেষ্ট। মাঝে মধ্যে তিনি বলতেন, 'অঙ্গীকার পালন করাতেই মু'মিনদের পরিচয়।' তিনি কোনো মাহফিলে কিংবা কোথাও যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে যত বাধা-বিপত্তিই থাকুক না কেন, প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পূরণ করতেনই। এমনকি তাঁর কোনো মুরিদ যদি সাধারণ কথাবার্তায় কাউকে কোনো কাজ বা কোথাও যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেন, তা পূরণের জন্য

---

১৯৭. আল-কুর'আন, ২ : ২৮৬

১৯৮. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ সম্পাদিত, ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, 'পীর ছাহেব কেবলার ইন্তেকালে', *জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১৯৯. উদ্ধৃত : এ. কে. মাহমুদুল হক, *নিম্নমাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা* (চট্টগ্রাম : আল-ইত্তেহাদ পাবলিশার, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ, ২০০৬), পৃ. ৩২২

তাগিদ দিতেন। তা না হলে ওয়াদা ভঙ্গের গুনাহ হবে বলে তিনি তাদের সতর্ক করে দিতেন; কারণ রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ অর্থাৎ 'ওয়াদার প্রতি যার দায়বদ্ধতা নেই, বস্তুতপক্ষে তার মধ্যে দীনও নেই।'[২০০]

নারীশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক : নারীশিক্ষার ব্যাপারে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তিনি নারীদেরকে কর্মহীন এবং শিক্ষার আলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখার বিরোধী ছিলেন। আবার আধুনিকতার নামে ইসলামি আদর্শের বিপরীত চাল-চলনকেও পছন্দ করতেন না। শালীনতার সাথে পর্দার পরিবেশে নারীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তাই মুসলিম নারীশিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি ছুটে গেছেন থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত পাঁচ দিন ব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। নারীশিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা'য় ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত নারী শিক্ষা চালু করেন। চট্টগ্রামের 'চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা'য় মহিলা শাখা চালুর ব্যাপারেও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অবিস্মরণীয়। 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'-এ ছাত্রীভর্তির ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাইলে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি অভিমত ব্যক্ত করে বলেন,

> 'ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদেরও ইসলামি শিক্ষাদীক্ষায় গড়ে তালা প্রয়োজন। যদি ছাত্রীদের জন্য হিজাবের ব্যবস্থা থাকে এবং তাদের আলাদাভাবে বসানো হয় তাহলে তাদের ভর্তির ব্যাপারে আপত্তি কোথায়?'[২০১]

ইন্তিকালের পূর্বে এক অভিভাবক সমাবেশে তিনি স্বউদ্যোগে একটি মহিলা মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। এভাবে নারীশিক্ষার উন্নয়নে তিনি অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

আর্তমানবতার সেবক : মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) দেশ, সমাজ ও জনগণের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সমাজসেবায় তিনি ছিলেন সিদ্ধপুরুষ ও দুর্গত মানুষের পরম বন্ধু। ১৯৭৮, ১৯৮০ ও ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের নির্যাতিত রোহিঙ্গা মুসলিমগণের সাহায্যার্থে তিনি ছুটে যান কক্সবাজার ও টেকনাফে। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে চকরিয়ায়, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার রূপগঞ্জে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে আনোয়ারা, বাঁশখালী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, টেকনাফ ও কুতুবদিয়াতে, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, প্রবল বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত সর্বহারা মানুষের সাহায্যের জন্য তিনি লক্ষ-লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী নিয়ে দুর্গত অঞ্চল সফর করেন।

তিনি ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে খুলনার রূপসাঘাটস্থ খ্রিষ্টানপাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে স্বহস্তে অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী প্রদান করেন। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত চকরিয়ার কাকারা ইউনিয়নের হিন্দুপাড়ায়, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে সমুদ্র উপকূলবর্তী চট্টগ্রামের বাঁশখালীর জেলেপাড়ায় শতাধিক হিন্দু

---

২০০. ইমাম আহমদ, *আল-মুসনাদ*, পূর্বোক্ত, খ.১২, হাদিস নং ১১৯৩৫, পৃ. ৩৮৮

২০১. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ তাহের, 'যাঁর জীবন ও কীর্তি ছিল অসাধারণ', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

পরিবারকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। এজন্য তাঁর আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে প্রায় একশ অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[২০২]

বিজ্ঞানমনস্ক ও আধুনিক : জ্ঞানের পরিপক্বতার কারণেই মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন উদার মানবতাবাদী। ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়ে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপটি তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। যেসব সমকালীন যুক্তি দ্বারা মানুষ ধর্মকে বিচার করে এর সবই ছিল তাঁর নখদর্পণে। তিনি আধুনিক মানুষের সাথে ইসলামি আদর্শের সেতুবন্ধন রচনায় পারদর্শী ছিলেন। এজন্য তিনি মাঝে-মাঝে ছন্দের তালে উচ্চারণ করতেন,

> 'আলেম সমাজের ভক্তি, ইংরেজি শিক্ষিতদের শক্তি, এ দু'য়ের মাঝে হয় যদি চুক্তি, তবেই আসবে উম্মাহ্‌র মুক্তি।'[২০৩]

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। তিনি বলতেন,

> 'তলোয়ার দিয়ে জিহাদের দিন আর নেই। যুগ ও প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং, রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত ভেবে তলোয়ার নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আণবিক শক্তির মোকাবেলা করতে হবে আণবিক শক্তি দিয়ে।'[২০৪]

চলমান মিডিয়া ও তথ্যসন্ত্রাসের ব্যাপারে তিনি বলতেন,

> 'প্রচার মাধ্যম ও লেখনীশক্তি হচ্ছে বর্তমানে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র। তাই সকল ইসলামপন্থিকেও এ অস্ত্রের ব্যবহারে নিপুণতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।'[২০৫]

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সাধনের নিমিত্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যারা অসামান্য অবদান রাখেন তাদের মধ্য থেকে প্রতিবছর চারজন মনীষীকে গুণীজন সংবর্ধনা ও 'বায়তুশ শরফ পুরস্কার' প্রদান করেছেন তিনি। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ড. মোহাম্মদ শমশের আলী (জন্ম ১৯৪০ খ্রি.), ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মালিক আকবর আলী (১৯১১–২০০১ খ্রি.) এবং ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রফেসর ড. জামাল নজরুল ইসলাম (১৯৩৯–২০১৩ খ্রি.) প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীদের সংবর্ধিত করে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাছাড়া সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে তিনি প্রতিবছর রবিউল আউয়াল উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য তামাদ্দুনিক প্রতিযোগিতা তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চালু করেন। এসব কর্মকাণ্ড থেকে বোঝা যায় তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক, সংস্কৃতিমান ও আধুনিক।

পরিবেশ সংরক্ষক : পরিবেশ[২০৬] সংরক্ষণ মানে, চারপাশের বস্তুসমূহকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা এবং তা ধ্বংসের হাত থেকে তা রক্ষা করা। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন একজন

---

২০২. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ,'জলোচ্ছ্বাসের দেশে' *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ৩৭

২০৩. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, অধ্যাপক আবদুন নূর, 'পীর ছাহেব (রহ.)-এর স্মরণে (১৯৩৩–১৯৯৮)', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫; আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, 'বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.)-এর পবিত্র জীবনধারা', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

২০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪; আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, 'বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.)-এর পবিত্র জীবনধারা', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

২০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫

পরিবেশবাদী সমাজসচেতন ব্যক্তিত্ব। তিনি পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকার সাহায্যেও এগিয়ে আসেন। তিনি পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বৃক্ষরোপণ করতে সকলকে উদ্‌বুদ্ধ করেন।

তিনি পরিবেশ সংরক্ষণের স্বার্থে ১৯৮০, ১৯৮২, ১৯৮৫, ১৯৮৬, ১৯৯১, ১৯৯২ ও ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় উদ্যোগে তাঁর ভক্ত-মুরিদদের নিয়ে আখতরাবাদ কুমিরাঘোনায়, চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফে, সীতাকুণ্ডের কুমিরা বায়তুশ শরফে জাঁকজমকভাবে 'বৃক্ষরোপন কর্মসূচি' পালন করেন যা কালের স্বাক্ষী হয়ে আছে।[২০৭] বিশেষত ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর সরকারি বন বিভাগের সহায়তায় ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ অভিযান পরিচালনা করেন।

সমাজসংস্কারক : 'ইল্‌মে শরি'আত, তরিকত, হাকিকত[২০৮] ও মা'রিফতের সমন্বয়ে তিনি আত্মশুদ্ধির এক নবজোয়ার সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর কল্যাণেই যুগে যুগে সমাজসেবক ও সংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা পাপ-পঙ্কিলতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত মানুষকে নতুন জীবনদান করেছেন; দীনের সঠিক পথ দেখিয়েছেন, সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

> অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের জন্যে প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে এমন একজন মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন, যিনি ধর্মের সংস্কার সাধন করেন।'[২০৯]

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)ও তেমন একজন সার্থক সমাজসংস্কারক। তিনি শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কার দূরীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি লোহাগাড়া উপজেলায় অবস্থিত হযরত শাহ্ পীর আউলিয়া (রহ.) (যিনি বার আউলিয়ার একজন বলে কথিত আছে) এর মাযারে আবহমানকাল থেকে চলে আসা শিরক ও বিদ'আতের উচ্ছেদ করেন।

লোহাগাড়ার বড় হাতিয়ায় ছিদ্দিক মিয়ার বলীখেলা, গরুর লড়াই, নাচ-গান ও জুয়া ইত্যাদি উচ্ছেদ করে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরাতুন্নবি (সা.) মাহফিল চালু করেন। ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে খুলনা বাগেরহাট ষাটগম্বুজ মসজিদ সংলগ্ন হযরত খান জাহান আলী (রহ.)-এর মাযারে অনুষ্ঠিত শিরক ও বিদ'আত ও নানান

---

২০৬. পরিবেশের আভিধানিক অর্থ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল, পরিধি ইত্যাদি। দ্র. ড. এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ৯২৭; এছাড়াও বসবাসের স্থান, আবাসস্থল, নির্ধারিত স্থান, ঠিকানা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। একে ইংরেজিতে Environment এবং আরবিতে اَلْبِيْئَةُ বলা হয়। পরিভাষায়, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত আলো, বাতাস, পানি, মাটি, পাহাড়, নদী-নালা, সাগর, মানবনির্মিত অবকাঠামো এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের সমন্বয়ে যা সৃষ্ট তাকে পরিবেশ বলা হয়। দ্র. ড. মো. মায়নুল হক, *ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ২৬

২০৭. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) : জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২; মুহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রহ.-এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৬

২০৮. সুষ্ঠু পদ্ধতির মাধ্যমে শরি'আতের সার্বিক বিধানাবলি বাস্তবায়ন করা হলে মানবহৃদয় পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে। মানবহৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় 'ইলাহ্ সত্তার' বহু তত্ত্ব ও রহস্য। এ রহস্যগুলোকে বলা হয় হাকিকত। আর যিনি আধ্যাত্ম জগতের এই মকামে পৌঁছেন তাঁকে বলা হয় মুহাক্কিক। এটি সুফি তরিকাহ্‌র সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরে সুফি সত্য উপলব্ধি করেন। সুফিরা বিশ্বাস করেন যে, শুধু ধর্মীয় আচার-আচরণ, রীতিনীতি পালনের মাধ্যমে এ সত্য জ্ঞান লাভ করা যায় না। আত্মার শুদ্ধীকরণের মাধ্যমেই এ সত্যজ্ঞান লাভ করা যায়। প্রেম, ভক্তি, সংযম ও সততার মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা যায়।

২০৯. আবু দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আশ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫

ধরনের কুসংস্কার ও জাহেলিয়াত উৎখাত করে সেখানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনদিন ব্যাপী ওয়ায মাহফিল চালু করেন।[২১০]

জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠপোষক : মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) একজন সুফি দরবেশই ছিলেন না; তিনি ইসলামি চিন্তাবিদ, শিক্ষানুরাগী, জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠাপোষকও ছিলেন। তিনি অন্যের প্রতিভাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতেন এবং তাদের প্রতিভার স্বীকৃতি দিতেন। এ লক্ষ্যেই তিনি ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। রাসুল (সা.)-এর আগমনের মাস রবিউল আওয়ালে তিনদিন ব্যাপী তামাদ্দুনিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে দেশের প্রখ্যাত 'আলিম, ইসলামি চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসাবিদ ইত্যাদি, যারা স্ব-স্ব পেশায় অসামান্য অবদান রেখেছেন তার স্বীকৃতিস্বরূপ গুণিজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান চালু করেন। তিনি ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্বমোট ২০ জন গুণী ব্যক্তিত্বকে স্মরণ ও সংবর্ধনা প্রদান করেন।[২১১]

প্রগতিশীল চিন্তাধারা : মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর চিন্তাধারা এত প্রগতিশীল ছিল যা সাধারণ পরিমণ্ডলে দেখা যায় না। আশির দশকের প্রথম দিকে তিনি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টিকারী সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম কার্যকর ও সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুশ শরফ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান' এর উদ্যোগে একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করেন। অবশেষে, অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সেমিনারে বর্ণিত সুপারিশের ভিত্তিতে সমমনা ইসলামি ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ৩০ মার্চ, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে এদেশে সর্বপ্রথম 'ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃত্যু অবধি তিনি ছিলেন এর শরি'আহ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পরিচালনা পর্ষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

নব্বইয়ের দশকে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করে। বর্তমানে এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়ও বটে। তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার একটি উদাহরণ হলো, 'আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম' এর সিন্ডিকেট সভায় ছাত্রী ও অমুসলিম শিক্ষার্থী ভর্তির পক্ষ-বিপক্ষে বিতর্কের সৃষ্টি হলে তিনি ভর্তির পক্ষে মতামত দিয়ে প্রগতিশীল চিন্তার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখেন। তাঁর প্রগতিশীলতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো : গরিব-অসহায় মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক সুবিধা সংবলিত একাধিক দাতব্য ক্লিনিক স্থাপন করেন। এখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ চিকিৎসা সেবা লাভ করছে।

সফল সংগঠক : মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলে আধ্যাত্মিক সাধনা ও মানবসেবার কাজে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন।[২১২] দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ব্যাপী

---

২১০. রায়হান আজাদ, *চট্টগ্রামের একশ মুসলিম মনীষা* (চট্টগ্রাম : সেন্টার ফর রিসার্চ এণ্ড পলিসি স্টাডিজ (সিআরপিএস), ২০১৬), খ.৪, পৃ. ৮২-৮৩

২১১. প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ, 'এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের স্মৃতিচারণ', *দৈনিক সুপ্রভাত বাংলাদেশ*, ২৫ মার্চ, ২০১২, পৃ. ১

২১২. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ সম্পাদিত, 'বায়তুশ শরফের মাধ্যমে সর্বস্তরে মানুষের কাছে ইসলামকে গ্রহণীয় করার ব্যাপারে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর অবদান', *আল-আছরার* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৫), পৃ. ৬০

দেশ-বিদেশে তিনি 'বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' এর অসংখ্য শাখা-উপশাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বায়তুশ শরফকে ফুলে-ফলে, পত্রপল্লবে সজ্জিত করে মহিরুহে রূপদান করেন। বায়তুশ শরফের অধিকাংশ শিক্ষা, সমাজসেবামূলক ও ধর্মীয় কাজ তাঁর আমলেই পূর্ণতা লাভ করে। এজন্য তাঁর কার্যকালকে 'বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ'-এর সোনালি যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং তাকে 'Architect or Builder of Baitush Sharaf' তথা বায়তুশ শরফের রূপকার বলা হয়।[২১৩]

তিনি 'বায়তুশ শরফ মসজিদ ৬৬টি, মাদ্‌রাসা (ইবতেদায়ি, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল) ১৪টি, এতিমখানা ১৬টি, হেফ্‌যখানা ১৫টি, দীনি তা'লিম কেন্দ্র ১৮৮ টি, ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা ৩২টি, ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ০১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ০৩টি, ইসলামি গণপাঠাগার ০৮টি, ইসলামি (গ্রন্থ বিক্রয় কেন্দ্র) লাইব্রেরি ০৫টি, হাসপাতাল তথা দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র ০৬টি, কার্পেন্ট্রি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ০৩টি, টেইলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ০৫টি, হেয়ার কাটিং (চুলকাটা) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ০৩টি, প্যাকেজিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ০২টি, প্রেস কম্পোজিটর্স ট্রেনিং সেন্টার ০১টি, ছাপাখানা ০১টি, ধর্মীয় দিবস উদ্‌যাপন ০৬টিসহ বহু শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।[২১৪] উল্লেখ্য যে, 'আন্‌জুমনে ইত্তেহাদে'র কার্যক্রম গতিশীল ও সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য তিনি ১৩টি কমপ্লেক্স[২১৫] প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেগুলো হলো:[২১৬]

ক্রমিক	কমপ্লেক্সসমূহের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠাকাল
০১	বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ধনিয়ালাপাড়া, ডি.টি. রোড, চট্টগ্রাম	১৯৫২ খ্রি.
০২	আখতরাবাদ (কুমিরাঘোনা) বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	১৯৭০ খ্রি.
০৩	কক্সবাজার বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার	১৯৭২ খ্রি.
০৪	ঢাকা বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ১৪৯/এ, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা	১৯৭৯ খ্রি.
০৫	রাঙ্গামাটি বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি	১৯৯০ খ্রি.
০৬	মাইনীমুখ বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, লংগদু, রাঙ্গামাটি	১৯৯০ খ্রি.
০৭	রেজওয়ান নগর বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ঈশ্বরদী, কুষ্টিয়া	১৯৯৩ খ্রি
০৮	রামপুর বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, উত্তর রামপুর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	১৯৯৫ খ্রি.
০৯	খাগড়াছড়ি বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি	১৯৯৬ খ্রি.
১০	বাগেরহাট বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, সুন্দরঘোনা, বাগেরহাট	১৯৯৯ খ্রি
১১	টেকনাফ বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, টেকনাফ, কক্সবাজার	২০০২ খ্রি
১২	মারিশ্যা বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, মধ্যমপাড়া, মারিশ্যা, খাগড়াছড়ি	২০০৫ খ্রি.
১৩	চকরিয়া বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, চিরিঙ্গা, চকরিয়া, কক্সবাজার	২০১৪ খ্রি.।

---

২১৩. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্‌ভী সম্পাদিত, আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, 'বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.)-এর পবিত্র জীবনধারা', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬; মুহাম্মদ এহছানুল হক মিলন, 'মসজিদ ভিত্তিক সমাজসেবা ও বায়তুশ শরফের পীর সাহেবের অবদান', *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৯ এপ্রিল, ২০১৫, পৃ. ০৮

২১৪. *দৈনিক কর্ণফুলী*, 'বায়তুশ শরফের পীর মওলানা আবদুল জব্বার (রহ.)-এর নামে সড়কের নামকরণ করা হোক', ১১ মে, ১৯৯৮; মোহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রহ.-এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪-২০৮

২১৫. 'কমপ্লেক্স' বলতে এমন একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে মসজিদ, মাদ্‌রাসা, এতিমখানা, হেফ্‌যখানা, হাসপাতাল ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসহ একাধিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

২১৬. অফিস রেকর্ড. বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ধনিয়ালাপাড়া, ডি.টি. রোড, চট্টগ্রাম।

দৈহিক গঠন আকৃতি

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মাঝারি আকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল গোলাকার। তাঁর কপোল মাংসলও ছিলো না আবার শুকনোও ছিলো না, বরং উভয়ের মাঝামাঝি ধরনের ছিলো। দাঁত ছিল সরু ধবধবে সাদা। তাঁর কপাল ছিলো হৃদয়ের মতো প্রশস্ত। গায়ের রং ছিলো উজ্জ্বল শ্যামল। মাথার চুল ও শ্মশ্রু ছিল ঘন কালো; তবে মৃত্যুর আগে এক তৃতীয়াংশ শুভ্র হয়ে গিয়েছিল। চোখ ছিল লালচে ডাগর ডাগর এবং ঘন পল্লববিশিষ্ট। চেহারা অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল; ফলে তাঁর দর্শনলাভের পর দর্শনার্থীর অন্তর তাঁর প্রতি প্রেম ও মহব্বতে পূর্ণ হয়ে যেত। তিনি উঁচু শব্দে হাসতেন না; বরং সব সময় মুচকি হাসতেন। চলার সময় নিম্নমুখী হয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন। তিনি প্রফুল্লমুখ ও অল্পভাষী ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্ত ও কোমল স্বভাবের। ডাক্তারের পরামর্শমতে চোখে সর্বদা চশমা পরতেন। তিনি সাদা পায়জামা, লুঙ্গি, জোব্বা, লাল মাফলার, ঘি রঙের কোটি, রঙিন টুপি, হাফ সু এবং কালো ছড়ি ব্যবহার করতেন।[২১৭]

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনাদর্শকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে ছিলেন। তাঁর মধ্যে বিপরীতধর্মী বহু সৎগুণের সমাবেশ ঘটেছিল। ফলে তিনি দেশ ও জাতির অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

২১৭. আলহাজ মওলানা মাহমুদুর রহমান, সাবেক শিক্ষক, টইটং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পেকুয়া, কক্সবাজার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিকতা

আল্লাহ্ তা'আলা ওলিগণের মর্যাদা সাধারণ মানুষের সামনে বিকশিত করার জন্য কতকগুলো অলৌকিক ক্ষমতা দান করেন, যেগুলোকে শরি'আতের পরিভাষায় 'কাশ্ফ ও কারামাত' বলে। এ কাশ্ফ-কারামাত পবিত্র কুর'আন ও হাদিস দ্বারা স্বীকৃত দুটি বিষয়। অবশ্য এগুলো একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছায় প্রকাশিত হয়। এখানে আওলিয়া কিরামের কোনো ভূমিকা নেই। এগুলোর মাধ্যমে যাদের ঈমান নেই তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং যাদের ঈমান আছে তাদের ঈমান আরও সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া সত্যিকারের আল্লাহ্র ওলিগণের জীবনে সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সাধারণ জনগণের জন্য শিক্ষণীয় বহু বিষয় নিহিত থাকে। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

কাশ্ফ

'কাশ্ফ' শব্দের অর্থ কোনো কিছু উন্মুক্ত হওয়া।[২১৮] এছাড়াও এটি অর্ন্তদর্শন, অধিবিদ্যা, আত্মানুন্ধান, রুহানিয়াত, অর্ন্তদৃষ্টি, আলোকদৃষ্টি, আত্মিকবাদ, অতীন্দ্রিয়তা ও সূক্ষ্মদর্শন-শক্তি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২১৯] শরি'আতের পরিভাষায় কাশ্ফ[২২০] হলো, আল্লাহ্র ওলিদের কাছে অদৃশ্য কোনো জিনিস কিংবা অজ্ঞাত কোনো বিষয় আল্লাহ্র ইচ্ছায় উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া।[২২১] পবিত্র কুর'আনে হযরত ইয়াকুব (আ.) হাজার মাইল দূর থেকে হযরত ইউসুফ (আ.) এর শরীরের গন্ধ অনুভব করার ঘটনা বর্ণিত আছে; যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ

অর্থাৎ 'অতঃপর যাত্রীদল যখন বাহির হয়ে পড়ল (মিশর থেকে) তখন তাদের পিতা বলল, 'তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না করো তবে (বলি) আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।'[২২২]

'আলিমগণ এ ঘটনাকে হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কাশ্ফ বলে অভিহিত করেছেন। সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মহানবি (সা.)-এর নিকট বহু কবরবাসীর অবস্থান কাশ্ফ হয়েছিল। তিনি কবরবাসীর অনেককে আল্লাহ্র আযাবে আক্রান্ত অবস্থায় দেখেছেন এবং নিজ কানে তাদের কান্নাকাটি শুনেছেন। এভাবে মিরাজের ঘটনায় মহানবির হাতের তালুতে বায়তুল মুকাদ্দাসের চিত্র ফুটে ওঠা, খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননকালে সান'আ[২২৩] ও মাদায়েন নগরদ্বয় দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত হওয়া, মদিনায় বসে হাবশার সম্রাট নাজাশির মৃত্যুসংবাদ লাভ করা প্রভৃতি মহানবি (সা.)-এর কাশ্ফেরই অন্তর্ভুক্ত

২১৮. ইব্ন মনযুর, *লিসানুল 'আরব*, পূর্বোক্ত, খ.৯, পৃ. ৩০০; আবুল কাসিম ইসমাঈল ইব্ন 'আব্বাদ, *আল-মুহিত ফিল লুগাহ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ২৬

২১৯. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *যথাশব্দ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪), পৃ. ৫৫

২২০. কাশ্ফ সাধরণত দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক. বস্তু ও বস্তুজগৎ সম্পর্কে কিছু কাশ্ফ হওয়া। তাসাওউফের পরিভাষায় এটাকে مُكَاشَفَاتْ كَوْنِيَةْ অর্থাৎ বস্তু ও বস্তজাগতিক কাশফ বলে। দুই. আল্লাহ্ তা'আলার মা'আরিফত ও রহস্য সম্পর্কে কাশ্ফ হওয়া। তাসাওউফের পরিভাষায় এটাকে مُكَاشَفَاتْ إِلٰهِيَةْ অর্থাৎ ঐশী ও ঊর্ধ্বজাগতিক কাশ্ফ বলে।

২২১. ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই, *বাসায়েরে হাকিমুল উম্মত* (করাচি : সাঈদ কোম্পানি, ১৯৮৯), পৃ. ২১৫-১৬

২২২. আল-কুর'আন, ১২ : ৯৪

২২৩. ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর; এটি ইয়েমেনের উত্তর অংশে অবস্থিত।

ছিল।[২২৪] সাহাবায়ে কিরাম থেকেও বহু কাশ্‌ফ বর্ণিত আছে; যেমন : আমিরুল মু'মিনিন হযরত 'উমর (রা.) মসজিদে নববির মিম্বর থেকে ইরানে অবস্থিত নেহাওয়ান্দ যুদ্ধের সেনাপতি হযরত সারিয়া (রা.)-কে ডেকে সতর্ক করা, হযরত 'উসমান (রা.)-এর হত্যাকারী আশতার নাখরি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা ইত্যাকার ঘটনা সাহাবিদের কাশ্‌ফ হিসেবে পরিগণিত;[২২৫] তবে এসব কাশ্‌ফ প্রকাশের ক্ষেত্রে নবি-রাসুল ও পীর-আউলিয়াদের কোনো ক্ষমতা নেই। কবি শেখ সা'দি (রহ.) বলেন,

ز مصرش بوئے پیراہن شنیدی - چرا در چاہ کنعانش نہ دیدی

অর্থাৎ 'হে ইউসুফের পিতা, আপনি মিশরের মতো দূরবর্তী শহর থেকে ইউসুফের জামার ঘ্রাণ অনুভব করলেন; আপনার নিকটস্থ স্থান (কেনান)-এর কূপ হতে তার দেহের ঘ্রাণ অনুভব করলেন না কেন?'[২২৬]

বান্দা সঠিক আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে একটা পর্যায়ে পৌঁছলে তার হৃদয়পট একটি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন আয়নায় পরিণত হয়। ঐ আয়নায় বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তাই তার হৃদয়পটে উদ্ভাসিত কোনো ফিরাসত তথা অর্ন্তদৃষ্টি সাধারণত অবাস্তব হয় না। তাছাড়া বান্দা যখন আল্লাহ্‌কে সঙ্গে নিয়ে দেখে এবং আল্লাহ্‌কে একসঙ্গে নিয়েই শোনে, তখন তার দেখা ও শোনা সবকিছু বাস্তবসম্মত হওয়াই স্বাভাবিক।[২২৭] আল্লামা ড. ইকবাল (রহ.) বলেছেন,

ہاتھ ہے اللہ کا بندۂ مومن کا ہاتھ - غالب وکار آفریں، کارِ کشا وکارساز

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলার হাত সে তো মু'মিনরই হাত, সে হাত তো কার্যকর, কারিগর, বিজয়ী ও বিনির্মাণকারী।'[২২৮]

অন্য বুযুর্গদের মতো মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কেও আল্লাহ্ তা'আলা কাশফের মর্যাদা দান করেছিলেন; ফলে তাঁর জীবনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু কাশ্‌ফ প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাশ্‌ফ বর্ণনা করা হলো :

১. 'রাঙ্গামাটি বায়তুশ শরফ মাদ্‌রাসা'র সাবেক শিক্ষক হাফেয কারি মুহাম্মদ ইদ্রিস বলেন, 'কুমিরাঘোনা বায়তুশ শরফ মাদ্‌রাসা'য় অধ্যয়নকালে আমার চোখে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অভিজ্ঞ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণের পরও দৃষ্টিশক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে; ফলে হাঁটা-চলায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অবশেষে, মাদ্‌রাসার তৎকালীন সেক্রেটারি মরহুম মাস্টার সিরাজুল ইসলামের অর্থানুকূল্যে 'চট্টগ্রাম পাহাড়তলী চক্ষু হাসপাতালে' ভর্তি হই। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার সাহেব আমাকে চশমা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। পরামর্শনুযায়ী চট্টগ্রামের লালদিঘির একটি দোকানে চশমা তৈরির অর্ডার দিই।

---

২২৪. মুহাম্মদ তাফাজ্জল হোসাইন ও ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, *মুজিযার স্বরূপ ও মুজিযা* (ঢাকা : ইসলামিক রিচার্চ ইনিস্টিটিউট, ১৯৯৯), পৃ. ৫০

২২৫. সা'দ উদ্দিন তাফতাযানি, *শরহে আকাইদ আন-নাসাফিয়্যাহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩।

২২৬. শেখ সা'দি, *গুলিস্তাঁ*, পূর্বোক্ত, বাবে দুয়াম, দর আখলাকে দরবেশা, পৃ. ৬০

২২৭. শায়খ মুহাম্মদ যাকারিয়্যা, *শরি'আত ওয়া তরিকত কা তালাযুম* (সাহারানপুর : কুতুবখানা ইশাআতুল উলুম, ১৯৭৮), পৃ. ১৯৯

২২৮. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ সম্পাদিত, *কুতবে জমান*, *শাইখুল আরব ওয়াল-আজম আল্লামা শাহ্ হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রহ. : জীবন*, *কর্ম ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

অতঃপর ধনিয়ালাপাড়াস্থ 'কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফে' কয়েকদিন অবস্থান করি। এ সময় ভয়ে পীর সাহেব হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ থেকে বিরত থাকি; কিন্তু টাকা-পয়সা শেষ হয়ে গেলে তাঁর সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আছরের নামাযের পর দূরদূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থী তাঁর কাছ থেকে দু'আ ও আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করতে লাগলেন। কক্সবাজারের একজন লোক হুজুরকে বললেন, তার ঘর-বাড়ি, টাকা-পয়সা সব ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এ সময় হুজুরের পকেটে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় তাকে নিজ কক্ষে নিয়ে গেলেন। এ সুযোগে আমিও মওলানা নূরুল ইসলাম হুজুরের পরামর্শে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করি। আমি হুজুরকে আমার সমস্যার কথা অবগত করি।

তিনি হালকা ধমক দিয়ে আমাকে বললেন, 'তুই এখানে এসেছিস আজ ১০ দিন হয়ে গেছে; অথচ একবারও আমার সাথে সাক্ষাৎ করিসনি। টাকার প্রয়োজন হয়েছে বিধায় আজ আমার নিকট এসেছিস। অতঃপর এ কয়েকদিন আমার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করতে লাগলেন। শত ব্যস্ততার মধ্যে আমার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের কথা শুনে আমি বিস্মিত হই। এরপর তিনি আমাকে তিনশ টাকা দিয়ে বললেন, 'চশমা নিয়ে আজই মাদরাসায় চলে যাবি।' অতঃপর আমি তাঁর প্রদত্ত টাকায় ক্রয়কৃত চশমা ব্যবহার করতে লাগলাম। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ কৃপায় তাঁর সেই চশমার বদৌলতে আমার চোখের রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছে।[২২৯]

২. 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে'র সাবেক পরিচালক আলহাজ সিরাজুল ইসলাম (১৯৩২–১৯৯৭ খ্রি.) বলেন, 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে' একটি চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন। চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণের জায়গাটি নীচু ছিল। একদিন তিনি 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফে' আগমন করলেন। মাঠের পূর্বদিক পশ্চিমমুখী হয়ে চেয়ারে বসলেন। আমরা সবাই তাঁর চারপাশে অবস্থানরত। হঠাৎ তিনি আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা সবাই পশ্চিম দিকে তাকাও। তোমাদের চোখের জ্যোতি বাড়বে।'

   আমরা তাঁর কথা শুনে মনে করছিলাম, পশ্চিম দিকের সেই পুরানো গর্তটি ভরাট করার কারণে খুশী হয়ে এ উক্তি করেন। অবশ্য পরে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম, বাস্তবে তা নয়। আল্লাহ্ তা'আলার কামেল বান্দার এ উক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অদূর ভবিষ্যতে ঐ স্থানে একটি চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হবে। এর দ্বারা লক্ষ-কোটি মানুষ চক্ষু চিকিৎসার মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। তাই তিনি আমাকে বলেছিলেন পশ্চিম দিকে তাকাতে। তিনি অন্তরচক্ষু দিয়ে ঐ স্থানে একটি চক্ষু হাসপাতাল দেখতে পেয়েছিলেন। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ অত্যাধুনিক চক্ষু হাসপাতাল' নামে বাস্তব রূপ লাভ করেছে।[২৩০]

৩. 'আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ'-এর ঢাকা শাখার সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, আমি হজে যাওয়ার নিয়ত করি; কিন্তু এ সময় আমার কাছে নগদ যে টাকা ছিল তা পর্যাপ্ত ছিল না। আমার এক বন্ধু হাতে একটি চিঠি ধরিয়ে দিয়ে বললেন, চিন্তা করো না, মক্কা শরিফের নির্ধারিত এক জায়গা থেকে আমি ভাড়া পাই। আপনি ইচ্ছা করলে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয়

---

২২৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) : জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৮-২১৯

২৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০

টাকা নিতে পারবেন। বিদ্যমান রিয়াল শেষ হয়ে গেলে ঠিকানা অনুসারে আমি ঐ লোকের নিকট যাই। চিঠি দিয়ে নির্ধারিত রিয়াল চাই। কিন্তু ঐ ভদ্রলোক রিয়াল না দেয়ায় আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে খালি হাতেই ফিরে এলাম। পথিমধ্যে আসরের নামায আদায় করে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিলাম যে, আমি আল্লাহ্‌র ঘরের মেহমান। তিনিই আমার সমস্যা সমাধান করবেন।

আমি হেরেম শরিফে এসে বিষণ্ন মনে বসে বসে চিন্তা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরই অপ্রত্যাশিতভাবে অচেনা এক লোক এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কি শহীদুল্লাহ্? প্রত্যুত্তরে বললাম, হ্যাঁ! তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কত রিয়াল দরকার? উত্তরে বললাম, আমার রিয়াল প্রয়োজন; তবে আপনাকে চিনি না বিধায় আপনার কাছ থেকে কেন রিয়াল নেব? এরপর তিনি ঢাকার একখানা ঠিকানা দিয়ে বললেন, চিন্তা করবেন না; সমপরিমাণ টাকা উক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে চলবে। এর দুদিন পর মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনার রিয়ালের সমস্যা সমাধান হয়েছে? তখন আমার বোধগম্য হলো যে, এটি ছিল হুজুরের কাশ্‌ফ।[২৩১]

৪. 'বাংলাদেশ ব্যাংকে'র সাবেক জয়েন্ট ডাইরেক্টর আলহাজ মুহাম্মদ নূরুল আলম বলেন, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র শবে কদর উপলক্ষ্যে 'মসজিদে বায়তুশ শরফ চট্টগ্রামে' উপস্থিত হই। হুজুরের মুনাজাত ও মুলাকাতের পর রাত ২টার জামাল খান লেনস্থ বাসায় ফিরছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত রিকশা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বুকে ভীষণ আঘাত পেয়ে শয্যাশায়ী হয়ে থাকি। প্রতিবৎসর 'মসজিদ বায়তুশ শরফ চট্টগ্রামে' পবিত্র ঈদুল ফিতর নামায আদায় করতাম; কিন্তু দুর্ঘটনাজনিত কারণে সে বৎসর 'চট্টগ্রাম মসজিদ বায়তুশ শরফে' ঈদুল ফিতরের নামায আদায় করতে পারিনি। তাই সেদিন ফজরের নামাযের পর মওলানা মীর মুহাম্মদ আখতর (রহ.)-কে স্মরণ করে দীর্ঘ মুনাজাত করি। কাঁদতে-কাঁদতে একসময় দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

স্বপ্নে দেখতে পাই, পীরসাহেব হুজুর হাতের লাঠির ওপর ভর করে আমার চেহারার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। স্বপ্নে আমি বিছানা থেকে ওঠার চেষ্টা করি এবং চিৎকার করে বলতে থাকি, পীরসাহেব হুজুরকে বসার ব্যবস্থা করে দাও। আশ্চর্যের ব্যাপার; এরপর থেকে ক্রমান্বয়ে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করি। এরপর 'চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ মসজিদে' জুমার নামায আদায় করে হুজুরের সাক্ষাৎ করি। আফসোস করে তিনি বললেন, সময়ের স্বল্পতার জন্য বাসায় গিয়ে আমার অসুস্থতার খোঁজখবর নিতে পারেননি। আমি উপরে উল্লেখিত স্বপ্নের কথা তাকে বর্ণনা করলে তিনি মুচকি হেসে অন্য লোকের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। ঘটনায় প্রতীয়মান হয়, তাঁর হৃদয়ে আমার দুর্ঘটনার কথা জানা ছিল; যদিও তাঁর নিকট দুর্ঘটনার সংবাদ পৌঁছানো আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আসলে এটি তাঁর কাশ্‌ফ, যা তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে।[২৩২]

৫. 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ'-এর দীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের সাবেক পরিচালক মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম বলেন, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) অত্যন্ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন

২৩১. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) : জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০-২২১

২৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮-২৯

ছিলেন। একদিন আমি নফল রোযা রেখে বায়তুশ শরফের একটি অনুষ্ঠানে মওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেকের সাথে যোগদান করি; কিন্তু রোযার কথা কাউকে বলিনি। ঠিক মাগরিবের আযানের আগে আমি মঞ্চ থেকে নেমে ইফতারের জন্য যাচ্ছি। এমন সময় পীর সাহেব হুজুরের ইঙ্গিতে আমাকে একজন উপরের তলায় নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বললেন, হুজুর আপনাকে ইফতার করতে বলেছেন। আমি তো হতবাক! যা হোক, ইফতার করে মাগরিবের নামায আদায় করে পুনরায় মঞ্চে বসে পড়লাম। নামায শেষে হুজুর আমাকে উপরে ডেকে পাঠালেন। সেখানে রাতের খাবার প্রস্তুত। হুজুর বললেন, রোযা রেখেছেন, এবার খাবার গ্রহণ করুন। 'আমি ইফতার করেছি' বলা সত্ত্বেও হুজুর আমাকে খেতে বাধ্য করলেন। আমি খাওয়া শুরু করলাম। আর তিনি মঞ্চে ফিরে এলেন।[২৩৩]

কারামত

'কারামত' আরবি শব্দ; 'কারমুন' শব্দের ক্রিয়ামূল থেকে উদ্ভূত। অভিধানে 'কারামত' অর্থ সম্মানিত হওয়া, দয়ালু হওয়া, উদার হওয়া। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Dignity, Honour, Respect.[২৩৪] বিভিন্ন মনীষী কারামতের একাধিক সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে সেগুলোর কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো :

১. আল্লামা সা'দ উদ্দিন তাফতাযানি (রহ.) বলেন, هُوَ اَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ مِنْ الوَلِي غَيْرَ مُقَارِنٍ لِدَعْوَى النُّبُوَّةِ. অর্থাৎ 'নবির দাবিদার নন এমন ব্যক্তি থেকে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম কোনো কাজ সংঘটিত হওয়াকে কারামত বলা হয়।'[২৩৫]
২. মুবারক ইবন মুহাম্মদ মাইলির মতে, অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্‌র কোনো আবেদের কাছ থেকে যদি কোনো কার্য সম্পাদিত হয়, তাকে কারামত বলে।[২৩৬]
৩. আবু বকর জাবির আল-জাযাইরি তাঁর 'আকিদাতুল মু'মিন' গ্রন্থে বলেন, কারামত একটি 'ইবাদত, যা আল্লাহ্ তাঁর পছন্দের বান্দাদের দান করেন। এই শক্তি দ্বারা এমন সব অস্বাভাবিক কার্য সংগঠিত হয় যার জন্য সেও প্রস্তুত নয়।[২৩৭]
৪. ড. মওলানা মুশতাক আহমদ বলেন, কোনো পরহেযগার মুসলিম থেকে কোনো অস্বাভাবিক কাজ প্রকাশিত হওয়াকে কারামত বলে।[২৩৮]

প্রখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদ ইবন্ সিনার দর্শনতত্ত্ব অনুসারে কারামত হচ্ছে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। আউলিয়াগণ মানবীয় আচরণের যথার্থতা এবং বহির্জগতের বস্তুসমূহের ওপর তাদের আত্মিক ক্ষমতা লাভের ফলে এ সকল অস্বাভাবিক ক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম হন।[২৩৯]

---

২৩৩. মুহাম্মদ সিরাজুল হক, 'বায়তুশ শরফের পরম শ্রদ্ধেয় পীর ছাহেব (র.)-এর সান্নিধ্যে', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া* (স্মরণ সংখ্যা ১), পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

২৩৪. D. Rohi Baalabak, *AL-Mawrid* (Bairuit : Daruf Marif, 1988), p. 890

২৩৫. সা'দ উদ্দিন তাফতাযানি, *শরহে 'আকাইদ নাসাফি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

২৩৬. মুবারক ইবন মুহাম্মদ সাইলি, *আশ-শিরক ওয়া মাজাহিরুহু* (মদিনা মুনাওয়ারা : মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৭), পৃ. ১২৭

২৩৭. আবি বকর জাবের আল-জাযাইরি, *আকিদাতুল মু'মিন* (জেদ্দা : দারুশ শারক, ১৯৮৭), পৃ. ১৭৭

২৩৮. মওলানা ড. মুশতাক আহমদ, *শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৮

২৩৯. Muhammad Qasim Syed, *The Encyclopedia of Islam* (London : Luzav co new, 1965), p. 423

কারামতের সহজ সরল অর্থ হলো কোনো অলৌকিক কাজ প্রকাশিত হওয়া। তাই কারামত হিসেবে প্রকাশিত ঘটনা সাধারণত বিস্ময়কর হয়ে থাকে। তবে যে কোনো লোক থেকে প্রকাশিত বিস্ময়কর ঘটনাকেই কারামত বলা যায় না। যেমন : কোনো যোগী, ঋষি, জাদুকর কিংবা ভণ্ড ফকির ও বিদ‘আতি থেকে যেগুলো প্রকাশিত হয় সেগুলো কারামত নয়।[২৪০] ঐগুলোকে পরিভাষায় ইরহাছ[২৪১] ও ইসতিদ্‌রাজ[২৪২] বলে।

পবিত্র কুর’আনে হযরত মারয়াম থেকে প্রকাশিত একটি কারামাতের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, يَامَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ অর্থাৎ ‘হে মারয়াম! এটি (ফল) তোমার নিকট কোত্থেকে এল ? তিনি উত্তর করলেন, আল্লাহ্ তা‘আলার কাছ থেকে এসেছে।’[২৪৩] সহিহ বুখারি গ্রন্থে সাহাবি হযরত খুবায়ব (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কাফিরদের হাতে বন্দি হন এবং তাঁকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় একটি আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে আটক রাখা হয়, তখন তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে গৃহকর্তা হারিসের জনৈকা কন্যা বললেন,

لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَإِنَّهُ لَمُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ

অর্থাৎ ‘আমি খুবায়বকে প্রকোষ্ঠের ভেতর আঙুরের ছড়া থেকে হাত দিয়ে আঙুর ছিঁড়ে খেতে দেখেছি; অথচ ঐ সময় মক্কার কোথাও আঙুর ফলের নামগন্ধও ছিল না। তাছাড়া খুবায়ব নিজেও ছিলেন ঘরের ভেতর শক্ত লৌহশৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ।’[২৪৪]

সাহাবি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একখানা হাদিসে আছে,

كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَإِذَا نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، حَتَّى تَفَرَّقَا، فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَعَهُمَا

অর্থাৎ ‘হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা.) ও হযরত আব্বাদ ইবন বিশর (রা.) একদা অন্ধকার রাতে মহানবি (সা.)-এর দরবারে ছিলেন। উভয়ে যখন মহানবি (সা.)-এর দরবার

---

২৪০. মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দিন, *আহকামে যিন্দেগী* (ঢাকা : মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ, ১৯৯৯), পৃ. ৫৫

২৪১. ইরহাছ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো : চিহ্ন, নিদর্শন, লক্ষণ ও আলামত। মু‘জামুল ওসিত অভিধান প্রণেতা বলেন, الأمر الخارق للعادة يظهر للنبي قبل بعثته অর্থাৎ ‘নবিগণ নবুয়ত লাভের পূর্বে তাদের থেকে অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ পেলে তাকে ‘ইরহাছ’ বলা হয়। অর্থাৎ নবিগণ নবুয়ত লাভের পূর্বে ভূমিকা হিসেবে যে সমস্ত অস্বভাবিক ঘটনা প্রকাশিত হয় সেগুলোকে ইরহাছাত বলা হয়। দ্র. ইবরাহিম মাদকুর, *আল-মু‘জামুল ওসিত* (মিসর : দারু লিইশা‘আতিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭২), পৃ. ৩৭৭

২৪২. ইসতিদ্‌রাজ আরবি ‘দারজ্’ ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর আভিধানিক অর্থ, কাউকে টেনে নিকটে আনা, এক স্তর হতে অন্য স্তরে উন্নীত করা, কাউকে ধোঁকা দেয়া ইত্যাদি। আল্লামা সা‘দ উদ্দিন তাফতাজানি বলেন, هُوَ أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَخْرُجُ مِنَ الْكَافِرِ أَوِ الْمُشْرِكِ حَسْبَ دَعْوَتِهِ অর্থাৎ ‘ঈমান এবং সৎ কার্যের সাথে জড়িত না, এমন লোক থেকে অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ পেলে তাকে ইসতিদ্‌রাজ বলে।’ দ্র. আল্লামা সাদুদ্দিন তাফতাযানি, *শরহুল ‘আকাইদ আন্-নাসাফিয়্যা* (চট্টগ্রাম : কুতুবখানা যমীরিয়া, তা. বি.), ১৪৫; আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) বলেন, ‘আল্লাহ্ তা‘আলার ভালোবাসার বান্দাহ্‌দের মধ্য থেকে যে কারামত প্রকাশিত হয় এগুলো তাদের ইয়াকিন বৃদ্ধির কারণ এবং এর দ্বারা তাদের ‘মুজাহাদা’-র পরিপক্বতা এবং চরিত্রগত উন্নতি সাধিত হয়; কিন্তু এগুলো যদি এমন লোক থেকে প্রকাশ পায় যারা ইসলামের সত্যিকার অনুসারী নয়, তাহলে সে এর পরবর্তীকারণ এবং এর ধোঁকা ও বোকামির মাধ্যমে পরিণত হয়। শরি‘আতের দৃষ্টিতে এগুলো অবশ্যই নাজায়েয বা হারাম। দ্র. সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২), খ.৩, পৃ. ২২৬-২৭

২৪৩. আল-কুর’আন, ৩৭ : ৫৪

২৪৪. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল বুখারী, *আল-জামি‘আস-সহীহ*, খ.১, পূর্বোক্ত, বাবুন গাযওয়াতুর রজি‘যি ওয়া রি‘লিন..., হাদিস নং ৩৭৭৭, ৪০৮৬, পৃ. ৪৮৯; মুহাম্মদ ইব্‌ন হিব্বান, *সহিহ ইব্‌ন হিব্বান*, হাদিস নং ৭১৬৫, পৃ. ১১৮

থেকে প্রস্থান করলেন, তখন দু'টি আলোকবর্তিকা তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলো এবং তাদের সাথে পথ চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর রাস্তার মোড়ে পৌঁছে তারা যখন পৃথক হয়ে গেলেন, তখন আলোকবর্তিকাগুলোও পৃথক হয়ে তাদের দু'জনের সাথে চলে গেল।'[২৪৫]

হাদিসে বর্ণিত এ সব ঘটনা ছিল বস্তুত সাহাবিদের কারামত; তবে পরবর্তী যুগে এ ধরনের ঘটনা বেশি দেখা গেছে; যাতে এর মাধ্যমে ঈমানদারদের ঈমান আরও সুদৃঢ় হয়। অধিকন্তু, আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ অর্থাৎ 'তা তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য শুধু সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত-প্রশান্তির জন্য করেছেন।'[২৪৬]

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.) (৭৮০–৮৫৫ খ্রি.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কী ব্যাপার? পরবর্তীদের মতো রাসুলুল্লাহ্‌র সাহাবিদের এত বেশি কারামতের ঘটনা বর্ণিত নেই কেন? তিনি জবাব দিলেন, لِقُوَّةِ إِيْمَانِهِمْ অর্থাৎ 'তাদের অন্তরের মজবুতির জন্য এত বেশি কারামাতের প্রয়োজন ছিল না।'[২৪৭] কাশ্‌ফ ও কারামাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা ওলিদের সম্মান বৃদ্ধি করে থাকেন।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর একজন সংস্কারক, ওলি ও আধ্যাত্মিক সাধক। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মুজাদ্দিদ বা ধর্মসংস্কারকরূপে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, কারামত প্রকাশ করার জন্য পাঠাননি। কারামত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি প্রায়ই বলতেন, الاستقامة فوق الكرامة অর্থাৎ 'শরি'আতের ওপর অবিচল থাকতে পারা সকল কারামাতের ঊর্ধ্বে।'[২৪৮] তিনি আরও বলতেন,

> 'আমি যে কুর'আন, হাদিসের মহামূল্যবান বাণীসমূহ সমুদ্রের তলদেশ থেকে মণি-মাণিক্যের মতো কুড়িয়ে এনে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি এগুলোই হলো আমার কারামত; তোমরা এর অনুসরণ করলেই জীবনে সফলতা লাভ করবে।'[২৪৯]

তিনি কারামাতকে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন না। তাঁর মতে, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তিনি বলতেন, কাশ্‌ফ ও কারামাতের পিছনে ছোটাছুটি করার চেয়ে সুন্নতের অনুসরণ করা ও এর ওপর অবিচল থাকাই শ্রেয়; তবে সুন্নাতের অনুসরণের সাথে-সাথে এ মর্যাদাপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট অনুগ্রহ। তিনি বিভিন্ন সময় এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, 'কারামত দেখিয়ে লোক বশীভূত করার' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। তাঁর সামনে কেউ তাঁর কারামত বর্ণনা করলে তিনি নাখোশ হতেন। যদিও কাছের ও দূরের অনেক ভক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর অনেক কারামত দেখেছেন। বিপদে-মুসিবতে অনেকে ফল পেয়েছেন। স্বপ্নযোগে ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা পেয়েছেন। বস্তুত, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে

---

২৪৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি'আস-সহীহ*, খ.১, পূর্বোক্ত, বাবুন মনকাবাতু উসায়দ ইবন হুযায়র ওয়া আব্বাদ ইবন বিশর (রা.), হাদিস নং ৩৫২১, ৩৮০৫, পৃ. ১৬৭

২৪৬. আল-কুর'আন, ৩ : ১২৬; ৮ : ১০

২৪৭. উদ্ধৃত : মওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

২৪৮. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, 'আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩

২৪৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্‌ভী সম্পাদিত, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫, ২৭১; মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

প্রতীয়মান হবে যে, তাঁর সমস্ত জীবনটাই ছিল কারামতপূর্ণ। তিনি সাধারণ লোকের কল্পানাতীত অগণিত কাজ অনায়াসেই করেছিলেন। তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা, শ্রম সহিষ্ণুতা সবকিছুই অলৌকিক ঘটনা। তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু অলৌকিক ঘটনা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ জামে' মসজিদে'র সাবেক ইমাম মওলানা তাহেরুল ইসলাম (জন্ম ১৯৪৭) বলেন, ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে খন্দকিয়ায় অবস্থানকালে সেহেরি খাওয়ার পর আমি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর কক্ষে প্রবেশ করার মনস্থ করি। তখন আমি কক্ষে কিছু অপরিচিত লোক দেখতে পাই; যাদের দেখে আমি অনেকটা বিস্মিত ও ভীত হই। কিছুক্ষণ পর তারা চলে গেলে আমি হুজুরের নিকট এসব অপরিচিত লোকদের ব্যাপারে জানতে চাই। তিনি বলেন, এরা হচ্ছে জিন্নাত। তাদেরকে তরিকতের সবক দেয়ার জন্য আমার পীর-মুর্শিদ (রহ.) প্রেরণ করেছেন।[২৫০]

২. বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ তাহের সোবহান (জন্ম ১৯৩৪) বর্ণনা করেন, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর কৃষি সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী চিন্তা ছিল। তিনি থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে গিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, কচুরিপানা দিয়ে কিছু হয় না?' আমি তাঁর কথায় হেসেছিলাম। তথায় কৃষির ওপর গবেষণারত একজন বাঙালি ছেলে জানালেন, 'আজ পনেরো দিন হলো চীন থেকে কচুরিপানা সম্পর্কে গবেষণা করে ফিরেছি। কচুরিপানা থেকেই বিউটিফুল টয়লেট্রিজ তৈরি হতে পারে। গবেষকের কাছ থেকে এই তথ্য বেরিয়ে এলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হলাম। পীরসাহেব হুজুর আমাকে বললেন, প্রথমে আমার কথাটা গুরুত্বই দিলে না। অবশ্য আমি আমার কথাটি এমনি বলেছি। আমি যাতে এটাকে কারামত মনে না করি তার জন্য তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন এবং বললেন, সবকিছু প্রচেষ্টারই ফল; সফলতা আল্লাহ্ দেন। যদি অলৌকিক কিছু কামনা করে থাকো তাহলে বুঝতে হবে তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই শেখোনি।[২৫১]

৩. ডা. মোহাম্মদ এমদাদুল হক (১৯৩৫–২০০৩ খ্রি.)-কে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে মওলানার মাতা ফিরোজা খাতুন বলেন, মোহাম্মদ আবদুল জব্বার তখন আমার পেটে। আমি যখন ছয় মাসের গর্ভবতী তখন বৃহস্পতিবার রাতের শেষাংশে তাহাজ্জুদের নামাযের সময় স্বপ্ন দেখি, দিগন্তব্যাপী এক ময়দানের মাঝে একটি নীলোজ্জ্বল বাতি জ্বলছে। আগ্রহের আতিশয্যে আমি বাতিটি ধরতে অগ্রসর হই। বাতিটি সরে নাগালের বাইরে চলে যায়; ধরতে-ছুঁতে পারছি না। মরিয়া হয়ে বারবার চেষ্টা করেছি। এমন সময় কে যেন আমাকে নিষেধ করলেন বাতিটি ছুঁয়ো না। নিষেধাজ্ঞা মান্য করে আমি তা ধরার চেষ্টা থেকে বিরত থাকি। তখন বড়ো ছেলে আবদুল কুদ্দসের কান্নায় আমার ঘুম ভেঙে যায়।[২৫২]

৪. মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর আম্মাজান বলেন, আবদুল জব্বারের বয়স যখন ঠিক তিন মাস পূর্ণ হয়, তখন এক জুমু'আর নামাযের পর আমিরাবাদ নিবাসী নুরুদ্দীন ফকির আমাদের ঘরের বারান্দায় বসা ছিলেন। ঐ সময় উঠানের এক পাশে গাছের ছায়ায় আবদুল জব্বার দোলনায় শোয়া ছিল। তাঁর আব্বা জুমু'আর নামায আদায় করে বাড়ি ফিরে বলেন, 'এখন বাইরের লোকজন বাড়িতে আসবে। ছেলেকে কেন উঠানে দোলনায় রেখেছ। 'একথা বলা শেষ না হতেই আবদুল

---

২৫০. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্ভী সম্পাদিত, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

২৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯-৭০

২৫২. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্ভী সম্পাদিত, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

জব্বার কাত হয়ে 'আল্লাহ্-আল্লাহ্' যিকির করতে শুরু করে। তার যিকিরের শব্দ আমরা সবাই স্পষ্ট শুনতে পাই। তখন নূরুদ্দীন ফকির দৌড়ে গিয়ে দোলনা থেকে আবদুল জব্বারকে কোলে তুলে নিলেন। চুমু দিয়ে আদর করতে করতে ছেলেকে আব্বার কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি ছেলের মায়ের সাথে একটু কথা বলতে আপনার অনুমতি চাই। এ ছেলেটি একদিন আল্লাহ্ওয়ালা হবে। একথা বলে নূরুদ্দীন ফকির ছেলের সারা শরীরে, মাথায় হাত বুলিয়ে কানে ও মুখে ফুঁ দিয়ে আমার কোলে তুলে দেন। আবদুল জব্বারের বয়স ৬ মাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত শব্দ করে 'আল্লাহ্-আল্লাহ্' যিকির করত। ৬ মাসের পর এ যিকির আর শোনা যায়নি।[২৫৩]

৫. বিশিষ্ট লেখিকা মিসেস জাকিয়া সুফিয়ান বলেন, কক্সবাজারের চকরিয়া গ্রামের বাড়িতে লাকড়ির খোঁচায় হঠাৎ বাম চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হলে মঙ্গলবার ২৮শে মে, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে আমাকে 'চট্টগ্রাম লায়ন চক্ষু হাসপাতালে' ভর্তি করা হয়। সার্জন ডা. মজুমদার আমার চোখের কর্নিয়ায় চিকিৎসা করেন। ২৮ দিন চিকিৎসার পরও চোখের দৃষ্টি ফিরে আসেনি। ডাক্তারের পরামর্শে আমাকে আমার স্বামীর কর্মস্থল 'বাড়বকুণ্ড আনোয়ারা জুট মিলে'র আবাসিক কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক চেষ্টা-তদবিরের পরও চোখের দৃষ্টি ফিরে না আসায় পরিবারের সবাই বিমর্ষ। তখন আমার তিন মেয়ে ও এক ছেলে। বড়ো মেয়ের বয়স মাত্র সাত বৎসর এবং ছোটো মেয়ে দুধের দুশ্চিন্তায় ডান চোখ থেকেও পানি এসে দৃষ্টিশক্তি ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। আমি তখন প্রায় অন্ধ।

উল্লেখ্য, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ই জুন, সোমবার, বিকাল ৫টার সময় হঠাৎ মাসিক 'দ্বীন দুনিয়া'র তৎকালীন সার্কুলেশন ম্যানেজার মোহাম্মদ শাহজাহান পীরসাহেব হুজুরের পক্ষ থেকে কিছু তোহফাসহ অর্থ-কড়ি নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত। তাঁর পরিচয় জেনে আমি তো বাগরুদ্ধ। পীরসাহেব হুজুরের সাথে আমার পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও তিনি কীভাবে অবগত হলেন যে, চকরিয়ার জাকিয়া নামক এক অতিনগন্যা মহিলা 'লায়ন চক্ষু হাসপাতালে' চিকিৎসাধীন। এ ঘটনার পর থেকে পীরসাহেব হুজুরের সাথে সাক্ষাতের জন্য মন আনচান করতে লাগল। তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে রইলাম। তখন 'আনোয়ারা জুট মিলে' কর্মরত নোয়াখালী নিবাসী সিকিউরিটি গার্ড জনাব তোফায়েলের সাথে আমাদের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। তিনি আমার চোখের অবস্থা দেখে একপর্যায়ে কেঁদে ফেললেন; প্রতিজ্ঞা করলেন, যে করেই হোক পীরসাহেবের সাথে আমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবেন। অতঃপর আমি আমার স্বামী সন্তানসহ এক বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাজের পর জনাব তোফায়েলের সহযোগিতায় ধনিয়ালাপাড়া পীরসাহেবে হুজুরের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাই। অনেকদিন পর হারানো পিতার সাক্ষাৎ ঘটলে যেরূপ হয়, আমার অবস্থাও তদ্রূপ হলো। কান্নাজড়িত কণ্ঠে অনেক কিছু বলতে গিয়ে কিছুই বলতে পারলাম না। তিনি বললেন যে, মহিলাদের সাথে তিনি সাক্ষাৎ দেন না; তবুও তিনি দয়াপরবশ হয়ে মুখে-মুখে আমাকে তরিকতের কিছু শিখিয়ে দিলেন। উভয় চোখে 'ফুঁ' দিয়ে বলেন, ক্রমান্বয়ে চোখের দৃষ্টি ফিরে আসবে। ইনশাআল্লাহ্! আলহামদুলিল্লাহ্, হুজুরের দু'আর বরকতে আমার চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ফিরে পাই।[২৫৪]

---

২৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

২৫৪. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, জাকিয়া সুফিয়ান, 'আমার দিশারী', *জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৮), পৃ. ৫৯-৬০

শিক্ষণীয় ঘটনাবলি

মানুষের মৌলিক গুণাবলি যাচাই করার সর্বোৎকৃষ্ট মানদণ্ড হলো তার জীবনের ছোটো-ছোটো ঘটনা। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে খুব গুরুত্ব দেয়া হয় না; অথচ জীবনের এসব ঘটনার নিরিখেই ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় নিরূপিত হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ব্যাপারেও ইসলামের আদর্শ ও 'আযিমত (শরি'আতের আবশ্যিক বিধান) রক্ষা করে গেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি কাজ অন্যের জন্য শিক্ষণীয় ছিল। বস্তুত, একজন আলিমে দীনের জীবনযাত্রা এ ধরনেরই হওয়া উচিত। সাধারণ মুসলিমগণ কুর'আন-হাদিসের গভীর জ্ঞান রাখে না; ধর্মের বিধান বলতে আলিমগণের কথা, কাজ ও জীবনাচার অনুসরণ করাই বোঝেন। হাদিসের মর্ম অনুসারে আলিমগণ সমাজের হৃৎপিণ্ড। এ কারণেই ইসলামি শরি'আতে একজন সাধারণ মুসলিমের চেয়েও একজন আলিমকে অধিক সাবধানতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের জীবনে এ নির্দেশের বাস্তব প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। তাঁর জীবনের অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা এখনও লোকমুখে শোনা যায়। কিছু-কিছু ঘটনার বিবরণ জীবনচরিত সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো:

১. মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার এতিমখানার ছাত্রদের চেয়ে নিজ সন্তানকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দিতেন না। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হাফেয মুহাম্মদ আবদুর রহিম 'বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসার ছাত্রাবাসে' সাধারণ ছাত্রের মতো থাকত। পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ ঘটত কালেভদ্রে। প্রতিদিন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার শতশত সাক্ষাতপ্রার্থী ও এতিমদের নিয়ে থাকতেন। আবদুর রহিমের ঐসব গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই তিনিও সময় কাটান পড়ালেখায়। জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আবদুর রহীম শয্যায় শায়িত ছিলেন; উপশমের লক্ষণ নেই।

   হোস্টেল সুপার পীরসাহেব হুজুরের নিকট গিয়ে বললেন, আবদুর রহীমের শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। চিন্তিত মনে ছেলের চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শিক্ষকরা বললেন, চিকিৎসা তো চলছে কিন্তু অসুস্থ রোগীর জন্য হোস্টেলকক্ষ অনুকূল নয়। তাকে আপাতত কয়েকদিনের জন্য হলেও তাঁর (পীরসাহেব হুজুরের) সাথে হুজরায় থাকার সুযোগ দিলে ভালো হয়। একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বজ্রকণ্ঠে তিনি পালটা প্রশ্ন করলেন, 'আবদুর রহীম অসুস্থ হলে পিতার কাছে থাকবে কিন্তু এতিম বা অন্য ছাত্রদের অসুখ হলে কার কাছে থাকবে ?' এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও বললেন, 'আমার বিশ্বাস ছিল যোগ্যতা দেখে অপনাদেরকে মাদ্‌রাসায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে, কিন্তু আজ আমি বড়ো কষ্ট পেলাম। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে আপনাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মাদ্‌রাসা কমিটির কাছে সুপারিশ করব।'[২৫৫]

২. তাঁর দান হিন্দু, মুসলিম জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে খুলনার রূপসাঘাটস্থ খ্রিষ্টান পাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে স্বহস্তে নগদ অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী প্রদান করেছেন। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে সমুদ্র উপকূলবর্তী চট্টগ্রামের বাঁশখালীর জেলে পাড়ায় শত শত হিন্দু পরিবারকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। 'বিধর্মীদের কেন সাহায্য করছেন ?'

২৫৫. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) : জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০

এরূপ প্রশ্ন করা হলে তিনি রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি নিজে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী (না খেয়ে) অভুক্ত থাকে সে প্রকৃত মু'মিন নয়।'[২৫৬] এখানে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিবেশীর হকের কথা বলেছেন; নির্দিষ্ট করে মুসলিমগণের কথা বলেননি। সুতরাং, রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাত হিসেবে বিপদগ্রস্ত অমুসলিমদের সাহায্য করা আমার ঈমানি দায়িত্ব । এমনও হতে পারে তারা নবি (সা.)-এর এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম কবুল করবে।[২৫৭] ঠিক তা-ই হয়েছে; তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শতাধিক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

৩. মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ইসলামের সত্যিকারের গণতান্ত্রিকতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। তার অনেক প্রমাণের মধ্যে একটি হলো, উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা। তিনি কোনো উত্তরাধিকারী নির্বাচন করে যাননি। নিজের উপযুক্ত পুত্র থাকা সত্ত্বেও মুরিদদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব স্বীয় মুরিদদের ওপর অর্পণ করে গেছেন। সাম্প্রতিককালে এটি একটি বিরল ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা, যা বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।[২৫৮]

৪. মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের জ্যেষ্ঠ ছেলে মওলানা আবদুল হাই নদভী ভারতের উত্তর প্রদেশের দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা, লখনউ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি অনেকটা কর্মহীনভাবে দিন কাটাতে লাগলেন। 'বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা'র শিক্ষক ও মাসিক 'দ্বীন দুনিয়া'র তৎকালীন নির্বাহী সম্পাদক (বর্তমান সম্পাদক) মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ পীরসাহেব হুজুরকে মাদ্‌রাসায় শিক্ষক সংকটের কথা বলেন। তিনি মওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য হুজুরের কাছে সুপারিশ করেন। পীরসাহেব হুজুর মাদ্‌রাসা ও দরবারের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সরাসরি তাঁকে নিয়োগ দান করেননি এবং নিয়োগ দানের সুপারিশও করেননি। বিষয়টি মাদ্‌রাসার প্রশাসক মাস্টার আবুল হোসেন চৌধুরী ও সেক্রেটারি হাজি শামসুল হক (১৯৩৭–২০১২) সাহেবের কাছে উপস্থাপনের অনুরোধ করেন। পরে কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাঁকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, নিয়োগ দেয়ার পর দীর্ঘ তিন বৎসর পর্যন্ত তাকে কোনো বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়নি; সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন।[২৫৯]

৫. 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ মসজিদে'র সাবেক খতিব মওলানা তাহেরুল ইসলাম বলেন, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ৮ শতক জায়গার ওপর 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ মসজিদে'র নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তখন এই জায়গা ছিল ঝোপ-জঙ্গলপূর্ণ ও অনাবাদি। তিনি শ্রমিকদের সাথে নিজ হাতে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করেন; অতঃপর মসজিদের ভিত্তি স্থাপন

---

২৫৬. আহমদ ইবনুল হুসাইন বায়হাকি, *শু'আবুল ঈমান*, খ.৭, পূর্বোক্ত, বাবুন মা জাআ ফি ফযলিল মনিহাতি, হাদিস নং ৩১১৭, ৯০৮৯, পৃ. ২৪ ও ৩৯৩

২৫৭. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

২৫৮. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৮৬; মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, 'মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার : একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত', *জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

২৫৯. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, সম্পাদক, মাসিক দ্বীন দুনিয়া ও সিনিয়র শিক্ষক, বায়তুশ শরফ কামিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

করেন।[২৬০] এত বড়ো ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার ঘর মসজিদ নির্মাণে স্বহস্তে কাজ করা থেকে কেউ তাকে বারণ করতে পারেনি।

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সত্যিকারের আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মবাদকে যথাযথ অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে তার প্রকৃতরূপ মানুষের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতা চর্চার মূল চালিকা শক্তি ছিল মানবসেবা। তিনি মানবসেবার মাধ্যমে আজীবন আধ্যাত্মিকতা চর্চা করে গেছেন।

২৬০. মওলানা তাহেরুল ইসলাম, 'হুজুর কেবলা (রহ.) এর আধ্যাত্মিক সাধনা', *আশ্-শরফ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অবদান

- প্রথম পরিচ্ছেদ : শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : গ্রন্থরচনা ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ : জ্ঞান-গবেষণাগার পৃষ্ঠপোষকতা ও যোগ্য ব্যক্তি তৈরি
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র ও ধর্মীয় মাহফিল প্রতিষ্ঠা
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ : মুসলিমগণের ঐক্যের প্রয়াস ও নীতিভিত্তিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : শির্ক-বিদ্‘আতমুক্ত সমাজ গঠন ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অবদান

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ও মানবসভ্যতার প্রাণ। মানবাত্মার সুষম বিকাশ, লালন ও উৎকর্ষ সাধনের একমাত্র মাধ্যম হলো শিক্ষা। তাই সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ বিনির্মাণ এবং আদর্শ চরিত্রবান দেশপ্রেমিক ও দক্ষ নাগরিক তৈরিতে সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা পৃথিবী সৃষ্টি করার পূর্বে সর্বপ্রথম শিক্ষার উপকরণ তথা কলমকে সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَلَمَ অর্থাৎ ‘নিশ্চয় আল্লাহ্ তা‘আলাহ্ সর্বপ্রথম কলমকে সৃষ্টি করেছেন।’[১] অনুরূপভাবে, মহানবি (সা.)-এর প্রতি আল্লাহ্র প্রথম প্রত্যাদেশ ছিল, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ অর্থাৎ ‘পড়ো! তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’[২] মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কুর’আন-হাদিসের এসব মর্মবাণী উপলব্ধি করে সমগ্র বাংলাদেশে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার মানসে নানান প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।

সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা বা বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও প্রথা পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া হলো সমাজসংস্কার[৩]। সাধারণত প্রচলিত সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান ও আইন ইত্যাদি যখন ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে তখন সংশ্লিষ্ট জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজে বৈষম্য, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের সম্মিলিত তৎপরতাকে সমাজসংস্কার বলে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও শির্ক-বিদ্‘আত দূর করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর এ ধরনের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য জাতির কাছে তিনি ‘বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ’ (Reformer) হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। জনৈক কবির ভাষায়,

بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ - بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ

> অর্থাৎ ‘যুগে-যুগে পৃথিবীতে এমন কিছু মহৎ ব্যক্তির অবির্ভাব ঘটে যারা এ বিশৃঙ্খল পৃথিবীকে সংস্কারের মাধ্যমে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে থাকেন।’

---

১. আবু আবদিল্লাহ ‘উবাইদিল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ, *আল্-ইবানাতুল কুব্‌রা* (রিয়াদ : দারুল রা’য়াতে, ১৯৯৪), খ.৬, পৃ. ২৭

২. আল্-কুর’আন, ৯৬ : ১-৫

৩. ‘সম’ও ‘কার’ শব্দদ্বয়ের মাঝে সন্ধি করে ‘সংস্কার’ শব্দ গঠন করা হয়েছে; অর্থ শুদ্ধি (Amendment), শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদি দ্বারা শোধন ও উৎকর্ষসাধন বা মেরামত (Reformation) প্রভৃতি। দ্র. জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭১; শব্দটির আরবি প্রতিশব্দ হলো الإِصْلَاحُ (আল-ইসলাহ)। আভিধানিক অর্থ إِزَالَةُ الْفَسَادِ বা ফাসাদ দূরীভূত করা। দ্র. ইবন্ মানজুর, *লিসানুল ‘আরব* (কায়রো : দারুল হাদিস, ২০০৩), খ.৪, পৃ. ২৩২; আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলি আল-ফায়উমি, *আল-মিসবাহুল মুনির* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪), খ.১, পৃ. ২৯৯; পরিভাষায়, বিরাজমান সকল কলহ, হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করে শান্তি স্থাপন করাকে আল-ইসলাহ বা সংস্কার বলে। সংস্কারের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে সাইয়েদ শরিফ আল-জুরজানি (রহ.) (১৩৪০–১৪১৩ খ্রি.) বলেন, هو إِسْمٌ مِنَ الْمُصَالَحَةِ وهِيَ الْمُسَالَمَةُ بَعْدَ الْمُنَازَعَةِ وفِيْ الشَّرْعِ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعُ بِالتَّرَاضِيْ. অর্থাৎ ‘ইসলাহ অর্থ মীমাংসা করা; অর্থাৎ ঝগড়ার পরে পরস্পর সংশোধিত হওয়া। ইসলামি শরি‘আতে সকল কলহ দূর করে সন্তুষ্টির ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদন করাকেই ‘আল-ইসলাহ’ বা সংস্কার বলা হয়।’ দ্র. সাইয়েদ শরিফ আল-জুরজানি, *কিতাবুত তা‘রিফাত* (করাচি : কদীমী কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ৯৬; মুফতী সাইয়েদ ‘আমীমুল ইহসান, *কাও‘য়াইদুল ফিক্‌হ* (দেওবন্দ : আশরাফী বুক ডিপো, ১৯৯১), পৃ. ৩৫৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রসারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন

ইসলামের প্রচার-প্রসার, যোগ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দা'ঈ এবং আদর্শবান নাগরিক তৈরির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) নবুয়তের প্রাথমিক যুগে হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.) (৫৯৪-৬৭২ খ্রি.)-এর বাড়িতে 'দারুল আরকাম'[৪] নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।[৫] এ প্রতিষ্ঠানে তিনি তাঁর নবদীক্ষিত সাহাবিগণকে গোপনে নামাজ-কালামসহ ইসলামের জরুরি বিষয়সমূহ শিক্ষা দিতেন। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি দ্বিতীয় হিজরিতে (৬২৩ খ্রি.) হযরত মাকরামাহ ইব্নে নওফেল (রা.) নামক আনসারি সাহাবির গৃহে 'দারুল কুর্‌রাহ' নামে একটি কুর'আন শিক্ষার আবাসিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।[৬] রাসুলুল্লাহ্ (সা.) মদিনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম মসজিদে নববি নির্মাণ করে তা 'ইবাদত গৃহ এবং ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র' হিসেবে ব্যবহার করেন।[৭] এ শিক্ষাকেন্দ্রটি পরবর্তীকালে 'সুফ্‌ফা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রত্যেক যুগেই ইসলামের হিতাকাঙ্ক্ষী ও দা'ঈগণ ইসলাম প্রচারের জন্য ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন; বিশেষ করে নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বঙ্গদেশে তারা মসজিদ, মাদ্‌রাসা, খানকা, চিল্লাখানা ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে এ শিক্ষা চালু রাখেন। তবে তেরশ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির (মৃ. ১২০৬ খ্রি.) বঙ্গদেশ জয় করার ফলে এ দেশে ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে বিকাশ লাভ করে।

প্রায় দুইশত বছরের ইংরেজ গোলামির পিঞ্জরে আবদ্ধ থেকে চঞ্চল মানুষগুলো নিষ্ক্রিয় ও ভাবলেশহীন হয়ে পড়েছিল। সে নিমজ্জিত মানুষগুলোকে শিক্ষিত, সমাজসচেতন ও প্রগতিমুখী করার জন্য মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা শুরু করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা শতাধিক। তিনি এসব প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও প্রচলিত শিক্ষার মাঝে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে ছিলেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী ধর্মীয় ও জাগতিক শিক্ষা নিয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। নিম্নে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

---

৪. দারুল আরকাম মাদ্‌রাসা ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক মাদ্‌রাসা। হযরত আরকাম বিন আবু আরকাম রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে তাঁর বাড়িতে এই মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মাদ্‌রাসার প্রধান ছিলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)। উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলি (রা.) সহ ১ম শ্রেণির সাহাবাগণ। এখানে এসেই হযরত 'উমর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্র. শেখ মোহাম্মদ ইবন্ আবদুল ওয়াহাব নজদি, *মুখতাছারু সীরাতির রাসূল* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবি, ১৯৫৬), পৃ. ১৭৭; ড. মোহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ ও ফাতিমা বেগম, 'ইসলামী শিক্ষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস : নববী যুগ ও খিলাফতের যুগ', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৫৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০১৬, পৃ. ১৩৫

৫. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১২

৬. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ও অন্যান্য, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯), পৃ. ১১

৭. ড. আ. ই. ম নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

১. আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠায় মওলানা আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অবদান

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের খ্যাতনামা মুসলিম রাজনীতিক ও সাহিত্যিক মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী[৮] (১৮৭৫–১৯৫০ খ্রি.)-এর স্বপ্ন ছিল চট্টগ্রামে একটি ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। কর্ণফুলী নদীর তীরে এর জন্য স্থানও নির্বাচন করা হয়; কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার দরুন তাঁর লালিত স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করেনি।[৯]

১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরিত করা হয়। ফলে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একটি বেসরকারি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তারই প্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের 'উলামায়ে কিরাম, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, আইনজীবী ও শিক্ষাবিদগণ তা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রাম এর তৎকালীন সভাপতি মওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন (রহ.) (১৯৩১–২০১০ খ্রি.)। তবে তাদের চিন্তা ছিল মসজিদকেন্দ্রিক এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। এদিকে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'The Private University Act. 1992' জাতীয় সংসদে পাশ হলে, মসজিদকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান করার পরিবর্তে স্বতন্ত্র ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পরিষদের সকল সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষী একমত পোষণ করেন।

উদ্যোক্তাগণ প্রথমেই মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর শরণাপন্ন হন। তিনি সাথে-সাথেই এ মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।[১০] প্রাথমিক প্রস্তুতি স্বরূপ

---

৮. মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ২২ আগস্ট, ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার বরমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুন্সি মোহাম্মদ মতিউল্লাহ আর মাতা ওহীমা বিবি। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য 'কলিকাতা হুগলী আলিয়া মাদ্রাসা'য় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে এফ.এ. পাস করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে তিনি রংপুর জেলার হাড়াগাছিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ও সীতাকুণ্ড আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ও প্রগতিশীল 'আলিম ছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি সাংবাদিকতা পেশায়ও নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি ইসলামি আদর্শ প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বহু পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মওলানা ইসলামাবাদী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে 'কৃষক প্রজা পার্টি' হতে 'বঙ্গীয় আইন সভা'র সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ৪২টি গ্রন্থ প্রণয়ন করে ইসলামি নবজাগরণে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন। বাংলার ক্ষণজন্মা এ মুসলিম নবজাগরণের নকিব ও সাহিত্যিক ২৪ অক্টোবর, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২০, পৃ. ১৪৩-৪৪; আবদুল হক চৌধুরী, *বন্দর শহর চট্টগ্রাম* (ঢাকা : গতিধারা প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ২৭৪; সেলিনা হোসেন ও নুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫

৯. কারও কারও মতে তিনি চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার দেয়াং পাহাড়ে ৬ শত একর জমি নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। প্রাথমিকভাবে ১০ লক্ষ টাকার তহবিলও গঠন করা হয়। অবশ্য তখন এর নামকরণ করা হয় 'মওলানা শওকত আলি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়'। মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক এর কর্মকাণ্ডে শরিক হন; তবে পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনাটি স্থায়ী রূপ লাভ করেনি। দ্র. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.) এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০; আ. ব. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২০, পৃ. ১৪৩-৪৪

১০. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক, 'এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের স্মৃতিচারণ', *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সভাপতিত্বে 'বায়তুশ শরফ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে' একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভি. সি প্রফেসর ড. আবদুল করিম (১৯২৮–২০০৭ খ্রি.), ইসলামি সমাজকল্যাণ পরিষদের তৎকালীন সভাপতি মওলানা শামসুদ্দীন (১৯৩১–২০১০ খ্রি.), অধ্যক্ষ এ.এ. রেজাউল করিম চৌধুরী (১৯২৬–২০০১ খ্রি.), প্রফেসর ড. জামাল নজরুল ইসলাম (১৯৩৯–২০১৩ খ্রি.) এবং প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান (১৯২৬–২০২১ খ্রি.) প্রমুখ বরেণ্য শিক্ষাবিদ অংশগ্রহণ করেন। তাতে চট্টগ্রামে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সমাবেশে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে আহ্বায়ক, অধ্যক্ষ এ.এ রেজাউল করিম চৌধুরী এবং মওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৬ অক্টোবর, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে উপরি-উক্ত মনীষীসহ অন্যদের সমন্বয়ে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করা হয়। কমিটির অহর্নিশ কর্মতৎপরতায় Bangladesh Private University Act. 1992-এর অধীনে ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম' প্রতিষ্ঠার অনুমোদন লাভ করে।[১১] পরবর্তীকালে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে এ আইন সংশোধিত হয়ে Private University Act (Amended) 2010 নামে পরিচিতি লাভ করে। তখন Bangladesh Private Univirsity Act. 1992 & revised Act. 2010-এর ৬/২ নং ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্ট গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদানের জন্য ১৭ জনকে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হয়। ২৩ অক্টোবর, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে তা রেজিস্টার্ড করা হয়। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে আমৃত্যু (১৫/০৫/১৯৯৫ থেকে ২৫/০৩/১৯৯৮ খ্রি. পর্যন্ত) দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি নিজ অর্থে একটি কম্পিউটার প্রদানের মাধ্যমে 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে'র ট্রাস্ট উদ্‌বোধন করেন।[১২]

বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ হলেন:[১৩]

ক্রম	নাম	পদবি	ঠিকানা
০১	মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)	চেয়ারম্যান	বায়তুশ শরফ, ধনিয়ালাপাড়া, দেওয়ান হাট, চট্টগ্রাম
০২	মওলানা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন	ভাইস-চেয়ারম্যান	দি মওলানা কমপ্লেক্স, ১১৩৪ পোর্ট কানেকটিং রোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
০৩	আলহাজ্ব মুহাম্মদ বদিউল আলিম	সেক্রেটারি	আবাসিক হাউজিং সোসাইটি, পাঠানপাড়া, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম

১১. রায়হান আজাদ, *চট্টগ্রামের একশ মুসলিম মনীষা*, পূর্বোক্ত, খ.৪, পৃ. ৭৭-৭৮

১২. মুহাম্মদ বদিউল আলিম, *আলোর মানুষেরা*, মওলানা শাহ্ আবদুল জব্বার ও অধ্যক্ষ এ রেজাউল করিম চৌধুরী স্মরণে-ইসলামিক য়ুনিভার্সিটি চিটাগাং ট্রাস্ট, ৭ জুলাই, ২০০১; রায়হান আযাদ, 'বায়তুশ শরফের রূপকার শাহসুফী হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) স্মরণে', *দৈনিক কর্ণফুলী*, ২৬ মার্চ, ২০১২

১৩. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.)-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২; সম্পাদনা পরিষদ, *সংঘ স্মারক* (চট্টগ্রাম : আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ট্রাস্ট, ২০১০), পৃ. ২

০৪	মওলানা মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম	কোষাধ্যক্ষ	২ নং কে. বি. মকবুল হোসেন লেইন, চট্টগ্রাম
০৫	মওলানা কাজী দীন মোহাম্মদ	অফিস সেক্রেটারি	কে ব্লক হালিশহর হাউজিং এস্টেট, চট্টগ্রাম
০৬	প্রফেসর ড. মোহাম্মদ লোকমান	সদস্য	ফাইন্যান্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
০৭	প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান	সদস্য	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
০৮	প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ	সদস্য	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
০৯	মওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী	সদস্য	বি. আই. এ. দেওয়ানজী পুকুর লেইন, চট্টগ্রাম
১০	অধ্যক্ষ মওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের	সদস্য	এম. আর. ম্যানশন (দোতলা), ৬০ দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম
১১	এডভোকেট শামসুদ্দীন আহমদ মীর্জা	সদস্য	৪ বংশাল রোড, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম
১২	এডভোকেট ফিরোজ আহমদ চৌধুরি	সদস্য	৪৪৭ হিল ভিউ সোসাইটি, আরেফিন লেইন, পূর্ব নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম
১৩	অধ্যাপক আহসান উল্লাহ	সদস্য	এম. ই. এস কলেজ, চট্টগ্রাম
১৪	জনাব মুহাম্মদ নুরুল্লাহ	সদস্য	নিশান প্রেস, ৫০ সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম
১৫	জনাব এ. এফ. এম. হাসান	সদস্য	৯১, নবাব সিরাজুদ্দৌলা রোড, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম
১৬	জনাব আজিজুর রহমান	সদস্য	২৯, সতীশ বাবু লেইন, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম
১৭	ড. শায়খ আবদুল্লাহ আবদুর রশিদ	সদস্য	মক্কা, সৌদি আরব।

১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র তিনটি ফ্যাকাল্টির অধীনে তিনটি বিভাগ[১৪] নিয়ে চট্টগ্রামের চকবাজারস্থ প্যারেড ময়দান সংলগ্ন একটি অস্থায়ী ক্যাম্পাসে 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'-এর যাত্রা শুরু হয়। ১ আগস্ট, ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে 'বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টে'র চেয়ারম্যান মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর দু'আ ও মুনাজাতের মাধ্যমে মাত্র ৪৩ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান শুরু হয়।[১৫] কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে ২০ জন, বিবিএ-তে ১৮ জন এবং কুর'আনিক সায়েন্সের ৪ জন ছাত্র নিয়ে বহদ্দারহাট সি. ডি. এ-তে একটি ভাড়া করা ভবনে ছাত্রাবাস চালু করা হয়। 'বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্ট' ২১ এপ্রিল, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

১৪. সেগুলো হলো : (ক) শরি'আহ ফ্যাকাল্টির অধীনে কুর'আনিক সায়েন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ (খ) মডার্ন সায়েন্স এর অধীনে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ (গ) এডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্স এর অধীনে বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ। দ্র. অধ্যাপক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ও হযরত শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩-১১৪

১৫. জ. ই. মামুন, 'কেমন চলছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়', *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭, পৃ. ১

গ্রহণ করে। অবশেষে সীতাকুণ্ড থানার জোড়া আমতল গ্রামে চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে কুমিরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়।

২৮ মার্চ, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের শুভযাত্রা শুরু হয়। একই দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনও অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর অধ্যাপক এ.কিউ.এম বদরুদ্দোজা চৌধুরি (জন্ম ১৯৩২ খ্রি.) এর শুভ উদ্‌বোধন করেন। স্থায়ী ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরু হয় ৮ অক্টোবর, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে এ স্থায়ী ক্যাম্পাসে পাঠদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে ০৫টি অনুষদের অধীনে ১২টি বিভাগে দেশ-বিদেশের প্রায় ১৬ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে।[১৬] তিনতলা বিশিষ্ট ভবনে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার রয়েছে। এতে রয়েছে প্রায় ১,৫০,০০০ হাজার গ্রন্থ।

উল্লেখ্য যে, ইউজিসির নেতৃত্বাধীন সরকারি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টিমের মূল্যায়নে IIUC দেশের সেরা ৯টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম হওয়ার গৌরব অর্জন করে।[১৭] ইতোমধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার হিসেবে দেশ-বিদেশে খ্যাতি লাভ করেছে। এভাবে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর আন্তরিক সহযোগিতায় চট্টগ্রামে একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবতার রূপ লাভ করে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর যে ত্যাগ-তিতিক্ষা তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।[১৮] এছাড়া নগরীর ফয়'সলেকে প্রতিষ্ঠিত 'চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউএসটিসি)'-এর জমি বন্দোবস্ত করার ক্ষেত্রেও মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অবদান রয়েছে। ইউএসটিসি এর প্রতিষ্ঠাতা, জাতীয় অধ্যাপক ডা. নূরুল ইসলাম (১৯২৮–২০১৩ খ্রি.) *'জীবনস্রোত'* নামক গ্রন্থে তাঁর এ অবদানের কথা স্বীকার করেন।[১৯]

উল্লেখ্য যে, ২৮ মার্চ, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে রোজ বৃহস্পতিবার 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে'র স্থায়ী ক্যাম্পাসের শুভ উদ্‌বোধন ও প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্ট্রে'র প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে 'মরণোত্তর ক্রেস্ট' প্রদান করা হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী (জন্ম ১৯৬৪ খ্রি. সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. এ. কিউ. এম বদরুদ্দোজার (জন্ম ১৯৩২ খ্রি.) কাছ থেকে ক্রেস্ট গ্রহণ করেন।[২০]

---

১৬. প্রফেসর, ড. আবু বকর রফীক, সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১৭. মোহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রাহ. এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, ৮৮

১৮. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, অধ্যাপক মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন তালকুদার, 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ও হযরত মাওলানা শাহ্ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫

১৯. রায়হান আযাদ, 'তরীকত, শিক্ষা ও সমাজসেবার অগ্রদূত বায়তুশ শরফের প্রধান রূপকার শাহ্সূফী হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার রহ.', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, ৪১ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, মার্চ ২০২০, পৃ. ২৭

২০. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর প্রথম সমাবর্তন ও স্থায়ী ক্যাম্পাস উদ্‌বোধন কালে বায়তুশ শরফের মরহুম পীর হাদিয়ে যামান শাহ্সূফী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)-কে বিশেষভাবে স্মরণ ও ক্রেস্ট প্রদান', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, ২৩ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মে ২০০২, পৃ. ২৫

(খ) মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বলতে কুর'আন ও হাদিসভিত্তিক শিক্ষাকে বোঝায়; অর্থাৎ ইসলামি বিধিবিধান ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং যেখানে যুগোপযোগী সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কুর'আন, হাদিস, ফিক্‌হ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজ, কম্পিউটার, অর্থনীতি সহ আধুনিক প্রযুক্তিগত বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়, তাকে মাদ্‌রাসা হিসাবে আমরা জানি। ইসলামি সভ্যতায় মাদ্‌রাসা এ সভ্যতার মতই প্রাচীন।[২১]

মানুষের দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতের মুক্তির লক্ষ্যে যে বাণী আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল, তাতেই মাদ্‌রাসা শিক্ষার আক্ষরিক ও পারিভাষিক নির্দেশ ছিল। এ শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক[২২] এবং পরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার[২৩] ধারাবাহিকতার পথ ধরেই মাদ্‌রাসা শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার[২৪] রূপ লাভ করে। রাসুলুল্লাহ্‌ (সা.) প্রথম থেকেই এসব অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং মহাপরিচালক ছিলেন। ইসলামের প্রথম যুগের অধিকাংশ সাহাবি (রা.) এ মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থী ছিলেন। রাসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর অনানুষ্ঠানিক দাওয়াতের প্রশিক্ষিত ছাত্ররাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক মাদ্‌রাসায় শিক্ষার তা'লিম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৫]

হিজরতের পর মদিনার মসজিদে নববিতে 'আহলে সুফফা মাদ্‌রাসা' স্থাপিত হয়। সেখানে মহানবি (সা.) সাহাবিগণকে কুর'আন, হাদিস ও ইসলামের বুনিয়াদি বিষয়সমূহ নিয়মিত শিক্ষা দিতেন। মহানবি (সা.) অনেক সাহাবিকে শিক্ষকরূপে বিভিন্ন গোত্রের মুসলিমগণের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তারা

---

২১. প্রফেসর মুহাম্মদ মনসুরুর রহমান, 'মানবসম্পদ উন্নয়নে মাদ্‌রাসা শিক্ষার ভূমিকা', *প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল* (গাজীপুর : বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নভেম্বর ২০০৭), পৃ. ২০

২২. কোনোরকম আয়োজন ছাড়া যে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদিত হয় তাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। দ্র. আনসার আলী খান, *বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা* (ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০০৬, পৃ. ১৯৭; জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে যে শিক্ষা লাভ করা হয় তাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Informal Education বলে। দ্র. মনসুর মুসা সম্পাদিত, হোসনে আরা বেগম, 'বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন : গণশিক্ষা ও সাক্ষরতার প্রসার', *সুশিক্ষাবর্ষ স্মারক গ্রন্থ* ২০০৩ (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৩), পৃ. ৯২; প্রফেসর নীলুফার রহমান সম্পাদিত, *মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল* (ঢাকা : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, ১৯৯৭), পৃ. ৫; প্রফেসর মোঃ আনসার আলী, *শিক্ষানীতি পরিক্রমা* (ঢাকা : মিতা ট্রেডার্স, ১৯৯৫), পৃ. ৫৬; ডা. মো. আনোয়ারুল আজিজ ও অন্যান্য, *শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন* (ঢাকা : আহছানিয়া মিশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৬), পৃ. ৪৭; আবূ হামিদ লতিফ, *উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ৯

২৩. সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবহির্ভূত শিখন চাহিদা পূরণের জন্য আলাদাভাবে বা সমন্বিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিচালিত শিক্ষামূলক কার্যক্রমই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Nonformal Education। দ্র. *উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি*, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (বিএনএফই), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৫; আনসার আলী খান, *বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

২৪. স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট বয়সে, নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম অনুযায়ী স্তরে-স্তরে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা Formal Education বলে। দ্র. হোসনে আরা বেগম, মনসুর মুসা সম্পাদিত, 'বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন : গণশিক্ষা ও সাক্ষরতার প্রসার', সুশিক্ষাবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, ২০০৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২; আনসার আলী খান, *বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০; প্রফেসর নীলুফার রহমান সম্পাদিত, *মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬; *সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষাকার্যক্রম ব্যবস্থাপনা*, পৃ. ৬১

২৫. ড. মো. আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সমাজজীবনে তার প্রভাব* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ৩২০

তাদেরকে কুর'আন, হাদিস, ফরায়েয, প্রাথমিক চিকিৎসা, বংশশাস্ত্র, তাজবিদ ইত্যাদি শিক্ষাদান করতেন। এছাড়া অশ্বচালনা, যুদ্ধবিদ্যা, হস্তলিপিবিদ্যা, শরীরচর্চা ইত্যাদিও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মক্কা বিজয়ের পর নবগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের মসজিদে নিয়মিত কুর'আন পাঠ ও ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষাদানের জন্য মহানবি (সা.) ওয়ালি তথা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের নির্দেশ দান করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর খোলাফায়ে রাশেদিন এ মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারে দায়িত্ব পালন করেন; বিশেষ করে হযরত ওমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে নতুন নতুন অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণপূর্বক সেখানে ইসলামি শিক্ষা প্রসারের ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। হযরত ওমর (রা.) মসজিদগুলোতে নিয়মিত শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করে রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে তাদের বেতন নির্ধারণ করে দেন।[২৬]

উমাইয়া যুগে (৬৬১–৭৫০ খ্রি.) বিশেষ করে হযরত 'উমর ইবনে আবদুল আযিয (৭১৭–৭২০ খ্রি.) এর 'ইল্‌মে হাদিস সংগ্রহের উদ্যোগের মাধ্যমেই সরকারিভাবে আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষা শুরু হয়।[২৭] এসময় শিক্ষাবিস্তারের জন্য মুসলিম বিশ্বে সরকারি ফরমান জারি ও শিক্ষকদের জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারিত হয়। এ ব্যাপারে তখনকার সরকারি ফরমান ছিল নিম্নরূপ:

> 'যারা পার্থিব সম্পদ বর্জন করে 'ইলমে ফিক্‌হের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, আর্থিক সাহায্য হিসেবে বায়তুল মাল থেকে তাদেরকে একশো দিনার হিসাবে দেয়া হবে।'[২৮]

বাগদাদের 'বায়তুল হিকমাহ্' তৎকালীন যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র ছিল। পরবর্তীকালে মিশরে ফাতেমীয় খিলাফতকালে (৯০৯–১১৭১ খ্রি.) এবং স্পেনে উমাইয়া খলিফা তৃতীয় আবদুর রহমানের (৮৯১–৯৬১ খ্রি.) যুগে তৎকালীন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাগুলো গড়ে ওঠে। আব্বাসীয় যুগে উজির খাজা নিযামুল মুলক (১০১৮-১০৯২ খ্রি.) এবং ফাতেমীয় খলিফার প্রতিষ্ঠিত মিশরের 'আল-জামিআ' আল-আযহার' এখন বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত।[২৯]

বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি (মৃ. ১২০৬ খ্রি.) ১১৯৭ মতান্তরে ১২০১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা জয় করে নদীয়ার (রাজধানী) পরিবর্তে রংপুর নামে একটি শহরের পত্তন করেন। অতঃপর বহু মসজিদ, মাদ্রাসা এবং খানকা স্থাপন করেন।[৩০] *'তারিখে ফেরেস্তা'*-য় এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে,

২৬. প্রফেসর মুহাম্মদ মনসুরুর রহমান, 'মানবসম্পদ উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা', *প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

২৭. মুহাম্মদ আলমগীর, *ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৩২

২৮. ইবনুল কাইয়্যিম ইবন জাওজী, *সিরাতে ওয়া মনাকিবে 'উমর ইব্ন 'আব্দিল 'আযিয আল-খলিফাতুয যাহিদ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪), পৃ. ৯৫

২৯. প্রফেসর মুহাম্মদ মনসুরুর রহমান, 'মানব সম্পদ উন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষার ভূমিকা', *প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২১

৩০. মিনজাহ-ই-সিরাজ, আ. কা. ম. যাকারিয়া অনূদিত, *তকাতে-ই-নাসিরী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), পৃ. ১৫; ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ১; ডক্টর এ. কে. এম নুরুল আলম, *ইসলামী দা'ওয়ার মর্মকথা ও ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য* (ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২), পৃ. ১৪৬; আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০২), পৃ. ২০২

ودر سرخد بنغله در عوض شهر ندیه شهر موسم به رنگپور بنا کرده دار الحکومت خود ساخته ومساجد وخانقاه ومدارس

وشهر وولایت برہم اسلام داده زتمام مذین و محلی گردانید.

অর্থাৎ 'নদিয়া রাজধানীর পরিবর্তে বাংলার সীমানায় রংপুর নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে অনেক মসজিদ, খানকা ও মাদ্‌রাসা গড়ে ওঠার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।'[৩১]

সুলতান প্রথম গিয়াস উদ্দিন ১২১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। বাংলার শাসকর্তা নিযুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরেই একটি সুরম্য মসজিদ, মাদ্‌রাসা এবং প্রবাসীদের জন্য লক্ষ্মণাবতীতে সরাইখানা স্থাপন করেন।[৩২] সুলতান গিয়াস উদ্দিন জ্ঞানী-গুণীদের বিশেষ সম্মান করতেন। ইতিহাসবিদ মিনহাজউদ্দিন তাঁর '*তবকাতে নাসেরি*'-তে এ প্রসঙ্গে বলেন,

مجامع ومساجد بنا کرد واهل خیررا از علماء ومشائخ وسدات ادارت داد

অর্থাৎ 'তিনি অনেক মিলনায়তন ও মসজিদ নির্মাণ করেন। কল্যাণকামী 'আলিম পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা ও আনুকূল্য প্রদর্শন করেন।'[৩৩]

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের শাসনামলে (১২৬৬–১২৮৭ খ্রি.) বাংলার বিখ্যাত সুফি শেখ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা[৩৪] (রহ.) ও তদীয় শিষ্য শেখ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানেরি (রহ.) বাংলাদেশের সোনারগাঁওয়ে মসজিদ নির্মাণ করে তৎপার্শ্বে মাদ্‌রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হন। কালক্রমে সোনারগাঁওয়ের মসজিদভিত্তিক এ শিক্ষা[৩৫] কেন্দ্রটি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামি শিক্ষার

---

৩১. মুহাম্মদ কাসিম হিন্দু শাহ আস্তারাবাদে, *তারিখে ফেরেস্তা* (তেহরান : আন্‌জুমনে আছারে ওয়া মফাখিরে ফরহাঙ্গি, ১৯৭৩), খ.২, পৃ. ৩৩

৩২. *Archeological survey of India*, 1861, Vol X VI, p. 76 ; ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ২

৩৩. মিনজাহ-ই-সিরাজ, আ. কা. ম. যাকারিয়া অনূদিত, *তকাতে-ই-নাসিরি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), পৃ. ১৫

৩৪. শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (রহ.) ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাদপীঠ বোখারা নগরে জন্মগ্রহণ করে খোরাসানে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের শাসনামলের প্রথম দিকে আনুমানিক ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দিল্লিতে আগমন করেন এবং তথায় ইসলামি শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক দীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর ইসলাম প্রচারে দিল্লিবাসী মুগ্ধ হয়ে পড়লে তাঁর জনপ্রিয়তা ভীত হয়ে সুলতান তাঁকে বাংলার সোনারগাঁয়ে নির্বাসন দেন। এখানে তিনি একটি মসজিদ ও খানকা নির্মাণ করে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তাঁর শিক্ষালয়ে দূর দুরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা সমবেত হতো। তাঁর প্রচেষ্টায় কালক্রমে সোনারগাঁও ইসলামি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানে পরিণত হয়। এখানে আজীবন ইসলামি শিক্ষা প্রচার করে তিনি ১৩০০ খ্রি. ইন্তিকাল করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫; ডক্টর মুহাম্মদ আবদুর রহিম, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩-১১৬; Dr. A. K. M. Ayub Ali, *History of Traditional Islamic Education In Bangladesh* (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1983), p. 16

৩৫. সাধারণত মসজিদকে ভিত্তি করে যে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয় তা-ই মসজিদভিত্তিক শিক্ষা; তবে খোদ মসজিদে অনুষ্ঠিত শিক্ষা কার্যক্রমই কেবল মসজিদভিত্তিক শিক্ষা নয়। মসজিদের বারান্দা, আঙিনা ও মসজিদ সংলগ্ন গৃহে পরিচালিত শিক্ষাও মসজিদভিত্তিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য। এককথায়, মসজিদভিত্তিক শিক্ষা হচ্ছে ইসলামের ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষাব্যবস্থা, যার মাধ্যমে মানুষ ইসলামের মৌলিক রীতিনীতি শিক্ষা করে প্রকৃত মুসলিম হিসেবে তার সার্বিক জীবনযাত্রায় আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাই একমাত্র শিক্ষাব্যবস্থা যা মহানবি (সা.) প্রবর্তিত ঐশী শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মহানবি (সা.) রিসালাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতিকে জ্ঞানের প্রভায় উদ্দীপ্ত করেছেন। দ্র. এম. এস. এম. আবদুল কাদের রহমানী,

পাঠ্যস্থানে পরিণত হয়।[৩৬] বাংলাদেশে আবু তাওয়ামা (রহ.) এর মসজিদভিত্তিক এ মাদ্‌রাসাতেই সর্বপ্রথম 'সহিহাইনের'[৩৭] শিক্ষাদান শুরু হয়। এখান থেকে পরবর্তীকালে এ শিক্ষাধারা বিভিন্নস্থানে প্রসার লাভ করে।[৩৮]

পরবর্তীকালে তাঁর বংশধর সুলতান দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহ্‌ও (মৃ. ১৫১৯ খ্রি.) জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ সম্মান করতেন। তিনি 'দর্‌সে বাড়ি'[৩৯] নামে একটি মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন। হোসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্র নুসরত শাহ্ (মৃ. ১৫৩৩ খ্রি)-এর সাথে বাংলার হোসাইনি বংশের সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তারা দুজনই গৌড়ে বেশ কয়েকটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এসব মাদ্‌রাসার অনেকগুলোর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান।

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশির আম্রকাননে বাংলার মুসলিমগণের শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার (১৭৩৩–১৭৫৭ খ্রি.) দুঃখজনক পরাজয় ঘটলে বাংলার মুসলিমগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেমে আসে ঘোর দুর্দিন। ইংরেজরা ক্ষমতা দখল করলেও তখনও রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফারসি। ফলে সময়োপযোগী চাহিদা পূরণে বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ এবং পরিসংখ্যান বিভাগ পরিচালনার জন্য দক্ষ লোকের অভাব প্রকট আকার ধারণ করে। বাংলার তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৩২–১৮১৮ খ্রি.) বিষয়টি অনুধাবন করে আরবি, ফারসি ও গণিত বিষয়ে পারদর্শী কিছু লোক তৈরির উদ্দেশ্যে ৩ অক্টোবর, ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে 'কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের মেমোরেন্ডামে উল্লেখ ছিল,

> The Calcutta Madrasah was founded by Warren Hastings in 1780 for the training of Muhammadans as officers in the East India Companys Service.[৪০]
> অর্থাৎ দক্ষ প্রশাসক তৈরির উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমের সমস্যা ও সম্ভাবনা : একটি সমীক্ষা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২), পৃ. ৩৭

৩৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩-৪; ডক্টর মুহাম্মদ আবদুর রহিম, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ. ১১৩-১১৭

৩৭. হাদিস শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য ছয়খানা বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থের মধ্যে 'সহিহ্ আল-বুখারি ও সহিহ্ আল-মুসলিম' গ্রন্থদ্বয়কে একত্রে 'সহিহাইন' বলা হয়।

৩৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৩৯. গৌড়ের শহরতলি ও বৃহত্তর রাজশাহী জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন ঘোষপুরে দরসবাড়ি মসজিদ অবস্থিত। এ মসজিদের ধ্বংসস্তূপ হতে সুলতান শামস উদ্দিন ইউসুফ শাহের শাসনামলে (১৪৭৪–১৪৮১ খ্রি.) একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ শিলালিপিতে সুলতান কর্তৃক ১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দে একটি জামে' মসজিদ নির্মাণের কথা উল্লেখ রয়েছে। দরসবাড়ি নাম থেকে অনুমান করা যায় যে, এই মসজিদে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছিল। মসজিদে সাধারণভাবে প্রাথমিক শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা থাকে এই মসজিদে তার চেয়ে উন্নত ও উচ্চশিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। দ্র. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, *রাজশাহীতে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৪৯

৪০. C. L. Thorpe, `Education and the Development of Muslim Nationalism in Pre-Partition India', *Journal of Pakistan Historical Socity,* Vol. XIII, Part-1, 1965, p.12

১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে হেস্টিংসের প্রচেষ্টায় এ মাদ্রাসা সরকারি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে হুগলীতে 'মোহসেনিয়া মাদ্রাসা' নামে দ্বিতীয় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়; যেখানে আরবির পাশাপাশি ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান বিষয়ও শিক্ষা দেয়া হতো।[৪১]

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা কালের পরিক্রমায় একটি স্বতন্ত্র দীনি শিক্ষাব্যবস্থার রূপ লাভ করে বর্তমান অবস্থানে পৌঁছয়। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে 'চৌদ্দ দলীয় মহাজোট সরকার' মাদ্রাসা শিক্ষাধারাতে ও শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে 'ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া'র অধীনে ৩১টি কামিল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়।[৪২]

পরবর্তীকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে 'ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' নামে স্বতন্ত্র আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকায়নের গতিধারায় বিপ্লবী পরিবর্তন আনেন। সূচনালগ্ন থেকেই শিক্ষা, সংস্কৃতি, নৈতিকতার বিকাশ, সুনাগরিক তৈরি এবং আধ্যাত্মিক ও পরকালীন মুক্তির ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) তা উপলব্ধি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স)) মাদ্রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে সুনাগরিক তৈরির লক্ষ্যে ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান' মিলনায়তনে সর্বপ্রথম 'বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করেন। উক্ত সেমিনারে দেশের শীর্ষস্থানীয় 'আলেম-'উলামা, বুদ্ধিজীবী, পীর-মাশায়েখ, সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।[৪৩] সেমিনারে বক্তাগণ যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে এ জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি মডেল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন,

> 'আজকের সেমিনারের পরামর্শ, প্রস্তাব ও সুধীমহলের মতামতের ওপর ভিত্তি করে অচিরেই একটি আদর্শ মাদ্রাসা স্থাপন করা হবে; যেখানে পড়ালেখা করে শিক্ষার্থীরা কুর'আন-হাদিস ও ইসলামি জ্ঞানে পারদর্শী হবে। সাথে সাথে যুগোপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা, প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বগুণে যুগপৎ নামাযের ইমামতি ও সমাজের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।'[৪৪]

---

৪১. Dr. Sekander Ali Ibrahimy, *Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bangladesh*, p. XII

৪২. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইসরামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসার অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৪৩. রায়হান আজাদ, 'বায়তুশ শরফের প্রধান রূপকার হাদীয়ে জামান শাহ্সুফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)', *মাসিক শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া*, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১৩, পৃ. ১৮

৪৪. মওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, *বায়তুশ শরফ আদর্শ আলীয়া মাদ্রাসার বার্ষিকী 'আলো' ১৯৯৬-১৯৯৮*, চট্টগ্রাম: বায়তুশ শরফ আদর্শ আলীয়া মাদ্রাসা, পৃ.২৪-২৫; মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, 'বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার একটি ঐতিহাসিক দলিল', *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কে প্রধান করে এগারো সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে এ কমিটির সমন্বয়ে প্রথম সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্‌বোধনী ভাষণে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বলেন,

‘বর্তমান মাদ্‌রাসা-শিক্ষা মুসলিম সমাজের সীমাবদ্ধ ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হলেও তা দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের চাহিদা মেটাতে অক্ষম। আমরা এ মাদ্‌রাসাকে একটি যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাই; যেখান থেকে দীনি ও দুনিয়াবি উভয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ লোক বের হবেন। নামাযের ইমামতির পাশাপাশি সমাজের সফল নেতৃত্ব দিকে সক্ষম হবে। তারা একদিকে ইসলামি চিন্তাবিদ, অন্যদিকে জাতীয় জীবনের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে। তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবেন, সাথে সাথে আলিমও হবেন। বস্তুত, এ প্রতিষ্ঠান সমগ্র দেশ ও জাতির সামনে পরিপূর্ণ ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার একটি মডেল হবে।’[৪৫]

এ শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য ১ জানুয়ারি, ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ‘বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা’ নামে একটি মডেল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন; যেটি চট্টগ্রাম বন্দরনগরির ব্যস্ততম প্রবেশদ্বার দেওয়ানহাট মোড় থেকে কদমতলী অভিমুখে পূর্বদিকে হাতের ডানে অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জনৈক মুরিদ কর্তৃক শহরে বাড়ি নির্মাণের নিমিত্তে প্রদত্ত অনুদানের জমিতে তিনি এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৬] মাত্র তিনটি ক্লাস নিয়ে এ মাদ্‌রাসার যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি নিজেই। তাঁর একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার ফলে যুগপূর্তিতেই এটি একটি পূর্ণাঙ্গ কামিল মাদ্‌রাসায় রূপান্তরিত হয়।

১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মেজো ছেলে হাফেজ মুহাম্মদ আবদুর রহিম (১৯৭১–১৯৮৭ খ্রি.) দাখিল পরীক্ষায় মেধাতালিকায় ৭ম স্থান অধিকার করলে মাদ্‌রাসার সুনাম ও খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।[৪৭] তাঁর সুদক্ষ ও সুযোগ্য পরিচালনায় মাত্র দেড়যুগ পূর্তিতে ১৯৯১ ও ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে’র শিক্ষামন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয়ভাবে এটি ‘শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান’ হিসেবে স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করে।[৪৮] ফলাফলের দিক থেকে এ মাদ্‌রাসা প্রতিবছর ‘বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড, কর্তৃক নির্বাচিত দেশের সেরা ২০টি মাদ্‌রাসার তালিকায় প্রথম ১০ এর মধ্যে অবস্থান করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আবদুন নূর বলেন,

‘চট্টগ্রামসহ অন্যান্য আধুনিক বিশ্বদ্যিালয়ে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ বাদে অন্যান্য আধুনিক বিষয়সমূহ যেমন অর্থনীতি, রাজনীতি বিজ্ঞান, লোক-প্রশাসন, ইংরেজী, ব্যবস্থাপনা

৪৫. আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, ‘বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা : সোনালী ঐতিহ্যের ধারক’, *দৈনিক ঈশান*, ১৭ মার্চ, ১৯৯৮; মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, ‘বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠার একটি ঐতিহাসিক দলিল’, *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৪৬. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের আয়না*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

৪৭. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.) এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭

৪৮. আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, ‘সমন্বিত শিক্ষার অতুল্য উদাহরণ বায়তুশ শরফ আদর্শ আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম’, *দৈনিক কর্ণফুলী*, ১৭ এপ্রিল, ১৯৯৫; মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *‘আন্-নকীব’ দোয়া ও বিদায়ী স্মারক গ্রন্থ’ ০৯*(চট্টগ্রাম: বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (এম. এ) মাদ্‌রাসা, ২০০৯), পৃ. ৪২

ও বিজ্ঞান অনুষেদের বিভিন্ন বিষয়ে মাদ্‌রাসা থেকে পাশ করে ভর্তি হবার সুযোগ লাভ করে তাদের অধিকাংশই বায়তুশ শরফের ছাত্র। এটা এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নত শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিফলন বলা যায়।'[৪৯]

বিগত ৪০ বৎসরে এ মাদ্‌রাসা থেকে বহুসংখ্যক কৃতী ছাত্র তাদের শিক্ষাজীবন শেষ করে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এছাড়া অসংখ্য ছাত্র সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। ইতোমধ্যে এ মাদ্‌রাসার অসংখ্য ছাত্র সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বক্তা ও আলোচক হিসেবে জাতীয়ভাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ব্যাবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অনেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন; শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন।

মাদ্‌রাসার প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে মুহাম্মদ আরিফুল কবির চৌধুরী ও মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম (ব্যারিস্টার, লন্ডন হাইকোর্ট), মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল (এডভোকেট, ঢাকা হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট) মুহাম্মদ মাহবুব কায়সার (সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), আশরাফুল হক (অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়), ড. সাখাওয়াত হোসাইন ও মুহাম্মদ রোকন উদ্দিন (অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), মুহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিন, মুহাম্মদ শফিউর রহমান, মুহাম্মদ আজিজুল হক, তাহের হোসাইন সেলিম (অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, আইআইইউসি), ড. আবদুল কাদের মুহাম্মদ মাসুম (অধ্যাপক, সিএসসি বিভাগ, আইআইইউসি), ডা. মুহাম্মদ ইলিয়াছ (সহযোগী অধ্যাপক, ইউএসটিসি), ডা. মুহাম্মদ শাহ্ সোলায়মান ও ডা. হাফেয মুজিবুল হক (মেডিক্যাল অফিসার, চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল) প্রমূখ।

এছাড়া মওলানা আবদুল কাদের নেজামী (মুহাদ্দিস, গারাংগিয়া কামিল মাদ্‌রাসা), মওলানা আব্দুর রউফ (সাবেক উপাধ্যক্ষ, খলিলুর রহমান কামিল মাদ্‌রাসা, নোয়াখালী), মুহাম্মদ মুবিনুল হক (সহকারী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, সরকারি হাজী মুহাম্মদ মুহসীন কলেজ), মুহাম্মদ আব্দুর রহমান (আরবি প্রভাষক, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসা), মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান (আরবি প্রভাষক, দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫০] তাছাড়া আরও শতাধিক মেধাবী ছাত্র দীন ও দুনিয়ার সমন্বিত শিক্ষা লাভ করে বর্তমানে দেশে-বিদেশে শিক্ষকতাসহ সম্মানজনক বিভিন্ন পেশায় কর্মরত থেকে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। তাই বলা যায়, যুগোপযোগী মাদ্‌রাসা শিক্ষায় আধুনিকায়ন ও ইসলামি শিক্ষার প্রচার-প্রসারে এই মাদ্‌রাসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী আদর্শ মাদ্‌রাসা।

২. বায়তুশ শরফ আখতরিয়া আদর্শ ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা, সাতকানিয়া

এটি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার ১ নং ওয়ার্ড পশ্চিম ঢেমশা নামক স্থানে অবস্থিত। সাতকানিয়ার বিশিষ্ট দানবীর, ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী বায়তুশ শরফ দরবারের একনিষ্ঠ খাদেম মরহুম

---

৪৯. অধ্যাপক আবদুন নূর, 'হযরত শাহ্ সুফি মাওলানা আব্দুল জব্বার (রহ.) স্মরণে (১৯৩৩-১৯৯৮)', *দৈনিক আজাদী*, ২ জুলাই, ১৯৯৮, পৃ. ৪; উদ্ধৃতি : মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আবু সালেহ মুহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্, 'দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারে হুজুর কেবলা (রাহ.)-এ চিন্তাধারা', *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

৫০. জনাব মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, অফিস সহকারি, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

আলহাজ নূর আহমদ সওদাগরের দানে এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৩ ও ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল ও আলিম এর সরকারি মঞ্জুরি লাভ করে। ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ফাযিল পাঠদানের অনুমোদন লাভ করে। প্রায় আটশ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। প্রতিবছরই পাবলিক পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল করে আসছে।[৫১]

৩. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ মাদ্‌রাসা, উত্তর রামপুরা, সাতকানিয়া

এটি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া পৌরসভার উত্তর রামপুরা নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজহিতৈষী আলহাজ মোহাম্মদ নুরুল ইসলামের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প সময়ের মধ্যে ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে এটি নবম শ্রেণিতে উন্নীত হয়। ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছে এবং পাশের হার অধিকাংশ সময় শতভাগ। বর্তমানে এখানে ১০০০ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত এবং ১৫ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।[৫২]

৪. আধুনগর আখতরিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, আধুনগর, খাঁরহাট, লোহাগাড়া

এটি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন আধুনগরের খাঁর হাট নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় প্রখ্যাত 'আলিমে দীন আলহাজ মওলানা আশরফ আলী (রহ.) (১৯৫১–২০০৭ খ্রি.) এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ০১/০১/১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল (সাধারণ বিভাগ) ও মুজাব্বিদ ও হিফজুল কুর'আন বিভাগ এবং ০১/০১/২০০৯ দাখিল (বিজ্ঞান বিভাগ) অনুমোদন লাভ করে। পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হার প্রায় ১০০%। বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৫০ জন এবং শিক্ষকের সংখ্যা ১৪ জন।[৫৩]

৫. খন্দকিয়া আখতরুল উলূম দাখিল (মহিলা) মাদ্‌রাসা, হাটহাজারী

এটি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার অন্তর্গত খন্দকিয়ায় অবস্থিত। স্থানীয় ও প্রবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিক্ষানুরাগীদের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল নবম শ্রেণিতে পাঠদানের অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে ১৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত ও ৪৫০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে। মাদ্‌রাসাটি এলাকার কচিকাঁচা মেয়েদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[৫৪]

---

৫১. জনাব মওলানা কফিল উদ্দিন, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বায়তুশ শরফ আখতরিয়া আদর্শ ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৫২. জনাব মওলানা সালামত উল্লাহ্, সুপারিনটেনডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত), বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ মাদ্‌রাসা, উত্তর রামপুরা, সাতকানিয়া পৌরসভা, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৫৩. জনাব মওলানা ফরিদ আহমদ, সুপারিনটেনডেন্ট, আধুনগর আখতরিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৫৪. জনাব মওলানা রিদওয়ান, সুপারিনটেনডেন্ট, খন্দকিয়া আখতরুল উলূম দাখিল (মহিলা) মাদ্‌রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৬. গৌড়স্থান আখতরুল উলূম দাখিল মাদ্‌রাসা, পুটিবিলা, লোহাগাড়া

এটি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত লোহাগাড়া উপজেলার পুটিবিলা ইউনিয়নের গৌড়স্থান নামক গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও ধর্মানুরাগী মওলানা আবদুল খালেদ ও অন্যদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ০১/০১/২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে এখানে ৭৮০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত এবং ১৫ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। পাবলিক পরীক্ষায় পাশের হার ১০০%।[৫৫]

৭. রাজাপালং বায়তুশ শরফ শাহ্ জব্বারিয়া আদর্শ বালিকা দাখিল মাদ্‌রাসা

এটি কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত উখিয়া থানার রাজাপালং নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও দানবীর 'রাজাপালং এমদাদুল 'উলূম ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা'র অধ্যক্ষ মওলানা এ. কে. এম. আবুল হাসান আলী (জন্ম ১৯৬২ খ্রি.) এর আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ০১/০১/১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৮ ও ৩৮৮ জন। ফলাফলের দিক দিয়ে প্রতিবৎসরই উখিয়া থানায় সেরা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আসছে।[৫৬]

৮. বায়তুশ শরফ শাহ জব্বারিয়া প্রি-ক্যাডেট মাদ্‌রাসা, বদরখালী, চকরিয়া

এটি কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত চকরিয়া উপজেলাধীন বদরখালী ইউনিয়নের পশ্চিম নতুন ঘোনা নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুজ্জামান সওদাগরের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২০০ জন।[৫৭]

৯. বায়তুশ শরফ ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, রত্নাপালং, উখিয়া

এটি কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত উখিয়া থানার রত্নাপালং নামক স্থানে অবস্থিত। বিশিষ্ট সমাজসেবক জনাব রশিদ আহমদ (জন্ম ১৯৫৭ খ্রি.) এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এটি স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে ১৮০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ও ০৫ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।[৫৮]

১০. বায়তুশ শরফ মোহাম্মাদীয়া রিয়াযুল জান্নাত দাখিল মাদ্‌রাসা, টেকনাফ

এটি কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত টেকনাফ থানার গোদারবিল নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট আলিম ও শিক্ষানুরাগী আলহাজ মওলানা আমির আহমদের সহযোগিতায়, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ০১/০১/১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ০১/০১/১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে অনুমতি,

---

৫৫. জনাব মওলানা ফরিদুল আলম, সুপারিনটেনডেন্ট, গৌড়স্থান আখতরুল উলূম দাখিল মাদ্‌রাসা, পুটিবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৫৬. জনাব মুহাম্মদ আতিক উল্লাহ্, অফিস সহকারী, রাজাপালং বায়তুশ শরফ আদর্শ শাহ্ জব্বারিয়া বালিকা দাখিল মাদ্‌রাসা, রাজাপালং, উখিয়া, কক্সবাজার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৫৭. জনাব এ. ছরওয়ার আলম, পরিচালক, বায়তুশ শরফ শাহ জব্বারিয়া প্রি-ক্যাডেট মাদ্‌রাসা, পশ্চিম নতুন ঘোনা, বদরখালি, চকরিয়া, কক্সবাজার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৫৮. জনাব রশিদ আহমদ, সেক্রেটারি, বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া মাদ্‌রাসা, রত্নাপালং, উখিয়া, কক্সবাজার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

০১/০১/২০০১ খ্রিষ্টাব্দে স্বীকৃতি এবং মে ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্জুরি লাভ করে। বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ১২০০ এবং শিক্ষক-কর্মচারী ২২ জন। প্রতিবৎসর পাবলিক পরীক্ষায় ১০০% পাশ করে।[৫৯]

১১. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, রাঙ্গামাটি সদর

এটি রাঙ্গামাটি সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী জনাব মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরীর আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ০১/০১/২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে পাঠদানের অনুমতি ও ৩১/০৪/২০১০ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্জুরি লাভ করে। বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ৩১০ জন এবং শিক্ষক ১৭ জন। প্রতিবৎসর পাবলিক পরীক্ষায় জেলা পর্যায়ে শীর্ষস্থান দখল করে আছে।[৬০]

১২. উত্তর গাঁথার ছড়া বায়তুশ শরফ আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা, লংগদু

এটি রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার ৩৮৭ নং গাঁথার ছড়া মৌজার মাইনীমুখ ইউনিয়নে অবস্থিত। স্থানীয় একদল ধর্মানুরাগী, শিক্ষানুরাগী ও সমাজহিতৈষীর আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১২-১৬ শিক্ষাবর্ষের হিসাব মতে, এ মাদ্‌রাসার মোট বাৎসরিক গড় ছাত্রসংখ্যা ৫৩০ জন এবং শিক্ষকের সংখ্যা ১৪ জন। প্রতিবৎসর পাবলিক পরীক্ষায় শতভাগ পাশ করে রাঙ্গামাটি জেলার শীর্ষস্থান দখল করে আসছে।[৬১]

১৩. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা, খাগড়াছড়ি সদর

এটি খাগড়াছড়ি জেলা সদরের আরামবাগ নামক স্থানে অবস্থিত। বিশিষ্ট আলেমে দীন আলহাজ মওলানা নূরুল ইসলামের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ০১/০১/২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে এটি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬৫০ জন। শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ২৭ জন। ফলাফলের দিক দিয়ে এ মাদ্‌রাসা ১০০% পাশ।[৬২]

১৪. বায়তুশ শরফ লহরি জব্বারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, উত্তর পদুয়া, চৌদ্দগ্রাম

এটি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত উত্তর পদুয়ার লহরি নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগীদের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে অনুমতি, ০১/০১/১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে স্বীকৃতি ও ০১/০৪/১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্জুরি লাভ করে। বর্তমানে এতে ৪৫০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত এবং ১৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।[৬৩]

---

৫৯. জনাব মওলানা আমির আহমদ, সুপারিনটেনডেন্ট, বায়তুশ শরফ মোহাম্মাদীয়া রিয়াযুল জান্নাত দাখিল মাদ্‌রাসা, টেকনাফ, কক্সবাজার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৬০. জনাব মওলানা শামসুল আরেফীন, সুপারিনটেনডেন্ট, বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৬১. জনাব হাফেজ মওলানা ফোরকান আহমদ, সুপারিনটেনডেন্ট, উত্তর গাঁথার ছড়া বায়তুশ শরফ আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা, মাইনীমুখ, লংগদু, রাঙ্গামাটি থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৬২. জনাব মওলানা মুহাম্মদ আবু ওসমান, সুপারিনটেনডেন্ট, বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৬৩. জনাব মওলানা আবুল কাসেম, সুপারিনটেনডেন্ট, বায়তুশ শরফ লহরি জব্বারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, লহরি, উত্তর পদুয়া, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১৫. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, রাজবল্লভপুর, চৌদ্দগ্রাম

এটি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামের রাজবল্লভপুরে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানের সাথে কেন্দ্রের যোগাযোগ না থাকায় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। আশা করি, ভবিষ্যতে কেন্দ্র এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

১৬. কুদ্দুস মিয়ার হাট বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ মাদ্‌রাসা, সোনাগাজী

এটি ফেনী জেলার সোনাগাজী থানার অন্তর্গত স্বরাজপুরের পশ্চিম আহমদপুর নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শ্রেণি-কার্যক্রম চালু রয়েছে। তাতে ৮ জন শিক্ষক কর্মরত এবং ১২০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে।[৬৪]

১৭. চাঁদগাজী জব্বারিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, ছাগলনাইয়া

এটি ফেনী জেলার অন্তর্গত ছাগলনাইয়া থানার চাঁদগাজী গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ০১/০১/১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ০১/০১/১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে নবম শ্রেণিতে পাঠদানের অনুমতি, ০১/০১/১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বীকৃতি এবং ০১/০১/১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মঞ্জুরি লাভ করে। এতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩০৮ ও ১৫ জন।[৬৫]

১৮. ষাটগম্বুজ বায়তুশ শরফ আদর্শ আলিম মাদ্‌রাসা, সুন্দরঘোনা

এটি বাগেরহাট জেলার বাগেরহাট সদর থানার অন্তর্গত সুন্দরঘোনা নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি আলহাজ মিফতাহ উদ্দিন ও শেখ সিদ্দিকুর রহমানের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০২ ও ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল ও আলিম পর্যায়ে সরকারি মঞ্জুরি লাভ করে। বর্তমানে এ মাদ্‌রাসায় ২০ জন শিক্ষক এবং ৬৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। ফলাফলের দিক দিয়ে এ মাদ্‌রাসা বাগেরহাট জেলায় বরাবরই ১ম স্থান দখল করে আছে। এলাকায় ইসলামি শিক্ষা ও তাহযিব-তামাদ্দুন বিস্তারে এ মাদ্‌রাসা অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছে।[৬৬]

১৯. বায়তুশ শরফ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, কলার দোয়ানিয়া, নাজিরপুর

এটি পিরোজপুর জেলার নাজিরপুরের কলার দোয়ানিয়া নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি মওলানা সুলতান আহমদ ও সমাজহিতৈষীদের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ০৪ জন শিক্ষক ও ২৫০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে।[৬৭]

---

৬৪. জনাব মওলানা মহিউদ্দিন, সুপারিনটেনডেন্ট, কুদ্দুস মিয়ার হাট বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ মাদ্‌রাসা, স্বরাজপুর, সোনাগাজী, ফেনী থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৬৫. জনাব মুহাম্মদ মাঈনুদ্দীন মজুমদার, সুপারিনটেনডেন্ট, বায়তুশ শরফ লহরি জব্বারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, লহরি, কুমিল্লা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৬৬. অধ্যক্ষ, ষাটগম্বুজ বায়তুশ শরফ আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা, সুন্দরঘোনা, বাগেরহাট থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৬৭. মওলানা হাফিজুল ইসলাম, পরিচালক, বায়তুশ শরফ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্‌রাসা, কলার দোয়ানিয়া, ফিরোজপুর থেকে সংগৃহীত তথ্য।

(গ) হেফ্‌জখানা প্রতিষ্ঠা

হেফজখানা শব্দটি আরবি ‘حفظ’ ও ফারসি ‘خانہ’ শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। আরবিতে একে ‘তাহফিজুল কুর’আন’ (تحفيظ القران) বা ‘দারুল হুফ্‌ফাজ (دار الحفاظ) বলা হয়; অর্থ পবিত্র কুর’আন মুখস্থ করার জায়গা বা ঘর। পরিভাষায়, যেখানে নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতির মাধ্যমে পবিত্র কুর’আন মুখস্থ করানোর সুব্যবস্থা রয়েছে, তাকে হেফজখানা বা তাহফিজুল কুর’আন বলা হয়। ইসলামে পবিত্র কুর’আন মুখস্থ করা এবং মুখস্থ করানোকে অত্যন্ত ফযিলত ও বরকতময় কাজ বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, خيركم من تعلم القرآن وعلمه অর্থাৎ ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুর’আন মজিদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।’[৬৮] মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদিসের মর্ম উপলব্ধি করে ১৫টি হেফ্‌জখানা প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. বায়তুশ শরফ আখতরিয়া হেফ্‌জখানা, ধনিয়ালাপাড়া

এটি চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ ধনিয়ালাপাড়া কমপ্লেক্সে অবস্থিত। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ৫০ জন ছাত্র পবিত্র কুর’আন হিফ্‌জরত রয়েছে।[৬৯]

২. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া হেফ্‌জখানা, আখতরাবাদ, লোহাগাড়া

এটি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন বড়হাতিয়া ভবানীপুর আখতরাবাদ (কুমিরাঘোনা) নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহীদের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ২৫ জন ছাত্র পবিত্র কুর’আন হিফ্‌জরত রয়েছে।[৭০]

৩. রামপুরা বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া হেফ্‌জখানা, উত্তর রামপুরা, সাতকানিয়া

এটি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া উপজেলার উত্তর রামপুরা নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দানবীর মোহাম্মদ নুরুল ইসলামের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ২৫ জন ছাত্র পবিত্র কুর’আন হিফ্‌জরত রয়েছে।[৭১]

৪. বায়তুশ শরফ হাফেজিয়া রহমানিয়া হেফজখানা, পশ্চিম চুনতী, লোহাগাড়া

এটি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন পশ্চিম চুনতিতে অবস্থিত। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু কয়েক বছর চলার পর বিভিন্ন সংকটের কারণে বন্ধ

---

৬৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল বুখারী, *আল-জামি‘আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, খ.২, হাদিস নং ৪৭৩৯, পৃ. ১৯১৯

৬৯. মওলানা আব্দুশ শাকুর, শিক্ষক, বায়তুশ শরফ আদর্শ আলিম মাদ্‌রাসা, ও তত্ত্বাবধায়ক, বায়তুশ শরফ আখতরিয়া হেফজখানা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭০. মওলানা আলমগীর, শিক্ষক, বায়তুশ শরফ আখতরুল উলূম মাদ্‌রাসা, আখতরাবাদ (কুমিরাঘোনা), লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭১. মওলানা সালামত উল্লাহ্, সুপারিনটেনডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত), বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ মাদ্‌রাসা, উত্তর রামপুরা, সাতকানিয়া (পৌরসভা), চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

হয়ে যায়। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় আলহাজ শামসুল ইসলাম, আলহাজ্ আহমদ কবির সওদাগর ও আলহাজ হাসান সওদাগরের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এটি পুনরায় চালু করেন। বর্তমানে এখানে ১৩২ জন শিক্ষার্থী পবিত্র কুর'আন হিফ্জ করছে এবং ৬ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।[৭২]

৫. বায়তুশ শরফ শাহ্ আখতরুল উলূম হেফ্জখানা, খন্দকিয়া, হাটহাজারী

এটি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারি থানার খন্দকিয়ায় অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি মরহুম আবদুচ ছোবহান ও অন্যদের সার্বিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ৩৫ জন শিক্ষার্থী পবিত্র কুর'আন হিফ্জ করছে এবং ২ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।[৭৩]

৬. দরগাহমুড়া কাদেরিয়া হেফজখানা, পশ্চিম কলাউজান, লোহাগাড়া

এটি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন পশ্চিম কলাউজানের দরগাহমুড়া এলাকায় অবস্থিত। স্থানীয় কিছু ধর্মানুরাগী ও শিক্ষানুরাগীদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এতে ৬০ জন ছাত্র পবিত্র কুর'আন হিফ্জরত রয়েছে।[৭৪]

৭. বায়তুশ শরফ শাহ্ জব্বারিয়া হেফ্জখানা, বড়ঘোপ, কুতুবদিয়া

এটি কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থানার অন্তর্গত বড়ঘোপ নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও সমাজহিতৈষী মরহুম মওলানা মাহমুদুল হকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ৬০ জন শিক্ষার্থী হিফ্জ করছে এবং ২ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।[৭৫]

৮. শাহ্ জব্বারিয়া হেফ্জখানা, রত্নাপালং, উখিয়া

এটি কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত উখিয়া থানার রত্নাপালং নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী জনাব আলহাজ আবদুর রশীদ সাহেবের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে পবিত্র কুর'আন হিফ্জ করছে ৫০ জন ছাত্র।[৭৬]

৯. উখিয়া শাহ্ জব্বারিয়া হেফ্জখানা, শৈলের ঢেবা, টিএন্ডটি, উখিয়া

এটি কক্সবাজার জেলাধীন উখিয়া থানার টিএন্ডটি কলোনির শৈবাল ঢেবা নামক স্থানে অবস্থিত। মাস্টার সিরাজুল ইসলামের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ৪০ জন ছাত্র পবিত্র কুর'আন হিফ্জরত রয়েছে।[৭৭]

---

৭২. মওলানা মুহাম্মদ আয়ূব, কোষাধ্যক্ষ, বায়তুশ শরফ হাফেজিয়া রহমানিয়া হেফযখানা, পশ্চিম চুনতী, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭৩. মোহাম্মদ শাহ্জাহান, শিক্ষক, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭৪. মওলানা শিহাব উদ্দিন, পরিচালক, দরগাহমুড়া কাদেরিয়া হেফজখানা, পশ্চিম কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭৫. হাফেজ মওলানা আবু সৈয়দ, তত্ত্বাবধায়ক, বায়তুশ শরফ শাহ্ জব্বারিয়া হেফ্জখানা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭৬. জনাব আলহাজ আব্দুর রশীদ, পরিচালক, শাহ্ জব্বারিয়া হেফ্জখানা, রত্নাপালং, উখিয়া, কক্সবাজার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭৭. জনাব আলহাজ আব্দুর রশীদ, পরিচালক, শাহ্ জব্বারিয়া হেফ্জখানা, রত্নাপালং, উখিয়া, কক্সবাজার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১০. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া হেফ্জখানা, ঈদগাঁ বাজার, ঈদগাঁ, কক্সবাজার

এটি কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার সদর উপজেলার অন্তর্গত ঈদগাঁ বাজারে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি মরহুম শাহজাহান চৌধুরী (লুতু মিঞা) ও অন্য ব্যক্তিদের আন্তরিক সহযোগিতায় ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ২ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছে এবং ৩৫ জন শিক্ষার্থী পবিত্র কুর'আন হিফ্জ করছে।[৭৮]

১১. খাগড়াছড়ি জব্বারিয়া হেফ্জখানা, আরামবাগ, খাগড়াছড়ি সদর

এটি খাগড়াছড়ি জেলা সদরের আরামবাগ নামক স্থানে অবস্থিত। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর বড়ো জামাতা আলহাজ মওলানা নূরুল ইসলাম সাহেবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও স্থানীয় একদল গরিব-দরদি, ধর্মানুরাগীদের আন্তরিক সহযোগিতায় তিনি ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ৬০ জন শিক্ষার্থী পবিত্র কুর'আন হিফ্জ করছে।[৭৯]

১২. বায়তুশ শরফ আখতরিয়া হেফ্জখানা, রাঙ্গামাটি সদর

এটি রাঙ্গামাটি জেলা সদরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিক্ষানুরাগী জনাব আবদুল করিম (কলা মৌলবি) এর আন্তরিক সহযোগিতায় বায়তুশ শরফের পীর শাহ্ মওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ৩০ জন শিক্ষার্থী পবিত্র কুর'আন হিফ্জ করছে।[৮০]

১৩. উত্তর গাঁথারছড়া আখতরিয়া হেফ্জখানা, গাঁথারছড়া, মাঈনীমুখ

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার ৩৮৭ নং গাঁথারছড়া মৌজার মাইনীমুখ ইউনিয়নে এ মাদ্রাসা অবস্থিত। স্থানীয় একদল ধর্মানুরাগী, শিক্ষানুরাগী ও সমাজহিতৈষীর আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ৩৫ জন ছাত্র পবিত্র কুর'আন হিফ্জ করছে।[৮১]

১৪. মক্রবপুর বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া হেফ্জখানা, মক্রবপুর, নাঙ্গলকোট

এটি কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত নাঙ্গলকোট থানার মক্রবপুর নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী জনাব আলহাজ খোরশেদ আলম চৌধুরীর আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ৭০ জন ছাত্র পবিত্র কুর'আন হিফ্জ করছে।[৮২]

---

৭৮. মুহাম্মদ শাহ্জাহান, শিক্ষক, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (এম. এ.) মাদ্রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭৯. মওলানা আবু ওসমান, তত্ত্বাবধায়ক, খাগড়াছড়ি জব্বারিয়া হেফজখানা, আরামবাগ, খাগড়াছড়ি সদর থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৮০. হাফেজ মওলানা ছরওয়ার আলম, বায়তুশ শরফ আখতরিয়া হেফজখানা, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৮১. হাফেজ মওলানা ফোরকান আহমদ, পরিচালক, উত্তর গাঁথারছড়া বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, মাঈনীমুখ, রাঙ্গামাটি থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৮২. হাফেজ মওলানা আবদুল মন্নান, তত্ত্বাবধায়ক, মক্রবপুর বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া হেফজখানা, কুমিল্লা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১৫. দক্ষিণ খানপুর জব্বারিয়া হেফজ্খানা, দক্ষিণ খানপুর

এটি বাগেরহাট জেলার বাগেরহাট সদর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ খানপুরে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি মরহুম মোল্লা নুরুদ্দিন সাহেবের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ২১ মার্চ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ২ জন শিক্ষক কর্মরত এবং ২৫ জন ছাত্র পবিত্র কুর'আন হিফ্জরত রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন হাফেজ মওলানা আইয়ূব আলী।[৮৩]

(ঘ) একাডেমি প্রতিষ্ঠা

১. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমী, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, কক্সবাজার

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমী' (আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ-সংবলিত এ প্রতিষ্ঠানে ৬০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত এবং ১৫০ জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠান ইসলামি শিক্ষার সাথে সমন্বয় করে যুগোপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক, মানসম্মত শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে এটি কক্সবাজার জেলার শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠান। ফলাফলের দিক দিয়ে প্রতিবৎসর কক্সবাজার জেলায় শীর্ষস্থান দখল করে আসছে।[৮৪]

২. বায়তুশ শরফ আল-আমিন একাডেমী, চৌধুরীহাট, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী

এটি নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানার বজুমিঞা চৌধুরীহাটে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও শিক্ষানুরাগীদের আন্তরিক সহযোগিতায় বায়তুশ শরফের মরহুম পীর মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ৩১/০৮/১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র ১২ জন শিক্ষার্থী ও ৪ জন শিক্ষক নিয়ে এর যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এখানে শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৮ ও ৬০০ জন।[৮৫]

(ঙ) প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বড়হাতিয়া শাহ্ জব্বারিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

এটি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া ধানাধীন বড়হাতিয়ার মিয়াজিপাড়ায় অবস্থিত। বায়তুশ শরফের মরহুম পীর মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ৬ জন শিক্ষক কর্মরত ও ৫০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে।[৮৬]

(চ) মক্তব ও ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা

মক্তব মুসলিমগণের কাছে সবচেয়ে প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। কথিত আছে, আরবরা ইসলামপূর্ব কাল থেকেই মক্তবের সঙ্গে পরিচিত ছিল। তবে তা ছিল অত্যন্ত গণ্ডিবদ্ধ। হিজরি প্রথম

---

৮৩. আলহাজ জাফর আহমদ রাজা, সাংগঠনিক সম্পাদক, খুলনা বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, খুলনা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৮৪. জনাব আলহাজ এম এম সিরাজুল ইসলাম, মহাপরিচালক, কক্সবাজার বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, কক্সবাজার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৮৫. জনাব মোহাম্মদ আসলাম, সভাপতি, বায়তুশ শরফ আল-আমিন একাডেমী, চৌধুরিহাট, নোয়াখালী থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৮৬. আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী, রাহবারে বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

শতকগুলোতে মক্তবের অবস্থান ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। কারণ মক্তবেই উচ্চশিক্ষার প্রস্তুতি সম্পন্ন হতো। মক্তব ছিল আমাদের আধুনিক যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো এবং সংখ্যায় ছিল প্রচুর। ইব্‌ন হাওকাল (মৃ. ৯২৯ খ্রি.) জরিপ করেছেন যে, সিসিলির একটিমাত্র শহরেই তিনশ মক্তব ছিল।[৮৭]

রাসুলুল্লাহ্ (সা.) শিশু-কিশোরদের শিক্ষাদানে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। বদর যুদ্ধের পর তিনি অসচ্ছল শিক্ষিত মুশরিক যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ হিসেবে ১০ জন মুসলিম বালকের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব নির্ধারণ করেন। এই সময় একদল আনসারি বালকের সঙ্গে যায়দ ইব্‌ন সাবিতও লেখা শেখেন।[৮৮]

শিশুদেরকে তাদের জীবনের শুরুতে ধর্মীয় তা'লিম প্রদানের নিয়ম উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে পূর্ব থেকেই পারিবারিক ঐতিহ্যরূপে চলে আসছিল। ইংরেজ শাসনামলে মুসলিমগণ সামাজিকভাবে বিপর্যয়গ্রস্ত হয়ে পড়লে ওই ঐতিহ্য ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

উপমহাদেশে সাধারণত মুসলিম শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক পর্যায়ের কুর'আন শরিফ, দীনিয়াত ও আরবি শিক্ষার স্থানকে ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা বা মক্তব বলা হয়।[৮৯] বাংলাদেশে ফুরকানিয়া বা মক্তব শব্দটি সাধারণত ইসলামি শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বোঝায়।[৯০] ফুরকানিয়া বা মক্তব শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো দীনি বিষয়ে মৌলিক শিক্ষা প্রদান। ইসলামি বিশ্বে মক্তবের বিষয় ও পাঠ্যসূচি একইরকম ছিল না। বিভিন্ন স্থানে তা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যদিও সব জায়গায় পাঠ্যসূচিতে কুর'আনুল কারিম পাঠ ও লেখা, ইতিহাস ও কাহিনি, প্রাথমিক দীনি বিধি-বিধান, কবিতা, প্রাথমিক গণিত ও আরবি ভাষার ব্যাকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মাধ্যমে একজন শিশু অল্প বয়সে দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানার্জন করে। কেননা নির্মল ও পবিত্র মনে শিশু-কিশোরদের মক্তবে যে শিক্ষা দেয়া হয় পাথরে খোদাইকৃত নক্‌শার মত দৃঢ়ভাবে তাদের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যায়। শৈশবকালীন শিক্ষা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

اَلْعِلْمُ فِيْ الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ عَلَى الْحَجَرِ

অর্থাৎ 'শৈশবে বিদ্যার্জন (স্থায়িত্বের দিক থেকে) পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্যের ন্যায়।'[৯১]

---

৮৭. মুস্তাফা ইব্‌ন হাসনি আস-সিবায়ি, *মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা* (দিমাশ্‌ক : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ৭ অক্টোবর, ২০০৯), পৃ. ১০০

৮৮. আবদুর রহমান সুহাইলি, *আর-রওযুল ইনুফ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৭ জানুয়ারি, ২০০৯), খ.৩, পৃ. ১৩৫

৮৯. ড. মো. আবদুস সাত্তার, *বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

৯০. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.১৬শ (২য় ভাগ), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৩; ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, এদেশের প্রাথমিক পর্ব বা সূচনা পর্বে ইসলামি শিক্ষার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি বা সিলেবাসভুক্তি ছিল না। মুসলিম ধর্মপ্রচারক, সাধক ও আউলিয়াগণ 'ইবাদত, আধ্যাত্মিক সাধনা এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে মসজিদ ও খানকা নির্মাণ করেন। এ সকল মসজিদ ও খানকাই ছিল বাংলায় ইসলামি শিক্ষার সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। তৎকালে এ সকল মসজিদ ও খানকাতে নওমুসলিমগণ ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এ সকল মসজিদ খানকাই তখন এদেশে প্রাথমিক মক্তব বা পাঠশালার প্রয়োজন মেটাত। আর এ সমস্ত মসজিদ খানকার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারক মুসলিম সাধক ও আউলিয়াগণ ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রাখেন। ফলে বাংলায় মুসলিম নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। এ ধারা বেয়েই ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় তথা মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছিল। দ্র. ড. মোহাম্মদ লোকমান ও এ. এফ. এ আমিনুল হক, 'মুসলিম আমলে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা, ঢাকা : *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৩৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৪, পৃ. ২৪; মেহরাব আলী, *দিনাজপুরে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১), পৃ. ২২০

৯১. আবু বকর আহমদ ইবন হুসাইন 'আলী আল-বায়হাকী, *আল-মাদখাল ইলা সুনাননিল কুবরা* (কুয়েত : দারুল যুলকা লিলকিতাবিল ইসলামি, ১৯৯৩), পৃ. ৩৭৫

উল্লেখ্য, শিশুদের শিক্ষাদান ও শিষ্টাচার শেখানো সম্পর্কে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ গাযালি (রহ.) তার *'ইহ্ইয়াউ 'উলুমিদ্দিন'* নামক গ্রন্থে بيان الطريق في روضة الصبيان في أول نشوئهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم (প্রাথমিক বেড়ে ওঠার সময়ে শিশুদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং তাদের শিষ্টাচার ও চরিত্র গঠনের উপায়) শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন,

> জেনে রাখো, শিশুদের প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। শিশুরা তাদের মা-বাবার কাছে আমানত। তাদের অন্তর স্বচ্ছ নির্মল মুক্তোর মত, তাতে কোনো দাগ ও চিহ্ন নেই। তাদের অন্তরে যা অঙ্কন করা হবে তারই জন্য প্রস্তুত। তাদের অন্তরকে যেদিকে ঝোঁকানো হবে সেদিকেই ঝুঁকবে। তাদের যা কিছু ভালো তার ওপর অভ্যস্ত করে তোলা হয় এবং ভালো শিক্ষা দেয়া হয়, তারা তারই ওপর বেড়ে উঠবে। এতে দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান হবে। তাদের সওয়াবের অংশীদার যেমন তাদের মা-বাবারা হবে, তেমনই তাদের প্রত্যেক শিক্ষক ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানকারীও অংশীদার হবে; কিন্তু তাদের মন্দের ওপর অভ্যস্ত করে তোলা হলে এবং জন্তুজানোয়ারের মতো অবহেলা দেখানো হলে তারা দুর্ভাগ্যের শিকার হবে এবং ধ্বংস হবে। এই পাপ তাদের অভিভাবক ও দায়িত্বশীল সবাইকে বহন করতে হবে।'[৯২]

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) যুগসচেতন একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি জাতিকে সার্বিক ইসলামের রঙে রাঙিয়ে তোলার জন্য মসজিদ ও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মসজিদকেন্দ্রিক মক্তব বা ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছেন; যাতে এর মাধ্যমে সৎ, যোগ্য, ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ জাতি গঠন করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন উপহার দেয়া যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মক্তব বা ফুরকানিয়াগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:[৯৩]

১. বায়তুশ শরফ ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।
২. রওশন মসজিদ ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, কদমতলী, চট্টগ্রাম।
৩. ডেবার পাড় ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৪. সি. জি. এস. কলোনী ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, আগ্রাবাদ।
৫. রঙ্গিপাড়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, রঙ্গিপাড়া, দক্ষিণ আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৬. পশ্চিম মাদারবাড়ি ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, পশ্চিম মাদারবাড়ি, চট্টগ্রাম।
৭. চান্দগাঁও ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, গোলাম আলী নাজির বাড়ি, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
৮. সৈয়দপুর ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, বোয়ালিয়া পাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৯. মিয়াজিপাড়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১০. কলাউজান ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, পূর্ব কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১১. রূপকানিয়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, দক্ষিণ রূপকানিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১২. কুমিরাঘোনা ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, আখতরাবাদ, চট্টগ্রাম।
১৩. ধামিরঘোনা ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৪. পশ্চিম ঢেমশা ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৫. নোয়ার বিল ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

৯২. আবু হামিদ গাযালি, *ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দিন* (কায়রো : দারুল ফজরি লিত তুরাস, ১০৯৬), খ.৩, পৃ. ৭২

৯৩. *কার্যক্রম তালিকা*, বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম।

১৬. রামপুরা বায়তুশ শরফ ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

১৭. বায়তুশ শরফ ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, মধ্যআমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১৮. খন্দকিয়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

১৯. ঈদগাঁ ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, বায়তুশ শরফ, ঈদগাঁ, কক্সবাজার।

২০. পুটিবিলা ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, বায়তুশ শরফ, মহেশখালী, কক্সবাজার।

২১. উখিয়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, বায়তুশ শরফ, উখিয়া, কক্সবাজার।

২২. কালামার ছড়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, মহেশখালী, কক্সবাজার।

২৩. বায়তুশ শরফ ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, মসজিদ বায়তুশ শরফ, কক্সবাজার।

২৪. বড়ঘোপ ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

২৫. রিজার্ভ বাজার ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য জেলা।

২৬. মাইনীমুখ ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, মাইনীমুখ, লংগদু, রাঙ্গামাটি।

২৭. সুন্দরপুর ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, সুন্দরপুর, দাগনভূঁইয়া, ফেনী।

২৮. বেতীহাটী ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, গাজীমুড়া, লাকসাম, কুমিল্লা।

২৯. গাজীমুড়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, গাজীমুড়া, লাকসাম, কুমিল্লা।

৩০. চৌরাইশ ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, বেরনাইয়া বাজার, লাকসাম, কুমিল্লা।

৩১. লালচানপুর ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, বেরনাইয়া বাজার, লাকসাম, কুমিল্লা।

৩২. ষাটগম্বুজ ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, বাগেরহাট, খুলনা।

৩৩. বায়তুশ শরফ ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা, রূপসা বাসস্ট্যান্ড রোড, খুলনা।

(ছ) বয়স্কদের জন্য নৈশ ধর্মীয় শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়া কোনো ব্যক্তি ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করতে পারে না। তাই রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বয়স্ক সাহাবিগণকে নিয়ে মসজিদে নববিতে বয়স্ক নৈশ ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিলেন। বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিকভাবে অক্ষরজ্ঞানের মাধ্যমে বয়স্ককে শিক্ষা প্রদানের প্রায় দেড় হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে; তবে বৃটিশ আমলেই এদেশে বয়স্ক শিক্ষাব্যবস্থা অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ আমলে ১৯১৭-১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দান করার ব্যবস্থা চালু ছিল। এই শতকের গোড়ার দিকে অবিভক্ত বঙ্গে ৯২৬টি নৈশ বিদ্যালয় ও ১৪০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই কেন্দ্রগুলো মূলত স্থানীয় জনসাধারণ ও সমবায়ের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত হতো।[৯৪]

১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম হান্টারের প্রতিবেদনে নৈশ বিদ্যালয় ধারণার উল্লেখ ছিল। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গে সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৩০ এর দশকে ড. ফ্রাংক চার্লস লাউবাচ (১৮৮৪–১৯৭০ খ্রি.) প্রবর্তিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা জনগণের মাঝে বিপুল সাড়া জাগানোর কারণে প্রাদেশিক সরকার ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে নবগঠিত ‘পল্লী পুনর্গঠন (Bengal Reconstruction

৯৪. মনসুর মুসা সম্পাদিত, হোসনে আরা বেগম, ‘বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন : গণশিক্ষা ও সাক্ষরতার প্রসার’, *সুশিক্ষাবর্ষ স্মারকগ্রন্থ-২০০৩*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫; প্রফেসর নীলুপার রহমান সম্পাদিত, *মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

Depertment) দপ্তরে'র হাতে বয়স্ক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের প্রচেষ্টায় বাংলায় বয়স্কশিক্ষা ১৯৩৭-১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বছরে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে : তখন কেবল পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) ৬২,৫৭৪টি নৈশ বিদ্যালয়ে ৫,৩০,১৭৮ জন শিক্ষা লাভ করেছিল। সে সময় বাংলায় সাক্ষরতার শতকরা হার ছিল ১৬ (ষোলো)।[৯৫]

বর্তমানে বাংলাদেশে পনেরো বছরের বেশি বয়সিদের সাক্ষরতার হার ৪৯%; অর্থাৎ পনেরো বৎসরের বেশি বয়সীদের শতকরা ৫১ ভাগ এখনও নিরক্ষর। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের কারণে দেশের বিরাজমান নিরক্ষরতা ব্যাপক। নানান কারণে অনেক ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না বা ভর্তি হয়েও লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে না; অথচ একটি দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে দেশের জনগণের শিক্ষা-দীক্ষার ওপর। তাই রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং বাংলাদেশ সরকারের বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির সাথে তাল মিলিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বয়স্কদের জন্য বিভিন্ন স্থানে নৈশ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেগুলো হলো:[৯৬]

১. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ডি. টি. রোড, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।
২. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ১৪৯/এ, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা।
৩. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, আখতরাবাদ, বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৪. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, বায়তুশ শরফ রোড, কক্সবাজার।
৫. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, পুরানা বাস স্ট্যান্ড রোড, রাঙ্গামাটি।

(জ) সহিহ্ কুর'আন প্রশিক্ষণ কোর্স

সর্বসাধারণের সহিহ-শুদ্ধ কুর'আন শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) আশির দশকে 'কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ মসজিদে' তিন মাসব্যাপী 'সহিহ কুর'আন প্রশিক্ষণ কোর্স' নামে এক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এর কার্যক্রম উদ্‌বোধন করা হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ এ. এ. রেজাউল করিম। এছাড়া আরও খ্যাতিমান আলিম-'উলামা উপস্থিত ছিলেন; যারা সহিহ-শুদ্ধভাবে কুর'আন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযিলতের ওপর আলোচনা পেশ করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ-কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালীর বিশিষ্ট কারি মওলানা কেফায়ত উল্লাহ্। সহযোগী হিসেবে ছিলেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র হাতিয়ার মওলানা শাহ্‌জাহান। এ প্রশিক্ষণে ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বশ্রেণির মানুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সবাইকে সনদপত্র, ব্যাগ, নগদ অর্থ ও প্রয়োজনীয় বইপুস্তক প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশিক্ষণকে কেন্দ্র করে মওলানা শাহ্‌জাহান '*তাজভীদ শিক্ষা*' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন; যেটি 'বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান' থেকে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৯৭]

---

৯৫. ডা. মো. আনোয়ারুল আজিজ ও অন্যান্য, *শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

৯৬. মো. শাহিনুজ্জামান, *গঠন-প্রকরণে বাংলদেশে সুফিবাদের বিকাশ (১৯৭১-২০০০)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

৯৭. মওলানা মোহাম্মদ ফরহাত আলম, সহকারী অধ্যাপক, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

(ঝ) সহিহ্ কুর'আন শিক্ষার আসর

বয়স্কদের সহিহ্-শুদ্ধ কুর'আন শিক্ষা দেয়ার নিমিত্তে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) প্রতি রমযানে মাসব্যাপী 'সহিহ্ কুর'আন শিক্ষার আসর' নামে আরেকটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। প্রশিক্ষণ দিতেন বাংলাদেশ বেতারের কুর'আন পাঠক কারি আবদুল হক। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার নিজেও এ প্রশিক্ষণে উপস্থিত থাকেতন। এ প্রশিক্ষণে আলেমদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা'র সহকারী অধ্যাপক মওলানা আবু তাহের, মওলানা ফরহাত আলম, বায়তুশ শরফ লাইব্রেরির সাবেক ম্যানেজার মওলানা ফজলুর রহমান, পীর সাহেবের খাদেম মওলানা আবদুল হামিদ ও বায়তুশ শরফ কেন্দ্রীয় জামে' মসজিদের সাবেক মুয়াজ্জিন কারি আবদুল মান্নান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৯৮]

(ঞ) আধুনিক আরবি ভাষা-প্রশিক্ষণ কোর্স

মাদ্‌রাসার শিক্ষকগণকে আরবি ভাষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলার নিমিত্তে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে 'আধুনিক আরবি ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স' নামে সীমিত আকারে একটি কোর্স চালু করেন। তাতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে'র সাবেক উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ (জন্ম ১৯৫০ খ্রি.)। পরবর্তীকালে আরবি ভাষার ওপর বৃহৎ আকারে আরও একটি কোর্স চালু করেন। তাতে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'জামি'আ দারুল মা'আরিফে'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, আরবি ভাষাবিদ, গবেষক ও সুসাহিত্যিক আল্লামা সুলতান যওক নদ্‌ভী (জন্ম ১৯৩৯ খ্রি.)।[৯৯]

(ট) ইমাম প্রশিক্ষণ

ইমামগণ সমাজের পথপ্রদর্শক। তারা সমাজের মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেন। তাদের সহিহ্-শুদ্ধভাবে কুর'আন তিলাওয়াত এবং ইসলামের সঠিক মাস'আলা-মাসা'য়িল জানা না থাকলে ভুল ফতোয়া দিয়ে সমাজের মানুষকে তারা গোমরাহ ও বিভ্রান্ত করবে। এজন্য মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে মাসব্যাপী ইমামদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ইমাম প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করে তিনি বলেন, এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো, এমন একদল যোগ্য ইমাম তৈরি করা যারা দেশের বিভিন্ন শহর, নগর ও গ্রামে গিয়ে বিশেষত পল্লিগাঁয়ের অনুন্নত অঞ্চলে গিয়ে শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলবেন; বয়স্কদের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা ও পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করবেন। ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বারের মতো মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে শত-শত ইমাম অংশগ্রহণ করে তাদের কির'আত, ঈমান ও আমলকে দুরস্ত করে নেন।[১০০]

তিনি দেশে নানান প্রন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের জন্য বহু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যাতে তারা দক্ষতার সাথে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারেন। এসব মহৎ উদ্যোগের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দেশের মানুষকে আলোকিত করার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

---

৯৮. মওলানা মোহাম্মদ আবু তাহের, সহকারী অধ্যাপক, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৯৯. মওলানা মোস্তাক আহমদ, সাবেক আরবি প্রভাষক, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১০০. এ. কে মাহমুদুল হক সম্পাদিত, 'বায়তুশ শরফ সংবাদ', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, ৪র্থ বর্ষ, ৪৪তম সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৮৪, পৃ. ৫৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

গ্রন্থরচনা ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সাহিত্য-অনুরাগী ছিলেন। তিনি কবি, সাহিত্যিক ও ইসলামি স্কলারদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এজন্য দেখা যায় যে, সমকালীন বহু লেখক, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ইসলামি ব্যক্তিত্ব তাঁর দরবারে ভিড় জমাতেন। এদের মধ্যে 'আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে'র তৎকালীন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, 'মাসিক মদীনা'র সম্পাদক মওলানা মহিউদ্দীন খান, কবি আল মাহমুদ, কবি আবদুল হালীম খাঁ, কবি মোজাম্মেল হক প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত কবি তরফাতু ইব্‌নুল 'আব্‌দ[১০১] বলেন,

عَنِ المَرءِ لا تَسأَل وَسَل عَن قَرينَهُ - فَكُلُّ قَرينٍ بِالمُقارِنِ يَقتَدي

অর্থাৎ 'কোনো লোক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না (যে সে কেমন?); বরং তার সঙ্গী ও সহচর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো; কারণ প্রত্যেক সঙ্গীই (কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার) তার সঙ্গীর অনুসরণ করে।'[১০২]

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) একজন সুলেখক ছিলেন। তিনি মৌলিক গ্রন্থরচনার পাশাপাশি অন্য ভাষায় লিখিত মূল্যবান গ্রন্থও বাংলায় অনুবাদ করেন। এসব গ্রন্থরচনার মাধ্যমে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তেমনি নিজেকে স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখার ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছেন। যেমন জনৈক কবি বলেছেন,

غرض نقشے ست کز ما یاد ماند — کہ ہستی را نمی بینم بقائے

অর্থাৎ 'এ হলো আমার কিছু স্মৃতি, যার মাধ্যমে আমি পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে থাকব। অন্যথা, মানুষের অস্তিত্ব তো চিরদিন থাকার নয়।'

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৬টি। এছাড়া তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে একাধিক ম্যাগাজিন, বার্ষিকী, বুলেটিং ও দেয়ালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোর বিভাজন নিম্নরূপ:[১০৩]

(ক) মৌলিক গ্রন্থ	: ১৩টি
(খ) অনুবাদ গ্রন্থ	: ০৯টি
(গ) প্রবন্ধ সংকলন	: ০১টি
(ঘ) পত্র-পত্রিকা	: ০১টি
(ঙ) অভিভাষণ	: ০২টি
	২৬টি।

১০১. তারাফা ইব্‌ন 'আবদ জাহিলি যুগে বিখ্যাত 'সব্‌আ' মু'আল্লাকাহ্' বা ঝুলন্ত সপ্তগীতিকার কবিদের একজন। বাহরাইনের এক অভিজাত পরিবারে ৫৩৪ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। হিরার অধিপতি আমার ইব্‌ন হিন্দকে নিয়ে ব্যঙ্গকবিতা রচনার অভিযোগে মাত্র ২৬ বছর বয়সে ৫৬৯ খ্রি. তাকে হত্যা করা হয়। দ্র. ড. আবদুল জলীল, আরবি কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৫), পৃ. ২০০

১০২. আহমদ আল-হাশেমি, *জাওয়াহিরুল আদাব* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, তা. বি.), খ.২, পৃ. ৬৩৫

১০৩. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, সম্পাদক, মাসিক দ্বীন দুনিয়া ও মাসিক শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া, বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

(ক) মৌলিক গ্রন্থ

১. শরীয়ত ও তরীকতের আদাব

এটি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর একটি মৌলিক গ্রন্থ। 'আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ', চট্টগ্রাম থেকে গ্রন্থটি ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০, মূল্য ১৫ টাকা। এ গ্রন্থটিতে শরি'আত ও তরিকত সম্পর্কিত বিভিন্ন আদব-কায়দা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর মতে, তরিকতের সকল কাজ শরি'আত-সম্মত তথা শরি'আত অনুমোদিত হওয়া উচিত।[১০৪] একইসাথে এতে কামিল পীরের পরিচয়, মুরিদ হওয়ার আসল উদ্দেশ্য, মুরিদগণের কর্তব্য, পারিবারিক ও সামাজিক যিন্দিগির আদাব ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। বইটি তরিকত চর্চাকারীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

২. রফিকুছ ছালেকীন (আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রার্থীদের সাথী) (২য় ভাগ)

এটিও তাঁর একটি মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০, মূল্য ১৫ টাকা; আগস্ট ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে 'চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ লাইব্রেরি' থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। এখানে বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা, মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.)-এর আরবি, উর্দু, ফারসি ভাষায় অমর বাণীসমূহ বাংলায় অনুবাদ করেছেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)। তাছাড়া তিনি তাঁর মুর্শিদের বাগদাদ সফরের সময় বিভিন্ন স্থান ও মাজার জিয়ারতকালীন ঘটনাপ্রবাহ উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

৩. তাফসীরে আউযুবিল্লাহ

এটি 'বায়তুশ শরফ লাইব্রেরি চট্টগ্রাম' থেকে আগস্ট, ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর রচিত মৌলিক একটি গ্রন্থ। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪, মূল্য ৪০ টাকা। বইটিতে শয়তানের[১০৫] পরিচয় তুলে ধরার পাশাপাশি নবি, অলি, গাউস-কুতুব ও সাধারণ মানুষের সাথে শয়তানের আচরণের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। 'আউযুবিল্লাহ্'র অর্থ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, তাৎপর্য, ফযিলত ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

৪. শরীয়ত ও মারফতের দৃষ্টিতে গানবাজনা

এ গ্রন্থটি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অনবদ্য একটি গ্রন্থ। এটি 'বায়তুশ শরফ লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম থেকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত

---

১০৪. মুহাম্মদ আব্দুল হাই নদ্‌ভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ্, 'শাহ্‌সুফী হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)', *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজসংস্কারক শাহ্‌সুফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

১০৫. শয়তান শব্দটি شَطَنٌ থেকে নির্গত গুণবাচক বিশেষ্য। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো, দূরে চলে যাওয়া। যেহেতু এ অভিশপ্ত শয়তান একে তো প্রকৃতিগতভাবে মানবপ্রকৃতি থেকে আলাদা, দ্বিতীয়ত সে তার নিজের অপকর্মের কারণে সব ধরনের কল্যাণ থেকে দূরে সরে গেছে, তাই তাকে এ নামে অভিহিত করা হয়। কারও মতে, শব্দটির 'নূন' বর্ণটি অতিরিক্ত। এটি شاط থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো, আগুনে প্রজ্বলিত হওয়া। যেহেতু সে আগুনের তৈরি, এ কারণে তাকে এ নামে অভিহিত করা হয়। কেউ কেউ এ দুটি ব্যাখ্যাকেই সঠিক মনে করেন; তবে প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাটি অধিক বিশুদ্ধ। দ্র. আবুল কাসিম মাহমুদ যামাখশারি, *আল-কাশশাফ 'আন হাকা'য়িকিত তানযিল* (বৈরুত : দারুল মা'রিফাত, তা.বি.), খ.১, পৃ. ১০৩; আবু 'আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আনিল কারীম* (বৈরুত : দারুল ইয়াহইয়াউত তুরাছিল 'আরাবি, তা.বি.), খ.১, পৃ. ৯০

হয় ১৯৯১ ও ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১ ও মূল্য ১৫ টাকা। বইটির প্রথম থেকে ৩১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখকের মূল রচনা; বাকি অংশে রয়েছে গান বাজনা হারাম হওয়া সম্পর্কে দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরামের মতামত। এতে কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে গানবাজনার বিশদ বিবরণ উল্লেখপূর্বক গানবাজনা ও সেমা সম্পর্কে লেখকের মতামত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। পাশপাশি বাদ্যযন্ত্র বেচাকেনা ও বাদ্যবিষয়ক সরঞ্জাম দিয়ে ব্যাবসা করা যে হারাম সে সম্পর্কেও আলোচনা বিধৃত হয়েছে।

৫. সংক্ষিপ্ত নামাজ শিক্ষা ও দীনিয়াত

এটি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। 'বায়তুশ শরফ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান' থেকে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪, মূল্য ৭০ টাকা। এটি সাধারণ মুসলিমগণের দৈনন্দিন 'আমলি যিন্দিগিতে অতীব প্রয়োজনীয়। এতে একজন মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

৬. তালীমে হজ্ব ও জিয়ারত

এটি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর হজ [১০৬] বিষয়ক মৌলিক প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২, মূল্য ২০ টাকা। তাঁর জীবদ্দশায় ৩৩ বার হজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচ্য গ্রন্থে হজের ফরজ, ওয়াজিব ও বিভিন্ন আহকাম এবং হজের কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় মাস'আলা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া তিনি হজে ও যিয়ারতকালে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধানও এতে সন্নিবেশ করেছেন। বইটি হাজিদের জন্য অতি নির্ভরযোগ্য ও অনুসরণীয়।

৭. কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে দোয়া ও মুনাজাতের তত্ত্ব

এটিও মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর একটি মৌলিক গ্রন্থ। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০ ও মূল্য ৩০ টাকা। এটি ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বায়তুশ শরফ লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে দু'আর গুরুত্ব, সূরা ফাতিহা, নাস ও ফালাকের অর্থ, মুনাজাতে হাত ওঠানো, শেষে মুখমণ্ডল মাসেহ্‌র দলিল, সম্মিলিত দু'আয়ে 'আমিন' বলা ও খতমে কুর'আন ও তারাবিহ নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ করা ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

৮. কোরআন ও হাদীসের আলোকে যিক্‌রুল্লাহর গুরুত্ব

পবিত্র কুর'আন ও হাদিসের আলোকে যিকির সম্পর্কে লিখিত এই গ্রন্থটি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অনন্য মৌলিক এক গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বায়তুশ শরফ লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২ এবং মূল্য ৩০ টাকা। আলোচ্য গ্রন্থে

১০৬. হজ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প করা। শরি'আতের পরিভাষায়, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট তারিখ ও নিয়মে কা'বা শরিফ ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারত করাকে হজ্ব বলে। হজের মধ্যে ইহরাম, উকুফে আরাফাহ ও তওয়াফে যিয়ারত ফরয। দ্র. মওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯), পৃ. ১৭৯; ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২৫, পৃ. ৭৩-৭৪; সম্পাদিত, *ফাতাওয়া ও মাসাইল* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯), খ.৪, পৃ. ১২৫

যিকিরের পরিচয়, গুরুত্ব, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যিকিরের উপকারিতা, আত্মা পরিষ্কার ও পরিশুদ্ধ রাখায় উপায় ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

৯. ইল্‌মে তাসাউফের হাকীকত

এই গ্রন্থটি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সুফিতত্ত্ব বিষয়ক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর তৃতীয় সংস্করণ বায়তুশ শরফ লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম হতে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৯ ও ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণ বায়তুশ শরফ আশ-শরফ একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০, মূল্য ৫০ টাকা। এ গ্রন্থটি কুয়েতের শেখ আবদুল কাদের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ঈসা (১৯২০–১৯৯১ খ্রি.) রচিত 'হকায়িক 'আনিত্‌ তাসাওউফ' গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে লেখা। ইলমে তাসাওউফের ওপর এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

১০. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর-আউলিয়ার গুরুত্ব

এটিও মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর একটি মৌলিক গ্রন্থ। এটি বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম থেকে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে প্রকাশিত হয়। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০, মূল্য ৩০ টাকা। এটি লেখকের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আল্লাহ্‌র ওলিগণ আধ্যাত্মিক শক্তি-সাধনা ও যিক্‌রে নিমগ্ন থেকেও সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, আল্লাহ্‌ তা'আলার আইন ও ইসলামি নীতিমালা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সাধনা ও সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তিনি উক্ত গ্রন্থে তা চমৎকারভাবে আলোকপাত করেন।

১১. রমযান উপলক্ষ্যে কয়েকটি উপদেশ ও জরুরী মাসায়েল

বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম থেকে ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) রচিত এই মৌলিক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২২, মূল্য ৫ টাকা। কুর'আন-হাদিসের আলোকে রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্য, রোযা সম্পর্কিত জরুরি বিভিন্ন মাস'আলা-মাসা'য়েল এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। তাছাড়া তারাবিহ[১০৭] ও তাহাজ্জুদ[১০৮] নামায আদায়ের গুরুত্ব, কদরের রাত্রিতে 'ইবাদত

---

১০৭. তারাবিহ শব্দটি 'তারবিহাহ' (ترويحة) শব্দের বহুবচন। একটি راحة শব্দ থেকে উদ্ভূত; এর অর্থ শান্তি, স্বস্তি, আরাম ও অবসাদশূন্যতা। 'তারাবিহ' (تراويح) অর্থ মনের শান্তিবিধান, অবসাদ দূরীকরণ ও শ্রমবিনোদন। আর 'তারাবিহ' বলতে সাধারণত অবসাদ দূরীকরণ ও বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে কোনো উপবেশন ও বৈঠককেই বোঝানো হয়; তবে পরিভাষায়, কিয়ামে রামাযানের সময় বিশ্রাম গ্রহণ ও শারীরিক অবসাদ দূর করার উদ্দেশ্যে প্রতি চার রাকা'আত পরপর আসীন বৈঠককেই 'তারাবিহ' বলা হয়। পরবর্তীকালে রূপকার্থে প্রত্যেক চার রাক'আত সালাতকেই এক এক তারাবিহাহ বলা হয় এবং রামাদান মাসের কিয়ামুল লাইল বা রাতের সালাতকে 'সালাতুত তারাবিহ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। দ্র. ড. আহমদ আলী, *সালাতুত তারাবীহ* (ঢাকা : মাকতাবাতুস সালাম, ২০২১), পৃ. ১৩

১০৮. তাহাজ্জুদ শব্দটি আরবি اَلْهُجُوْدُ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এ শব্দটি আভিধানিকভাবে যেমন ঘুমানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি জাগ্রত থাকার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দ্র. আবুল ফাদল ইবনু মানযুর, *লিসানুল 'আরব*(ইরান : নাশরু আদবিল হাওয়া, ১৯৮৪), খ.৩, পৃ. ৬৩; দ্র. ফাইয়ুমী, *আল-মিসবাহুল মুনীর* (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), খ.১, পৃ. ১২৮; যখন কেউ কৃত্রিমভাবে ঘুমকে দূরীভূত করে জাগ্রত থাকে, তখন 'আরবিতে تَهَجَّدَ বলা হয়। পরিভাষায় 'তাহাজ্জুদ বলতে সাধারণত রাতে ঘুমানোর পর ওঠে আদায়কৃত নফল সালতকে বোঝানো হয়। দ্র. আবু যাকারিয়া ইয়াহয়া নববি, *আল-মাজমু' শারহুল মুহাযযব* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪ নভেম্বর, ২০১০), খ.৪, পৃ. ১৯; মুহাম্মদ আল-খতীব শারবীনী, *মুগনীউল মুহতাজ ফি আলফালি মিনহাজ* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৯৪), খ.১, পৃ. ২২৮

বন্দিগির ফযিলত, যাকাত ও ফিতরা আদায়ের গুরুত্ব এবং আদায় না করার পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। রমযানের মাস'আলা-মাসা'য়েলের জন্য এটি একটি অনুসরণীয় পুস্তিকা।

১২. আল্ আসমাউল হুসনা

এ গ্রন্থটি মুসলিমগণের নাম সংকলন সম্পর্কে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর একটি মৌলিক গ্রন্থ। এটি বায়তুশ শরফ লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম থেকে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৮, মূল্য ৩০ টাকা। গ্রন্থটি প্রস্তুতকরণে লেখকের নির্দেশিকা মতে সহযোগিতা করেন মওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক। গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থটিতে আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নাম, নবি-রাসুলগণ ও সাহাবিগণের নাম অর্থসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গ্রন্থটি নবজাতকের নাম নির্বাচনে খুবই সহায়ক।

১৩. মাহ্ফিলে ইছালে ছওয়াব কি ও কেন

এটিও মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর অনন্য সৃষ্টি। বইটি কখন প্রকাশিত হয়েছিল তার সঠিত তথ্য পাওয়া যায় নাই। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬, মূল্য ২০ টাকা। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মাযার খানকা-কেন্দ্রিক ওরশে যে অনৈসলামিক কাজ সংঘটিত হয় তা মূলোৎপাটনের নিমিত্তে তিনি আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটিতে 'ইছালে ছওয়াব মাহফিল' সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করার পাশাপাশি শরি'আতের মানদণ্ডে 'ইছালে ছওয়াব মাহফিল' এবং তাতে করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

(খ) অনুবাদ গ্রন্থ

১. বেশারাতুল এখওয়ান ফী খাওয়াচ্ছিল কোরআন

এটি বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) লিখিত একটি মৌলিক গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)। ২২৫ পৃষ্ঠা সংবলিত এ গ্রন্থে তরিকতের নীতিমালা ও তরিকতপন্থিদের জন্য দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রয়েছে।

২. আল-মুনাব্বেহাত

এটি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর একটি অনুবাদ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মূল লেখক হযরত ইব্ন হাজার আস্কালানি (রহ.)[১০৯]। মূল গ্রন্থটি আরবি ভাষায় রচিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৪, মূল্য ৬০ টাকা। বায়তুশ শরফ লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম হতে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর

---

১০৯. ইব্ন হাজার আসকালানি (১৩৭২-১৪৪৮ খ্রি.)-এর আসল নাম আবুল ফযল আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলি ইব্ন মাহমুদ আল-কিনানি। তিনি হাফিয ইব্ন হাজার আল-আসকালানি নামে সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তিনি একজন বিদগ্ধ হাদিস বিশারদ ও শাফেয়ি মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ্। তিনি ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৩৭২ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনের (বর্তমান ইসরাইলের) আসকালান শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিশরের কায়রো শহরে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৪৪৮/১৪৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৫০ এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে ১২ খণ্ড বিশিষ্ট বুখারি শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ *'ফতহুল বারী'* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্র. ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব* (বৈরুত : দারু ইব্ন কাসির, ১৯৮৬), খ.৭, পৃ. ২৭০-২৭৩

হাদিস, সাহাবি ও প্রসিদ্ধ মনীষীদের বাণী উক্ত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থটি মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার দিক-নির্দেশনা রয়েছে।

৩. চল্লিশ হাদীস ও চল্লিশ বাণী

এটিও মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) অনূদিত একটি ছোটো পুস্তিকা। বায়তুশ শরফ লাইব্রেরি থেকে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৮, মূল্য ২০ টাকা। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে মওলানার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্‌ভী তথ্যসূত্র সংযোজন করে বইটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে ৪০টি সহিহ্ হাদিসের মূল আরবি এবং সাহাবি ও অন্য মনীষীদের ৪০টি বাণীর আরবি উদ্ধৃতি বাংলা অর্থসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামি জীবন গঠনের ক্ষেত্রে গ্রন্থটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৪. তোহফাতুল উশ্‌শাক বা প্রেমিকদের তোহফা

এটি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর অনূদিত একটি গ্রন্থ। এটি মূলত হাজি এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)[১১০]-এর ফারসি ভাষায় লিখিত একটি কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি জুলাই ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০, মূল্য ১৫ টাকা। এটি মানব অন্তরে আল্লাহ্ প্রেমের আকর্ষণ সৃষ্টির অন্যতম প্রয়াস। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি ফারসি কবিতার পাশাপাশি বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ লিপিবদ্ধ করেছেন। সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য সুখপাঠ্য একটি গ্রন্থ। আল্লাহ্‌র প্রেমিকদের জন্য এটি এক অনন্য উপহার।

৫. গেযায়ে রূহ বা রূহের খোরাক

এটিও মওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) এর একটি অনুবাদ গ্রন্থ। এর মূল লেখক ভারতীয় উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ, আধ্যাত্মিক সাধক হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)। এটি উর্দু ভাষায় রচিত তরিকত বিষয়ক একটি অমূল্য গ্রন্থ। তিনি গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষায় আনুবাদ করে নামকরণ করেছেন 'রূহের খোরাক'। বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৪, মূল্য ১০ টাকা। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বইটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে সর্বস্তরের মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা লাভ, আখিরাতের শান্তি ও মুক্তি লাভের উপায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. জিহাদে আকবর

এটি তাঁর অনূদিত গ্রন্থ। এটি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বায়তুশ শরফ প্রকাশনী, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। বইটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭০, মূল্য ২০ টাকা। এ গ্রন্থটির মূল রচয়িতার পরিচয় জানা যায় নি। ধারণা করা হয়, আল্লাহ্ প্রেমিক কোনো অলি নিজের নাম গোপন করে ফারসি ভাষায় কিতাবটি রচনা

১১০.হাজি এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কি (১৮১৫-১৮৯৯ খ্রি.) ভারতের মুযাফ্ফর নগর জেলার অন্তর্গত থানাভবন গ্রামে ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকে তিনি 'ইল্‌মে তাসাওউফের প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তাঁর সফল আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে উপমহাদেশের বড়ো-বড়ো 'আলিম যেমন হযরত মওলানা কাসেম নানুতবী, হযরত মওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, হযরত মওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, হযরত মওলানা আশরফ আলী থানভী, হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী প্রমুখ তাঁর মুরিদ ও খলিফা ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৩১৫ হি./ ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল মু'আল্লায় তাঁকে দাফন করা হয়। দ্র. হাবিবুর রহমান, *আমারা যাদের উত্তরসূরী* (ঢাকা : আল কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৪৩-৪৮; মওলানা মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ* (ঢাকা : শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৭২-৭৩

করেন। হাজি এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.) কিতাবখানায় আরও কিছু যোগ করে ১২৬৮ হিজরিতে কবিতা আকারে উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। মওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) গ্রন্থটির উর্দু কবিতার চরণের বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ সংযোজন করেন। আলোচ্য গ্রন্থে সুন্দর উপমা ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে মানবজীবনে রুহ ও নফসের দ্বন্দ্বকে দার্শনিক চিন্তাধারার আলোকে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। গ্রন্থটি সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষণীয় ও অনুসরণীয়।

৭. হৃদয়ের টানে মদিনার পানে

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বিশ্ববরেণ্য 'আলিম, শায়খুল হিন্দ মওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস আদ-দেহলভি (রহ.)[১১১] এর ফারসি ভাষায় রচিত 'জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব' এর ভাষান্তর করেছেন 'হৃদয়ের টানে মদিনার পানে' নামে। এটি বায়তুশ শরফ লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৬৪, মূল্য ১৫০ টাকা। মদিনা মুনাওয়ারার প্রামাণ্য ইতিহাস, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর মাদানি যিন্দিগির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, ফযিলতপূর্ণ পবিত্র স্থানসমূহের আলোচনা, রসুলের রওযা মুবারকের শান ও মর্যাদা, দরুদ শরিফের ফযিলতসহ ইসলামি জ্ঞান-ভান্ডারের অনেক অমূল্য তথ্য এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৮. আছরারুল আহকাম

এটি পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিমে দীন হযরত মওলানা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী (রহ.) কর্তৃক উর্দু ভাষায় লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গ্রন্থটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২০, মূল্য ৫০ টাকা। এটি শাহ্ আবদুল জব্বার একাডেমি, চট্টগ্রাম থেকে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়।

৯. আল ইহসান

এটি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর ইন্তিকালের পর প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ অনুবাদ গ্রন্থ। এটি ১৫ জানুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্ভী কর্তৃক শাহ্ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমি, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৩২, মূল্য ৭৫ টাকা। গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট এগারোজন 'আলিমে দ্বীনের কুর'আন ও হাদিসের আলোকে তাসাওউফ সংক্রান্ত তথ্যবহুল আলোচনা স্থান পেয়েছে।

---

১১১. আবদুল হক মুহাদ্দিস আদ-দেহলবি স্বনামধন্য ইসলামি পণ্ডিত ও জগতশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ছিলেন। উপমহাদেশে 'ইলমে হাদিস চর্চা ও প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি ১৫৫১ খ্রি. দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র তিন মাসে তিনি পবিত্র কুর'আন মুখস্থ করেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ৬০টিরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে *আশি'আতুল লুম'আত, মাদারিজুন নবুয়্যত ও জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব* ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৬৪২ খ্রি. দিল্লিতে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলি, *শাযারাতুয যাহাব ফি আখবারি মান যাহাব*(বৈরুত : দারু ইব্ন কাসির, ১৯৮৬), খ.২, পৃ. ১৭০-১৭৩

(গ) প্রবন্ধ সংকলন

মলফুজাতে পীর ছাহেব বায়তুশ শরফ

এটি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন। গ্রন্থটি বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মওলানা আবদুল হাই নদভীর প্রথম সাহিত্যকর্ম হিসেবে ৯ অক্টোবর, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১৬, মূল্য ৩০ টাকা। এ গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর চরিত্র সম্পর্কে ৬টি, সুফিবাদ সম্পর্কিত ১১টি এবং রমযান ও ঈদ সম্পর্কে ৩টিসহ সর্বমোট ২০টি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধ কুর'আন-হাদিসের আলোকে লেখা তথ্যসমৃদ্ধ।

(ঘ) অভিভাষণ

১. ভাবের সৈকতে শান্তির সন্ধান

৫৪ পৃষ্ঠা সংবলিত এ বইয়ে 'ইলমের প্রকারভেদ, শরি'আত ও মা'রিফতের একটি পর্যালোচনা' এবং 'আল্লাহ্‌র সন্ধানে আল্লাহ্‌র ওলিরাই পথের দিশারী' শীর্ষক মওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) (১৯৩৩-১৯৯৮ খ্রি.) প্রদত্ত দুটি ভাষণ স্থান পেয়েছে। এই ভাষণ দুটিকে 'ভাবের সৈকতে শান্তির সন্ধান' নাম দিয়ে নভেম্বর ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী প্রকাশ করেন।

২. খুতবাত-এ পীর ছাহেব বায়তুশ শরফ

১২৪ পৃষ্ঠা সংবলিত এ গ্রন্থে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) প্রদত্ত ভাষণসমূহ স্থান পেয়েছে। মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্‌ভী সে ভাষণগুলো সংকলন করে বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম থেকে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে 'খুতবাত-এ পীর ছাহেব বায়তুশ শরফ' নামে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত। যথা : ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ এবং সম্মেলন ও সেমিনারে প্রদত্ত ভাষণ।

(ঘ) পত্র-পত্রিকা

মাসিক দ্বীন দুনিয়া

সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রচার-প্রসার ঘটানো আলিমগণের পবিত্র দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী মুখপত্রের। এ মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে 'দ্বীন দুনিয়া' নামে একটি সৃজনশীল মাসিক পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাহিত্য, প্রবন্ধ এবং কুর'আন ও হাদিসের শাশ্বত বাণী দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। পাশ্চাত্য ও হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মাসিক 'দ্বীন দুনিয়া' বলিষ্ঠ ও সাহসী নিরন্তর লড়াই ও সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

(ঙ) ম্যাগাজিন, বার্ষিকী ও স্মারকগ্রন্থ

১. আল আছরার (বিশেষ প্রকাশনা)

এটি বায়তুশ শরফের বার্ষিক প্রকাশনা। কাদেরিয়ার তরিকার পরিচয়, ইছালে ছওয়াব মাহফিল, সমাজসেবা ও বায়তুশ শরফের পরিচিতি জনসমক্ষে তুলে ধরার লক্ষ্যে এটি প্রকাশিত হয়। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ

থেকে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১২টি সংখ্যা ১২টি শিরোনামে মাসিক 'দ্বীন দুনিয়া'র বর্তমান সম্পাদক মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্র সম্পাদনায় বায়তুশ শরফ আন্জুমনে নওজোয়ান ও বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে আখতরাবাদে (কুমিরাঘোনা) বার্ষিক ইছালে সাওয়াব মাহ্ফিল উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো হলো:

(ক) আল-আছরারে বায়তুশ শরফ-জানুয়ারি, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ (খ) আল-আছরার (শহীদ হাফেয আব্দুর রহীম সংখ্যা), মার্চ, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ (গ) আল-আছরার, জানুয়ারি ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ (ঘ) আল-আছরার, জানুয়ারি ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ (ঙ) আল-আছরার ('উলামায়ে কিরাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে বায়তুশ শরফের পীর সাহেব), ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ (চ) আল-আছরার (হুজুর কেবলার আমেরিকা সফর), ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ (ছ) আল-আছরার (বায়তুশ শরফের মর্মকথা), জানুয়ারি, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ (জ) আল-আছরার (এ দেশ শাহ্ জালাল, খান জাহান, শাহ্ মাখদুম ও শাহ্ আখতারের), জানুয়ারি ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ (ঝ) আল-আছরার (সমাজসেবক ও আধ্যাত্মিক সাধক বায়তুশ শরফের পীর সাহেব), ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ (ঞ) আল-আছরার (বায়তুশ শরফ আমার ভালোবাসা), জানুয়ারি, ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ (ট) আল আছরার (বায়তুশ শরফের মর্মবাণী), জানুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ (ঠ) আল-আছরার (আবদুল কাদের জিলানি রহ., ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ (ড) আল-আছরার (হুজুর কেবলা রহ. এর স্মরণে), ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ।[১১২]

২. সোচ্চার

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর মেজো ছেলে হাফেয আবদুর রহীম ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজপথে মিছিল করতে গিয়ে বাতিলের হাতে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে শাহাদত[১১৩] বরণ করেন। 'শহিদ আবদুর রহীম স্মৃতি সংসদে'র উদ্যোগে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর তত্ত্বাবধানে বায়তুশ শরফ মাদ্রাসার বাংলা বিভাগের তৎকালীন শিক্ষক জনাব গোলাম মোস্তফা রঙ্গসীর সম্পাদনায় ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে *'সোচ্চার'* নামে একটি সাময়িকী বের হয়। এতে শহিদ আবদুর রহীমের জীবনবৃত্তান্তসহ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর পারিবারিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।[১১৪]

---

১১২. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্ভী, *এক মহিমান্বিত জীবন কর্ম ও প্রকাশনা আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার রহ.-সিরিজ-৪* (চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ১৩-১৪

১১৩. শাহাদত আরবি শব্দ; এটি শহিদা (شَهِدَ) শব্দমূল থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিত। ইবনুল ইমাদ (রহ.) বলেন, 'শহিদ' শব্দটি সাতটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা : পৌঁছানো, সংরক্ষক, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত, আল্লাহ্র রাস্তায় শহিদ, কোনো ব্যক্তির অধিকারের পক্ষে সাক্ষী হওয়া, উপস্থিত ব্যক্তি এবং শরিক বা অংশীদার। দ্র. ড. মুসাফির ইব্ন সাঈদ দাম্মাস আল-গামিদি, *মাজাল্লাতুল বুহুস আল-ইসলামিয়্যাহ* (রিয়াদ : ইদারাতুল বুহুসিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ২৮৫; শহিদের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-জুরজানী (রহ.) বলেন, هُوَ كُلُّ مُسْلِمٍ طَاهِرٍ بَالِغٍ قُتِلَ ظُلْمًا ولم يَجِبْ بِقَتْلِهِ مَالٌ ولَمْ يَرْتَثُّ 'এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে শহিদ বলা হয়, যে ব্যক্তি পবিত্র, বয়ঃপ্রাপ্ত এবং অন্যায়ভাবে নিহত। তার হত্যার বিনিময়ে মাল প্রদান করা ওয়াজিব হয় না।' দ্র. আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-জুরজানী, *আত-তারীফাত* (ইস্তাম্বুল : আহমদ কামিল, ১৩২৭ হি.), পৃ. ৮৭; মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান, *কাওয়াইদুল ফিক্হ* (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ৩৪৩

১১৪. জনাব গোলাম মোস্তফা রঙ্গসী, সাবেক শিক্ষক, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্রাসা, চট্টগ্রামে থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৩. শানে বায়তুশ শরফ

'বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' এর অঙ্গ সংগঠন 'আন্‌জুমনে নওজোয়ান বাংলাদেশ' কর্তৃক ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে *'শানে বায়তুশ শরফ'* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এবং সম্পাদনা করেন 'আন্‌জুমনে নওজোয়ানে'র তৎকালীন সদস্য মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ও হাফেয মজিবুর রহমান বেলাল। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে বিভিন্ন মাহফিল ও সংবর্ধনায় যে মানপত্রগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো গ্রন্থকারে সংকলন করা হয়েছে।[১১৫]

৪. 'আলো' বার্ষিক সাময়িকী

'বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা'র শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও আদর্শ কলম সৈনিক তৈরির উদ্দেশ্যে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মাদ্‌রাসার সিনিয়র শিক্ষক ও 'মাসিক দ্বীন দুনিয়া'র বর্তমান সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্‌র সম্পাদনায় ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে *'আলো'* নামে একটি বার্ষিক সাময়িকী বের হয়। বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত ছাত্র-শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধ এতে ছাপানো হয়; তবে এটিরও মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটে। ১৯৮৫ থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ৭টি সংখ্যা বের হয়েছে।[১১৬]

৫. শতফুল ফুটিতে দাও

'বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা'র অষ্টম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তদীয় জ্যৈষ্ঠপুত্র মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভীর সম্পাদনায় ৪৬ পৃষ্ঠা সংবলিত *'শতফুল ফুটিতে দাও'* শিরোনামে বাংলা ম্যাগাজিন (বিশেষ সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছিল। এতে জব্বারিয়া এতিমখানার শিক্ষার্থীরা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ও বায়তুশ শরফ নিয়ে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছিল।[১১৭]

৬. আশ শরফ

'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স' কর্তৃক 'মাহফিলে ইছালে ছওয়াব কক্সবাজার' উপলক্ষ্যে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ', কক্সবাজার জেলা কার্যালয়ের তৎকালীন উপ-পরিচালক আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেকের সম্পাদনায় ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে *'আশ্‌-শরফ'* নামে আরেকটি ম্যাগাজিনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এটিরও বেশ কয়েক সংখ্যা বের হওয়ার পর ছন্দপতন ঘটে। তাঁর ইন্তিকালের পর আর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।[১১৮]

---

১১৫. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, সাবেক সদস্য, কেন্দ্রীয় কমিটি, আন্‌জুমনে নওজোয়ান বাংলাদেশ, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১১৬. জনাব মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, সিনিয়র শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান), বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১১৭. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী, পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ ও সভাপতি, বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১১৮. মওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক, সাবেক বিভাগীয় পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭. আল-ইহসান

‘ঢাকা বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে’র তত্ত্বাবধানে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় *‘আল-ইহসান’* নামে একটি সাময়িকী বের হয়েছিল। এটি পর-পর বেশ কয়েক সংখ্যা বের হয়েছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর এটিরও ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।[১১৯]

৮. আল-বুশরা

বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চকরিয়া শাখার ‘বায়তুশ শরফ মসজিদ ও কমপ্লেক্সের শুভ উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে মুহাম্মদ নুরুল আমিনের সম্পাদনায় ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ‘আল-বুশরা’ নামে একটি স্মারকগ্রন্থ বের হয়। এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)। এতে বায়তুশ শরফের ভক্ত অনুরক্তগণ বায়তুশ শরফ নিয়ে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর থেকে এ পর্যন্ত এটি আর বের হয়নি।[১২০]

(চ) ইংরেজি ও বাংলা দেয়ালিকা

১. ‘রেভ্যুলেশন’ ইংরেজি দেয়ালিকা

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় নব্বই দশকের দিকে ‘বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা’র শিক্ষার্থীরা ‘রেভ্যুলেশন’ নামে একটি ইংরেজি দেয়ালিকা প্রকাশ করে। দেয়ালিকাটির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায় ছিলেন মাদ্‌রাসার তৎকালীন শিক্ষক মিসবাহুল ইসলাম; তবে এটির মাত্র এক সংখ্যা বের হয়েছিল। তারপর আর বের হয়নি।[১২১]

২. ‘বিজ্ঞান বিচিত্রা ইউনিটি’ দেয়ালিকা

বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসার বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর পৃষ্ঠপোষকতায় ‘বিজ্ঞান বিচিত্রা ইউনিটি’ নামে আরেকটি দেয়ালিকা প্রকাশ করে। এতে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সচিত্রভাবে লিপিবদ্ধ করার সুযোগ পেত; তবে এটাও পরবর্তীকালে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি।[১২২]

৩. বাংলা দেয়ালিকা

মাদ্‌রাসার ছাত্রদের সুপ্ত মেধা বিকাশের নিমিত্তে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর পৃষ্ঠপোষকতায় ‘প্রতিভা’, ‘শাহাদত’, ‘আল-হেলাল’, ‘আল-হেদায়া’ ইত্যাদি নামে বাংলা দেয়ালিকা

---

১১৯. জনাব ইমামুল আহসান ফারুক, হিসাবরক্ষক, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ফার্মগেইট, ঢাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১২০. জনাব মুহাম্মদ নূরুল আমিন, সম্পাদক, আল-বুশরা, বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চকরিয়া শাখা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১২১. জনাব মিসবাহুল হক, সিনিয়র শিক্ষক (ইংরেজি), বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১২২. জনাব মুহাম্মদ শাহজাহান, সিনিয়র শিক্ষক (বিজ্ঞান), বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

প্রকাশ করা হতো। তাতে ছাত্রদের প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলো ছাপা হতো; তবে পরবর্তীকালে এ দেয়ালিকাগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি।[১২৩]

৪. রাহমাতুল লিল-আলামিন

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাহমাতুল লিল-আলামিন' নামে আরেকটি দেয়ালিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়। এতে শিক্ষার্থীরা আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। বর্তমানেও এ দেয়ালিকার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।[১২৪]

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বহু রচনা করেছেন। তিনি নিজে বই পড়তেন, অন্যদেরকে বই পড়ার প্রতি উৎসাহিত করতেন। গ্রন্থরচনা, অনুবাদ, সম্পাদনা এবং পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে ইসলামি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

---

১২৩. জনাব মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, প্রভাষক (পদার্থবিজ্ঞান), বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১২৪. জনাব মওলানা সিরাজুল হক, সিনিয়র শিক্ষক (আরবি), বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জ্ঞান-গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা ও যোগ্য ব্যক্তি তৈরি

আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানের ধারক ও বাহক হওয়ার কারণেই মানুষ এ বিশাল মর্যাদা লাভ করেছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ জ্ঞান-গবেষণার জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠান ছিল দারুল আরকাম; যা মক্কায় অবস্থিত ছিল। হিজরতের পর মসজিদে নববি ছিল জ্ঞান-গবেষণার প্রধান কেন্দ্র। এখানে কিছুসংখ্যক সাহাবি সার্বক্ষণিকভাবে জ্ঞান অন্বেষণে নিমগ্ন থাকতেন। রাতদিন রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সান্নিধ্যে পড়ে থাকতেন। এভাবে তা পর্যায়ক্রমে সাহাবা, তাবি'ঈ ও তাবে-তাবে'ঈন এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। অগণিত শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলিমগণ যতদিন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-গবেষণায় নিমগ্ন ছিল, ততদিন তারা সারাবিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে; বিজয়ের পতাকা উড্ডীন রেখেছিল; কিন্তু তারা শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-গবেষণা অনুশীলনের পরিবর্তে বিলাস-ব্যসনে ডুবে গিয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ফলে তাদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হলো। এখন মুসলিমগণের সে সোনালি ঐতিহ্য বাস্তবে আর নেই। এখন তা শুধু স্বপ্নের মতো ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) তাঁর দূরদর্শী চিন্তাভাবনার দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, মুসলিমগণকে এই নিদ্রা থেকে জাগাতে হবে; সে হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে হবে। এই জন্য তিনি জ্ঞান-গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা ও যোগ্য ব্যক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

(ক) জ্ঞান-গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) জ্ঞান-গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে ইসলামি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন, গ্রন্থ প্রকাশ, গণপাঠাগার স্থাপন ও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১. ইসলামি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মুসলিমগণের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে 'বায়তুল হিকমাহ্'[১২৫] এর আদলে 'বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান'

১২৫.বায়তুল হিকমাহ শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খলিফা মামুনের স্থান ইসলামের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। ইতিহাসবিদগণ তাঁর যুগকে 'ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগ' তথা The Golden Age of Islamic Civilization বলে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রিক, সংস্কৃত, ফারসি, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির অনুবাদকার্যকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাগদাদ নগরীতে 'বায়তুল হিকমাহ্' (House of Wisdom) প্রতিষ্ঠা করেন। বায়তুল হিকমার প্রথম পরিচালক (সাহিবু বায়তিল হিকমা) ছিলেন সাহল ইব্ন হারুন আল-ফারিসি (মৃ. ৮৩০ খ্রি.)। উল্লেখ্য, বায়তুল হিকমার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে একটি বিশেষ গ্রন্থাগার হিসেবে, তারপর তা অনুবাদকেন্দ্রের রূপ পায়, তারপর তা পরিণত হয় গবেষণা ও সংকলনকেন্দ্রে, অবশেষে তা একটি শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠে। এখানে পাঠদান ও ইজাযতদানের কার্যক্রম চালু হয়। তারপর এতে যুক্ত করা হয় একটি মানমন্দির (Astronomical Observatory)। এভাবে বায়তুল হিকমা কয়েকটি বিভাগে রূপান্তরিত হয়েছিল। অনুবাদ বিভাগে যারা কাজ করতেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ইউহান্না ইব্ন মাসাওয়াইহ, জিবরিল ইব্ন বুখতিশু এবং হুসাইন ইব্ন ইসহাক। তাদের চেষ্টার ফলে

প্রতিষ্ঠা করেন।[১২৬] এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানেই সেমিনারের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাংলাদেশে প্রথম সুদমুক্ত পরিপূর্ণ ইসলামি ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড', 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম', 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স, মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা'র মতো আরও বহু প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০টির অধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। একই সাথে এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলিমগণের হারানো ঐতিহ্য কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। বাংলাদেশে ইসলামের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে 'বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান' নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনার কর্মসূচি গ্রহণ করে:[১২৭]

১. বাংলাদেশের ইসলামি ঐতিহ্যের নিদর্শনসমূহ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করা। আরবি, উর্দু, ফারসি, বাংলা পাণ্ডুলিপি, শিলালিপি, মুদ্রা এবং ইসলামি শিল্পকর্মগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।
২. ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে; যেমন : কুর'আন, হাদিস, ফিক্‌হ, তফসির, উসুলে ফিক্‌হ, তাসাওউফ, ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, প্রত্নতত্ত্ব এবং স্থাপত্য-শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা।
৩. বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাইরে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা।
৪. বক্তৃতা ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা।
৫. বই-পুস্তক, সাময়িকী ও পুস্তিকা প্রকাশ করা।
৬. একটি উন্নতমানের গবেষণাগার স্থাপন করা।
৭. গবেষণা এবং ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্যে গবেষণাবৃত্তি, ফেলোশিপ, পুরস্কার এবং মেডেল প্রবর্তন করা।
৮. গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে পরে যে কোনো কার্যকলাপ নির্ধারণ করা।
৯. 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা' ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ রাখা এবং প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরকে গবেষণামুখী করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সুষ্ঠু সমাজ গঠনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা।

এরিস্টটল, গ্যালেন, প্লেটো, হিপোক্রিটাস প্রমুখ পণ্ডিতের গ্রন্থ অনূদিত হয়ে আরবি সাহিত্যের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়। খলিফা অনুবাকদের বড় অঙ্কের সম্মানী দিতেন, এমনকি তিনি অনূদিত গ্রন্থের সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণও দিতেন। (যা দুই কেজি সোনার চেয়েও বেশি!) দ্র. ড. খিদির আহমাদ আতাউল্লাহ্, *বায়তুশ হিকমা ফিল 'আসরি আল-আব্বাসিয়্যিন* (কায়রো : দারুল ফিকরি আল-আরাবি, তা.বি.), পৃ. ২৯; ইব্‌ন আবি উসাইবি'আ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা* (কায়রো : দারুল মা'রিফ, ১৯৯৬), খ.২, পৃ. ১৩৩ ও ১৭২; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১৫, পৃ. ৬০৮; অধ্যাপক কে.আলী, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা : আলী পাবলিকশেনস, ১৯৮৫), পৃ. ২১৩; ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৭৬), পৃ. ৪৪৭

১২৬. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ঃ জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

১২৭. ড. আবদুল করিম, *ইসলামি ঐতিহ্য* (বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র) (চট্টগ্রাম: বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন, ১৯৮৫), পৃ.৩; মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, ড. আবদুল করিম, 'ইসলামী গবেষণায় বায়তুশ শরফ', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর সাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকগণের নাম ও মেয়াদকাল:[১২৮]

ক্র.	মহাপরিচালকগণের নাম	মেয়াদকাল
০১	প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	১৯৮০- ১৯৮৫ খ্রি.
০২	প্রফেসর ড. আবদুল করিম, প্রাক্তন উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	১৯৮৫- ১৯৯০ খ্রি.
০৩	প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	১৯৯১-১৯৯৮ খ্রি.
০৪	প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	১৯৯৮-২০১৬ খ্রি.
০৫	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ্ (আহসান সাইয়েদ), উপাচার্য, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।	২০১৭-২০২০ খ্রি.
০৬	প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, সাবেক অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	২০২০-২০২১ খ্রি.
০৭	প্রফেসর ড. আ.ক.ম আবদুল কাদের, সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	২০২১-বর্তমান

উল্লেখ্য, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) তাঁর প্রতিষ্ঠিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলিমগণের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি যুগ সমস্যার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেন। এসব সেমিনারের আলোচক, সমালোচক ও প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ও গবেষকবৃন্দ।

বায়তুশ শরফ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে তিনটি জাতীয় সেমিনার যথাক্রমে ২৬ এপ্রিল, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে ‘সুদবিহীন ইসলামি ব্যাংকিং’, ৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে ‘বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান’, এবং ১৫, ১৬, ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘বাংলাদেশে ইসলাম’ অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক শিক্ষক, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, গবেষক অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর ড. সিরাজুল হক (১৯০৫–২০০৫ খ্রি.) এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ও বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন মহাপরিচালক প্রফেসর ড. আবদুল করিম (১৯৩১–২০১৫ খ্রি.)। উল্লেখ্য যে, এ সেমিনারের প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র সাময়িকী ‘ইসলামী ঐতিহ্য’ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলো দিয়ে জাপান ও শ্রীলঙ্কায় *‘Islam in Bangladesh’* নামে একটি ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উক্ত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলো হলো:[১২৯]

---

১২৮. বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ এর কেন্দ্রিয় অফিস, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১২৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্‌ভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ঃ জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬

১. প্রফেসর ড. সিরাজুল হক, *বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ*, আলোচক : ড. এ. এম. এম. শরফুদ্দীন ও প্রফেসর আবদুল হক।

২. ড. রফীউদ্দিন আহমদ, *Advent of the Muslims in Bengal and the Spread of Civilizition,* আলোচক : প্রফেসর শব্বির আহমদ।

৩. ড. হাফীজুল্লাহ খান, *An Hitherto Unnoticed Ancient Mosque at Narayanganj,* আলোচক : ড. এম. আবদুল গফুর।

৪. ড. এম. গোলাম রাসুল, *Sufi Approach to Islam and Its Effects on the Mediaeval Muslim Bengal Society,* আলোচক : ড. মোহাম্মদ ইনামুল হক ও অধ্যাপক বদিউর রহমান।

৫. প্রফেসর ড. আবদুল করিম, *বাংলাদেশে মাদ্‌রাসা শিক্ষার গোড়ার কথা*, আলোচক : ড. এয়াকুব আলী ও প্রফেসর শব্বির আহমদ।

৬. ড. মফীজুল্লাহ কবীর, *Arab Contact with Chittagong,* আলোচক : ড. মুঈনদ্দীন আহমদ খান ও ড. এস. বি. কানুনগো।

৭. ড. এম. এ. রহীম, *Impact of British Rule on the Society and Culture of the Muslims of Bengal: Some preliminary suggestions*, আলোচক : ড. আলমগীর সিরাজুদ্দীন, ড. আবু ইউসুফ ও প্রফেসর শামসুল আলম।

৮. ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, *চীনা দস্তাবেজে বাঙ্গালা ও মুসলমান*, আলোচক : ড. এনামুল হক ও ড. এস. বি. কানুনগো।

৯. ড. মনযুর-ই-খুদা, *Welfare Stage and Islam*, আলোচক : ড. এম. আনিসুজ্জামান ও ড. আতাউল হক প্রামাণিক।

১০. প্রফেসর সুলতান আহমদ ভূঁঞা, *Muslim Contribution to Early Bengali Literature*, আলোচক : প্রফেসর শামসুল আলম ও প্রফেসর মুহাম্মদ শাহজাহান।

১১. ড. এনামুল হক, *Revenue Condition of Bengal in the early 18th century,* আলোচক : ড. রফীউদ্দিন আহমদ ও প্রফেসর তৌফিক হোসেন চৌধুরি।

১২. ড. আলমগীর সিরাজুদ্দীন, *Muslim Family Law and Society in Bangladesh in the Light of Development in the Muslim world,* আলোচক : ড. সিরাজুল হক।

১৩. সৈয়দ আহমদুল হক, *চট্টগ্রামে শিল্প ও বাণিজ্য (লবণ-শিল্প)*, আলোচক : প্রফেসর ড. আবদুল করিম।

১৪. অধ্যাপক শব্বির আহমদ, *The Concept of Bidah in Islam. A Problematic Study of it in the Context of Bangladesh,* আলোচক : প্রফেসর এ. বি. রফিক আহমদ ও প্রফেসর মফিজুদ্দীন।

১৫. ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, *বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব*, আলোচক : প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান।

১৬. মোহাম্মদ সানাউল্লাহ, *A. K. Fazlul Hoque and Muslim Education in Bengal,* আলোচক : ড. রফীকুল ইসলাম চৌধুরী ও বদিউল আলম।

১৭. প্রফেসর এ. বি. রফীক আহমদ, *আরবি হরফের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা ও একটি সহজলভ্য বিকল্প প্রস্তাব*, আলোচক : প্রফেসর ড. আবদুল করিম।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সময় উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ

বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে বিভিন্ন সময় নিম্নোক্ত প্রবন্ধসমূহ উপস্থাপন করা হয়:[১৩০]

ক্র.ন	তারিখ	প্রবন্ধ শিরোনাম	আলোচক
০১	২১/০৪/১৯৮১	সুদবিহীন ব্যাংক	জনাব মোহাম্মদ খালিদ খাঁন, ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।
০২	০৬/০৯/১৯৮১	বর্তমান মাদ্‌রাসা শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান	প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ।
০৩	০২/০৪/১৯৮৪	একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা	প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ।
০৪	১২/০৬/১৯৮৩	ইসলামের আলোকে বিজ্ঞান	জনাব মালিক আকবর আলি।
০৫	১৯/০৮/১৯৮৪	অধুনা নৈতিক সংকট ও বাংলাদেশ : একটি শব্দতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান।
০৬	১০/১০/ ১৯৮৪	শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ (রা.)-এর দৃষ্টিতে ইজতিহাদ[১৩১]	প্রফেসর আতাহার আলী।
০৭	০৬/১২/১৯৮৪	ইসলামী আইনে ইজতিহাদ ও বুদ্ধির স্থান এবং নতুন সমস্যা সমাধানে ইজতিহাদ	প্রফেসর মফিজ উদ্দিন আহমদ।
০৮	০৭/১২/১৯৮৪	হযরত হাসান বসরী (রা.)-এর পরিচিতি এবং তাঁর দৃষ্টিতে মন্দের ধারণা	প্রফেসর বদিউর রহমান।
০৯	৩০/০৩/১৯৮৫	বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সুফিদের ভূমিকা	প্রফেসর শেহাবুল হুদা।
১০	১০/০৪/১৯৮৫	কিতাব-উর-রাসূল (ইসলামের ইতিহাসের প্রথম সংবিধান)	প্রফেসর ড. আবদুল করিম।
১১	০৬/০৬/১৯৮৫	মুসলিম বিশ্বে হিন্দুস্থানী ওলেমার ব্যুৎপত্তিগত প্রভাব ও প্রতিপত্তি	প্রফেসর শব্বির আহমদ।
১২	১৯/০১/১৯৮৬	Evolution of Science in the Perspective: The Holy Quran	ড. মনজুর-ই-খুদা।

১৩০. মোহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ আবদুল জব্বার রাহ. জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১-৭৭; মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মোহাম্মদ শাহজাহান মানিক, 'বাংলাদেশে ইসলাম শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের একটি প্রতিবেদন', *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০-৬২

১৩১. ইজতিহাদ শব্দটি আরবি 'জুহ্দ' বা 'জাহ্দ' ধাতু থেকে নির্গত। 'জাহ্দ' এর অর্থ কষ্ট, মেহনত; আর 'জুহ্দ' এর অর্থ শক্তি, সামর্থ্য। দ্র. ইবনু মানযুর, *লিসানুল 'আরব*, পূর্বোক্ত, খ.৩, পৃ. ১৩৩; আর তা থেকে নির্গত 'ইজতিহাদ' এর অর্থ সর্বাত্মক চেষ্টা করা, দুরূহ কিছু অর্জনের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালানো। ইসলামি শরি'আতের পরিভাষায় ইজতিহাদ বলা হয়, কোনো বিষয়ে শরি'আতের বিধান জানার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। বিশিষ্ট হানাফি ফকিহ্ আবদুল আযিয আল-বুখারি (রহ.) (মৃ. ৭৩০ হি.) বলেন, هو بذل المجهود في طلب العلم بأحكام الشرع. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في طلب بحيث يحس من نفسه بالعجر عن مزيد طلب. অর্থাৎ 'ইজতিহাদ হলো, শরি'আতের বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করা। আর পূর্ণাঙ্গ ইজতিহাদ হলো, এ জ্ঞানার্জনের পথে সাধ্যমতো সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। দ্র. 'আলাউদ্দিন 'আবদুল 'আযিয আল-বুখারি, *কাশফুল আসরার 'আন উসূলি ফাখরিল ইসলাম আল-বাযদাভী* (বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবি, ১৯৭৪), খ.৪, পৃ. ২০

ক্র.ন	তারিখ	প্রবন্ধ শিরোনাম	আলোচক
১৩	২১/০৩/১৯৮৬	পবিত্র কোরআনের আলোকে বিজ্ঞান ও সৃষ্টি রহস্য	ড. মনজুর-ই-খুদা
১৪	২৯/০৫/১৯৮৬	কোরআন ও বিজ্ঞান-জ্যোতিবিজ্ঞানের কিছু রহস্য	ড. মোহাম্মদ আবু ছালেহ
১৫	০৬/০৭/১৯৮৬	শাহ্ সুফি নিজামপুরী (রহ.) ও তাঁর কর্মজীবন	ড. মোহাম্মদ শেহাবুল হুদা
১৬	০৪/১০/১৯৮৬	রাজকবি সভাসদ হযরত আমির খসরুর ব্যক্তি মানস : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা	প্রফেসর শব্বির আহমদ
১৭	০৯/১১/১৯৮৬	মহানবি (সা.) এর বক্ষবিদারণ ও বক্ষ সম্প্রসারণ একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা	জনাব আবুল হায়াত মোহাম্মদ তারেক
১৮	১২/০৪/১৯৮৭	মনসুর হাল্লাজের সর্বাত্মক প্রেম ও ব্যক্তি মানস	প্রফেসর শব্বির আহমদ
১৯	১৭/০৫/১৯৮৭	রোজার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য	প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান
২০	০৮/০৭/১৯৮৭	গিয়াসিয়া মাদ্‌রাসা (বাংলার সোলতান কর্তৃক পবিত্র মক্কা শরিফে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)	প্রফেসর ড. আবদুল করিম
২১	২৪/১০/১৯৮৭	ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামী প্রভাব	প্রফেসর ড. আবদুল করিম
২২	১৯/০৪/১৯৮৮	মৌলানা ইমাম উদ্দিন বাঙ্গালী	ড. শাহ্ মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ
২৩	২২/০৮/১৯৮৮	উপমহাদেশে মুসলিম শিক্ষার বিকাশগত রূপান্তর	প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ
২৪	১৫/০২/১৯৮৯	ওলেমা সম্প্রদায় ও মুসলিম সমাজ গঠন	প্রফেসর ড. শব্বির আহমদ
২৫	২৭/০৫/১৯৮৯	মওলানা জালাল উদ্দিন রুমির প্রেম ও ভক্তির রূপরেখা	জনাব সৈয়দ আহমদুল হক
২৬	০৪/০২/১৯৮৯	পবিত্র কোরআনের অলৌকিকতা ও বিশুদ্ধতার অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ	প্রফেসর মোহাম্মদ আলী আজাদী
২৭	১৭/০৪/১৯৯০	সামাজিক ন্যায় বিচার ও ইসলাম	প্রফেসর আবদুন নূর
২৮	২৯/০৫/১৯৯০	রাসুলুল্লাহ্ (সা) এর জীবন ও আদর্শের সামাজিক তাৎপর্য	প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান
২৯	২৮/০৭/১৯৯০	মুসলিম সমাজের দ্বান্দ্বিক ভিত্তি ও মার্ক্সীয় তত্ত্ব সমীক্ষা	প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান
৩০	২২/১০/১৯৯০	ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও মানস সম্পদ উন্নয়ন	প্রফেসর আবদুন নূর
৩১	০৪/০৪/১৯৯১	বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'আলিম সমাজের ভূমিকা	প্রফেসর মোহাম্মদ হাসান
৩২	১৫/১০/১৯৯১	তাওহীদ দর্শন ঃ অর্থ ও তাৎপর্য	ড. মোহাম্মদ আবদুল জলিল মিয়া
৩৩	১৫/০৩/১৯৯২	আরাকানে ইসলাম	প্রফেসর সোলতান আহমদ ভূঁইয়া

ক্র.ন	তারিখ	প্রবন্ধ শিরোনাম	আলোচক
৩৪	১৪/০৮/১৯৯২	বসনিয়া হার্জেগোভিনায় মুসলিম গণহত্যা- বিপন্ন বিশ্ববিবেক	আ. ফ. ম. জাহাঙ্গীর চৌধুরি
৩৫	২৩/১০/১৯৯২	বাংলাদেশে মুসলিম দর্শনচর্চা	প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শাহজাহান
৩৬	০৬/১২/১৯৯২	বাজার অর্থনীতির আবর্তে তৃতীয় বিশ	প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান
৩৭	২০/০২/১৯৯৩	ইমাম গাজ্জালীর দৃষ্টিতে খেলাফতের রাজনীতি	প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান
৩৮	০৭/০৭/১৯৯৩	: কাবুসনামার আসর-১ম	মওলানা মোহাম্মদ ঈসা শাহেদী
৩৯	২৮/০৭/১৯৯৩	কাবুসনামার আসর-২য়	মওলানা মোহাম্মদ ঈসা শাহেদী
৪০	১০/১১/১৯৯৩	নিযামুল মুলক তুসীর সিয়াসত নামা (মুসলিম রাজনীতির ৩য় অধিবেশন)	প্রফেসর ড. মুঈনুদ্দিন আহমদ খান
৪১	০২/১১/১৯৯৩	লোক প্রশাসন প্রক্রিয়ায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী	প্রফেসর আবদুন নূর
৪২	০৮/০৮/১৯৯৪	হাদিসের জরাহ ও তাদীল	প্রফেসর শব্বির আহমদ
৪৩	২১/১২/১৯৯৬	আল্লাহ্র একত্ব ও এলমের ভিত্তি	ড. মাসউদুল আলম চৌধুরী
৪৪	১৩/০৯/১৯৯৭	ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব ও পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব : একটি তুলনামূলক সমীক্ষা	ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান
৪৫	১২/০৫/১৯৯৮	আল-কোরআন ও জীবজগৎ	ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী
৪৬	১২/১০/১৯৯৮	সীরাত সাহিত্যের বিকাশধারা	আনোয়ারুল হক খতিবী।

বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহ

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে 'বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান' থেকে গবেষণাধর্মী বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো: [১৩২]

১. শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.), *চল্লিশ হাদীস ও চল্লিশ বাণী*, ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ।

২. শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.), *সংক্ষিপ্ত নামাজ শিক্ষা ও দ্বীনিয়াত*, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।

৩. মওলানা মোহাম্মদ শাহ্জাহান, *তাজভীদ শিক্ষা*, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ।

৪. Prof. Dr. Abdul Karim, *Social History of the Muslim in the Bengal*, 2nd Edition 1985.

৫. ড. আবদুল করিম সম্পাদিত, *ইসলামি ঐতিহ্য* (বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র), ১ জুন, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ।

৬. ড. আবদুল করিম, *মোল্লা মিসকিন শাহ (রহ.)*, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ।

৭. ড. আবদুল করিম, *মক্কা শরীফে বাঙ্গালী মাদ্রাসা*, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ।

৮. ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, *ত্রিপুরা ভাষায় ইসলাম ও নামাজ শিক্ষা*, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ।

৯. ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, *যুগোপযোগী রাজনীতিবিজ্ঞানের সন্ধানে ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিধারা-১*

১০. ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, *সার্ক এর স্বরূপ ও সম্ভাবনা (যুগোপযোগী রাজনীতিবিজ্ঞানের সন্ধানে-৪)*

১১. Edited by: Prof. Dr. Mainuddin Ahamed Khan, *Political Crisis : Socialism, Capitalism & What Next?*,

১৩২. প্রফেসর ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান, মহাপরিচালক, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১২. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ (সম্পা.), *আল-আছরার*, (১৯৮৮-১৯৯৯ খ্রি.) পর্যন্ত ১২ সংখ্যা ১২ শিরোনামে।
১৩. শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.), *তালীমে হজ্ব ও জিয়ারত*, প্রকাশকাল ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ।
১৪. মোঃ বদিউর রহমান, *হযরত ইমাম হাসান আল-বসরী (রহ.)*, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ।
১৫. শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.), *মলফুজাতে পীর ছাহেব বায়তুশ শরফ*, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ।
১৬. শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.), *রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দৃষ্টিতে পীর-আউলিয়ার গুরুত্ব*, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ।
১৭. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ (লিখিত ও সম্পাদিত.), *জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর*, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।
১৮. শাহ্ মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, *কিতাব ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তরিকতের মূলনীতি*, ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ।
১৯. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ (লিখিত ও সম্পাদিত), *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ।
২০. শাহ্ মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, *গুলহায়ে আকীদত*, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ।
২১. নুরুদ্দীন মাহমুদ সংকলিত, *নির্বাচিত ভাষণ*, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।
২২. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।
২৩. নুরুদ্দীন মাহমুদ সংকলিত, *হেদায়াতের আলো*, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

২. গণপাঠাগার স্থাপন

সমাজে এমন অনেক অবেহেলিত গরিব লোক রয়েছে যাদের জ্ঞানের স্পৃহা প্রবল কিন্তু উপযুক্ত সুযোগের অভাবে প্রতিভার বিকাশ ঘটেনি। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) অনুধাবন করলেন যে, প্রতিভার সেই সুপ্ত বীজকে একটু নাড়া দিলেই জেগে উঠবে। তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন গণপাঠাগার। যেখানে শিক্ষিত-মূর্খ, ধনী-গরিব সবার জন্য দ্বার উন্মুক্ত। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ৮টি গণপাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো: [১৩৩]

১. বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা পাঠাগার, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ডি. টি. রোড, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।
২. মসজিদ পাঠাগার আখতরাবাদ দরবার শরিফ, বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩. মসজিদ পাঠাগার, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা।
৪. মসজিদ পাঠাগার, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, বায়তুশ শরফ রোড, কক্সবাজার।
৫. মসজিদ পাঠাগার, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, পুরানা বাস স্ট্যান্ড, রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি।
৬. মসজিদ পাঠাগার, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, উত্তর গাঁথের ছড়া, লংগদু, পার্বত্য জেলা।
৭. মসজিদ পাঠাগার, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা।
৮. দক্ষিণ রতনাপালং শাহ্ আবদুল জব্বার (রহ.) স্মৃতি পাঠাগার, উখিয়া, কক্সবাজার।

৩. লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা

সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি এবং অর্জিত জ্ঞানের সংরক্ষণের জন্য লাইব্রেরির বিকল্প নেই। তাই বিশ্বের উন্নত দেশগুলো গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন

---

১৩৩. *কার্যক্রম তালিকা*, বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, পৃ. ০৯

করেছে এবং গ্রন্থাগারের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। গ্রন্থাগার জ্ঞানার্জনের সহায়ক। কেবল গ্রন্থাগারই পারে একজন ব্যক্তিকে প্রকৃত জ্ঞানী হিসেবে গড়ে তুলতে। তাই দেখা যায়, প্রাচীনকালের রাজা-বাদশাহগণ জ্ঞানচর্চার জন্য গ্রন্থাগার গড়ে তুলতেন; কিন্তু বর্তমান আমাদের দেশে সবচেয়ে অবহেলিত খাতগুলোর একটি হচ্ছে গ্রন্থাগার। তাই গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষাব্যবস্থা এ দেশে এখনও গড়ে ওঠেনি। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বিভিন্ন জায়গায় নিম্নোক্ত ৪টি ইসলামি পুস্তকের লাইব্রেরি স্থাপন করেন। সেগুলো হলো:[১৩৪]

১. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ১৪৯/এ নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা।
২. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, রিজার্ভ বাজার, পুরানা বাসস্ট্যান্ড, রাঙ্গামাটি।
৩. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, বায়তুশ শরফ রোড, কক্সবাজার।
৪. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা।

৪. জ্ঞানী-গুণীর পৃষ্ঠপোষকতা

বায়তুশ শরফ জাতীয় পর্যায়ে অনুমোদিত মসজিদভিত্তিক ধর্মীয় ও সমাজসেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন ও চর্চার ইতিহাসে এটি স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর এক ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ প্রতিষ্ঠান মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। গুণিজন সংবর্ধনা এ দরবারের একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এ অনুষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন।

এ গুণিজন সংবর্ধনা ইসলামের বহু পুরাতন একটি সংস্কৃতি; যেমন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দেয়ার পর ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে সংবর্ধনা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে রাসুল (সা.) হযরত হাস্সান বিন সাবিত (রা.)-এর কবিতা আবৃত্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের গায়ের চাদর তাঁকে প্রদান করার মাধ্যমে সংবর্ধিত করেছিলেন। হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এলে সবাই নিজেদের জায়গায় অনড় রইলেন। তাদের কেউ তাঁকে বসার সুযোগ দিলেন না। অতঃপর রাসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর দিকে একটি চাদর নিক্ষেপ করে বললেন, 'তুমি এতে বসো।' তিনি চাদরটি নিয়ে তাঁর চেহারা এবং গলায় রাখলেন এবং চুমু দিলেন। তারপর সামনে দিয়ে দিলেন এবং বললেন, أَكْرَمَكَ اللهُ يَا رَسُولَ اللهِ، كَمَا أَكْرَمْتَنِي অর্থাৎ 'হে রাসুলুল্লাহ্ (সা.), আল্লাহ্ আপনাকে সম্মানিত করুক; যেমনিভাবে আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন।'[১৩৫] ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫–১৯৬৯ খ্রি.) বলেছেন, 'যে সমাজে গুণিজনের সম্মান প্রদর্শন করা হয় না সে সমাজে গুণী জন্মায় না।'

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইসলামি সোনালি যুগের ঐতিহ্য পুনর্জাগরণের মানসে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে গুণিজন সংবর্ধনা নামে এ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। অদ্যাবধি উক্ত অনুষ্ঠান অব্যাহত রয়েছে। 'বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' দীন, শিক্ষা,

---

১৩৪. *কার্যক্রম তালিকা*, বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, পৃ. ০৯; মো. শহিনুজ্জামান, *গঠন-প্রকরণে বাংলাদেশে সূফীবাদের বিকাশ (১৯৭১-২০০০)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

১৩৫. আবু বাকর আহমদ বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বাবুন ফি রেহমিস সগির ওয়া তাওকিরিল কবির, হাদিস নং ১০৪৮৮; *আল-মুস্তাদ্‌রেক 'আলাস সহিহাউন লিল-হাকিম*, ৭৯০০

সমাজসেবা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য প্রতিবছর পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) উপলক্ষ্যে চারজন গুণী ব্যক্তিকে সংবর্ধনা প্রদান করে। এ পর্যন্ত শতাধিক গুণিজনকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সময়ে সংবর্ধিত গুণী ব্যক্তিবর্গের সালভিত্তিক তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:

১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ[১৩৬]

০১. প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান : তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক এবং বিদগ্ধ ইসলামি চিন্তাবিদ ছিলেন। জাতীয় জীবনে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

০২. **কবি আল মাহমুদ :** তিনি দেশের অন্যতম প্রধান কবি। বাংলা সাহিত্যে ইসলামি নবজাগরণের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

০৩. **মওলানা মীর গোলাম মোস্তফা :** তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়ার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও আধ্যাত্মিক সাধক। আজীবন শিক্ষকতার মাধ্যমে ইল্‌মে দীনের খেদমত করায় তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

০৪. **আলহাজ আবুল খায়ের মেম্বার :** তিনি চট্টগ্রাম জেলার কদমতলী মহল্লার বিশিষ্ট সমাজসেবক, নগর বাইশ মহল্লার সর্দার ছিলেন। সমাজসেবায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ[১৩৭]

০৫. ড. এম. শমশের আলী : তিনি একজন পদার্থবিজ্ঞানী। 'বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে'র স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চ্যান্সেলর। আজীবন গবেষণার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের বৈজ্ঞানিক তথ্য সর্বসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসারের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

০৬. হযরত মওলানা মুহিউদ্দিন খান : তিনি বিদগ্ধ আলিম ও মাসিক মদীনার সম্পাদক ছিলেন। আজীবন ইসলামি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমগণের জন্য প্রশংসনীয় অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

০৭. কবি আবদুল হালীম খাঁ : তিনি টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানাধীন এক নিভৃতচারী রাসুল প্রেমিক কবি। আজীবন সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে ইসলামি আদর্শের প্রচার-প্রসারে অনবদ্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

০৮. এডভোকেট আমিরুল কবীর চৌধুরি : তিনি 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে'র বিশিষ্ট আইনজীবী ও নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মী। আজীবন সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানবতার কল্যাণে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

---

১৩৬. *গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক'৯৪*, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

১৩৭. মুহাম্মদ ওমর ফারুক, 'বায়তুশ শরফের মিলাদুন্নবীতে গুণীজন ও সাংস্কৃতিক সমাবেশ', *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫; *গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক'৯৫*, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ[১৩৮]

০৯. হযরত মওলানা মুজহের আহমদ : তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। আজীবন দীনি শিক্ষার প্রচার-প্রসার এবং ইসলামের মহান আদর্শের যুগোপযোগী মূল্যায়ন ও সমস্যা সমাধানে যুগপৎ ভূমিকা রাখায় তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

১০. জনাব মালিক আকবর আলী : তিনি একজন বিজ্ঞান লেখক ও কুর'আন গবেষক ছিলেন। আজীবন গবেষণার মাধ্যমে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অতীত অবদানের পুনরুজ্জীবন এবং পবিত্র কুর'আনের বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহকে সর্বসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসারে অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

১১. কবি মোজাম্মেল হক : তিনি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার মহাদেবপুরের নীরব সাহিত্য সাধক। আজীবন উত্তর বঙ্গের মফস্সল শহর নওগাঁর নিভৃত কোণে থেকেও নিরবচ্ছিন্ন কাব্যসাধনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

১২. মরহুম মৌলভি নুর আহমদ (চেয়ারম্যান) : তিনি চট্টগ্রাম পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান। তিনি 'এশিয়ায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জনক' হিসেবে আজও পরিচিত। চট্টগ্রাম পৌরসভাসহ এতদঞ্চলে শিক্ষার প্রচার-প্রসারে অনন্য অবদান রাখায় তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ[১৩৯]

১৩. হযরত মওলানা মোবারক আহমদ ছাহেব : তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অধিবাসী। প্রখ্যাত ওয়ায়েজ ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। আজীবন দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা এবং ওয়ায মাহফিলের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমগণের জন্য অনন্য অবদান রাখায় তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

১৪. প্রফেসর ড. কাজী দীন মুহম্মাদ : তিনি এশিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রো-ভিসি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। শিক্ষকতা, সাহিত্য সাধনা ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে ইসলামের অনুপম সৌন্দর্য্য উপস্থাপন এবং বাগ্মিতা ও লেখনীর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমগণের খেদমতে অসাধারণ অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

১৫. প্রফেসর ড. জামাল নজরুল ইসলাম : তিনি একজন ভৌতবিজ্ঞানী। আজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষকতার মাধ্যমে দেশ ও জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন এবং পবিত্র কুর'আনের অন্তর্নিহিত সত্যসমূহকে উদ্ঘাটনের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

১৬. মরহুম আলহাজ অ্যাডভোকেট বাদশাহ্ মিঞা চৌধুরী : তিনি চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানায় জন্মগ্রহণ। আজীবন শিক্ষার প্রচার-প্রসার এবং সমাজসেবায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে মরণোত্তর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়।

---

১৩৮. *গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক'৯৬*, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

১৩৯. *গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক'৯৭*, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ[১৪০]

১৭. হযরত মওলানা হাবীব আহমদ : তিনি চট্টগ্রাম জেলার অর্ন্তগত লোহাগাড়া থানাধীন চুনতীর পীর তথা আধ্যাত্মিক রাহবার ছিলেন। আজীবন শিক্ষার প্রচার-প্রসার এবং সাধারণ মানুষের হিদায়াতের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

১৮. প্রফেসর ড. সৈয়দ আলী আশরাফ : তিনি দারুল ইহ্‌সান ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। দেশ-বিদেশে উচ্চশিক্ষার সাধনা, ইসলামের সৌন্দর্য বিকাশ এবং ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

১৯. হযরত মওলানা নেছারুল হক : তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলুম কামিল (অনার্স, মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা ও বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (এম. এ.) মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদিস ছিলেন। আজীবন ইল্‌মে হাদিসের খেদমত করায় তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

২০. জনাব অধ্যাপক আবদুল গফুর : তিনি একজন ভাষাসৈনিক ও দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার ফিচার সম্পাদক ছিলেন। আজীবন ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের জন্য তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়।

(খ) যোগ্য ব্যক্তি তৈরি

পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব হযরত আদম (আ.)-কে দিয়েই মূলত খিলাফতের ক্রমধারা শুরু হয়। তাঁর তিরোধানের পর যুগে-যুগে নবি-রাসুলগণই ছিলেন এই খিলাফতের প্রধান ও প্রাণপুরুষ। নবি-রাসূলগণও দীনি দাওয়াত দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে খলিফা তথা প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। যেমন সাদেক ও সদুককে হযরত ঈসা (আ.) হাবিবে নাজ্জারের এলাকায় পাঠিয়েছিলেন। নবুয়তের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এই খিলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় উম্মতের কাঁধে। সে সূত্রে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর চারজন প্রসিদ্ধ খলিফা ছিলেন; যারা 'খুলাফায়ে রাশেদা' নামে খ্যাত। সুতরাং, মানুষ স্বীয় দায়িত্ব পালনার্থে প্রতিনিধি নির্বাচন পূর্ববর্তী সুন্নাতেরই অংশ।

তরিকতের ক্ষেত্রেও শিক্ষাকে সুচারুরূপে পরিচালনা ও প্রচার-প্রসার ঘটানোর জন্য মুর্শিদগণ নিজেদের খলিফা বা প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকেন। এসব খলিফাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) অক্লান্ত পরিশ্রম করে এবং অজস্র শ্রম দিয়ে আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তৈরি করে গেছেন; যারা নিজ নিজ এলাকায় এক একজন পথপ্রদর্শক এবং সঠিক ইসলামি আদর্শের মূর্ত প্রতীক; যাদের দ্বারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আধ্যাত্মিক শিক্ষাসহ ইসলামি শরি'আতের জ্ঞান লাভে ধন্য হয়েছেন। নিম্নে তাঁর হাতে গড়া কিছু ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তুলে ধরা হলো:

১. শাহ্ সুফি মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন (রহ.) (১৯৪২–২০২০ খ্রি.)

মওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন (রহ.) চট্টগ্রাম শহরের অদূরে বৃহত্তর সাতকানিয়া (বর্তমান লোহাগাড়া) উপজেলার অন্তর্গত আধুনগরস্থ সুফি মিয়াজি পাড়ায় ১ জানুয়ারি, ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত ও 'আলিম

১৪০. *গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক'৯৮*, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ।

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মওলানা মরহুম মুসলেহ উদ্দিন এবং মাতা মরহুমা রাইহানাহ্ বেগম। স্বীয় পিতা-মাতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে 'চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র (বর্তমানে কামিল) মাদ্‌রাসা'য় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে হাফতুম (দাখিল) কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে একই প্রতিষ্ঠান হতে ছুয়াম (আলিম) ১ম বিভাগে ১৬শ স্থান এবং ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে উলা (ফাযিল) ১ম বিভাগে ৫ম স্থান অধিকার করে বিরল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। হাদিস বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে কামিল (হাদিস) ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করায় 'গোল্ড মেডেল' লাভ করেন।[১৪১]

কামিল পাশ করার পর ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে সাতকানিয়া থানার 'রসুলাবাদ সিনিয়র মাদ্‌রাসা'য় যোগদান করেন। তিনি এখানে প্রথমে সহকারী শিক্ষক ও পরে সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি 'রসুলাবাদ মাদ্‌রাসা'র দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসেন এবং 'বায়তুশ শরফ দরবারে'র একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে পীর-মুর্শিদের সার্বক্ষণিক সাহচর্য গ্রহণ করে দীর্ঘসময় আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন করেন।[১৪২] অতঃপর ১ জানুয়ারি, ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা' প্রতিষ্ঠিত হলে, তিনি ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করেন। এরপর ১ জুন, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ, ১৯৯৭ থেকে ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অধ্যক্ষ হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় পর্যায়ে তিনি 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান' (অধ্যক্ষ) হিসেবে নির্বাচিত হন এবং 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে'র তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা থেকে স্বর্ণপদক ও সনদপত্র লাভ করেন।

২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেও অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবী ওস্তাদ হিসেবে 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা'র ছাত্রদের বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফসহ অন্যান্য বিষয়ে পাঠদান করেছেন। পাশাপাশি 'মাদ্‌রাসা পরিচালনা পর্ষদে'র (গভর্নিং বডির) সম্মানিত সভাপতি ও সহ-সভাপতি হিসেবে সার্বিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রেখেছেন।[১৪৩] গবেষক নিজেও এ মহান ব্যক্তিত্ব থেকে বুখারি শরিফ অধ্যয়ন করে ধন্য হন। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে তিনি 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে 'ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড' এর শরি'আহ্ সুপারভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন।[১৪৪] এছাড়াও তিনি সাফল্যের সাথে আরও বহু দীনি, সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

২৫ মার্চ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ইন্তিকাল করলে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে, বায়তুশ শরফের পীর হিসেবে খিলাফতের দায়িত্বভার তাঁর স্কন্ধে অর্পিত হয়। তাঁর

---

১৪১. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসার অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৬৮

১৪২. মোহাম্মদ ইলিয়াছ, *লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (চট্টগ্রাম : মোহাম্মদ ফিজনূর রহমান, ২০১৫), পৃ. ১৪১

১৪৩. মোহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ, 'চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসার কৃতী ছাত্রদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবস্থান', *আনজুমন ২০১০*(২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা) (চট্টগ্রাম : আন্‌জুমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীন, চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, ২০১১), পৃ. ১৮২-১৮৩

১৪৪. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, 'আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ ও পীর মুর্শিদ বাহরুল 'উলুম হযরত আল্লামা শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন ছাহেব (ম.জি.আ.) শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান নির্বাচিত', পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

গতিশীল নেতৃত্বে বায়তুশ শরফ একটি ধর্মীয়, সামাজিক ও তামাদ্দুনিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও ত্বরিত কর্মদক্ষতার ফলে বায়তুশ শরফের বহুমুখী কার্যক্রম সুবিস্তৃত হয়েছে।[১৪৫] ১৯৯৮–২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক প্রতিষ্ঠান। সেগুলো হলো : (১) বায়তুশ শরফ মসজিদ ১০০টি (২) মাদ্‌রাসা ১৫টি (৩) এতিমাখানা ০৭টি (৪) হেফ্‌জখানা ১২টি (৫) হাসপাতাল ০৩টি (৬) সুদৃশ্য মজবুত তোরণ (বাবে মীর আখতর) ০১টি।

ওয়ায-নসিহত, তা'লিম-তরবিয়ত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ার পাশাপাশি গ্রন্থরচনায়ও তিনি রেখেছেন অনন্য ভূমিকা। তাঁর লিখিত ও অনূদিত গ্রন্থগুলো হলো : (১) জান্নাতী ও জাহান্নামী যারা (অনুবাদ গ্রন্থ) (২) বেশারাতুল ইখওয়ান ফি খাওয়াচ্ছিল কুর'আন (৩) কিতাব ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তরিকতের মূলনীতি (৪) গুলহায়ে আকীদত (কাব্যগ্রন্থ)।[১৪৬] তাছাড়া শিশু-কিশোরদের মাঝে ইসলামি তাহজিব তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার জাগ্রত করার মানসে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মাসিক 'শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া' নামে স্বতন্ত্র মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে।

তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ৫০ বারের অধিক পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালন করেন। ভারত, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, ইরাক, সুইজারল্যান্ড, জর্ডান, ফিলিস্তিন, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বহু দেশ সফর করেন।[১৪৭] তিনি ২০ মে, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। পারিবারিক জীবনে তিনি এক পুত্র ও ছয় কন্যাসন্তানের জনক।[১৪৮]

২. মওলানা মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্‌ভী (জন্ম ১৯৬৪ খ্রি.)

বিশিষ্ট লেখক মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্‌ভী চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন বড়হাতিয়া ইউনিয়নের মিয়াজিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এবং মাতা মোছাম্মৎ মনসুরা বেগম। পিতামাতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর 'আখতরুল উলুম দাখিল মাদ্‌রাসা'য় কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। অতঃপর 'বড়হাতিয়া এশায়াতুল উলুম সিনিয়র মাদ্‌রাসা' থেকে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল এবং 'চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা' থেকে ১৯৮৫, ১৯৮৮ ও ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে আলিম, ফাযিল ও কামিল কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন।

'উলুমে শরি'আহ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য তিনি ভারতের 'দারুল উলুম নদওয়াতুল 'উলামা' মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে 'উলুমে শরি'আহ ওয়া উসুলুদ্দিন' বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন শেষ করে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা'য় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে অদ্যাবধি অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি লেখালেখিকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে একজন লেখক, বক্তা ও ইসলামি চিন্তাবিদ

---

১৪৫. মোহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ সম্পাদিত, *আনজুমন ২০১০*, (২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

১৪৬. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

১৪৭. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসার অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২

১৪৮. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, 'বায়তুশ শরফের পীর সাহেবের একটি দুর্লভ ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার-৩', *মাসিক শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

হিসেবে সর্বমহলে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি বিদ্যমান। তিনি এ পর্যন্ত (২০২০) তথ্যসমৃদ্ধ প্রায় দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন; আরও বহু গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

পিতা মওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর মতো তিনিও ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক যার ফলে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'শাহ্ আবদুল জব্বার পাবলিক লাইব্রেরি' নামে একটি অত্যাধুনিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন; যাতে দেশি-বিদেশি প্রায় ২০ থেকে ৩০ হাজার বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে। অনেক পাঠক ও গবেষক দৈনন্দিন সেখানে এসে জ্ঞানের সুধা পান করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি তিনি উক্ত ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এসকল কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজেও সক্রিয় আছেন। বর্তমানে তিনি প্রায় শতাধিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন।

২৩ মে, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'বায়তুশ শরফ দরবারের পীর' এবং 'বায়তুশ শরফ আন্জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি ভারত, পাকিস্তান, ইরাক, জর্দান, ফিলিস্তিন, তুরস্ক, মায়ানমার ও সৌদিআরব সফর করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সাতকানিয়ার প্রখ্যাত আলিমে দীন মওলানা কাজি মোস্তাফিজুর রহমান নোমানীর ২য় কন্যা জান্নাতুন নাঈমের সাথে শুভপরিণয়ে আবদ্ধ হন। পারিবারিক জীবনে তিনি চার সন্তানের জনক।[১৪৯]

৩. মওলানা আবদুল মোমেন (১৯৫২–১৯৯৭ খ্রি.)

'বায়তুশ শরফ দরবারে'র তৎকালীন মুখপাত্র, বিশিষ্ট আলিমে দীন মওলানা আবদুল মোমেন চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী থানার অন্তর্গত বাহারছড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ওহিদুর রহমান এবং মাতা মাকছুদা খাতুন। তিনি স্বীয় পিতামাতার কাছে অক্ষরজ্ঞান লাভ করে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার দোহাজারীস্থ 'রাসুলাবাদ ফাযিল মাদ্রাসা'য় ভর্তি হয়ে ১৯৭০, ১৯৭২ ও ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। অতঃপর হাদিসশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য তিনি চট্টগ্রামের 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা'য় ভর্তি হয়ে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে কামিল (হাদিস) পাশ করেন। তিনি ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

ছাত্রজীবন শেষে তিনি 'কুমিরাঘোনা আখতারুল উলুম মাদ্রাসা'য় শিক্ষকতা করেন। মৃত্যু অবধি বহদ্দারহাট বাস টার্মিনালস্থ 'মসজিদে বায়তুশ শরফে' খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। 'দোহাজারী মসজিদে বায়তুশ শরফ' প্রতিষ্ঠা তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফসল। দেশে বহুসংখ্যক মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠায় তাঁর উদ্বুদ্ধকারী বক্তব্য কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বায়তুশ শরফের মুখপাত্র হিসেবে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি পীর-মুর্শিদের সাথে বহু দেশ সফর করেন।

১৯৭২–১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 'কুমিরাঘোনা মাহফিলে ইছালে ছওয়াবে'র মুনাজাতের পূর্বমুহূর্তে তিনি সুললিত কণ্ঠে না'তে রাসুল (সা.) পেশ করতেন। তিনি 'বায়তুশ শরফ আন্জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' এর সদস্য, 'মজলিসুল উলামা বাংলাদেশ' এর প্রতিষ্ঠাতা মাহাসচিব, 'আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত

১৪৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী (মা. যি. আ.), রাহবারে বায়তুশ শরফ, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

বাংলাদেশ' এর সাংগঠনিক সম্পাদক, 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ্' এর অন্যতম দায়িত্বশীল ছিলেন। এ মহান ব্যক্তিত্ব বাঁশখালীর এক ওয়ায মাহফিলে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৫ জুন, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মহান রবের সান্নিধ্যে চলে যান।[১৫০]

৫. মওলানা নূরুল ইসলাম (রহ.) (১৯৫৩–২০২০ খ্রি.)

মওলানা নুরুল ইসলাম (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া (বর্তমান লোহাগাড়া) উপজেলার কুমিরাঘোনা গ্রামের নুরুদ্দীন মুন্সির বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা আবদুর রশীদ (রহ.) এবং মাতার নাম শরফুন নিসা। পিতামাতার কাছেই তিনি শিক্ষার প্রথম সবক লাভ করেন। 'কুমিরাঘোনা আখতরিয়া মাদ্‌রাসা' ও 'চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা'য় কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। অতঃপর 'চট্টগ্রাম ওয়াজেদীয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় ভর্তি হয়ে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে দাখিল, ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে আলিম ও ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ফাযিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় যথাক্রমে ৩য়, ৭ম ও ৫ম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ১ম শ্রেণিতে কামিল (হাদিস) পাশ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

তিনি ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে বায়তুশ শরফের মরহুম পীর মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর প্রথম কন্যা যাকেরা বেগমের সাথে শুভপরিণয়ে আবদ্ধ হন। তিনি অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত অবস্থায় মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) (১৯০৮–১৯৭১) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে পীর মুর্শিদের অনুমতিক্রমে 'কুমিরাঘোনা আখতরিয়া মাদ্‌রাসা'য় ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যিকির মাহফিল পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 'বায়তুশ শরফ কেন্দ্রীয় জামে' মসজিদে'র পেশ ইমাম, ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 'রাঙ্গামাটি বায়তুশ শরফ মসজিদে'র খতিব, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মৃত্যু অবধি 'কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ মসজিদে'র খতিব, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বায়তুশ শরফের বিভিন্ন মসজিদে যিকিরের ইমাম হিসেবে এখলাসের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তাছাড়া তাঁর পীর-মুর্শিদ মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে রাঙ্গামাটি ও মাইনীমুখ, ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে খাগড়াছড়ি, ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাঘাইছড়ি ও মারিশ্যা এবং ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে 'বাঁশখালী বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে'র পরিচালক হিসেবে আমৃত্যু সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বায়তুশ শরফ দরবারের একজন নিবেদিতপ্রাণ খাদেম ও তরিকতের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি ২০ মে, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[১৫১]

৬. মওলানা শামসুল ইসলাম হেলালী (১৯৪৩–১৯৯৯ খ্রি.)

প্রিন্সিপাল মওলানা শামসুল ইসলাম হেলালী চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত জাফরাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোলাম শরিফ চৌধুরী। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৫০

---

১৫০. মোহাম্মদ শাহ্জাহান, 'বায়তুশ শরফের হারিয়ে যাওয়া সপ্ত নক্ষত্রের স্মৃতিকথা', *আল্-আছ্রার*, পূর্বোক্ত, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১৪৩-১৪৫; *দৈনিক কর্ণফুলী*, 'প্রখ্যাত আলেম আবদুল মোমেনের ইন্তেকাল', ২৬ জুন, ১৯৯৭; *দৈনিক সংগ্রাম*, 'প্রখ্যাত ওয়ায়েয মওলানা আবদুল মোমেনের ইন্তেকাল', ২৬ জুন, ১৯৯৭, পৃ. ২

১৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭

খ্রিষ্টাব্দে ‘সাতকানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা’য় ভর্তি হন। সেখান থেকে যথাক্রমে ১৯৫৬ ও ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে আলিম ও ফাযিল পাশ করেন। এরপর তিনি পটিয়া জমীরিয়া ও জিরি মাদ্‌রাসায় ফনুনাতের কিতাবাদি অধ্যয়ন করে ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রামের ‘ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা’ থেকে কামিল পাশ করেন।

১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে জাফরাবাদ সিনিয়র মাদরাসায় হেড মওলানা হিসেবে যোগদান করে এ মাদ্‌রাসার প্রিন্সিপাল হিসেবে দীর্ঘ এক যুগ অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৫ থেকে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ‘রাঙ্গুনিয়া আলমশাহ পাড়া আলিয়া মাদ্‌রাসা’র প্রধান মুফাস্‌সির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে পুনরায় ‘জাফরাবাদ ফাযিল মাদ্‌রাসা’র প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগদান করে শিক্ষকতা জীবনের ইতি টানেন। তিনি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর মুরিদ ছিলেন। বৃহত্তর চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তিনি বিভিন্ন মাহফিলে একজন সুবক্তা হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। ইসলামি শিক্ষার প্রচার-প্রসারে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে একাধিক মাদ্‌রাসা ও মসজিদ। তিনি ১৮ জুলাই, ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার মগবাজারস্থ ‘হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে’ ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[১৫২]

৭. প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ্ (জন্ম ১৯৬৩ খ্রি.)

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ্ (আহসান সাইয়েদ) চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার দক্ষিণ রামপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ‘আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাকিম মওলানা শফিক আহমদ এবং মাতার নাম মাহফুজা খাতুন। পিতামাতার কাছেই প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে ‘সাতকানিয়া মাহমুদুল ‘উলূম মাদ্‌রাসা’য় ভর্তি হয়ে জামাতে হাফতুম (৮ম শ্রেণি) পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এরপর ‘চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা’য় ভর্তি হয়ে ১৯৭৩, ১৯৭৫ ও ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। অতঃপর ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে ‘সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা’ হতে কামিল (হাদিস) এবং ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে ‘রাঙ্গুনিয়া আলম শাহ্ পাড়া কামিল মাদ্‌রাসা’ হতে কামিল (ফিকহ) কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন।

ছাত্রজীবন থেকে তিনি সাহিত্যমনস্ক ও কাব্যপ্রিয় ছিলেন। উচ্চশিক্ষা অর্জন করার জন্য তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘আরবি ও ফারসি বিভাগে’ ভর্তি হয়ে ১৯৮৩ (অনুষ্ঠিত ১৯৮৪) খ্রিষ্টাব্দে বি.এ. অনার্স ও ১৯৮৫ (অনুষ্ঠিত ১৯৮৬) খ্রিষ্টাব্দে মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণিতে ২য় স্থান অধিকার করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।[১৫৩] ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে তিনি ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পটিয়া থানাধীন ‘মনসা ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা’র অধ্যক্ষ, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে র‘াঙ্গুনিয়া আলমশাহ্ পাড়া কামিল মাদ্‌রাসা’র কামিল আদব (আরবি সাহিত্য) বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে ‘কুয়াইশ বুড়িশ্চর শেখ মুহাম্মদ ডিগ্রি কলেজে’ প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘আরবি ও ফারসি বিভাগে’ প্রভাষক পদে যোগদান করেন।

২০০১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ’ শীর্ষক পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘ইসলামিক স্টাডিজ’ নামে আলাদা বিভাগ

---

১৫২. হেলাল হুমায়ন, ‘স্মৃতিতে অম্লান : মওলানা শামসুল ইসলাম হেলালী’, *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, পূর্বোক্ত, মার্চ ২০১২ , পৃ. ৩৯
১৫৩. সম্পাদনা পরিষদ, *সাতকানিয়ার শ্রেষ্ঠ ১০০ আলেমের জীবনী*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ১২৮

প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি উক্ত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে ‘ইসলামিক স্টাডিজ’ বিভাগের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন।

ড. আহসান সাইয়েদ পেশাগত পরিচয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক; তবে একজন প্রখ্যাত আলিম, ইসলামি চিন্তাবিদ, সুসাহিত্যিক, অনুবাদক, গবেষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। আধুনিক বাংলা শব্দের ব্যবহার, স্বকীয় রচনারীতি, হৃদয়ছোঁয়া কাহিনি-নির্মাণ এবং শৈল্পিক চিত্রায়ণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁর প্রতিটি লেখাই হয়ে ওঠে আকর্ষণীয় ও সুখপাঠ্য। ৫ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার’ কর্তৃক ‘ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা’ প্রতিষ্ঠিত হলে ‘প্রথম উপাচার্য’ হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। বর্তমানে তিনি ‘বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ’ এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি (শিক্ষা ও গবেষণা) হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। হাদিসশাস্ত্রে উচ্চতর গবেষণা ও ইসলামি শিক্ষার প্রচার-প্রসারে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ‘বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ’ এর পক্ষ থেকে ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে গুণিজন সংবর্ধনা ও ‘বায়তুশ শরফ স্বর্ণপদক’ প্রদান করা হয়। তাঁর লিখিত বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জার্নাল, পত্রপত্রিকায় তাঁর লিখিত প্রায় অর্ধশত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।[১৫৪]

৮. মওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক (জন্ম ১৯৫৩ খ্রি.)

মওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলাধীন বাবুনগর গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী ‘আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শায়খুল হাদিস মওলানা মুহাম্মদ আমীন[১৫৫] (রহ.) (১৯২২–২০০১ খ্রি.) দেশবরেণ্য ‘আলিমে দীন ও নিবেদিতপ্রাণ ওস্তাদ এবং মাতা সাজেদা বেগম খোদাভীরু বিদুষী মহিলা। পিতার নিকট শিক্ষার হাতেখড়ি এবং অক্ষরজ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর বাবুনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহ্যবাহী ‘চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা’য় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৭০, ১৯৭২ ও ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রামের ‘দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা’য় ভর্তি হয়ে

---

১৫৪. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক' ১৫*, পূর্বোক্ত, ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৫, পৃ. ২৮-২৯

১৫৫. তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার বাবুনগর গ্রামে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ‘গারাংগিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা’য় ভর্তি হন। সেখানে দুবছর অধ্যয়ন করে সাতকানিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে দাখিল পাশ করেন। অতঃপর ‘চুনতী হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা’ থেকে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় অবিভক্ত বাংলায় ১ম শ্রেণিতে ৯ম স্থান এবং ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ১ম শ্রেণিতে ফাযিল পাশ করেন। হাদিসশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা অর্জনে তিনি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ‘দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা’য় ভর্তি হন এবং দওরায়ে হাদিসের ফাইনাল পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করার বিরল গৌরব অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি ‘গারাংগিয়া ইসলামিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা’য় ১৯৫০-১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ ও ১৯৯৩-২০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং ‘চুনতী হাকিমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা’য় ১৯৬৪-১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ‘শায়খুল হাদিস’ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি বুখারি শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ‘ইনআ'মুল বারী ফি শরহিল বুখারি’ (কিতাবুল মগাজী ওয়াত তাফসির) উর্দু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এ মহান শিক্ষাগুরু তাঁর হাজারো ওরাছাতুল আম্বিয়া দুনিয়াতে রেখে অবশেষে ১২ জানুয়ারি, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *সাতকানিয়ার শ্রেষ্ঠ ১০০ আলেমের জীবনী* (চট্টগ্রাম : বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষক পরিষদ, ২০১২), খ.১, পৃ. ২৫

১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে কামিল (হাদিস) পাস করেন। উচ্চশিক্ষা অর্জনে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবি ও ফারসি বিভাগে' ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৮১ ও ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে অনার্স ও মাস্টার্স পাশ করেন।

ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে চট্টগ্রাম 'বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্‌রাসা'র উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করে ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অত্যন্ত যোগ্যতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি তিনি মাসিক 'দ্বীন দুনিয়া' পত্রিকায়ও কর্মরত ছিলেন। ফলে বায়তুশ শরফ দরবারের সাথে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে'র ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশনে' যোগদান করে সহকারী পরিচালক, উপ-পরিচালক ও বিভাগীয় পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[১৫৬]

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক বিদগ্ধ একজন গবেষক, লেখক, ইসলামি চিন্তাবিদ ও সুবক্তা হিসেবে সকলের কাছে সুপরিচিত। এ পর্যন্ত তাঁর রচিত ও অনূদিত ৩৫টিরও অধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আরও ০৫টি গ্রন্থ 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' থেকে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশন ও অন্যান্য চ্যানেলেও বিভিন্ন সময় আলোচনা উপস্থাপন করে থাকেন।[১৫৭]

৯. মওলানা সৈয়দ আহমদুল হক (১৯৩৯–২০১১ খ্রি.)

মওলানা সৈয়দ আহমদুল হক চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত ইকবাল পার্কের পশ্চিম সারোয়াতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মওলানা সৈয়দ ইউসুফ আহমদ এবং মাতা মোছাম্মৎ মাজেদা খাতুন। তিনি স্বীয় পিতার কাছে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে তৎকালীন 'মুহছেনিয়া মাদ্‌রাসা'য় (বর্তমানে হাজী মুহসিন কলেজ) ভর্তি হন। তিনি ১৯৪৯, ১৯৫১, ১৯৫৩ ও ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও ইন্টারমিডিয়েট কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। তিনি ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ এবং ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যথাক্রমে পটিয়া থানার অন্তর্গত 'মুজাফ্‌ফরাবাদ উচ্চবিদ্যালয়' এবং বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত পি. সি. সেন সারোয়াতলী উচ্চবিদ্যালয়ে হেড মওলানা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.)-এর হাতে বায়'আত হয়ে স্বীয় মুর্শিদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মসজিদে যিকিরের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 'বায়তুশ শরফ কেন্দ্রীয় জামে' মসজিদে'র ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকায় 'মসজিদ বায়তুশ শরফ' প্রতিষ্ঠিত হলে স্বীয় পীর মুর্শিদের নির্দেশে ঢাকায় চলে যান এবং ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অবৈতনিকভাবে মসজিদের ইমামতিসহ কমপ্লেক্সের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে 'ঢাকা বায়তুশ শরফ দারুশ শেফা হাসপাতাল' ও 'বায়তুশ শরফ লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অনন্য। তাছাড়া ঢাকায় 'মসজিদ বায়তুশ শরফে'র সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবরস্থানের জন্য কাঁচপুরে প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করা ও বিভিন্ন জায়গায় যিকির মাহফিল চালু

১৫৬. মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ সম্পাদিত, *আনজুমন ২০১০* (২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা), পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০

১৫৭. মওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১০

করার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিজ এলাকায় 'বায়তুশ শরফ মসজিদ বোয়ালখালী' ও 'সারোয়াতলী আখতারুল উলুম নিজামিয়া ফুরকানিয়া মাদ্‌রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ২৩ নভেম্বর, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১৫৮]

১০. ড. মওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (জন্ম ১৯৬০ খ্রি.)

মওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলাধীন পশ্চিম কলাউজান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা এলাহী বখ্‌স ও মাতা সিরাজ খাতুন। ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা'য় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৭১, ১৯৭৩ ও ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। অতঃপর চট্টগ্রাম 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা' থেকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কামিল (হাদিস) এবং ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে 'মাদ্‌রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা' হতে কামিল (ফিক্‌হ) পাশ করেন।

তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'ঢাকা তেজগাঁও কলেজ' থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বি.এ পরীক্ষায় ১ম শ্রেণিতে ৭ম স্থান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এম. এ. প্রিলিমিনারি ও ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে এম. এ. ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ' থেকে তিনি ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে 'ইমাম খোমেনির কবিতায় আধ্যাত্মিকতা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কামিল পাশ করে চট্টগ্রামের 'লোহাগাড়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা'য় হেড মওলানা হিসেবে কর্মজীবন শুরু হয় তাঁর। তিনি ১৯৮১ থেকে ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাসিক 'দ্বীন দুনিয়া'র সহকারী সম্পাদক, 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা'র শিক্ষক ও 'বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানে'র নির্বাহী পরিচালক হিসেবে বহুমুখী দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের বিজয় বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ইরানের রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে তেহরান সফর করেন এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩ থেকে ২৩ অক্টোবর, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বৎসর 'রেডিও তেহরানে'র বাংলা অনুষ্ঠানের সহকারী পরিচালক (অনুবাদক ও সংবাদ পাঠক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে দেশে ফিরে এসে আবারও লেখালেখি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। তিনি বিভিন্ন মেয়াদে 'ঢাকা ইসলামি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমি', 'চট্টগ্রাম ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ' এবং 'ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে' শিক্ষা গবেষণা পরিচালক ও ফারসি ভাষার শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ২০০4 থেকে ২০০5 খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রে ফারসি ভাষার শিক্ষক পদে নিয়োজিত ছিলেন। একজন ইসলামি চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। তাঁর রচিত ২০টিরও অধিক গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।[১৫৯]

১৫৮. মওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬

১৫৯. মোহাম্মদ ওবাইদুল্লাহ, *আনজুমন ২০১০* (২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭-১৯৮; ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসার অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭-৮৮

১১. মওলানা আশরফ আলী (১৯৫১–২০০৭ খ্রি,)

মওলানা আশরফ আলী (রহ.) দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর গ্রামে ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মওলানা আবদুল আলিম এবং মাতা মুস্তফা খাতুন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয় নিজ গ্রামে। এরপর ভর্তি হন ঐতিহ্যবাহী 'চুনতি হাকিমিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা'য়। সেখান থেকে ১৯৬৬, ১৯৬৮ ও ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। অতঃপর ১৯৭২ ও ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা' ও চট্টগ্রাম 'ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা' থেকে যথাক্রমে হাদিস ও ফিক্‌হ বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাশ করেন।

১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বায়তুশ শরফের মরহুম পীর মওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) এর দ্বিতীয় কন্যা মোছাম্মৎ তাহেরা বেগমের সাথে শুভপরিণয়ে আবদ্ধ হন। ছাত্রজীবন শেষ করে ১ জানুয়ারি, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে 'চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় আরবি প্রভাষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। শিক্ষকতার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে হেদায়াতের আলোয় আলোকিত করার জন্য ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 'লোহাগাড়া বায়তুশ শরফ জামে' মসজিদে'র খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আমৃত্যু 'চকরিয়া বায়তুশ শরফ জামে' মসজিদে'র খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজে যোগ্য নাগরিক গঠন করে দেশ ও জাতির সেবার করার জন্য তিনি ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে আধুনগর আখতারিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে 'আধুনগর শাহ্‌ জব্বারীয়া এতিমখানা' ও ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে 'আধুনগর বায়তুশ শরফ মসজিদ' প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় বৃহত্তর লোহাগাড়া-সাতকানিয়া ও চকরিয়ার অসংখ্য মানুষ তরিকতের দীক্ষা নিয়ে বায়তুশ শরফের মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ও মওলানা কুতুব উদ্দিন (রহ.)-এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। এ মহান কর্মবীর আলেম ২৩ অক্টোবর, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে মহান রবের সান্নিধ্যে চলে যান।[১৬০]

১২. মওলানা এ. কে. মাহমুদুল হক (জন্ম ১৯৩৫ খ্রি.)

মওলানা এ. কে. মাহমুদুল হক চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত হাইদচকিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত 'আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মওলানা আমিনুল হক এবং মাতার নাম ছফুরা খাতুন। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে 'সীতাকুণ্ড সিনিয়র মাদ্‌রাসা' থেকে দাখিল, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে 'কাগতিয়া এশায়াতুল উলুম মাদ্‌রাসা' থেকে আলিম এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা' থেকে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাশ করেন। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে 'লাকসাম নওয়াব ফয়েজুন্নেসা কলেজ', ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ডিগ্রি এবং ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে এম. এ. পাশ করেন।

তিনি হাটহাজারী মির্জাপুর হাই স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১৯৫২ থেকে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, 'চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল হাইস্কুল'-এ সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং প্রধান শিক্ষক হিসেবে ১৯৭১ থেকে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর অত্যন্ত যোগ্যতা, দক্ষতা ও

---

১৬০. মোহাম্মদ হোসেন সম্পাদিত, মাস্টার শেখ আহমদ, 'হযরত শাহ্‌ মওলানা আশরফ আলি (রহ.) কে যেমন দেখেছি', *স্মরণিকা হযরত আলহাজ্ব মৌলানা আশরফ আলী (রহ.)* (লোহাগাড়া : আনজুমনে তোলবায়ে সাবেকীন, আধুনগর আখতরিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা, ২০১২), পৃ. ৫৪; মুহাম্মদ হেফাজতুল ইসলাম, 'হারিয়ে যাওয়া জ্যোতির্ময় নক্ষত্র মরহুম আলহাজ্ব মওলানা আশরাফ আলি', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, ৩২ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ৫৬-৫৭

সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেন। তিনিই আধুনিক 'মিউনিসিপ্যাল মডেল হাই স্কুলে'র রূপকার। তাঁর এ সাফল্যমণ্ডিত শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে'র শিক্ষামন্ত্রণালয় তাঁকে জাতীয় পর্যায়ে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষক' হিসেবে পুরস্কৃত করে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) -এর সান্নিধ্যে (বায়'আত গ্রহণ করে) এসে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

তিনি বহুলপ্রচারিত মাসিক 'দ্বীন দুনিয়া' ও 'শিশু-কিশোর দ্বীন দুনিয়া' পত্রিকার অবৈতনিক প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সম্পাদক ও 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা'র পরিচালনা পর্ষদের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারত, পাকিস্তান, আমেরিকা, সৌদি আরবসহ বহু রাষ্ট্র সফর করেন এবং জীবনে বহুবার হজ ও ওমরাহ পালন করেন।[১৬১]

১৩. মওলানা তাহেরুল ইসলাম (১৯৪৭–২০২১ খ্রি)

মওলানা তাহেরুল ইসলাম চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার অন্তর্গত মনকির চরের শিলকুপ পাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম ডা. ফরিদ আহমদ এবং মাতা মরহুমা মুসলেমা খানম। তিনি 'মনছুরিয়া মাদ্‌রাসা' থেকে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে 'পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় ভর্তি হন। অতঃপর ১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন। কামিল পাস করে তিনি ওয়াজেদিয়া মাদ্‌রাসা সংলগ্ন উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে ১ম শ্রেণিতে ম্যাট্রিকুলেশন (এস.এস.সি.) পাশ করেন।

তিনি ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) এর হাতে বায়'আত হন। স্বীয় মুর্শিদের সাথে চট্টগ্রামস্থ 'কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে' অবস্থান করে দীর্ঘদিন তরিকতের প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। স্বীয় মুর্শিদ ইন্তিকাল করলে তাঁর খলিফাহ্ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর হাতে তিনি পুনরায় বায়'আত নবায়ন করেন। পীর সাহেবের অনুরোধে তিনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ জামে' মসজিদে'র ইমাম ও খতিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে'র সহ-সভাপতি এবং 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ হাসপাতালে'র নির্বাহী সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে বার্ধক্যের কারণে মৃত্যুবরণ করেন।[১৬২]

১৪. মওলানা বদিউর রহমান (১৯১৭–১৯৯১ খ্রি.)

মওলানা বদিউর রহমান চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার দক্ষিণ মাদার্শা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নজির আহমদ এবং মাতা লালজান বিবি। তিনি 'মির্জাখীল দরবার শরিফ' সংলগ্ন মাদ্‌রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে 'গারাংগিয়া সিনিয়র (বর্তমান কামিল) মাদ্‌রাসা'য় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৩৫ ও ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল ও আলিম পাশ করেন। অতঃপর

---

১৬১. মওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১

১৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৫

'চট্টগ্রাম দারুল উলুম সিনিয়র (বর্তমান আলিয়া) মাদ্‌রাসা'য় ভর্তি হয়ে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে কৃতিত্বের সাথে ফাযিল পাশ করেন।

ছাত্রজীবন সমাপ্ত করে বহুদিন 'শাহচান্দ আউলিয়া সিনিয়র মাদ্‌রাসা'য় শিক্ষকতা করেন। ষাটের দশকে তিনি বায়তুশ শরফের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) এর হাতে বায়'আত হন এবং পীর সাহেবের নির্দেশে চট্টগ্রাম শহরে চলে আসেন। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে তিনি স্বীয় মুর্শিদের সাথে পবিত্র হজব্রত পালন করেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুর্শিদ ইন্তিকাল করলে তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর পাশে থেকে দরবারের সার্বিক কর্মকাণ্ডে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। দীন প্রচারের পাশাপাশি সামাজিক কাজেও তিনি অসামান্য অবদান রেখে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১৬৩]

১৫. মওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম চৌধুরী (জন্ম ১৯৩৮ খ্রি.)

মওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম চৌধুরি চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার ফরহাদাবাদ নামক স্থানে ইউসুফ চৌধুরী বাড়িতে ১ জানুয়ারি, ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম আবদুল্লাহ্ খান চৌধুরী এবং মাতা মরহুমা রাবেয়া খাতুন। পিতামাতার কাছেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি। অতঃপর তিনি 'ফটিকছড়ি জামিয়া' মিল্লিয়া আহমদীয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা'য় ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৫০, ৫২ ও ৫৪ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল এবং চট্টগ্রাম 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা' থেকে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে কামিল (হাদিস) পাশ করেন। মাদ্‌রাসা শিক্ষার পাশাপাশি তিনি 'মির্জাপুর উচ্চবিদ্যালয়' থেকে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিক (প্রবেশিকা) এবং চট্টগ্রাম সিটি কলেজ থেকে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে আই. এ. পাশ করেন।

ছাত্রজীবন শেষ করে ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের পরিবহণ ট্রাফিক বিভাগে চাকুরিতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) এর হাতে কাদেরিয়া তরিকায় আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর পীর-মুর্শিদের নির্দেশে দরবারের অপর নিবেদিত খাদিম হযরত মওলানা আবদুর রশীদ (রহ.) এর সাথে 'কদমতলী রওশন মসজিদে'র পাশে মুর্শিদের সান্নিধ্যে অবস্থান করে আধ্যাত্মিকতা চর্চায় পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় মুর্শিদ ইন্তিকাল করলে তিনি তাঁর পরবর্তী খলিফা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর হাতে বায়'আত নবায়ন করেন। দীর্ঘ প্রায় অর্ধশত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৮ খ্রি. থেকে ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত বায়তুশ শরফের পীর সাহেবানের পাশে থেকে নিজের সাধ্য ও যোগ্যতা অনুসারে দরবারের প্রায় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।[১৬৪]

১৬. মওলানা মামুনুর রশীদ নূরী (জন্ম ১৯৫৯ খ্রি.)

মওলানা মামুনুর রশীদ নূরী চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার ১১ নং সুয়াবিল ইউনিয়নের পূর্ব সুয়াবিল তমিজ উদ্দিন মুন্সীর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম মওলানা মোহাম্মদ মুছা (রহ.) এবং মাতা মরহুমা নুর জাহান বেগম। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে

---

১৬৩. মওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১

১৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১

হাটহাজারী উপজেলার ‘বাথুয়া মাদ্‌রাসা’য় জমা‘আতে এয়াজদহম (শিশু শ্রেণি) থেকে হাস্তুম (৭ম শ্রেণি) পর্যন্ত, ‘আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া জিরি মাদ্‌রাসা’য় হাশ্তুম-দুআম পর্যন্ত এবং চট্টগ্রাম শহরের চরচাক্তাই ‘মোজাহেরুল উলুম মাদ্‌রাসা’ থেকে উলা ও দাওরায়ে হাদিস কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন।

ছাত্রজীবনে তিনি আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) (১৮৯৮–১৯৬৯) এর প্রতিষ্ঠিত ‘খাদেমুল ইসলাম জামা‘আতে’র অঙ্গসংগঠন ‘খাদেমুল ইসলাম ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগরীর সেক্রেটারি এবং পরবর্তীকালে বিভাগীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে তিনি ১৯৮৩-৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ‘শুলকবহর মাদ্‌রাসা’য় শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৪-৯০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ‘চট্টগ্রাম নিউমার্কেট জামে’ মসজিদে’র ইমাম ও খতিব এবং ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে অদ্যাবধি ‘চট্টগ্রাম স্টেশন রোড জামে’ মসজিদে’র খতিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

তিনি বহু সামাজিক ও দীনি সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ও প্রান্তে ওয়ায-নসিহতের মাধ্যমে দীনের দা‘ওয়াত দিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর হাতে বায়‘আত হন এবং দরবারে একনিষ্ঠ খাদেম হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করেন। বর্তমানে তিনি ‘বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ’ এর কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সম্পাদক (তরিকত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। দরবারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অন্যতম আলোচক হিসেবে বায়তুশ শরফের প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।[১৬৫]

১৭. ড. মওলানা শেহাবুল হুদা (১৯৪০–১৯৮৬ খ্রি.)

ড. মওলানা শেহাবুল হুদা চট্টগ্রাম বন্দর নগরীর ধনিয়ালাপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কারি মুহাম্মদ সোলায়মান এবং মাতা আসমা খাতুন। পিতামাতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে ‘চট্টগ্রাম কাজেম আলী হাইস্কুল’ থেকে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন (এস.এস.সি.), চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে ১৯৫৮ ও ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে আই. এ. ও বি. এ. এবং ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগ’ থেকে ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাশ করেন।

শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি কিছুদিন‘ চট্টগ্রাম বন্দর হাইস্কুলে’ সহকারী শিক্ষক, ১৯৬২ থেকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজের ইসলামিক স্টাডিজ এন্ড আরবি বিভাগের প্রভাষক এবং ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ফারসি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে *‘Saints and Shrines of Chittagong’* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

ব্যক্তি হিসেবে তিনি অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান, কর্মঠ ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। পীর আউলিয়ার প্রতি তাঁর আজন্ম ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল; বিশেষ করে বায়তুশ শরফের সাথে তাঁর নাড়ির সম্পর্ক ছিল। তিনি আমৃত্যু বায়তুশ শরফ দরবারের একজন খাদেম হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। এ মহান ব্যক্তিত্ব খাদ্যনালিতে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে মারা যান।[১৬৬]

১৬৫. মওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২

১৬৬. এ. কে. মাহমুদুল হক সম্পাদিত, মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, ‘ড. শেহাবুল হুদা অকালে ঝরে যাওয়া ফুল’, *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, অক্টোবর ১৯৮৬, পৃ. ৩২-৩৫; তদীয় বড়ো ছেলে মুহাম্মদ আজাদ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মানুষ গড়ার কারিগর ছিলেন। তিনি বহু আলিম-উলামা ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতকে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন এবং তাদের জ্ঞান-গবেষণার সম্প্রসারণে নানামুখী বাস্তব কর্মসূচিও গ্রহণ করেছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র ও ধর্মীয় মাহফিল প্রতিষ্ঠা

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তিনি পথহারা মানুষকে সরল-সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চিন্তায় সদাবিভোর থাকতেন। তিনি অসংখ্য নবি-রাসুল, সাহাবি ও আউলিয়ার মাযার যিয়ারত করে আধ্যাত্মিকতার সুধা পান করেছিলেন। এ আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে মানবাত্মা সংশোধন করে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাই তিনি মানুষকে আধ্যাত্মিকতার মধুর অবগাহনে সিক্ত করার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এজন্য ওয়ায-নসিহতের পাশাপাশি তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং ইছালে ছওয়াবের মাহফিল প্রতিষ্ঠান করেন; যাতে জীবিত মানুষেরা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের পাশাপাশি মৃত মুসলিমগণও উপকৃত হতে পারেন।

(ক) আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন

আধ্যাত্মিক শিক্ষাবিস্তার ও প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বহু দীনি তা'লিম কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। নিম্নে বায়তুশ শরফ দীনি তা'লিম কেন্দ্র ও তা'লিমি সপ্তাহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

১. দীনি তা'লিমি কেন্দ্র স্থাপন

আল্লাহ্‌র বিধানমতো জীবন পরিচালনার মাধ্যমে অন্তরে সর্বদা তাঁর স্মরণই নৈকট্য দিতে পারে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন আল্লাহ্‌ প্রেমে সিক্ত এবং আত্মার শান্তিপ্রাপ্ত কামেল পীর। তাই তিনি স্থায়ীভাবে যিকিরের ব্যবস্থা করার জন্য ১৮৮টি দীনি তা'লিম কেন্দ্র ও যিকিরের মাহফিলের ব্যবস্থা করেন।[১৬৭]

২. তা'লিমি সপ্তাহের প্রবর্তন

কর্মীর দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। অনুরূপভাবে তরিকতের আলিম, মুবাল্লিগ ও অনুসারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা আরও বেশি জরুরি; কারণ অন্যান্য প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য পৃথিবীর সাফল্য লাভ করা; পক্ষান্তরে, তরিকতের শিক্ষা-দীক্ষার মূল উদ্দেশ্য আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করা। এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ৬ জুলাই, ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে কুর'আন-হাদিস, শরি'আত-তরিকত, মা'রিফত-হাকিকত এর অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে 'তা'লিমি সপ্তাহ' নামে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। সমগ্র দেশ থেকে নির্বাচিত প্রায় ৫০০ জন তরিকতের আলিম-'উলামা, ছাত্র-শিক্ষক ও বায়তুশ শরফের ভক্ত-অনুরক্ত এতে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানেও এ প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ছয়টি

---

১৬৭. *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, স্মরণ সংখ্যা ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

‘তা‘লিমি সপ্তাহ’ সুসম্পন্ন হয়।[১৬৮] এভাবে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) একজন মানুষকে পূর্ণ মু’মিন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরলস কাজ করে গেছেন।

(খ) ধর্মীয় মাহফিল প্রতিষ্ঠা

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) আধ্যাত্মিকতা চর্চায় অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি মুরিদান এবং সাধারণ মানুষদের হেদায়াতের পথে এনে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার চিন্তায় বিভোর থাকতেন। কর্মব্যস্ততার কারণে আধুনিক যুগের মানুষের পক্ষে সবসময় পীরের সান্নিধ্যে থাকা সম্ভব নয়। আগের যুগের মানুষ বছরের পর বছর পীরের সান্নিধ্যে এবং পাহাড়ে-জঙ্গলে কাটাতেন। লোকজন যাতে পীরের সান্নিধ্যে কিছুসময় থেকে সাহচর্য অর্জন করে আধ্যাত্মিক ছোঁয়া লাভে ধন্য হতে পারে সেজন্য তিনি ‘কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ’সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ায মাহফিল ও যিকিরের মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাহফিলসমূহের বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

১. পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) ও তামাদ্দুনিক প্রতিযোগিতা

দেশে প্রচলিত মিলাদুন্নবি[১৬৯] (সা.)-এর অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে ইসলামভিত্তিক সিরাত চর্চার মাধ্যমে দেশে ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মানসে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ‘পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) ও তামাদ্দুনিক প্রতিযোগিতা’ নামে এক সৃজনশীল অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। প্রথমে এ অনুষ্ঠান একদিনব্যাপী ছিল। পরে ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে পর্যায়ক্রমে ২, ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মরহুম পীর মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন (রহ.)-এর মাধ্যমে এ অনুষ্ঠান চারদিনে উন্নীত হয় এবং তা অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। প্রতিবৎসর হিজরি সনের ৯ রবিউল আউয়াল থেকে ১২ রবিউল আওয়াল চার দিনব্যাপী পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) ও তামাদ্দুনিক প্রতিযোগিতা কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ডি. টি. রোড, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানসূচি নিম্নরূপ:

- **৯ রবিউল আউয়াল :** পবিত্র কুর’আন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বায়তুশ শরফের পীর সাহেব এ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্‌বোধন করেন। তাতে হিফজুল কুর’আন প্রতিযোগিতা (১০, ২০ ও ৩০ পারা), উপস্থিত রচনা প্রতিযোগিতা (ক, খ ও গ গ্রুপ), চল্লিশ হাদিস মুখস্থ বলা প্রতিযোগিতা (অর্থছাড়া ও

---

১৬৮. সেগুলো হলো : প্রথম তা‘লিমি সপ্তাহ ১৯৭৪ খ্রি. এর ৭ জুলাই থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত। ‘দ্বিতীয় তা‘লিমি সপ্তাহ’ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৮ খ্রি. এর ৭ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত। ‘তৃতীয় তা‘লিমি সপ্তাহ’ ১৯৮৬ খ্রি. ১৫ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত। চতুর্থ তা‘লিমি সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৯ খ্রি. এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পঞ্চম তা‘লিমি সপ্তাহ ২০০৪ খ্রি. ২৪ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। দ্র. মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, *নির্বাচিত ভাষণ* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০১৭), পৃ. ১১-১২

১৬৯. মিলাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ জন্মস্থান, জন্মদিন (Birthday)। ‘মাওলিদ’ (مَوْلِدٌ)ও এর সমার্থক; তবে ‘মাওলিদ’ জন্মস্থান (Birthplace) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দ্র. ইব্‌ন মানযুর, *লিসানুল ‘আরব*, পূর্বোক্ত, খ.৩, পৃ. ৪৬৮; প্রচলিত অর্থে সাধারণত ‘মিলাদ’ বলতে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্মদিনকে বোঝানো হয়। এ কারণে খ্রিষ্টীয় সালকে বলা হয় ‘মিলাদি’ বা মিলাদিয়্যাহ (مِيْلَادِيٌّ، مِيْلَادِيَةٌ, A.D., After Christ)। আর ‘ঈদুল মিলাদ’ বলতে হযরত ঈসা ‘আলাইহিস সালামের জন্ম উপলক্ষ্যে ২৫ ডিসেম্বর আয়োজিত উৎসব-অনুষ্ঠান (Christmas, Xmas) কে বোঝানো হয়। ‘ঈদে মিলাদুন্নবি’ (সা.) বলতে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর জন্ম উপলক্ষ্যে তাঁর জন্মদিন ১২ রবিউল আউয়াল কোনো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করাকেই বোঝানো হয়। দ্র. ড. আহমদ আলী, *বিদ‘আত* (চট্টগ্রাম : রিলেটিভ পাবলিকেশন্স, ২০১৩), খ.৩, পৃ. ১৭

অর্থসহ) হয়। মাগরিবের নামাযের পর কচিকাঁচা শিশু-কিশোর পরিবেশিত 'পাখ-পাখালির আসর' নামে মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

- **১০ রবিউল আউয়াল :** কির'আত, হামদ বা না'ত প্রতিযোগিতা, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি (শিশু, কিশোর বিভাগ)। মাগরিবের নামাযের পর অনুষ্ঠিত হয় শানে মোস্তফা (সা.)-এর না'তে রাসুল মাহফিল। এতে দেশের খ্যাতনামা কবিদের মাধ্যমে আরবি, উর্দু, ফারসি ও বাংলা ভাষায় রচিত না'তে রাসুল (সা.) পরিবেশিত হয়।
- **১১ রবিউল আউয়াল :** ফুরকানিয়া ও মক্তবের শিক্ষার্থীদের, আযান ও কিরা'আত প্রতিযোগিতা (জুনিয়র ও সিনিয়র গ্রুপ)। বাদে মাগরিব দেশের বিশিষ্ট চারজন গুণীব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।
- **১২ রবিউল আউয়াল :** না'তে রাসুল (সা.) প্রতিযোগিতা (বাংলা/ উর্দু/ ফারসি/ আরবি), আরবি কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, মেয়েদের ও সর্বসাধারণের জন্য 'ঘরে বসে রচনা প্রতিযোগিতা'। বাদে আসর 'বায়তুশ শরফ শাহ্ আখতরিয়া হেফজখানা'র ছাত্রদের দস্তারবন্দি এবং বাদে মাগরিব পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) উপলক্ষ্যে দেশের খ্যাতিমান আলিম ও ইসলামি চিন্তাবিদগণের মাধ্যমে ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এসব অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের শত-শত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে থাকে। এসব প্রতিযোগিতায় একাধিক বিচারকের সুপারিশক্রমে প্রত্যেক বছর বিজয়ীদের মাঝে নগদ অর্থ, সনদ, শিক্ষা উপকরণসহ আরও বহু মূল্যবান পুরস্কার দেয়া হয়। এ চমৎকার অনুষ্ঠানটি চট্টগ্রামসহ সারা বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

২. আখতরাবাদ (কুমিরাঘোনা) বার্ষিক ইছালে সওয়াব মাহফিল

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) শরি'আত সম্মত পন্থায় বার্ষিক ইছালে সওয়াব[১৭০] মাহফিলের আয়োজন করতেন। বায়তুশ শরফ দরবারের মূল প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) তরিকতের ভক্ত-অনুরক্ত এবং আপামর জনসাধারণের জন্য বাৎসরিক ভ্রাতৃ-সম্মিলন স্বরূপ ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে 'ইছালে সওয়াব মাহ্ফিল' এর প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এটাকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তোলেন। এ মাহফিল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়।[১৭১]

---

১৭০. ইছালে সওয়াব ফারসি শব্দ; আরবিতে হবে 'ইছালুস সওয়াব'; আভিধানিক অর্থ 'সওয়াব রেসানি' বা সওয়াব পৌঁছে দেয়া। এ শব্দটি ফারসি ভাষার হলেও বাংলায় বহুলব্যবহৃত বলে সাধারণ সমাজে খুবই পরিচিত। কেউ কেউ বলেন, সওয়াব বখশে দেয়া। প্রকাশের ধরন ভিন্ন হলেও শব্দগুলোর অর্থ ও মর্ম একই। পুণ্য বা সওয়াব প্রেরণ করা। পরিভাষায়, ইছালে সওয়াব হলো, মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য নেক আমল (সৎকর্ম) বা 'ইবাদত-বন্দিগি করে তা উক্ত ব্যক্তির জন্য উৎসর্গ করা। মওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন বলেন, মৃত মুসলিমগণের জন্য কৃত নামাজ, রোযা, দান-সদকাহ্, তসবিহ-তাহলিল, কুর'আন তিলাওয়াত ইত্যাদি শারীরিক ও আর্থিক 'ইবাদতের সওয়াব পৌঁছানোকে ইছালে সওয়াব বলা হয়। দ্র. মওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, *ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ* (ঢাকা : মাকতাবাতুল আবরার, ২০০৭), পৃ. ১৫২

১৭১. **প্রথমবার :** প্রথম ইছালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় সম্ভবত ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) এর নিজ বাসস্থান মাদারবাড়িতে। **দ্বিতীয়বার:** ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয় রাঙ্গুনিয়ায় তাঁর নানার বাড়িতে। **তৃতীয়বার :** ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় নিজ বাসস্থান মাদারবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। **চতুর্থবার :** ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় রাঙ্গুনিয়া থানার বাক্মোত্তর গ্রামে তাঁর নানা হযরত মওলানা শাহ্ আকরম আলী সাহেব (রহ.)-এর বাড়িতে। **পঞ্চমবার :** ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীস্থ হাজী ক্যাম্প মসজিদে। এ মসজিদে পর পর তিন বৎসর যথাক্রমে ১৯৪৬, ৪৭, ৪৮ খ্রিষ্টাব্দে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। **ষষ্ঠবার :** ১৯৪৯ ও ৫০ খ্রিষ্টাব্দে সাতকানিয়া থানার কলাউজানে এ মাহফিল

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রতিবৎসর চট্টগ্রাম শহর থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে লোহাগাড়ার কুমিরাঘোনা (আখতরাবাদ) নামক স্থানে 'আখতরাবাদ বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স' এ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। শেষরাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযের পর যিকির-আযকার, দু'আ মুনাজাতসহ বিভিন্ন পন্থায় মুসলিমগণকে পরিপূর্ণ মু'মিন হিসেবে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জোহরের নামাযের পর থেকে আসর পর্যন্ত পীর সাহেব সুদীর্ঘ মুনাজাত পরিচালনা করেন।[১৭২]

৩. কক্সবাজার ফাতেহায়ে ইয়াযদাহম

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ অর্থাৎ 'তোমরা মু'মিনের অন্তর্দৃষ্টিকে ভয় করো, কারণ তিনি আল্লাহ্‌র জ্যোতিতে দৃষ্টি দেন।'[১৭৩] মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আল্লাহ্‌র ওলি ছিলেন। তিনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে 'কক্সবাজার ফাতেহা[১৭৪]-ই-ইয়াযদাহম[১৭৫]' নামে 'পবিত্র ইছালে সওয়াব মাহফিলে'র প্রবর্তন করেন। এ মাহফিল প্রবর্তনের লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'কক্সবাজারে প্রায় লোক আসে বনভোজন (পিক্‌নিক) করার জন্য। আর আমরা আসি মনভোজনের জন্য।' অর্থাৎ 'কক্সবাজারের ইছালে সওয়াব মাহফিলে গেলে আলেমদের ওয়ায-নসিহত শ্রবণ করে এবং যিকির-আযকারে শরিক হয়ে রুহানি খোরাক হাসিল হয়ে মন ভরে যাবে। এতে 'মনভোজন' হাসিল হবে, একই সাথে আনন্দ ভ্রমণটাও হয়ে যাবে।'[১৭৬]

প্রতি চান্দ্রবৎরের ১১ রবিউস্ সানি তারিখে বড়ো পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ.) (১০৭৭–১১৬৫ খ্রি.)-এর স্মরণে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মূলত এ মাহফিল হযরত আবদুল কাদির জিলানি (রহ.)-এর ওফাত দিবস উপলক্ষ্যে পালিত হয়। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ মাহফিল সুবিশাল সংখ্যক ভক্ত-অনুরক্ত এবং সাধারণ মুসলিমদের নিয়ে সারারাত অনুষ্ঠিত হয়। যিকির-আযকার, ওয়ায-নসিহত ও হযরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর জীবনী আলোচনা, খতমে কুর'আন, বুখারি শরিফ, দরুদ পাঠ, মিলাদ এবং দু'আ-মুনাজাত ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠিত হয়। **সপ্তমবার :** কলাউজানের পর ১৯৫১ ও ৫২ খ্রিষ্টাব্দে আমিরাবাদে তাঁর এক মুরিদের বাড়িতে এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দ্র. মোহাম্মদ আমান উল্লাহ্ খান, *মহিমাময় জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০-৯১

১৭২. আলহাজ্ব মওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার, 'আখতারাবাদ (কুমিরাঘোনা) মাহফিলে ইছালে ছওয়াবের বৈশিষ্ট্য', *দৈনিক কর্ণফুলি*, ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৬; মওলানা বদিউর রহমান, 'হাদীসের দৃষ্টিতে মাহফিলে ইছালে ছওয়াব', ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৬, পৃ. ১২; মো. শাহিনুজ্জামান, *গঠন-প্রকরণে বাংলাদেশের সূফীবাদের বিকাশ (১৯৭১-২০০০)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

১৭৩. আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, খ.২, পূর্বেক্তি, বাবুন মিন সুরাতিল হিজরি, হাদিস নং ৩০৫২, পৃ. ৩৯৯

১৭৪. ফাতিহা শব্দটি আরবি; অর্থ প্রারম্ভিকা, উন্মুক্তকারী ও উদ্‌বোধনকারী। মুসলিম সমাজে এর ব্যবহার দ্বিবিধ : কুর'আনের সূরা অর্থে এবং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুর'আন তিলাওয়াত ও দু'আ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়। দ্র. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.৬, পৃ. ৫৫

১৭৫. ইয়াযদাহম ফারসি শব্দ; অর্থ ১১ তারিখ। যেহেতু হযরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ.) ৫৬১ হিজরি/ ১১৬৬ খ্রি. ১১ রবিউস্‌সানি সোমবার, রাতের শেষ প্রহরে ইন্তিকাল করেন, সে কারণে এই ১১ বলতে ১১ রবিউস্ সানিকেই বোঝানো হয় এবং এই ১১ এমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে যায় যে, অনেক খানকায় 'এগারো শরিফ বা গেয়ারবি শরিফ' অনুষ্ঠিত হয়।

১৭৬. মাওলানা আবু ছালেহ মুহাম্মদ ছলীমুল্লাহ্, 'কক্সবাজার মাহফিলে ইছালে ছওয়াব', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, ৩৪ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, মার্চ ২০১৩, পৃ. ৩৭

৪. জবালে সিরাত সিরাতুন্নবি (সা.)

শির্‌ক-বিদ্‌'আত এবং কুফুর-নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন খড়গহস্ত। সাতকানিয়া থানার বড়হাতিয়ায় ৪০ বছর ধরে স্থানীয় প্রভাবশালী ছিদ্দিক আহমদ চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে বৈশাখ মাসের ১২ ও ১৩ তারিখ গরুর লড়াই ও বলীখেলা অনুষ্ঠিত হতো।[১৭৭] সকালে গরুর লড়াই, বিকালে বলীখেলা এবং রাতে মদ-জুয়া ও অসামাজিক কার্যকলাপ চলত বেপরোয়াভাবে। জীবনসায়াহ্নে ছিদ্দিক আহমদ চৌধুরী মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে ছেলেদের এ বলে অসিয়ত করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর যেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর মাধ্যমে জানাযা পড়ানো হয়।

তিনি মারা গেলে জানাযার মাঠে তাঁর কফিন হাজির হলে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) জানাযা পড়াতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাঁর ছেলেদের থেকে ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ না করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে জানাযা পড়াতে সম্মত হন। মরহুমের ছেলেরা পরবর্তীকালে পীর সাহেবের সাথে কৃত ওয়াদা রক্ষা করেন। সেই বলীখেলার স্থানে একই তারিখে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিরাতুন্নবি (সা.) মাহফিলের প্রচলন করেন এবং সেই পাহাড়ি স্থানটির নামকরণ করেন 'জবলে সিরাত।'[১৭৮] আজও সে মাহফিল চলমান রয়েছে। প্রতিবছর হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলিম উক্ত মাহফিলে উপস্থিত হয়ে দীন ও দুনিয়া উভয় জাহানে সফলতা লাভ করছে।

৫. শাহ্ পীর আউলিয়া সিরাতুন্নবি (সা.)

সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা এটা দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কেউ কেউ একে ইসলামের ষষ্ঠ রুকনরূপেও গণ্য করেছেন।[১৭৯] প্রত্যেক মু'মিনই অপর মু'মিন ভাইয়ের সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী এ দায়িত্ব পালন করে যাবে এটাই তার ঈমানের দাবি। তাই হক্কানি পীর-মাশায়েখ সাধারণ মানুষকে দীনি তা'লিমের পাশাপাশি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের সংগ্রাম আজীবন চালিয়ে যান। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) শরি'আতবিরোধী কর্মকাণ্ডকে কখনও প্রশ্রয় দেননি। যেখানে সম্ভব হয়েছে তাঁর সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন হেকমতের সাথে।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় শাহ্ পীর আউলিয়া (রহ.)-এর মাযারে তথাকথিত ওরশের নামে অনুষ্ঠিত হতো নাচ-গান, মদ, জুয়া, যেনা-ব্যভিচারসহ শরি'আতবিরোধী কার্যকলাপ। তিনি স্থানীয় গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম ও শরি'আত বিরোধী এসব কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন করেন। সেখানে সিরাতুন্নবি (সা.) মাহফিল প্রবর্তনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা চর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেছেন। প্রতিবছর হাজারো ধর্মপ্রাণ মানুষ উক্ত মাহফিলে উপস্থিত হয়ে কুর'আন ও হাদিসের অমূল্য বয়ান শুনে তাদের জীবনকে ধন্য করছেন।

---

১৭৭. রায়হান আজাদ, *চট্টগ্রামের একশ মুসলিম মনীষা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১৭৮. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.) এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

১৭৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন সালেহ আল-উসাইমিন, *শরহু রিয়াদিস সালিহীন* (বৈরুত : মাদারুল ওয়াতনি লিন-নাশ্‌রি, ১৪২৬), পৃ. ২২৬

৬. খুলনা বাগেরহাট ইছালে সওয়াব (সা.) মাহফিল

হযরত খান জাহান আলী (রহ.) বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে মসজিদভিত্তিক জনকল্যাণমূলক মানবসেবার মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের অন্তর জয় করেছিলেন। যশোর, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় তাঁর শতাধিক কীর্তিসমূহ আজও কালের সাক্ষী হয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি ১৩৭৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪১৯ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করে যশোরের বার বাজার নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন। সেখানে অবস্থান করে তিনি বিচক্ষণতার সাথে সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচার তথা মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা ও বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফলে অল্প সময়ে তিনি মানুষের কাছে আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

আনুমানিক ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে দক্ষিণ বঙ্গের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম 'ষাট গম্বুজ মসজিদ' নির্মাণ করেন। কথিত আছে যে, মহান সাধক-শাসক খানজাহান আলী দীর্ঘদিন ইসলাম প্রচার ও নানাবিধ জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থেকে শেষজীবনে সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক সাধনা ও 'ইবাদত-বন্দিগিতে নিমগ্ন হন। ২২ অক্টোবর, ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করলে তাঁর নির্মিত মাজারেই দাফন করা হয়। কিন্তু পরে 'ষাট গম্বুজ মসজিদ ও মাজার'কে কেন্দ্র করে যুগ-যুগ ধরে চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে 'চৈত পূর্ণিমা' নামে ৩ দিনব্যাপী মেলায় শির্ক, বিদ্'আত, শরি'আতবিরোধী বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ড শুরু হয় এবং যুগ-যুগ ধরে তা চলতে থাকে।

১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) শতাধিক 'আলিম নিয়ে এই মহান অলির মাজার শির্ক ও বিদ্'আত মুক্ত করে মসজিদ ও মাযার প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী 'বার্ষিক ইছালে ছওয়াব মাহফিলে'র প্রবর্তন করেন। সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন সুন্দরঘোনা ষাট গম্বুজ বায়তুশ শরফ আদর্শ দাখিল মাদ্রাসা, হেফ্জখানা, এতিমখানা, লিল্লাহ বোর্ডিং এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।[১৮০]

৭. পবিত্র লায়লাতুল বরা'আত (শবে বরা'আত)

'লায়লাতুল বরা'আত' মুসলিমগণের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। প্রতিবৎসর হিজরি সনের অষ্টম মাস শাবান মাসের পঞ্চদশ রাতে এ অনুষ্ঠান পালিত হয়। উপমহাদেশে শবে বরা'আত প্রধানত সৌভাগ্য রজনি হিসেবে পালিত হয়।[১৮১] যদিও 'শবে বরা'আত'[১৮২] বা 'লায়লাতুল বরা'আত নামে কোনো রাতের নাম কুর'আন ও হাদিসে কোথাও পাওয়া যায় না; তবে বিভিন্ন হাদিসে এ রাতের নাম এসেছে 'লাইলাতুন নিসফ মিন শা'বান' অর্থাৎ শা'বান মাসের মধ্যরাত। অবশ্যই তাফসিরের কিতাবসমূহে 'লায়লাতুল বরা'আতে'র নাম পাওয়া যায়। যতটুকু জানা যায়, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.)-ই সর্বপ্রথম

---

১৮০. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ সম্পাদিত, ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী, 'হযরত খান জাহান আলী (রহ.)', *আল-আছরার* (বিশেষ প্রকাশনা) (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৪), পৃ. ৫০-৫৩

১৮১. সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, পূর্বোক্ত, খ.৯, পৃ. ২৫৪

১৮২. শবে বরাত একটি যৌগিক শব্দ; 'শব' ফারসি শব্দ, যার অর্থ রাত, রজনি আর 'বরাত' আরবি শব্দ, যার অর্থ মুক্তি, নাজাত ও নিষ্কৃতি; যার সম্মিলিত অর্থ 'মুক্তি পাওয়ার রাত'। এ রাতে পাপীরা আল্লাহ্র 'ইবাদত-বন্দিগির মাধ্যমে ক্ষমা লাভ করে থাকে বিধায় এ রাতটি 'শবে বরা'আত' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। একে আরবিতে 'লায়লাতুল বরা'আত' ও 'লায়লাতু নিসফে মিন শা'বান' বলা হয়।

এ রাতের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রেখে এটিকে 'লায়লাতুল বরা'আত' নামে অভিহিত করেন।[১৮৩] রাসুলুল্লাহ (সা.) এ মাসে বেশি-বেশি রোযা রাখতেন। এ মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রির বেশ কিছু ফযিলতের কথা হাদিসে বর্ণিত রয়েছে।[১৮৪]

এ রাত্রিতে বিশেষভাবে জাগ্রত থেকে 'ইবাদত করাকে বিদ'আত বলা সমীচীন হবে না; কেননা এ রাতের 'আমল সম্পর্কে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন,

> إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ
>
> অর্থাৎ 'যখন শা'বান মাসের মধ্যরাত্রির আগমন ঘটে, তখন তোমরা সে রাত্রে জাগ্রত থেকে আল্লাহ্‌র 'ইবাদতে মশগুল থাকো এবং দিনের বেলায় রোযা পালন করো; কেননা মহান আল্লাহ্ সে দিন সূর্যাস্তের পর প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, তোমাদের মাঝে কি কেউ গুনাহ ক্ষমা চাওয়ার আছ ? আমার কাছে ক্ষমা চাও। আমি ক্ষমা করে দেবো। কোনো রিযিক তালাশকারী কি আছ ? আমি আজ রাত তাকে রিযিক দান করব। কোনো বিপদগ্রস্ত আছ ? আজ আমি তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দেবো। এভাবে ভোর হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে (বিভিন্ন বিষয়ে) ঘোষণা অব্যাহত থাকে।'[১৮৫]

'আল্লামা সুয়ুতি, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভি ও আল্লামা আশরফ আলি থানবি (রহ.) (১৮৬৩–১৯৪৩ খ্রি.) সহ অধিকাংশ আলেম এ রাতে জাগ্রত থেকে একাকী 'ইবাদত করাকে মুস্তাহাব বলেছেন।[১৮৬] এ রাতে রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর 'আমল সম্পর্কে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল হক দেহলভি (রহ.) (১৫৫১–১৬৪২ খ্রি.) বলেন, 'এ রাতে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) রাত জেগে নামাজ, দীর্ঘ সিজদা ও আহলে বকি'দের জন্য ইস্তিগফার ব্যতীত অন্য কিছু করেছেন–তা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নেই।'[১৮৭]

তাই মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) প্রতিবৎসর 'শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রি'তে কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফে এ উপলক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভা চালু করে গেছেন। তাতে বক্তাগণ কুর'আন ও হাদিসের আলোকে এ রাতে মুসলিমগণের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে বয়ান পেশ করেন। বয়ান শেষে নফল সালাত, যিকির-আযকার, দু'আ-দরুদ, যিয়ারত এবং সর্বশেষ পীর সাহেবের হৃদয়গ্রাহী দীর্ঘ মুনাজাতের মাধ্যমে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় এ রাত পালিত হয়।

---

১৮৩. আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দি, *আন-নুকাত ওয়াল 'উয়ুন (তাফসিরুল মাওয়ার্দি)* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০১০), খ.৬, পৃ. ৩১৩

১৮৪. আল্লামা সুয়ুতি (রহ.) তাঁর *'আদ-দুররুল মনছুর'* তাফসির গ্রন্থে এ রাতের ফযিলত সংক্রান্ত মারফু' ও মাওকুফ মিলে ১৫টি হাদিস উল্লেখ করেছেন; তবে সব কটি হাদিস সূত্রগত দিক দিয়ে দুর্বল। দ্র. আল্লামা জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতি, *আল-দুররুল মনছুর ফি তাফসিরিল মা'ছুর* (কায়রো : মারকাযুল হিজর লিল বুহুছি ওয়াদ দিরাসাতিল 'আরাবিয়্যাহ ওয়াল ইসলামিয়্যাহ, ২০১১), খ.৬, পৃ. ২৬-২৮

১৮৫. আবু 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, বাবুন মা জাআ ফি লায়লাতি মিন নসফি মিন শা'বান, হাদিস নং ১৩৭৮, পৃ. ১৩৭৮; আবু বাকর আহমদ বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, খ.৩, হাদিস নং ৩৮২২, পৃ. ৩৮৯

১৮৬. 'আলা উদ্দিন হাম্বলি, *আল-ইনসাফ ফি মা'রিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ লিল মরদাভি* (বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল 'আরাবি, তা. বি.), খ.৩, পৃ. ৩১৩; আবদুল হক ইব্‌ন সাইফুদ্দীন আদ-দেহলভী, *মা সাবাতা বিস্ সুন্নাত ফি আইয়্যামিস্ সানাহ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০১৮), পৃ. ৩৬০

১৮৭. আবদুল হক মুহাদ্দিস আদ-দেহলভি, *মাদারিজুন নবুয়ত* (করাচি : শব্বির ব্রাদার্স, তা. বি.), খ.১, পৃ. ৪৯১

৮. পবিত্র লায়লাতুল কদর (শবে কদর)

'শবে কদর' অধিক মহিমান্বিত এবং বরকতের অমিয় ধারায় প্লাবিত দিন-রাতসমূহের মধ্যে অন্যতম রজনী। সমগ্র জাহানের হিদায়াত ও কল্যাণের জন্য নাযিলকৃত আল-কুর'আন এই রাতেই নাযিল হওয়া শুরু হয়। এ রাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা 'সূরাতুল কদর' নামে একটা পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেছেন। কুর'আন ও হাদিসে এর নাম 'লায়লাতুল কদর'; তবে বাংলাদেশে 'শবে কদর'[১৮৮] হিসেবেই পরিচিত। কুর'আন ও হাদিসে এর সুনির্দিষ্ট কোনো দিন-তারিখ বর্ণিত হয়নি; তবে বিভিন্ন হাদিসের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে এটাই আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় যে, 'শবে কদর' রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতে তথা ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ও ২৯ তারিখে হতে পারে। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ অর্থাৎ 'তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করো।'[১৮৯] এজন্য রাসুলুল্লাহ্ (সা.) রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। অধিকাংশ আলিম মনে করেন যে, রমজানের ২৭তম রাতই শবে কদর। হাদিসে এ রাতের বহু গুরুত্ব ও ফযিলতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কদর রাতে ঈমানসহ সওয়াবের নিয়তে 'ইবাদতের জন্য দাঁড়াবে তাঁর অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।'[১৯০] হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

> إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ
>
> অর্থাৎ 'তোমাদের মাঝে এ মাস (রমযান) এসেছে। এ মাসের মধ্যে এমন একটি রাত আছে, যা হাজার মাস থেকেও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত হবে সে সমগ্র কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবে। এর কল্যাণ থেকে একমাত্র হতভাগা লোক ছাড়া আর কেউ বঞ্চিত হয় না।'[১৯১]

এ রাতের 'আমল সম্পর্কে আল্লামা মাহমুদ আলুসি (রহ.) (১৮৩২–১৮৫৪ খ্রি.) তাঁর *'তাফসিরে রুহুল মা'আনি'* গ্রন্থে বলেন, 'কদরের রাতে সব ধরনের 'ইবাদত করা উচিত; যেমন : নফল নামাজ, পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াত, তাসবিহ-তাহলিল, ক্ষমাপ্রার্থনা ও দু'আ ইত্যাদি। এককথায়, এ রাতে যত 'ইবাদত

---

১৮৮. শব ফারসি শব্দ অর্থ রাত। আর কদর আরবি শব্দ, সম্মান-মর্যাদা ও মাহাত্ম্য, পরিমাপ, পরিমাণ, নিরূপণ, মহিমা ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণসহ এর আরও অনেক অর্থ আছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমি এটা (কুর'আন) কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি।' দ্র. আল-কুর'আন, ৯৭ : ০১; হাদিস শরিফে এ রাত সম্পর্কে এসেছে, هي الليلة التى تقدر فيها الأرزاق وتقضي অর্থাৎ 'এটা এমন রাত যাতে বান্দার রিযিক নির্ধারণ করা হয়।' দ্র. যয়নুদ্দীন আবিল ফযল ইব্ন আবদির রহিম, *থর্হুত তাছরিব ফি শরহিত তাকরিব* (বৈরুত : এহইয়ায়িত তুরাসি আরাবি, তা. বি.), খ.৪, পৃ. ১৫০

১৮৯. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ*, খ.১, বাবুন তাহারিয়্যু লায়লাতিল কদরি ..., হাদিস নং ১৮৭৮, পৃ. ৬৪; আবু বাকর আহমদ বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বাবুন ফি ফযলি লায়লাতিল কদরি, হাদিস নং ৩৩৯৯, পৃ. ১৮৬

১৯০. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ*, খ.১, বাবুন মন ছামা রমযান ..., হাদিস নং ১৭৬৮ ও ১৮৭৫, পৃ. ১১০ ও ৪৬৮; মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, খ.১, হাদিস নং ১২৬৮, পৃ. ১৪৬; আবু দাউদ সুলাইমান ইব্ন আশ'আশ, *আস-সুনান*, হাদিস নং ১১৬৫, পৃ. ১৩৬; আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, খ.১, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৬১৯, পৃ. ১০৪; আহমদ ইব্ন শু'আইব আন-নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ২১৬৪, পৃ. ৩৭৫

১৯১. আবু 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, বাবুন মা জাআ ফি ফযলি শাহরি রমযান, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ১৬৩৪ ও ১৬৪৪, পৃ. ১৪০

করা যায় ততই ভালো।’ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) প্রতি চান্দ্রবৎসরের ২৭ রমযান তারিখকে কেন্দ্র করে এক গুরুত্বপূর্ণ ওয়ায মাহফিল চালু করে গেছেন। এতে বক্তাগণ কুর’আন-হাদিসের আলোকে কদরের রাতে মুসলিমগণের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। আলোচনা শেষে যিকির-আযকার, তসবিহ-তাহলিল ও নফল সালাত আদায় এবং সর্বশেষ পীর সাহেবের হৃদয়গ্রাহী দীর্ঘ মোনাজাতের মাধ্যমে যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় এ দিবস পালিত হয়। এতে হাজারো ভক্ত-অনুরক্ত ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়ে তাদের অতীত গুনাহের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে কান্নাকাটি করে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

৯. মি‘রাজুন্নবি (সা.) মাহফিল

ইস্‌রা[১৯২] ও মি‘রাজের[১৯৩] ঘটনাটি সাধারণভাবে ইসলামের ইতিহাসে এবং বিশেষভাবে মহানবি (সা.) এর জীবনে এক বিশেষ তাৎপর্যবহ ঘটনা। একদিকে এ ঘটনা মহানবি (সা.) এর জন্য এক বিরাট সান্ত্বনা ও সম্মাননা; অপরদিকে, তা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের জন্য তা মহাপরীক্ষা। ইসরা ও মি‘রাজ দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; বরং একই ঘটনার দুটি পর্যায় মাত্র। সুতরাং বলা যায়, এ দুটির সমন্বিত নাম হচ্ছে মি‘রাজুন্নবি (সা.)। মি‘রাজ সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে একাধিক মতামত থাকলেও আল্লামা যারকানি (রহ.) (১৬৪৫–১৭১০ খ্রি.) বলেন, নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষের রজব মাসের ২৭ তারিখই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য অভিমত।[১৯৪]

এ রাতে যেহেতু আল্লাহ্ তা‘আলা উম্মতে মুহাম্মদি (সা.)-এর ওপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয করেছেন সেহেতু এ রাতের করণীয়র মধ্যে সর্বপ্রথম পড়ে বেশি বেশি নফল নামাজ পড়া। এছাড়াও নফল রোযা (যদিও রোযা রাখার বিষয়টি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়), কুর’আন তিলাওয়াত, দু‘আ-দরুদ, যিকির-আযকার, দান-সাদকা ইত্যাদির মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া এবং জান্নাতের প্রার্থনা করা। এ উপলক্ষ্যে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) প্রতিবছর ‘কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ

---

১৯২. ইসরার আভিধানিক অর্থ হলো নৈশভ্রমণ, রাত্রিকালীন সফর। ইমাম রাগেব ইসপাহানি (রহ.) বলেন, السَّرِيُ: سَيْرُ اللَّيْلِ অর্থাৎ রাতের ভ্রমণ। দ্র. আবু কাসেম আল-হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ আল-ইস্পাহানি, *আল-মুফরিদাত ফি গরিবিল কুর’আন* (কায়রো : আল-মকতাবাতুল তাওফিকিয়্যাহ, ২০১৫), পৃ. ৩২৯; পারিভাষিক অর্থে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত মহানবি (সা.)-এর রাত্রিকালীন সফরকে ইসরা বলা হয়। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ অর্থাৎ ‘পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করে দিয়েছিলাম বরকতময়, তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।’ দ্র. আল-কুর’আন, ১৫ : ০১

১৯৩. মি‘রাজ শব্দটি আরবি। এটি একবচন; বহুবচনে মাআ‘রিজ (مَعَارِجُ)। এটি ‘উরজুন (عُرْجٌ) ধাতু থেকে নির্গত। অর্থ সিঁড়ি, মই (Staircase), লিফট (Lift), উত্থান, ঊর্ধ্বগমন ও আরওহণ করা ইত্যাদি। ইমাম রাগেব বলেন, ذِهَابٌ فِيْ صَعُوْد অর্থাৎ উপরে ওঠা বা যাওয়া। শরি‘আতের পরিভাষায়, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দিসে (জেরুযালেম) উপনীত হওয়া এবং সেখান থেকে সপ্ত আসমান ভ্রমণ করে মহান আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার ঘটনাকে ‘মি‘রাজ’ বলে। দ্র. ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু নোমান, *ইস্‌রা ও মিরাজুন্নবী (সা.) : একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থার মূলনীতি* (চট্টগ্রাম : সাইয়েদা আফিফা মুবাশশিরা, ২০১৬), পৃ. ১৭; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্ব*কোষ, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ১৯২

১৯৪. শিহাবুদ্দিন আল কস্তুলানী, *আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়াহ* (কায়রো : আল-মাকতাবাতু তাওফিকিয়্যাহ, ২০১০), খ.১, পৃ. ৩০৭

মসজিদে’ এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভার আয়োজন করতেন। এতে দেশের শীর্ষস্থানীয় ‘উলামায়ে কিরাম উপস্থিত হয়ে কুর’আন ও হাদিসের আলোকে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করতেন।

১০. ১০ই মুহার্‌রম তথা আশুরা

আরবি নববর্ষের প্রথম মাস ‘মুহার্‌রম’। এই মাসের দশ তারিখ ‘আশুরা’ নামে পরিচিত। এই তারিখে ঘটেছে মানবসভ্যতা ও বিশ্বসৃষ্টিসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার (১০ তারিখে) রোযা রাখা ফরয ছিল। হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এবং তাঁর তিরোধানের পর সুদীর্ঘ ৫০ বৎসর অর্থাৎ আমিরে মুয়াবিয়া (রা.) এর খিলাফতকাল (৬০ হি.) পর্যন্ত মুহার্‌রমের দশ তারিখ আশুরা হিসেবে ‘ইবাদত-বন্দিগি, তসবিহ-তাহলিল ও দু‘আ-মুনাজাতের মাধ্যমে পবিত্রতার সাথে পালিত হয়ে আসছে। অতঃপর ৬১ হিজরির ১০ মুহর্‌রম কারবালার ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দৌহিত্র ইমাম হোছাইন (রা.) অবৈধ ক্ষমতার অধিকারী ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন। ফলে আশুরার মুক্তি দিবস ‘শোক দিবসে’ পরিণত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, ইসলামে শোক দিবস বলে কোনো বিশেষ দিন বা দুঃখোৎসব নেই। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) মুসলিম জাতিকে খোদাদ্রোহী জালিম শাসক এজিদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য জিহাদ করলে তিনি এবং আহলে বাইতের ৭২ জন সদস্য শহিদ হন। এ বিয়োগান্তক ঘটনার মাধ্যমে তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে আল্লাহ্‌র পথে আত্মত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মুসলিম জাতি আজ কারবালার প্রকৃত ইতিহাস ও শিক্ষা ভুলে গেছে। তারা শুধু শোক পালন, আলাপ-আলোচনা ও সভা-সেমিনার ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কারবালার প্রকৃত ইতিহাস মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য আলোচনাসভার আয়োজন করে গেছেন। তাতে বক্তাগণ কুর’আন-হাদিস ও ইসলামি ইতিহাসের আলোকে মুহার্‌রমের তাৎপর্য এবং কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর আত্মত্যাগের বিষয়টি অত্যন্ত সুচারুরূপে তুলে ধরেন।

(গ) দা‘ওয়াতি কাফেলা গঠন

দাওয়াতি কাফেলা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর একটি অনন্য সৃষ্টি। সাধারণ জনগণের মাঝে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করা এবং সমাজে বিদ্যমান বিদ্‘আত ও কুসংস্কার দূর করার নিমিত্তে তিনি এ দ‘ওয়াতি কাফেলা গঠন করেন। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর মুসলিমগণের মন-মানসে ইসলামের বিশুদ্ধ ‘আকিদা-বিশ্বাস মজবুত করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দা‘ওয়াতি কর্ম পরিচালনা করাই এ কাফেলার অন্যতম কাজ। এ দা‘ওয়াতি কাফেলার মধ্যে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে মওলানা মাহমুদুল হক খতিবী (১৯০৭–১৯৮৬ খ্রি.), মওলানা আবদুল লতিফ (১৯৪৭–২০১০ খ্রি.) মওলানা বদিউর রহমান (১৯১৭–১৯৯১ খ্রি.), গাযী মওলানা আবদুল মোমেন (১৯৫২–১৯৯৭ খ্রি.), মওলানা শামসুল ইসলাম হেলালী (১৯৪৩–১৯৯৯ খ্রি.), পোর্টকলোনীর সাবেক ইমাম মওলানা আহমদ সাইয়েদ, কাশেম জুট মিলস্-এর সাবেক ইমাম মওলানা আবুল কাশেম, মওলানা নূরুল হক, ফেনীর মওলানা ইসমাঈল সূরী, ঢাকার মওলানা আবদুল আলীম, মওলানা হাবিবুর রহমান, প্রিন্সিপ্যাল মওলানা সিরাজুল ইসলাম,

ড. মওলানা ঈসা শাহেদী (জন্ম ১৯৬০ খ্রি.), মওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দিক ফারুকী (জন্ম ১৯৪৭ খ্রি.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৯৫]

(ঘ) বায়তুশ শরফ রেনেসাঁ শিল্পীগোষ্ঠী গঠন

পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রতিরোধে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা'র শিক্ষার্থীদের নিয়ে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুশ শরফ রেনেসাঁ শিল্পীগোষ্ঠী' নামে একটি ইসলামি শিল্পীগোষ্ঠী গঠন করেছিলেন। এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তাঁর ছোটো ছেলে বিশিষ্ট শা'য়ির মুহাম্মদ আবদুল কাইয়্যুম।[১৯৬]

এভাবে মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সংশোধনের উদ্দেশ্যে তিনি আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন ধর্মীয় মাহফিল জারি করেন। সর্বোপরি, এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দা'ওয়াতি কাফেলা নামে একটি টিমও গঠন করেন।

---

১৯৫. জনাব মওলানা বদিউল আলম, সাবেক মুবাল্লিগ, বায়তশ শরফ দরবার, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১৯৬. মওলানা মুহাম্মদ আবদুল কাইয়্যুম, সহ-সভাপতি, আন্জুমনে নওজোয়ান বাংলাদেশ, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মুসলিমগণের ঐক্যের প্রয়াস ও নীতিভিত্তিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ

মুসলিমগণ ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ', 'মজলিসুল উলামা বাংলাদেশ' ও 'আন্‌জুমানে নওজোয়ান বাংলাদেশ' ইত্যাদি সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের মধ্যে ঐক্যের প্রয়াস চালান। মুসলিমগণকে ঐক্যবদ্ধ করে বাংলাদেশে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালান।

(ক) মুসলিমগণের ঐক্যের প্রয়াস

পৃথিবীতে ইসলামের আগমন ঘটেছে ঐক্যের পয়গাম নিয়ে। তাওহিদের পরে মু'মিনগণকে যে ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি তাগিদ দেয়া হয়েছে তা হলো ঐক্য। ঐক্যবদ্ধভাবে জীবনযাপন মু'মিনের অপরিহার্য কর্তব্য। মহানবি (সা.) শতধাবিভক্ত এক ভঙ্গুর সমাজে আবির্ভূত হয়ে সমাজকে একাত্মাবাদের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে একক সমাজব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন। তাই মুসলিমগণ একসময় অর্ধপৃথিবী শাসন করেছিলেন; কিন্তু কালক্রমে মুসলিমগণ ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনৈক্য ও দলাদলির পথে পা বাড়িয়ে জাতিগত মতাদর্শ ও মত-পথের বিভাজন-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। তারা সব গৌরব হারিয়ে একটি হতভাগা জাতিতে পরিণত হয়েছে; সভ্যতা-সংস্কৃতিতে তারা পিছিয়ে পড়েছে। আজ পৃথিবীর মুসলিমগণের সংখ্যা দেড়শ কোটির বেশি হওয়া সত্ত্বেও শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তারা অন্যান্য জাতির তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে রয়েছে। এর অন্যতম কারণ অনৈক্য। অনৈক্যের কারণেই মুসলিমগণের ওপর দুর্ভাগ্যের এই অমানিশা চেপে বসেছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মুসলিমগণকে ঐক্যবদ্ধ করে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। মুসলিমগণকে ঐক্যবদ্ধকরণে তিনি যেগুলো কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন সেগুলো হলো:

১. ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ

বিভিন্ন ইখতিলাফ[১৯৭] আর মতভেদের গোলকধাঁধায় পড়ে উলামায়ে কেরাম শতধাবিভক্ত। সামান্য মাস'আলাকে কেন্দ্র করে তাদের ফেরকাবাজি আর বিচ্ছিন্নতা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে বেশ মর্মাহত করে। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার চিন্তায় তিনি সদা বিভোর থাকতেন। তিনি তাঁর যুক্তিপূর্ণ নসিহত ও ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে ঐক্যের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। সভা-সমাবেশ ও ওয়ায-নসিহতের সময় অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহী ভাষায় বিভেদ-বিভক্তির কুফল তুলে ধরতেন; ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাতেন। তিনি বলতেন, অন্যান্য ফরযের চেয়ে উম্মতের মাঝে ইত্তেহাদ প্রতিষ্ঠা করাকে আমি সবচেয়ে বড়ো ফরয মনে করি। তিনি 'আলিম-'উলামাগণের মধ্যে বিদ্যমান লঘু মতভেদকে বর্জন করে দীনের বৃহত্তম স্বার্থে তাদের সাথে সহনশীল ও

---

১৯৭. ইখতিলাফ আরবি শব্দ। এর প্রকৃত অর্থ ভিন্নতা, পার্থক্য, অসংগতি, বৈপরীত্য প্রভৃতি। শব্দটি সাধারণত ভাষা, বর্ণ, অবস্থা, আকৃতি, মত ও চিন্তা-দর্শনের ক্ষেত্রে পার্থক্য, অসংগতি ও ভিন্নতা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হলেও মত ও চিন্তা-দর্শনের ক্ষেত্রে পরস্পর ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করার অর্থে বহুলব্যবহৃত।

সহিষ্ণু আচরণ করে চলতেন। তিনি আলেমসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করে তিনি বলেন,

> 'আমাদের ঐক্যের সূত্র একটি আর তা হলো মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন। কুর'আনকে সামনে রাখলে আমাদের মাঝে শত মতপার্থক্য থাকলেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি।'[১৯৮]

তিনি আল্লামা ইকবালের যুগান্তকারী যে কবিতাংশ পাঠ করেও ঐক্যের আহ্বান জানাতেন, তা হলো:

منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک

ایک ہی سب کا نبیؐ، دین بھی، ایمان بھی ایک

حرم پاک بھی، اللہ بھی، قران بھی ایک

کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

'এ জাতির কল্যাণ ও মুক্তির পন্থা হলো একটিই।
এদের নবি, দীন, ঈমান কালিমা এক।
কা'বা ঘর, আল্লাহ্, কুর'আনও এক এবং অভিন্ন।
কাজেই মুসলিম জাতি ঐক্যবদ্ধ হলে কতই না ভালো হতো।'[১৯৯]

তিনি আরও বলতেন, যদি (আল্লাহ্ না করুন) খোদাদ্রোহী শক্তি ক্ষমতা দখল করে তাহলে তারা ওয়াহাবি, সুন্নি ও বুযুর্গ কোনো পার্থক্য না করে সবাইকে পাইকারি হারে গণহত্যা করবে অথবা কারাগারে নিক্ষেপ করবে; যেমন : রাশিয়া ও অপরাপর মুসলিম বিশ্বে সংঘটিত হয়েছে। তিনি রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর নিম্নোক্ত হাদিসের রেফারেন্স টেনে বলতেন,

> اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا
>
> 'তিন বা দোতলাবিশিষ্ট জাহাজ আরওহীগণ লটারির মাধ্যমে আসন বরাদ্দ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপরের তলায়, কেউ নিচতলায়। (পানির ব্যবস্থা ছিল উপরের তলায়) কাজেই নিচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহকালে উপরের তলার লোকদের ডিঙিয়ে যেত। তখন নিচতলার লোকেরা বলল, ওপরতলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নিই (তাহলে ভালো হয়)। এমতাবস্থায়, তারা যদি এদেরকে নিজেদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়, তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তাদের বিরত রাখে, তারা এবং সকলেই রক্ষা পাবে।'[২০০]

---

১৯৮. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আবু ছালেহ মুহাম্মদ ছলীমুল্লাহ্, 'ইসলামী ঐক্যের মূর্তপ্রতীক', *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

১৯৯. আল্লামা ইকবাল, *জওয়াবে শেকওয়া*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৫৫

২০০. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি'আস-সহীহ*, খ.১, পূর্বোক্ত, বাবুন হাল ইউকরা'উ ফিল কিসমতি ওয়াল ইস্তিহামি ফিহি, হাদিস নং ২৩১৩, ২৪৯৩, পৃ. ৩৯৯

এ হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী বর্তমান সমাজে যে সীমিত সংখ্যক লোক অপরাধ করছে, তাদের প্রতিহত করার জন্য অবশ্যই সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; না হয় জাতীয়ভাবে সকলের ধ্বংস অনিবার্য। তাই মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। আর এক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা কেবল বক্তৃতা-বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এজন্য তিনি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় 'উলামায়ে কিরামকে নিয়ে কুর'আন-সুন্নাহর ভিত্তিতে একটি প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ' গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৮১ সালের ৬ আগস্ট ঢাকার 'টিএন্ডটি কলোনী মসজিদে' ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি এন্তেজামিয়া কমিটির উদ্যোগে সমগ্র দেশ থেকে ৮৫ জন শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখ উপস্থিত হন। উক্ত সম্মেলনে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ' নামে একটি অরাজনৈতিক ঐক্য সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য ৬৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি' গঠন করা হয়। উপজেলাভিত্তিক আহ্বায়ক কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি'ও গঠিত হয়। তিনি এ সংগঠনের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং কেন্দ্রীয় সাদারাতের মুখপাত্র ছিলেন।[২০১]

কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর সভাপতিত্বে ঢাকার 'মতিঝিল টিএন্ডটি কলোনী মসজিদে' দুদিনব্যাপী ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন সকাল ১০টায় 'বাংলাদেশ রেডিও' এর প্রখ্যাত কারি মওলানা মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ্ (১৯৪৪–২০১৬ খ্রি.) এর পবিত্র কুর'আন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্‌বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। উদ্‌বোধনী বক্তব্য পেশ করেন মওলানা দেলওয়ার হোসাইন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মাসুম, মওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দিন, সুইহারীর পীর হযরত মওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী, দুধমুখার পীর হযরত মওলানা মুহাম্মদ আবদুল হক, মওলানা মাযহারুল হক, ঢাকা আজিমপুর শাহী মসজিদের ইমাম হযরত মওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, মওলানা ইউসুফ, ছারছিনার পীর হযরত মওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিক, মওলানা সাইয়্যেদ কামাল উদ্দিন জাফরী, মওলানা আবদুল লতিফ, ড. মওলানা লুৎফুর রহমান, মওলানা সিফাত উল্যাহ, অধ্যাপক মওলানা মনিরুজ্জামান ফরিদী, মওলানা জুলফিকার আহমদ কিছমতী, মওলানা আবদুস সাত্তার ইসলামাবাদী ও মওলানা আবদুল মালেক প্রমুখ।[২০২]

উদ্‌বোধনী অধিবেশনের সভাপতি এবং ইত্তেহাদের অন্যতম প্রধান আহ্বায়ক মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বলেন, আমাদের ঐক্যের পথে যে সব ইখতিলাফি বিষয় প্রতিবন্ধক হয়ে আছে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে সে সব ব্যাপারে সকলকে নমনীয় হতে হবে এবং কুর'আন-সুন্নাহ্র[২০৩] নির্দেশিত বিষয়ের

---

২০১. মওলানা আবু সালেহ মুহাম্মদ ছলীমুল্লাহ, 'তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক', *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক শাহ্‌সুফী হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫; রায়হান আজাদ, 'বায়তুশ শরফের প্রধান রূপকার হাদীয়ে জামান শাহ্ সুফী মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)', *শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া*, জানুয়ারি, ২০১৩, পৃ. ২১-২২

২০২. মোহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রাহ. এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮

২০৩. সুন্নাহ্ হলো কুর'আনের পরিপূরক ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে 'ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদিস আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। একবার এক লোক বলল, এগুলো থেকে আমাদের মুক্তি দিন এবং আমাদের কাছে আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে আসুন। তখন 'ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) তাকে বললেন, 'তুমি একটা নির্বোধ। তুমি কি আল্লাহ্র কিতাবে নামায বিস্তারিতরূপে পাবে? তুমি কি আল্লাহ্র কিতাবে রোযা বিস্তারিতরূপে পাবে?

ভিত্তিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের অনৈক্যজনিত দুর্বলতার দরুন এদেশে ইসলামের ক্ষতি হলে দলমত-নির্বিশেষে সকলকেই দায়ী হতে হবে।

মুসলিমগণের ঐক্যের ক্ষেত্রে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছিল, তা 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশে'র অন্যতম মজলিসে সাদারাতের সদস্য আল্লামা দেলওয়ার হোসাইনের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, '১৯৮২–১৯৯০ খ্রি. পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছর ইত্তেহাদুল উম্মাহর দায়িত্ব পালনকালে আমি তাঁর সাহচর্য লাভ করেছি। আমরা দুজন সে সময় ইত্তেহাদুল উম্মাহর দাওয়াত নিয়ে আলিম-উলামাদের এক প্ল্যাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করেছি। দীর্ঘদিনের এ সাহচর্যে আমি উপলব্ধি করেছি, তিনি ছিলেন সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে, উদারপ্রাণ ও মহৎ হৃদয়ের অধিকারী কামিল অলি। তিনি জীবনে কখনও কারও বিরুদ্ধে ফতোয়া দেননি; বরং সবসময় দলমত-নির্বিশেষে সকলকে একই মঞ্চে, একই শামিয়ানার নিচে একত্রিত করার প্রয়াসী ছিলেন।'[২০৪] এ প্রসঙ্গে 'দারুল উলুম আলিয়া মাদ্‌রাসা'র সাবেক মুহাদ্দিস হযরত মওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.) (১৯২১–১৯৮৬ খ্রি.) বলেন,

'কারও চোখের আয়তন ছোটো
আর কারও মন সংকীর্ণ
কিন্তু পীর বায়তুশ শরফ যিনি
তাঁর হেদায়ত সর্বজনীন।'[২০৫]

উল্লেখ্য যে, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঢাকা থেকে কবি মোশাররফ হোসেন খানের সম্পাদনায় *'আল ইত্তেহাদ'* নামে একটি ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিনও বেশ কয়েক বছর প্রকাশিত হয়।[২০৬]

ইত্তেহাদুল উম্মাহ্‌র মূলনীতি

নিম্নে ইত্তেহাদুল উম্মাহ্‌র মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হলো:[২০৭]

কুর'আন এগুলো বিধিবদ্ধ করেছেন এবং সুন্নাহ্ এগুলোর সবিস্তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। দ্র. আবদুর রহমান জালালুদ্দিন সুয়ুতি, *মিফতাহুল জান্নাহ ফিল-ইহতিজাজি বিস-সুন্নাহ* (মদিনা মুনাওয়ারা : আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৮), পৃ. ৫৯; আবু সাঈদ আবদুল করিম ইব্‌ন মুহাম্মদ আস-সাম'আনি, *আদাবুল ইমলা ওয়াল-ইসতিমলা* (জিদ্দা : মাতবা'আতুল মাহমুদিয়্যাহ, ১৯৯৩), পৃ. ১০

২০৪. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, 'স্মরণকালের বৃহত্তম নাগরিক স্মরণসভায় সর্বসম্মত অভিমত, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২

২০৫. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আবু নোমান মুহাম্মদ তারেখ, 'বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.) এর পবিত্র জীবনধারা', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০

২০৬. ড. আওরায়ে কারেমি ও ড. জহিরুদ্দীন বাবর সম্পাদিত, মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, 'ইসলামী ঐক্যের অগ্রপথিক শাহ্ সুফি হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার-পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ', *বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যের অগ্রপথিকগণ* (ঢাকা : ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ২০০৭), পৃ. ৪০

২০৭. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ঃ জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭০-৪৭২

(ক) ব্যাপক ঐক্য সম্পর্কে মূলনীতি

১. মুসলিমগণের কোনো দলকেই ইসলামি ঐক্যে আনতে আপত্তি তোলা যাবে না। 'আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আতে'র অন্তর্ভুক্ত সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

২. যত রকম মত-পার্থক্যই থাকুক, যারা ইসলাম থেকে খারিজ নয়, তাদের সবাইকে এক পতাকার তলে সমবেত করতে হবে।

৩. যদি কোনো একটি মহল ঐক্যে শামিল হওয়ার শর্ত পেশ করে যে, অমুক মহল, ফেরকা বা দলকে বাদ দিতে হবে; তাহলে এমন শর্ত কবুল হবে না; কারণ এভাবে বাদ দেয়ার নীতি গ্রহণ করলে পূর্ণ ঐক্য হতে পারে না।

৪. শুধু 'উলামা ও মাশায়েখের ঐক্যই যথেষ্ট নয়। সকল শ্রেণি-পেশার মুসলিমকেই ঐক্যে শরিক হওয়ার সুযোগ দিতে হবে; যাতে মুসলিম উম্মাহ্র সত্যিকার ঐক্য সৃষ্টি হয়।

৫. হানাফি ও আহলে হাদিস, দেওবন্দি, বেরলভি, আলিয়া ও কওমি ইত্যাদি নামে যত বিভেদই থাকুক, ইত্তেহাদুল উম্মাহ্কে সবাইকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ইত্তেহাদুল উম্মাহর নেতৃত্বের ব্যাপারে মূলনীতি ও আদর্শ

১. সকল মহলের প্রতিনিধিদের মুসলিম উম্মাতের সামগ্রিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে।

২. 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ্'তে সকল মহলের নেতাদের ঐক্যের ফলে যখন সম্মিলিত নেতৃত্ব সৃষ্টি হবে তখন সর্বসম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো এক ব্যক্তিকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়া যাবে।

৩. সব সময়ই বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে, যাতে কোনো অবস্থাতেই নেতৃত্বের জন্য কোনো রকম প্রতিযোগিতা বা কোন্দলের পরিবেশ সৃষ্টি হতে না পারে।

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে মূলনীতি

১. প্রত্যেক সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করতে হবে।

২. প্রত্যেক বিষয়ে অধিকাংশ মতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৩. ইখতিলাফি বিষয়ে কোনো এক মতের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না।

(ঘ) বিভিন্ন মত, পথ ও দলের মর্যাদা সম্পর্কে মূলনীতি

১. 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ্'র প্লাটফর্মে কোনো এক দলের কোনো প্রাধান্য থাকবে না। এখানে শরিক সবারই মর্যাদা সমান।

২. প্রত্যেক দলের লোক নিজস্ব সংগঠনের কাজ আগের মতই স্বাধীনভাবে চালিয়ে যেতে পারবেন।

(ঙ) রাজনৈতিক বিষয়ে মূলনীতি

১. ইত্তেহাদুল উম্মাহ্ কোনো রাজনৈতিক সংগঠন না হলেও এতে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি গ্রহণ করা যাবে।

২. যে সব রাজনৈতিক দল ইসলামের স্বার্থে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ্'তে শরিক হবেন, তারা নিজস্ব দলীয় কর্মসূচি আগের মতো চালিয়ে যেতে পারবেন।

৩. ইত্তেহাদুল উম্মাহ্ সরাসরি নির্বাচনে কোনো প্রার্থী দাঁড় করাবে না; কিন্তু নির্বাচনের সময় ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে সে উদ্দেশ্যে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারবে।

এ সংগঠনের উদ্দেশ্য

দীন ইসলামের সমস্ত মুসলিম সেবককে একটি প্ল্যাটফর্মে সমবেত করে সত্যিকার ইসলামি ঐক্য সৃষ্টি করাই এ সংগঠনের মহান উদ্দেশ্য।

পাঁচদফা কর্মসূচি

'আল আমর বিল মারুফ, ওয়ান নাহি আনিল মুনকার' এর যে মহান দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা ও রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মদির ওপর অর্পণ করা হয়েছে, সেই দীনি দায়িত্ব পালনই এ সংগঠনের কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আসল উদ্দেশ্য হলো প্রচলিত ইসলামবিরোধী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে পুরোপুরি ইসলামি ছাঁচে রূপান্তরিত করা। এ মহান উদ্দেশ্য সাধনের প্রস্তুতিস্বরূপ এ সংগঠন ইসলাম ও মুসলিম জাতির প্রতিনিধি হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নলিখিত ৫ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে:

১. ইসলামের যে সব বিষয়ে 'উলামাগণের মধ্যে মতভেদ নেই সে সব বিষয়ের তালিকা প্রকাশ করবে। এতে প্রমাণিত হবে যে, কুর'আন-সুন্নাহ্র ভিত্তিতে মুসলিমগণ ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে ইসলামি বিধানে মৌলিক কোনো মতভেদ নেই। এর ফলে মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং জাহেলিয়াত ও বিদ্'আতের শক্তি খর্ব হবে।

২. দেশের সরকার যা কিছু করছে তা ইসলামের দৃষ্টিতে বিবেচনা করে সঠিক বক্তব্য পেশ করবে। সরকার ভুল করলে তা সংশোধনে ঐক্যবদ্ধ রায় প্রকাশ করলে সরকার সহজে তা অমান্য করার সাহস করবে না।

৩. যারা দেশ শাসন করেন এবং যারা শাসন ক্ষমতায় আসতে চান তাদেরকে ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করবে, যাতে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা তাওহিদি জনতার ভাবানুভূতির বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে।

৪. সকল দীনি সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভালো সম্পর্ক সৃষ্টি ও বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা চালাবে এবং কোথাও বিরোধ দেখা দিলে মীমাংসায় পৌঁছাতে সাহায্য করবে। এখ্তেলাফি (মতপার্থক্য) বিষয়ে যাতে এ'তেদালের (মধ্যপন্থা) সীমা বজায় থাকে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সহযোগিতা করবে এবং পারস্পরিক মুখালিফাতের (মতবিরোধ) ফলে জনগণের নিকট ইসলামের মর্যাদা যাতে নষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ রাখবে।

৫. কুর'আন ও সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে যে সমস্ত কার্যকলাপ মুসলিমগণের ঈমান-আকিদাহ্ ও 'আমল-আখলাক বিনষ্ট করে সে সব যাতে সমাজে চালু থাকতে না পারে সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন কারণে 'ইত্তেহাদুল উম্মাহ বাংলাদেশ' এর কার্যকারিতা স্থবির হয়ে গেলেও তিনি 'আলিম সমাজের ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং তাঁদের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করার জন্য ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে 'মজলিসুল 'উলামা বাংলাদেশ' নামে নতুন আরেকটি প্ল্যাটফরম গঠন করেন।[২০৮] তাছাড়া স্থানীয় ছাত্র ও তরুণ সমাজকে নিয়ে 'আন্জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' এর সহযোগী সংগঠন হিসেবে ১৯

২০৮. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ঃ জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

এপ্রিল, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে 'আন্জুমনে নওজোয়ান বাংলাদেশ' নামে আর একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক নিঃস্বার্থ সমাজসেবী যুব কাফেলা প্রতিষ্ঠা করেন।[২০৯] নিম্নে সেগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো:

২. মজলিসুল 'উলামা বাংলাদেশ

পারস্পরিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আলিমগণকে এক প্ল্যাটফর্মে সমবেত করে সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের চেতনা জাগ্রত করা এবং শান্তিপূর্ণ পন্থায় নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহ্র দীনি ও ঈমানি অধিকার আদায় ও সংরক্ষণ করার নিমিত্তে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) একটি চমৎকার কর্মপন্থা আবিষ্কার করেন। তাহলো, 'আল-ইত্তেহাদ মা'আল-ইখতিলাফ' অর্থাৎ মতবিরোধসহ ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। ২৮ নভেম্বর, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'মজলিসুল 'উলামা বাংলাদেশ' নামে একটি অরাজনৈতিক ও ইসলামি ঐক্যপ্রয়াসী সেবামূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আমৃত্যু এ সংগঠনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।[২১০] তিনি ইন্তিকাল করলে তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি বাহরুল উলুম মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন (রহ.) এ সংগঠনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মওলানা আবদুল হাই নদভী।

মরহুম পীর মওলানা কুতুব উদ্দীনের সুযোগ্য নেতৃত্বে ২০০২ ও ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফে 'উলামা মাশায়েখের এক বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[২১১] তাছাড়া প্রতিবছর লোহাগাড়া থানার আখতরাবাদ (কুমিরাঘোনা) বায়তুশ শরফে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ইছালে সওয়াব মাহফিল এবং কক্সবাজার বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত ফাতেহায়ে ইয়াজদাহুম উপলক্ষ্যে 'মজলিসুল 'উলামা বাংলাদেশ' এর সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বায়তুশ শরফের প্রতিটি ধর্মীয় কাজে মজলিসুল 'উলামার সদস্যগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

নিম্নে সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হলো:[২১২]

১. দীন ও ঈমানের স্বার্থে 'উলামায়ে কিরামকে ঐক্যবদ্ধ করা।
২. সমাজের দরিদ্র, দুঃখী ও অভাবগ্রস্ত জনগণের সেবার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।
৩. দেশের 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে ইখতেলাফের দরুন যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে পরস্পর বসে তা কমানোর চেষ্টা করা।
৪. ইসলাম ও জাতির স্বার্থে প্রয়োজনে 'ইত্তেহাদ মা'আল ইখতেলাফ' কায়েম করা।
৫. এ সংগঠন কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক রাখবে না বা অঙ্গ সংগঠন হিসেবেও কাজ করবে না; অবশ্য সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে সরকারি-বেসরকারি সকল শ্রেণির লোকের

---

২০৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্ভী সম্পাদিত, ড. মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, 'তিনি ছিলেন সুন্নতে মুহাম্মদীর নির্ভেজাল নমুনা', *ইসলামি রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

২১০. মুহাম্মদ আহসান উল্লাহ, 'মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার: জীবন ও কর্ম', *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক শাহ্সুফী হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার রহ.*, মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্ভী সম্পাদিত,(চট্টগ্রাম: শাহ্ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী, ডিসেম্বর ২০০৫) পৃ. ৩১

২১১. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ (রচনা ও সম্পা.), মজলিসুল 'উলামা বাংলাদেশ, *বায়তুশ শরফের আয়না*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

২১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

নিকট হেদায়াতের বাণী পৌঁছে দেয়ার ভূমিকা পালনে সচেষ্ট থেকে আর্তমানবতার সেবা এবং ইসলামি ঐক্য প্রয়াসে নিজস্ব সংবিধান মোতাবেক পরিচালিত হবে।

৬. এ সংগঠনের কার্যক্রম প্রথমে বাংলাদেশে এবং পরবর্তীকালে বহির্বিশ্বে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস চালানো হবে।

কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ

বর্তমানে দায়িত্বরত 'মজলিসুল 'উলামা বাংলাদেশ'-এর 'কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদে'র সদস্যবৃন্দের তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো:[২১৩]

ক্রম	নাম	পদবি	ঠিকানা
০১	আল্লামা শায়খ আবদুল হাই নদভী (মা. যি. আ.)	সভাপতি	পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম
০২	মওলানা জাফর আহমদ	সহ-সভাপতি	খতিব, মসজিদ বায়তুশ শরফ, ফার্মগেট, ঢাকা
০৩	ফখরুল ইসলাম নিজামী	সহ-সভাপতি	পীরবাড়ি, সুফিয়া, মিরসরাই, চট্টগ্রাম
০৪	হাফেয মুহাম্মদ ইসহাক	সহ-সভাপতি	খতিব, বদরপাতি জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম
০৫	মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ নূরী	মহাসচিব	খতিব, স্টেশন রোড জামে মসজিদ, চট্টগ্রাম
০৬	আবু সালেহ মুহাম্মদ ছলিম উল্লাহ্	যুগ্ম-সচিব	অধ্যক্ষ, পতেঙ্গা ইসলামিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা
০৭	মওলানা আবু হানিফা মুহাম্মদ নোমান	যুগ্ম-সচিব	সহকারী অধ্যাপক, কাট্টলী জাকেরুল উলুম ফাযিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম
০৮	মুহাম্মদ আবদুল হালিম হেলালী	সাংগঠনিক সম্পাদক	সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম
০৯	আহমদুর রহমান নদভী	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	মুহাদ্দিস, দারুল উলুম কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম
১০	মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম	শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক	উপাধ্যক্ষ, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম
১১	মওলানা শাব্বির আহমদ	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	সহকারী অধ্যাপক, চরন্দ্বীপ রজভীয়া ফাযিল মাদ্রাসা, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম
১২	মুহাম্মদ আবদুল কাদের নিজামী	সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	মুহাদ্দিস, গারাংগিয়া কামিল মাদ্রাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

২১৩. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, 'মজলিসুল ওলামা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২০-২০২৩ সেশন', *মাসিক শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া*, ২২ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২০২০, পৃ. ৭৩

১৩	মুহাম্মদ ইলিয়াছ	অর্থ সম্পাদক	খতিব, হক সাহেব জামে মসজিদ, নারিকেল তলা, দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম
১৪	ড. মওলানা মাহমুদুল হক ওসমানী	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	উপাধ্যক্ষ, লোহাগাড়া ইসলামিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম
১৫	মওলানা ওসমান গণী	সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক	উপাধ্যক্ষ, আধুনগর ইসলামিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম
১৬	কাজী জাফর আহমদ	সদস্য	সাবেক খতিব, বিপ্লব উদ্যান জামে মসজিদ, ২ নং গেইট, চট্টগ্রাম
১৭	মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী	সদস্য	উপাধ্যক্ষ, দারুল উলুম কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম
১৮	আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক	সদস্য	সাবেক বিভাগীয় পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চট্টগ্রাম
১৯	মুহাম্মদ আবু তাহের	সদস্য	সহকারী অধ্যাপক, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম
২০	সিরাজুল হক নদভী	সদস্য	সহকারী মওলানা, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম
২১	হেফাজত উল্লাহ্ নদভী	সদস্য	অধ্যক্ষ, আলমাছিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, কক্সবাজার।

উল্লেখ্য, তিনি আলিমগণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি সর্বশ্রেণির মানুষ ও উম্মতের ঐক্যের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। বিশ্বমুসলিম ঐক্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের অংশ হিসেবে প্রতিবছর তিনি হজ পালন করতেন। সেখানে তিনি মুসলিম দেশের নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করতেন। লন্ডন, ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশ সফর করে সেখানেও নতুন মুসলিম সৃষ্টি এবং মুসলিম উম্মাহর সংহতি বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

৩. আন্‌জুমনে নওজোয়ান বাংলাদেশ

ইতিহাসের সকল কল্যাণ সুন্দর ও ঐতিহ্যের রূপকার হলো তরুণরা। প্রৌঢ়ের প্রজ্ঞা এবং বৃদ্ধের পরামর্শ তরুণদের পথ দেখিয়েছে ও সাহস জুগিয়েছে। কঠিন সুউচ্চ পর্বতশ্রেণি আর গহিন জঙ্গল কেটে; সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মাড়িয়ে আকাশের নীলিমা ছাড়িয়ে জলে-স্থলে-অন্তরিক্ষে পথ রচনার কাজটি তরুণদেরই করতে হয়েছে। আর্তের সেবা করা, অত্যাচারীকে বাধা দেয়া, উৎপীড়িতকে সাহায্য করা এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা তরুণের ধর্ম। এজন্য রাসুলুল্লাহ্ (সা.) তরুণ ও যুবকদের নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল'[২১৪] নামে একটি সেবামূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সর্বযুগে সর্বকালের মুসলিম

২১৪. হরবুল ফুজ্জার এর বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত এবং 'আস ইবনে ওয়ায়েল যোবায়ের গোত্রের জনৈক ব্যক্তির কিছু জিনিস ক্রয় করে মূল্য পরিশোধ না করায় মর্মাহত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এ আত্মঘাতী যুদ্ধ বন্ধ করা এবং অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে সাধারণ জনগণকে রক্ষার নিমিত্তে ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে একটি শান্তি কমিটি গঠন করেন; যা ইতিহাসে 'হিলফুল ফুযুল' নামে পরিচিত। 'হিলফুল ফুযুলে'র মূলমন্ত্র ছিল, 'সমবেত জনগণ আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে এ

তরুণ ও যুবকদের জন্য সমাজসেবা ও দেশ গঠনের উত্তম আদর্শ। সেই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) 'আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ' এর সহযোগী সংগঠন হিসেবে তরুণ সমাজকে নিয়ে ১৯ এপ্রিল, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'আন্‌জুমনে নওজোয়ান বাংলাদেশ' নামে একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক নিঃস্বার্থ সমাজেসেবী যুব কাফেলা।[২১৫]

এ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ছাত্র ও যুবসমাজকে ইসলামি শরি'আহ্ ও তরিকতের নিয়ম মোতাবেক সংগঠিত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রাসুল (সা.) এর মুহাব্বত লাভ এবং ইসলামের আদর্শে দেশ ও সমাজের পরিবর্তন সাধন করা এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কর্মসূচি

নিম্নে এ সংগঠনের কর্মসূচি উল্লেখ করা হলো:[২১৬]

১. **সংগঠন :** ইল্‌ম, 'আমল ও আখলাকের সমন্বয় সাধন করে আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা ও রাসুল (সা.)-এর সত্যিকার উম্মত হওয়ার জন্য ছাত্র ও যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করা।

২. **তাযকিয়া, তা'লিম ও তরবিয়ত :** সংগঠিত তরুণদেরকে তা'লিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে অজ্ঞতার অভিশাপমুক্ত করে আত্মশুদ্ধির জন্য তরিকতের নির্দেশিত পথে পরিচালনা করা এবং গোটা সমাজে এই প্রচেষ্টা সম্প্রসারিত করা।

৩. **আমর বিল মা'রুফ ওয়া নাহি 'আনিল মুনকার :** মুসলিম সমাজের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিধানাবলি যুবসমাজের মাঝে ব্যাপকভাবে চেতনা সৃষ্টি করা এবং তদানুযায়ী সমাজ সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো।

৪. **ইসলামের প্রচার ও প্রসার :** মুসলিমগণকে ইসলামের মর্মবাণী ভালোভাবে বোঝানো এবং তা 'আমল করার জন্য উৎসাহিত করা। অমুসলিমগণের মাঝেও তাওহিদের অমিয় বাণী সুন্দর ও যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরা। সর্বোপরি, মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো।

৫. **খেদমতে খালক :** বেকার, অসহায় ও বিধবাদের সেবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য করা, অভাবী যুবক ও ছাত্রদের সার্বিক সহযোগিতা ও নিরক্ষর শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের অক্ষরজ্ঞান দানের ব্যবস্থা করা।

মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, তারা উৎপীড়িত ও অত্যাচারিতদের পক্ষাবলম্বন করবেন এবং অত্যাচারীর নিকট হতে জনগণের স্বাধিকার আদায় না করে ক্ষান্ত হবেন না। যতদিন সমুদ্রে একটি পশম সিক্ত করার মতো পানি অবশিষ্ট থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা বলবৎ থাকবে।' রাসুল (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পরও এ শান্তি কমিটির কার্যকারিতা লক্ষ করা গিয়েছিল। দ্র. আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, খাদিজা আখতার রেজায়ী অনূদিত, *আর রাহীকুল মাখতুম* (ঢাকা : আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, ২০০০), পৃ. ৮১-৮২

২১৫. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, ড. মুহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, 'তিনি ছিলেন সুন্নতে মুহাম্মদীর নির্ভেজাল নমুনা', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

২১৬. সংবিধান, *আন্‌জুমনে নওজোয়ান*, বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম।

সাংগঠনিক বিস্তৃতি

ইতোমধ্যে উক্ত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছে। অদূর ভবিষ্যতে এ সংগঠনের শাখা বাংলাদেশের সর্বত্র, এমনকি বহির্বিশ্বেও বিস্তৃতি লাভ করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। 'আন্‌জুমনে নওজোয়ান' প্রতিষ্ঠার পর রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক সেবামূলক কাজে নওজোয়ান সদস্যরা অংশগ্রহণ করে ব্যাপক সুনাম লাভ করেছে।

কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ

বর্তমানে দায়িত্বরত 'আন্‌জুমনে নওজোয়ান বাংলাদেশ'-এর 'কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদে'র তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো:[২১৭]

ক্রম	নাম	পদবি
০১	হাফেয মওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম	সভাপতি
০২	মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম	সহ-সভাপতি
০৩	হাফেয ডা. মুজিবুল হক	সহ-সভাপতি
০৪	হাফেয মও. মুহাম্মদ মফিজ উদ্দিন	সাধারণ সম্পাদক
০৫	হাফেয মওলানা মুহাম্মদ শাহ্ আলম	সহ-সাধারণ সম্পাদক
০৬	শাহ্ আজিজুর রহমান	সহ-সাধারণ সম্পাদক
০৭	মঈন উদ্দিন আহমদ চৌধুরী	সাংগঠনিক সম্পাদক
০৮	মুহাম্মদ দিদারুল আলম	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
০৯	রিদওয়ানুল হক জুনুন	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক
১০	কাজী সিরাজ উদ্দিন ইমামী	অর্থ সম্পাদক
১১	মুহাম্মদ ইমরানুল ইসলাম	সহ-অর্থ সম্পাদক
১২	মুহাম্মদ ইউসুফ	প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক
১৩	সরফুদ্দীন মোহাম্মদ জাহেদ	সহ-প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক
১৪	মুহাম্মদ এহছানুল হক মিলন	সহ-প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক
১৫	মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন	সমাজকল্যাণ সম্পাদক
১৬	মুহাম্মদ আবুল মোকার্‌রম টিপু	সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক
১৭	রোকন উদ্দিন মুহাম্মদ আবদুল আহাদ	সহ-সমাজকল্যাণ সম্পাদক
১৮	মুহাম্মদ আবদুল আজিজ	শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
১৯	সিরাজুল মোস্তাজিব	সহ-শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক
২০	নাঈম উদ্দিন মু. আবদুল মাজেদ	তথ্য ও দপ্তর সম্পাদক
২১	মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ	সহ-তথ্য ও দপ্তর সম্পাদক
২২	মুহাম্মদ মিজানুর রহমান রায়হান	ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
২৩	হাফেয মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক	সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক
২৪	ডা. মুহাম্মদ ইলিয়াছ	স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক

২১৭. *মাসিক শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া*, ২২ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি., পৃ. ৭১-৭৩

২৫	মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল	তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক
২৬	মুহাম্মদ আবু সালেহ মোতালিব	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
২৭	মুহাম্মদ মিসবাহ উল হক	সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
২৮	মুহাম্মদ নূরুল হক	কার্যকরী সদস্য
২৯	মুহাম্মদ শরফুদ্দিন মু. তৌহিদুল ইসলাম	কার্যকরী সদস্য
৩০	মাহবুবুল আলম	সদস্য
৩১	মুহাম্মদ জুনায়েদ হায়দার	সদস্য
৩২	মুহাম্মদ অহিদুল ইসলাম	সদস্য
৩৩	মুহাম্মদ শাহ্জাহান	সদস্য
৩৪	মুহাম্মদ মিসবাহ উদ্দিন শাহেদ	সদস্য
৩৫	হাফেয মুহাম্মদ ফয়েজ	সদস্য
৩৬	মুহাম্মদ সোহাইল উদ্দিন	সদস্য
৩৭	কমরুদ্দীন মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম	সদস্য
৩৮	মুহাম্মদ সাহাব উদ্দিন	সদস্য
৩৯	হাফেয আবদুল কাদের মু. ফয়সাল	সদস্য
৪০	মুহাম্মদ যাইনুদ্দীন সাহাল	সদস্য
৪১	আহমদ হোসাইন	সদস্য

উল্লেখ্য, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ইন্তিকালের পর 'আন্জুমনে নওজোয়ান ঢাকা শাখা'র উদ্যোগে ১ মে, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের 'আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে' এক স্মরণসভা ও দু'আ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এ সভায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে'র বিভিন্ন বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে ২৬ জুন, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে '*রাহনুমা*' নামে একটি স্মরণিকাও প্রকাশ করা হয়।

(খ) নীতিভিত্তিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ

ইসলাম একটি সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে এর উত্তম দিক-নির্দেশনা। পারিবারিক জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই ইসলামের সুশীতল ছায়া বিস্তৃত। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) যুগসচেতন একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা ও চেতনাবোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতির পথে ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে ইসলামি সমাজব্যবস্থা[২১৮] গড়ার প্রচেষ্টা চালান। তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামি অনুশাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হিকমতের সাথে গঠনমূলক তৎপরতা চালিয়েছেন। তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত

২১৮. ইসলামি রীতি-নীতি, আইন-কানুন ও বিধি-বিধান দ্বারা যে সমাজ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাই ইসলামি সমাজব্যবস্থা। দ্র. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ* (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৫), পৃ. ২৩

করেছে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভি[২১৯] (রহ.) (১৭০৩–১৭৬২ খ্রি.)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি الدين والسياسة أخوان توأمان অর্থাৎ 'দীন এবং রাজনীতি দুটি যমজ সন্তান'। তাই ব্যক্তিজীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা ঈমানের অপরিহার্য দাবি।

তিনি ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার পাশ্চাত্য অপপ্রচারের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিলেন। তিনি 'উলামায়ে কিরামকে রাজনীতির প্রতি উৎসাহিত করতেন। তিনি সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত না থাকলেও ইসলামি শাসনতন্ত্র কায়েম আন্দোলনে যারা বদ্ধপরিকর তাদের নিকটতম অভিভাবক ছিলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে না জড়ালেও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর পরোক্ষ সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।[২২০]

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ইসলামি আদর্শ সমাজে কায়েম করাকে ইসলামের অন্যতম খিদমত হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ আমাদের প্রিয় নবি (সা.) ও তাঁর চার খলিফা করেছেন। কাজেই ইসলামি আন্দোলন করা, ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো এবং শাসকদের সামনে সত্য কথা বলা, এগুলো ইসলামি রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[২২১] মওলানা আতহার আলী (রহ.) (১৮৯১–১৯৭৬ খ্রি.), মওলানা মুসলেহ উদ্দীন (রহ.) ও খতিবে আ'জম মওলানা সিদ্দিক আহমদ (রহ.) (১৯০৩–১৯৮৭ খ্রি.) প্রমুখ তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন।[২২২]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ইসলামি সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য বিভিন্ন সময় নানান কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এর অংশ হিসেবে ১৩ মার্চ, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের প্রখ্যাত 'আলিম, ইসলামি চিন্তাবিদ এবং পীর-মাশায়েখদের আহ্বানে ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঢাকার মতিঝিল শাপলা চত্বরে মহাসমাবেশে তিনি প্রায় দুই সহস্রাধিক ভক্ত-মুরিদ নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে যোগদান করেন। জুমু'আর সালাত শেষে হাজার হাজার মুসল্লি 'বায়তুল মোকার্‌রম জাতীয় মসজিদ' থেকে শাপলা চত্বরের দিকে এগিয়ে যায় এবং 'জাতীয় প্রেস ক্লাবে'র সম্মুখে জমায়েত হয়। অনুষ্ঠান চলাকালে পুলিশ শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক (১৯১৯–২০১২ খ্রি.) এবং মওলানা মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে।

---

২১৯. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) দিল্লির সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আবুল ফাইয়্যাদ আহমদ কুতুব উদ্দিন। পাঁচ বছর বয়সে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর পনেরো বছর বয়সে তিনি আরবি ও ফারসি ভাষা শেখার পাশাপাশি তাফসির, হাদিস, ফিক্‌হ, মানতিক, কালাম, তাসাওউফ, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন ও জ্যামিতি ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করেন। ১৭১৯ খ্রিষ্টাব্দে পিতার ইন্তিকালের পর মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। তিনি মুসলিমগণকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং এর মাধ্যমে দা'ওয়াত দেন। তিনি ইসলামকে বিপ্লবী ধর্ম হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি প্রায় দু'শত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ *'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'*। তিনি আধ্যাত্মিক জগতেরও মহান সাধক ছিলেন। দীর্ঘকাল মানবকল্যাণে রত থাকার পর তিনি ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৯৭

২২০. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০

২২১. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আবু ছালেহ মুহাম্মদ ছলীমুল্লাহ্, 'ইসলামী ঐক্যের মূর্তপ্রতীক', *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

২২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকারের পেটুয়া পুলিশবাহিনী মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কে গ্রেফতার করতে উদ্যত হলে তিনি প্রেসক্লাবের সামনে রাস্তায় আসরের নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান। তাঁর পেছনে হাজার-হাজার মুসল্লিও কাতারবন্দি হয়ে গেলে পুলিশ অফিসারগণ অবশেষে তাঁকে বাসায় গিয়ে নামায পড়ার অনুরোধ জানান। ফলে তিনি সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে ফার্মগেটস্থ 'বায়তুশ শরফ মসজিদে' এসে আসরের নামায আদায় করেন। স্মর্তব্য যে, কুর'আনি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি উদার হস্তে ধন-সম্পদ ব্যয় করেছেন, তেমনি জানও কুরবানিও দিয়েছেন। কুর'আনি শাসন প্রতিষ্ঠার দাবীতে মিছিল করতে গিয়ে তাঁর ২য় পুত্র হাফেয আবদুল রহিম চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে শাহাদাত বরণ করেন।[২২৩]

'ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলনে'র মিছিলে দেশের প্রখ্যাত আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণের ওপর গণবিরোধী স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পৈশাচিক পুলিশি হামলা চালায়। এর প্রতিবাদে ১৯ মার্চ, ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জোহরের নামাযের পর মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর নেতৃত্বে 'চট্টগ্রাম শাহী জামে' মসজিদে' এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আওলাদে রাসুল সৈয়দ আবদুল আহাদ আল-মাদানী (রহ.) এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন,

> 'ইসলামি শাসনতন্ত্র কায়েম করা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমগণের প্রাণের দাবি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, 'আমি রাজনীতি করি না, আমার কোনো রাজনৈতিক দল নেই, গদি দখল বা সরকার বদল আমাদের উদ্দেশ্য নয়; মুসলিমগণকে সমাজের যাবতীয় অত্যাচার, অনাচার এবং যুলুম[২২৪]-নির্যাতন থেকে একমাত্র ইসলামি শাসনব্যবস্থাই রক্ষা করতে পারে।'[২২৫]

তিনি ঐক্যের ডাক দিয়ে বলেন,

> 'এককভাবে নয়, সমস্ত ইসলামপন্থি দল একত্রিত হয়ে ইসলামি শাসনতন্ত্রের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হলেই কেবল এ দেশে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব হবে। অন্যতায়, তা সুদূর পরাহত।'[২২৬]

দীনের তা'লিম ও তাযকিয়ায়ে নফসের সাথে সাথে দীনের আদর্শকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠার জন্য মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর চেষ্টা ছিল বিরামহীন। রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আগে তিনি সামাজিক বিপ্লবের কাজ শুরু করেন। সমাজ সংশোধন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। আজকের যুগে অগ্রসর হওয়ার এটি একটি বড়ো কৌশল বা পদ্ধতি।

---

২২৩. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন'* পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

২২৪. যুলুম শব্দটি বাবে দারাবা এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ অত্যাচার করা, যুলুম করা, নির্যাতন করা, নিপীড়ন করা, অন্যায় আচরণ করা ও দুর্ব্যবহার করা। দ্র. ড. আহমদ মুখতার, মু'জামুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ আল-মু'আসিরাহ (বৈরুত : দারু 'আলামিল কুতুব, ২০০৮), খ.২, পৃ. ১৪৩৮; তাছাড়া সত্যচ্যুত হওয়া, সীমালঙ্ঘন করা, নিপীড়ন করা, কোনো বস্তুকে তার স্থানে না রেখে অন্য স্থানে রাখা ইত্যাদি। দ্র. ইব্‌ন মনযুর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত : দারু সাদির, ৩০ সংস্করণ, ১৯৯৩), খ.১২, পৃ. ৩৭৩; ইমাম রাগেব আল-ইস্পাহানি (রহ.) বলেন, কোনো বস্তুকে তার নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে রাখা, হয়ত ত্রুটি করবে বা বৃদ্ধি করবে কিংবা তার নির্দিষ্ট সময় বা স্থান ব্যতীত অন্য সময় বা স্থানে রাখা। দ্র. আবুল হুসাইন রাগিব, *আল-মুফরাদাত ফি গরীবিল কুর'আন* (দিমাশ্‌ক : দারুল কালাম, ১৯৯১), পৃ. ৫৩৭

২২৫. মোহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রাহ. এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

২২৬. *দৈনিক আজাদী*, 'ইসলামী শাসন কায়েমে ঐক্যের আহ্বান', ২১ মার্চ, ১৯৮৭; মোহাম্মদ শাহজাহান, *পীর এ বায়তুশ শরফ শাহ আবদুল জব্বার রাহ. এর পবিত্র জীবন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

উল্লেখ্য যে, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন ‘ইরানে ইসলামি বিপ্লবে’র একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষী। বিংশ শতাব্দীর সফল বিপ্লবী ও রাষ্ট্রনায়ক আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেইনি (১৯০২–১৯৮৯ খ্রি.) (রহ.)-এর প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তিনি তাঁর ভক্তবৃন্দের সামনে ইমাম খোমেনিকে তরিকতের অনুসারী ‘রুহানী পীর’ বলে সম্বোধন করেন। তাঁর অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা বারবার বলতেন। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ইরানি প্রেসিডেন্ট আয়াতুল্লাহ্ রাফসানজানি (১৯৪৩–২০১৭ খ্রি.) বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফরে এলে ওলামা সম্মেলনে তিনি শত শত আলেমকে সঙ্গে নিয়ে মান্যবর রাফসানজানির সাথে গুলশানস্থ ইরানি দূতাবাস প্রাঙ্গণে সাক্ষাৎ করেন; একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিমিশ্রিত আলাপচারিতায় মেঠে ওঠেন। একই জামা‘আতে মাগরিবের নামায আদায় করেন।[২২৭]

এভাবে বিভিন্ন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে মুসলিমগণকে ঐক্যবদ্ধ করার নিমিত্তে তিনি টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া এবং রূপসা থেকে পাথুরিয়া পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়ে ছিলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা শতভাগ সফল না-হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা আশার আলো জ্বালিয়েছে।

---

২২৭. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শির্ক-বিদ্‘আতমুক্ত সমাজ গঠন ও ইসলামের মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা

খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষের দিকে এদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। পরবর্তীতে পীর-আউলিয়াদের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের বিস্তৃতি লাভ করে। তাদের হাতে অসংখ্য হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান ইসলাম গ্রহণ করায় স্বাভাবিকভাবেই তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের রীতি-নীতি ইসলামে প্রবেশ করে। ফলে ইসলামে শির্ক-বিদ্‘আতসহ নানান ধরনের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের অনুপ্রবেশ ঘটে। একপর্যায়ে এগুলো ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানের সাথে এমনভাবে মিশে যায় যে, কোন্‌টি ইসলামের মৌলিক বিধান তা পার্থক্য করা সাধারণ মুসলিমের পক্ষে কষ্ঠসাধ্য হয়ে পড়ে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সমাজে বিরাজমান এ ধরনের শির্ক ও বিদ্‘আতের বিরুদ্ধে আজীবন সোচ্চার ছিলেন। তাছাড়া তাঁর সময়কার ইসলাম বিদ্বেষীদের দ্বারা ইসলাম যতবারই আক্রান্ত হয়েছে, তিনি ততবারই তাদের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-মিটিং এর মাধ্যমে তা প্রতিহত করে ঈমানি দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছেন।

(ক) শির্ক-বিদ্‘আতমুক্ত সমাজ গঠন

সৎ কাজের আদেশ দান করা ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা দীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কেউ কেউ একে ইসলামের ষষ্ঠ রুকন হিসেবে গণ্য করেছেন।[২২৮] প্রত্যেক মু’মিনই অপর মু’মিন ভাইয়ের সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে নিজ নিজ সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী এ দায়িত্ব পালন করে যাবে। এটাই হলো তার প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবি; অর্থাৎ একজন মু’মিনের নিজে চরিত্র ও কার্যকলাপ সংশোধনের পাশাপাশি অন্যের চরিত্র ও কার্যকলাপ সংশোধনের জন্যও চেষ্টা চালাতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন,

> مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
>
> অর্থাৎ ‘তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো অন্যায় হতে দেখবে, সে যেন নিজ হাত দ্বারা (অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে) তা পরিবর্তন করে দেয়। যদি সে তা করতে অক্ষম হয়, তবে মুখে তার প্রতিবাদ করবে। যদি সে তাও না পারে, তা হলে সে অন্তত মনে মনে ঘৃণা করবে। আর এটা ঈমানের দুর্বলতম স্তর।’[২২৯]

কখনও কখনও এ দায়িত্ব সামষ্টিকভাবে পালন করতে হয়। এ গুরু দায়িত্ব পালনে উম্মাতের মধ্যে সবসময় এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন, যাদের কাজই হবে লোকদের সত্যের দিকে আহ্বান জানানো, সৎ কাজের আদেশ দেয়া ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

---

২২৮. উসায়মীন, *শারহু রিয়াদিস সালিহীন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

২২৯. মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, বাবুন বয়ানু কুওনিন নাহয়ি ‘আনিল মুনকার মিনাল ঈমান.., হাদিস নং ৭০; আবু দাউদ সুলাইমান ইব্‌ন আশ‘আশ, *আস-সুনান*, হাদিস নং ৯৬৩, ৩৭৭৭; আবু ‘ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদিস নং ২০৯৮; আবু ‘আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদিস নং ১২৬৫, ৪০০৩

অর্থাৎ ‘আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। বস্তুত, এরাই সফলকাম।’[২৩০]

বলাই বাহুল্য, মুসলিম উম্মাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব এ গুরুদায়িত্ব পালনেই মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

অর্থাৎ ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করো, অসৎকাজের নিষেধ করো এবং আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস করো।’[২৩১]

উপরিউক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, সাফল্য, কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য নিজের সংশোধনই যথেষ্ট নয়; বরং অপরের সংশোধনও জরুরি। অতীতের জাতিসমূহের ওপরও এ গুরুদায়িত্ব অর্পিত ছিল। কিন্তু তারা তা যথাযথ পালন না করে শৈথিল্য প্রদর্শন করায় অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

নবি-রাসুলগণ এসেছিলেন শির্ক[২৩২] বিদ্‘আত[২৩৩] বিদূরিত করে আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। হক্কানি পীর মাশায়েখগণ শুধু সাধারণ মানুষকে দীনি তা'লিম দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেন না; বরং পবিত্র কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের সংগ্রাম আজীবন চালিয়ে যান। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামি জীবন-ব্যবস্থার প্রতিফলনে তারা ব্রতী হন। আল্লাহ্‌র পথে মানুষকে ডাকা, কুর’আন ও সুন্নাহ্ নির্দেশিত জীবন-পদ্ধতিতে মানুষকে চলতে উদ্‌বুদ্ধ করাই তাদের কাজ। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)ও শরি‘আত বিরোধী কর্মকাণ্ডকে কখনও প্রশ্রয় দেননি। তিনি নবি-রাসুলগণ ও পীর-আউলিয়াগণের শির্ক-বিদ্‘আত-বিরোধী সংগ্রামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন এবং আমৃত্যু সেই লড়াই চালিয়ে গেছেন। শির্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তিনি

---

২৩০. আল-কুর’আন, ৩ : ১০৪

২৩১. আল-কুর’আন, ৩ : ১১০

২৩২. শিরক শব্দটি الإِشْرَاكُ মাছদার থেকে নির্গত, অর্থ শরিক করা। শিরকের সংজ্ঞার্থ প্রদানে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً وَهُوَ خَلَقَكَ অর্থাৎ ‘আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা অথচ তিনি (আল্লাহ্) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ দ্র. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল বুখারী, *আল-জামি‘আস-সহীহ*, খ.১, বাবুন কওলুহু তা‘আলা ফালা তাজ‘আল্লাহি আনদাদান.., হাদিস নং ৪১১৭, পৃ. ৩৯৪; আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেছেন, الشرك هو أن يتخذ من دون الله نداً يحبه كما يحب الله অর্থাৎ ‘শির্ক হলো আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ গ্রহণ করা এবং আল্লাহ্‌র মতো তাকে ভালোবাসা।’ দ্র. ইবনুল কাইয়্যুম আজ-জওযিয়্যাহ, *মাদারেজুস সালেকীন* (লেবনান : দারুল কিতাবিল ‘আরবি, ২০০৩), খ.১, পৃ. ৩৩৯

২৩৩. বিদ্‘আত আরবি শব্দ। শব্দটি আরবি হলেও সারা দুনিয়ার মুসলিমদের কাছে এটি একটি অতীব পইচিতি পরিভাষা। অর্থ ও প্রয়োগগত দিক থেকে এটি সুন্নাতের বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো, নতুন সৃষ্টি; যার কোনো পূর্বদৃষ্টান্ত ছিল না; ইংরেজিতে যার অনুবাদ করা হয় newness বা নতুনত্ব, novelty বা অভিনবত্ব, unprecedented বা নজিরবিহীন। দ্র. Hans Wehr, *A Dictionary of Modren Written Arabic* (London : 3rd printing, May 1980), p. 46; শরি‘আতের পরিভাষায়, মহান আল্লাহ্ ‘ইবাদাতের যে অবকাঠামো, আকৃতি-প্রকৃতি ও সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তা যথার্থভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে তাঁর রাসুলকে (সা.) তিনি যে পদ্ধতি-প্রণালি, বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া ও বিধি-বিধান শিক্ষা দিয়েছেন, তার নিরিখে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) নিজে যে পন্থায় ‘ইবাদত করেছেন এবং যেভাবে করতে তাঁর উম্মতকে আদেশ করেছেন, এর বাইরে ‘ইবাদতের যত পন্থা পরবর্তীকালে চালু হয়েছে তা-ই বিদ্‘আত। দ্র. ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া, *বিদ্‘আতের পরিচয় ও পরিণাম* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০), পৃ. ৯-১০

ছিলেন চির অজেয় এক সংগ্রামী মহানায়ক। ইসলামের দুঃসাহসী সিপাহসালার শরি'আতবিরোধী কর্মকাণ্ডকে কখনও প্রশ্রয় দেননি কোনো অজুহাতে। যেখানে সম্ভব তাঁর সামর্থ অনুযায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন হেকমতের সাথে।

ইসলাম ও মুসলিম যখনই স্বজাতি কিংবা বিজাতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তখনই দীন ইসলামের মশালকে প্রজ্বলিত করেছেন পীর-মাশায়েখ ও অলি-আবদালরা। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার এবং আজাদি অন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (১১৪৩–১২৩৬ খ্রি.), মোজাদ্দেদে আলফেসানি (১৫৬১–১৬২৪ খ্রি.), শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভি (১৭০৩–১৭৬২ খ্রি.), হযরত শাহজালাল (১২৭১–১৩৪৬ খ্রি.), হযরত খান জাহান আলি (১৩৬৯–১৪৫৯ খ্রি.), শাহ মাখদুম (১২১৬–১৩১৩ খ্রি.), শহিদ আহমদ শহিদ ব্রেলভি (১৭৮৬–১৮৩১ খ্রি), শহিদ তিতুমীর (১৭৮২–১৮৩১ খ্রি.), হাজি শরীয়ত উল্লাহ্ (১৭৮১–১৮৪০ খ্রি.) এবং মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) (১৮৪৫–১৯৩৯ খ্রি.) প্রমুখ আধ্যাত্মিক মুসলিম নেতা ও মুসলিম মুজাহিদের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। এদেরই একজন সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)।

শির্ক-বিদ্'আত এবং কুফর-নাস্তিকতার বিরুদ্ধে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন খড়্গহস্ত। যারা ধর্মের ছদ্মাবরণে নিজেদের আখের গোছাতে যারা ব্যস্ত, তিনি তাদের দীনের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। পীর-আউলিয়া ও ইসলামের নামে যে সব শির্ক-বিদ্'আত ও কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত রয়েছে তার মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি কবরপূজা, মাযারপূজাসহ তথাকথিত 'উরস-এর নামে পুঁজিহীন বআবসার বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। তিনি ওয়ায-নসিহত, বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনীর মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করেন এবং শির্ক-বিদ্'আতমুক্ত সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর শির্ক ও বিদ্'আত প্রতিরোধের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলোঃ

১. চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন বড় হাতিয়ায় ৪০ বছর ধরে বৈশাখ মাসের ১২ ও ১৩ তারিখ জৌলুসপূর্ণভাবে গরুর লড়াই ও বলীখেলা অনুষ্ঠিত হতো। এ খেলায় মদ-জুয়া, সিনেমা থিয়েটার, জেনা-ব্যভিচার ইত্যাদি অসামাজিক ও গর্হিত কার্যকলাপ বেপরোয়াভাবে চলতো। এ খেলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্থানীয় প্রভাবশালী সিদ্দীক আহমদ চৌধুরী। তথ্যসূত্রে জানা যায়, তিনি এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ ধরনের গর্হিত কাজের প্রচলন করেন। স্মর্তব্য যে, তিনি পীর-বুজুর্গদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলও ছিল। বার্ধক্যের কারণে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। ফলশ্রুতিতে, তাঁর জানাযার নামাযের ইমামতি করার জন্য মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে অনুরোধ জানানো হলে তিনি সে অনুরোধ সাদরে গ্রহণ করেন। জানাযার নামাযের জন্য হাজার-হাজার লোক উপস্থিত। নামাযের ইমামের স্থানে তিনি দাঁড়িয়ে হঠাৎ মরহুমের সন্তানদের ডাক দিলেন।

তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, আপনাদের আব্বা ব্যক্তি হিসেবে খুবই ভালো মানুষ ছিলেন কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্যে এই বলীখেলার প্রবর্তন করেছেন মূলত তা আজ শরি'আতবিরোধী কর্মকাণ্ডের আসর হয়ে উঠেছে। কাজেই, এই বলীখেলার মাধ্যমে অর্জিত যাবতীয় পাপ আপনাদের পিতার কবরে অহরহ পৌঁছতে থাকবে। এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলীখেলা ও গরুর লড়াই চিরতরে বন্ধ করে দেয়া। তিনি তাঁর ছেলেদের কাছ থেকে 'এ খেলা ভবিষ্যতে আর আয়োজন করবে না' মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। এরপর সবাইকে নিয়ে জানাযার নামায আদায় করেন। মরহুমের ছেলেরা তাঁর সাথে কৃত

ওয়াদা রক্ষা করেন। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সেই বলীখেলার স্থানে অনুরূপ তারিখে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরাতুন্নবি (সা.) মাহফিলের প্রচলন করেন এবং সেই পাহাড়ি স্থানটির নামকরণ করেন 'জবলে সিরাত।'[২৩৪]

২. চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়ার উপজেলায় শাহ্ পীর আউলিয়া (রহ.)-এর মাযার অবস্থিত। দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর মাযারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় প্রভাবশালীদের নেতৃত্বে বার্ষিক 'উরশের নামে অশ্লীল নাচ, গান ও জুয়ার আসর বসত। সেগুলোকে কেন্দ্র করে বহু লোক শরি'আত বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) স্বীয় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে সেই অনৈসলামিক কর্মকান্ড উচ্ছেদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে তিনি এসব ইসলাম বিরোধী তৎপরতা কঠিন হস্তে দমন করেন এবং সেখানে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সিরাতুন্নবি (সা.) মাহফিলের প্রচলন করেন। সমাগত জনগণকে যিকির-আযকার ও দু'আ মুনাজাতের মাধ্যমে রুহানি তরিকার সুযোগ সৃষ্টি করে তিনি চিরতরে শির্কের উচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। বর্তমানেও এ মাহফিল অব্যাহত রয়েছে।[২৩৫]

৩. খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলায় আরেক আধ্যাত্মিক সাধক হযরত পীর খান জাহান আলি (রহ.)-এর মাযার অবস্থিত। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য দিল্লি থেকে এসেছিলেন। তিনি প্রথমে শাসকরূপে জীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে ধর্মচিন্তা ও জনসেবাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। দুঃস্থ মানুষের মুখে ক্ষুধায় অন্ন বিতরণ, পানিকষ্ট নিবারণের জণ্য অসংখ্য দিঘি খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, হাটবাজার স্থাপন, এবাদতের জন্য অপূর্ব স্থাপত্য সুষমামণ্ডিত অগণিত মসজিদ নির্মাণসহ অসংখ্য কীর্তিরাজি কালের সাক্ষী হয়ে আছে; কিন্তু যুগের পরিক্রমায় মানুষ এসব কীর্তিকে ভুলে গিয়ে তাঁর মাযার ও ষাট গম্বুজ মসজিদকে কেন্দ্র করে নানান ধরনের শরি'আত বিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে 'চৈত্র পূর্ণিমা' নামে ৩ দিন মেলা যুগ-যুগ ধরে চলে আসছিল। এ মেলায় শির্ক, বিদ্'আত ও অসামাজিক শরি'আত বিরোধী কার্যকলাপ চলত।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) স্থানীয় বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় এই মহান অলির মাযার হতে শিরক ও বিদ'আত উচ্ছেদ করেন। তাওহিদের পতাকাকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ষাট গম্বুজ মসজিদ প্রাঙ্গণে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তিন-দিনব্যাপী 'বার্ষিক ইসালে সওয়াব মাহফিলে'র প্রবর্তন করেন। এভাবে তিনি শির্ক বিদ্'আতের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এসবই তাঁর শির্ক ও বিদ্'আতমুক্ত সমাজসংস্কার চেতনাকে মহিমান্বিত করেছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মাযার প্রাঙ্গণে 'ষাট গম্বুজ খান জাহানিয়া জব্বারিয়া এতিমখানা, লিল্লাহ্ বোডিং ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেন।[২৩৬]

যেখানে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা ও প্রতিবাদ করার ক্ষমতা ছিল না সেখানে মৌখিক প্রতিবাদ করে গেছেন; নিন্দা করেছেন। সব ধরনের অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে সিংহের মতো গর্জন দিয়ে ওঠেছিলেন। সত্যকথন

---

২৩৪. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মাওলানা আবু সালেহ মুহাম্মদ ছলীমুল্লাহ্, 'উজ্জ্বল সে নক্ষত্রটি আর উদিত হবে না', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

২৩৫. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৫

২৩৬. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *মুহাম্মদ আবদুল জব্বার এর নির্বাচিত ভাষণ* (চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ৯৩-৯৭

ও অসত্যের প্রতি তিনি খড়্গউত্তোলক ছিলেন। বাতিলের রক্তচক্ষুকে ভয় না করে শরি'আতের ওপর অটল থাকার ক্ষেত্রে সত্যি অসাধারণ নির্ভিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ড. আল্লামা ইকবাল (রহ.) বলেন,

آئین جوانمرداں، حق گوئی وبیباکی - اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

'খোদা-ভীরুদের পরিচয় হলো সত্যকথন ও অভয়, খোদায়ি সিংহের থাকতে পারে কি শিয়ালের মতো ভীতি-ভয়?'[২৩৭]

উপরে তিনটি ঘটনার উল্লেখ করা হলেও তাঁর জীবনের সামগ্রিক কার্যাবলি পর্যালোচনা করলে অবশ্যই পরিলক্ষিত হয় যে, তাঁর সমস্ত কর্মকাণ্ডই সমাজের সর্বস্তরে ইসলামি ধ্যান-ধারণার প্রচার-প্রসার ও ইসলামের নামে প্রচলিত কুসংস্কারসমূহের প্রতিরোধে পরিচালিত হয়েছে। এসবই তাঁর শির্কমুক্ত সমাজসংস্কার চেতনাকে মহিমান্বিত করেছে।

(খ) ইসলামের মর্যাদা রক্ষার প্রচেষ্টা

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) প্রগতিশীল সমাজসংস্কারক ছিলেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৯৮৬/৮৭ খ্রিষ্টাব্দে 'সৌদি রাজতান্ত্রিক সরকারে'র দ্বারা মক্কায় অন্যায়ভাবে শতাধিক ইরানিকে নিহত ও আহত করায় বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকার মাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ জানান তিনি। এ জুলুমের প্রতিবিধান চেয়ে 'রেডিও তেহরানে'র বাংলা বিভাগে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।[২৩৮]

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক কুখ্যাত সালমান রুশদি 'স্যাটানিক ভার্সেস' নামক গ্রন্থে মহানবি (সা.), উম্মুহাতুল মু'মিনিন ও সাহাবিগণকে নিয়ে কটূক্তি করায় ১০ মার্চ, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে, শুক্রবার জুমু'আর নামাযের পর আন্দরকিল্লা শাহী জামে' মসজিদ চত্বর থেকে এক বিক্ষোভ মিছিলের আহ্বান করা হয়। এতে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করে তার সর্বোচ্চ শাস্তির পাশাপাশি তার সহযোগীদেরও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। তিনি মুসলিমগণের ঐক্যের ডাক দিয়ে বলেন,

'নাস্তিকতা ও ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে বিশ্বমুসলিমের ঐক্যই আজকের দিনের একান্ত দাবি। আমি দুনিয়ার মুসলিমগণের সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের আহ্বান জানাচ্ছি।'[২৩৯]

ভারতীয় নাগরিক নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত এবং 'বি. আর পাবলিশিং কর্পোরেশন' কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারত বিশ্বকোষে'র ৪র্থ খণ্ডে মহানবি (সা.) অবমাননার প্রতিবাদে ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে, শুক্রবার জুমু'আর নামাযের পর আন্দরকিল্লা শাহী জামে' মসজিদ চত্বরে এক বিরাট প্রতিবাদ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে সভাপতিত্ব করেন শাহী জামে' মসজিদের তৎকালীন খতিব সৈয়দ আবদুল আহাদ আল-মাদানী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)। সভাপতির ভাষণে তিনি বিশ্বকোষের লেখক,

---

২৩৭. https://jang.com.pk/news/38472, Visited on : 14.06.2021

২৩৮. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, ৪৮

২৩৯. মোহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রাহ. এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

সম্পাদক ও প্রকাশকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। পরবর্তীকালে দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ শুরু হলে বাংলাদেশ সরকার ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বকোষটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত বিশ্বকোষ নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে 'বায়তুশ শরফ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান' থেকে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) লিফলেট বিতরণ করা হয়।[২৪০]

১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে 'সম্মিলিত 'উলামা-মাশায়েখ সংগ্রাম পরিষদে'র উদ্যোগে বসনিয়া হার্জেগোভিনায় মুসলিম গণহত্যার প্রতিবাদে তিনি রাজপথে নেমে পড়েন। তাছাড়া স্বৈরাচারী এরশাদ (জন্ম ১৯৩০ খ্রি.) সরকার কর্তৃক ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে 'ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়' গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরের প্রতিবাদে এবং তসলিমা নাসরিন (জন্ম ১৯৬২ খ্রি.), দাউদ হায়দার (জন্ম ১৯৫২ খ্রি.) ও আহমদ শরিফ (১৯২১-১৯৯৯ খ্রি.) প্রমুখের আল্লাহ্, রাসুল ও ইসলামবিরোধী অপতৎপরতা রুখে দেয়ার দাবিতে তিনি বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এগুলো বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আজও কালের সাক্ষী হয়ে আছে।[২৪১]

১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' এর গবেষণা বিভাগের পরিচালক মওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ চিঠির মাধ্যমে কাদিয়ানি সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানতে চান। তিনি কুর'আন ও হাদিসের দৃষ্টিতে তাঁদের কাফের হিসেবে আখ্যায়িত করে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।[২৪২]

অনুরূপভাবে, কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের ওপর ভারত সরকারের গণহত্যা চালানো, মা-বোনদের ইজ্জত-আব্রু পৈশাচিকভাবে হরণ করায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর মন বেদনার্ত হয়ে ওঠে। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং জনমত গড়ে তোলেন। ভারতের হিন্দুরা ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করলে তিনি ভক্ত-অনুরক্ত ও মুরিদানদের নিয়ে রাজপথে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মিছিল-মিটিং শোভাযাত্রা ও সমাবেশের মাধ্যমে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান।[২৪৩]

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) শির্ক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে ইস্পাত কঠিন ছিলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি সব সময় মাঠে-ময়দানে সরব ছিলেন। শির্ক ও বিদ'আতমুক্ত সমাজ গঠনে আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। ইসলাম ও মুসলিমগণের স্বার্থ-সংরক্ষণে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন।

---

২৪০. মোহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রাহ. এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২-২০৩

২৪১. *দৈনিক আজাদী*, 'ওলামা সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ : বসনিয়ায় মুসলিম গণহত্যা বন্ধ করার দাবী', ১০ জুলাই, ১৯৯৩; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১০ জুলাই, ১৯৯৩; আবদুর রহমান চৌধুরী, 'মহান কর্মবীর ও সমাজসংস্কারক বায়তুশ শরফের পীর সাহেব রহ.', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*(স্মরণ সংখ্যা ১), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

২৪২. মোহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রাহ. এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯-৩০

২৪৩. পূর্বোক্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

মানবসেবায় শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অবদান

- প্রথম পরিচ্ছেদ : মানবসেবার পরিচয়
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলামে মানবসেবার গুরুত্ব
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : আর্তমানবতার সেবা
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ইসলামি মিশনারি ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রম

পঞ্চম অধ্যায়

মানসেবায় শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)

'মানবসেবা' বলতে আধুনিক কালের সুসংগঠিত সেবাদান কার্যক্রমকে বোঝায়। এর লক্ষ্য হলো জাতিধর্মনির্বিশেষে সব মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধন। এ কল্যাণকর কাজ মানবসেবা পরিকল্পনা, নীতি ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে মানবসেবার সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন দর্শন নির্ণয় করা বাস্তবিকপক্ষে কঠিন। কারণ, সমাজ পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। প্রত্যেক দেশেই মানবসেবা কার্যক্রম সে দেশের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এজন্য মানবসেবা দর্শনের মধ্যে সর্বজনীন ঐক্য পরিলক্ষিত হয় না। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবসেবা দর্শনেরও পরিবর্তন ঘটে। তদুপরি, মানবসেবার ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, অনুশাসন এবং অনুভূতিই মানবসেবা দর্শনের চিরায়ত ধর্মীয় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় সার্বজনীন মানবসেবা দর্শন গড়ে না উঠা সত্ত্বেও অভিন্ন কতকগুলো মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেই মানবসেবামূলক কার্যক্রম সব সমাজে পরিচালিত হয়ে আসছে।

সমাজব্যবস্থা ও সমাজবদ্ধ মানুষের প্রয়োজনের ভিন্নতার কারণে মানবসেবার অভিন্ন ধারণা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, তথাপি, সমাজবদ্ধ মানুষের কতিপয় অভিন্ন সত্ত্বা রয়েছে। এসব সত্ত্বার স্বীকৃতি লালন ও উন্নয়নই আধুনিক মানবসেবার স্বকীয়তা ও সর্বজনীনতা দান করেছে। মানবসেবার দর্শন হল, এমন সব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান যা সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর গ্রহণযোগ্য কল্যাণ সাধনের চালিকা শক্তি। যা জাতিধর্মনির্বিশেষে সব মানুষের সার্বিক মঙ্গল বিধান করে। যার ফলে কতিপয় অভিন্ন বিষয়ে সব মানুষের নিরাপত্তা সেবা নিশ্চিত হয়।[১]

শিল্পোত্তর সমাজের জটিল ও বহুমুখী সমস্যা সমাধানের তাগিদ মানবসেবা ধর্মীয় আদর্শের চেয়ে মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আদর্শের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। ফলে মানবসেবার দার্শনিক রূপরেখা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানী, সমাজদরদি, সমাজচিন্তাবিদ এবং মানবহিতৈষী মনীষীদের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে সাম্য, মৈত্রী, সহযোগিতা ও সামাজিক ন্যায়পরাণয়তা প্রভৃতি দার্শনিক মূল্যবোধ মানবসেবার দর্শন সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। তাই পৃথিবীর সকল দেশেই সমাজ কাঠামো ও সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখেই মানবসেবা দর্শন গড়ে তোলা হয়, যাতে সমাজবদ্ধ সকল মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়; তবে মানবতাবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের অনুভূতি ও তাগিদই যে মানবসেবার সর্বজনীন দার্শনিক ভিত্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

---

১. অধ্যাপক আবদুস সামাদ, *আধুনিক সমাজকল্যাণ* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৭), পৃ. ১৫৩

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানবসেবার পরিচয়

'মানবসেবা' পদবাচ্যটি 'মানব' (Human) ও 'সেবা' (Services) প্রত্যয় দু'টির সংমিশ্রণে গঠিত। মানব শব্দটির উৎপত্তি বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান লিখেছেন, 'বাংলা ভাষার অভিধান ও বিশ্বকোষগুলো 'মানব' শব্দটির উৎপত্তি 'মনুষ্য' অর্থাৎ মনুর অপত্য তথা 'মনু'র স্নেহভাজন বা পুত্রবৎ বলে নির্দেশ করে বলে মনুষ্যকে 'মানব' বলা হয়। আমার অনুমান 'মনুর অপত্য' মানে মনুর সন্ততি বা পৌত্র, যেমন আদম সন্তানকে 'বনি আদম' বলে আরবিতে অভিহিত করা হয়।'[১] আর 'সেবা' মূলত একটি মানসিক ধারণা এবং তা পরিবর্তনীয় ও গতিশীল। স্থানকালপাত্র ও শ্রেণিভেদে এ ধারণাটি ভিন্ন-ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। মানুষের তৃপ্তি, সন্তুষ্টি ও সুখানুভূতির সঙ্গে এটি সম্পর্কিত; যা মহৎ ও ভালো কাজকে বোঝায়; কিংবা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[২] তাই 'মানবসেবা' বলতে স্বাভাবিকভাবেই সমাজস্থ মানুষের আর্থ-সামাজিক, নৈতিক ও দৈহিক ইত্যাদি সামগ্রিক দিকের তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা বা কার্যক্রমের সমষ্টিকে বুঝায়।[৩]

মানবসেবার পরিচয়

মানবসেবার পরিচয় প্রদানে বিখ্যাত মনীষী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ একাধিক সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

- Prof. Dr. Walter Andreas Friedlander (১৮৯১–১৯৮৪ খ্রি.) বলেন, Human service, in a broad sense, encompasses the well-being and interests of large numbers of people, including their physical, educational, mental, emotional, spiritual, and economic needs. অর্থাৎ 'মানবসেবা হল সমাজের সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা। যাতে সমাজবদ্ধ সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জনসমষ্টি তাদের শারীরিক, শিক্ষাগত, মানসিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক কল্যাণের অধিকারী হতে পারে।'[৪]

- Encyclopadia of Social Work এর সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী, 'The term 'Human service' denotes the full range of recognised activities of voluntary and governmental agencies that seek to prevent, alleviate or contribute to the solution of recognised Social Problems or to improve the well-being of individuals, groups or communities.'[৫] অর্থাৎ 'মানবসেবা

---

১. শরীফ হারুন সম্পাদিত, ড. মঈনুদ্দীন আহমদ খান, 'বাংলাদেশ দর্শন : ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধানে', *মানবতাবাদ ও বাংলাদেশ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), খ.৩, পৃ. ৬২২

২. ড. মো. ইবরাহীম খলিল, *ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ* (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশনা, ২০১৫), পৃ. ৯৭

৩. ড. মুহাম্মদ আবু বাশার, 'সমাজকল্যাণ দর্শনের বিবর্তনে ইসলামের প্রভাব', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৪৫

৪. Walter A. Friendlander, *Concepts & Methods of Social work* (Prentice Hall June, Engle wood cliffs Ng.1962), p. 7

৫. *Encyclopadia of Social Work* (New York : The National Association of Social workers of U.S.A. 1965), p. 3

বলতে স্বেচ্ছাসেবী ও সরকারি অঙ্গসংস্থাসমূহের সকল স্বীকৃত কার্যক্রমকে বুঝায়, যেগুলো স্বীকৃত সামাজিক সমস্যাগুলোর নিবারণ, লাঘব কিংবা সমাধানে অবদান রাখতে চায় কিংবা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে পারে।'

❖ হাসনি 'ইওয়াদ ও রা'য়িদ নমর বলেন,

مهنة مُعيّنة ذات أنشطة عديدة تُساعد الأفراد والجَماعات والمُجتمع، وذلك لتَرجمة المقدرات والمؤهّلات التي لديهم، ودَعمها ليتمّ إيصالها إلى مَرحلة التفاعل الاجتماعي بِصورةٍ جيدة.[৬]

অর্থাৎ 'মানবসেবা হলো, একটি বিশেষ পেশা; যাতে রয়েছে নানাবিধ কার্যসম্পাদনের সুযোগ, যা কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজকে তাদের যোগ্যতা ও সামর্থকে কাজে লাগিয়ে সুন্দরভাবে একটি সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ায় পৌঁছার সুযোগ করে দেয়।'

❖ 'আয়িদ ইব্‌ন সা'দ আশ-শাহরানি বলেন,

مساعدة الفرد أو الجماعة على استغلال إمكاناته المُختلفة، وإمكانات مجتمعه؛ وذلك بهدف التغلّب على الصّعوبات التي تعوق أدائه لوَظيفته الاجتماعية.[৭]

অর্থাৎ 'কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে সহযোগিতা করার মাধ্যমে তাদের মধ্যস্থিত নানান সম্ভবনা ও সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে ঐ বাধা দূর করার চেষ্টা করা, যা তাদের সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে অন্তরায়।'

উৎপত্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, মানবসেবা হচ্ছে মানুষের আর্থসামাজিক, নৈতিক ও দৈহিক ইত্যাদি সামগ্রিক তৃপ্তি এবং সন্তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টা বা কার্যক্রমের সমষ্টি।[৮]

❖ সমাজবিজ্ঞানী Gertrude Wilson (১৮৯৫–১৯৮৪ খ্রি.) মানবসেবার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার্থে বলেন, 'মানবসেবা হচ্ছে সকল মানুষের কল্যাণে সকল মানুষের সংগঠিত প্রচেষ্টা।'[৯]

❖ *Elizabeth Wickenden* (১৯০৯–২০০১ খ্রি.) বলেন, Human service is a system of laws, programmes, benefits and services which strengthen or assure provisions for meeting social needs recognised as basic for the welfare of the population and the functioning of the social order. The system is undergoing rapid transformation in response to the transition of our society to relative abundance and to the revolution of rising expectation.[১০] অর্থাৎ 'মানবসেবা হলো এমন একটি কর্মসূচি, উপকারমূলক ও সেবামূলক পদ্ধতি যা জনসাধারনের কল্যাণ ও সামাজিক শৃঙ্খলার কার্যকারিতার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত সামাজিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের ধারা বা শর্তসমূহকে

---

৬. হাসনি 'ইওয়াদ ও রা'য়িদ নমর, *ওয়াকিয়ু' তাতবিকি মিহনাতিল খিদমাতিল ইজতিমা'ইয়্যাহ* (কায়রো : মাকতাবাতুল আযহার, ২০০৮), খ.১, পৃ. ৮

৭. 'আয়িদ ইব্‌ন সা'দ আশ-শাহরানি, *আল-খিদ্‌মাতুল ইজতিমা'ইয়্যাতু ওয়া যাহিরাতুল 'ইন্‌ফিল আসার* (সৌদিআরব : আল-জম'ইয়্যাতুল ইজতিমা'ইয়্যাতু লি'ইলমি ইজ্‌তিমা, ২০০৮), খ.১, পৃ. ৬-৭

৮. মো. আতিকুর রহমান, *সমাজকল্যাণ* (ঢাকা : কোরআন মহল, ১৯৯৯), পৃ. ৪

৯. Gertrud Wilson & Gladys Ryland, *Social Group Work Practice* (Boston : Houghton Mifflin, 1949), p. 15

১০. Elizabath Wickenden, *Social Welfare in Changing World* (Washingtion : Department of Health Education and Wealfare, 1965), p. viii

সুদৃঢ় কিংবা সুনিশ্চিত করে। এ পদ্ধতি আমাদের সমাজের আপেক্ষিক প্রাচুর্য ও ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশার বিবর্তনের প্রেক্ষিতে দ্রুত রূপান্তিত হচ্ছে।'

❖ Walter Friedlander (১৮৯১–১৯৮৪ খ্রি.) এর মতে, 'Social welfare is the organised system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life, health and personal and social relationships, which permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with needs of their families and the community.'[১১] 'সমাজসেবা হচ্ছে সামাজিক সেবা ও প্রাতিষ্ঠানিক সুসংগঠিত প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সন্তোষজনক জীবনমান, স্বাস্থ্যমান এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক অর্জনে সহায়তা করে; যে সমস্ত সম্পর্ক তাদের পূর্ণাঙ্গ সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ দেয় এবং তাদের পারিবারিক ও সম্প্রদায়গত প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কল্যাণ বৃদ্ধি করে।'

সুতরাং, উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, মানবসেবা হলো এমন একটি ব্যাবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান যা সুসংগঠিত সেবাকার্যের মাধ্যমে সকল মানুষকে সাহায্য করে, যাতে তারা নিজেরাই সব সমস্যা সমাধান করে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবনের নিশ্চয়তা লাভ এবং উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

---

১১. Walter Friedlander, *Indrodution to Social welfare* (New Delhi : Second Edition, 1963), p. 4.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামে মানবসেবার গুরুত্ব

ইসলামে সেবামূলক কাজের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[১২] ইসলামের পূর্বে পৃথিবীর কোনো ধর্মই ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে সরাসরি আইন প্রণয়ন করে গরিব, দুঃস্থ ও অনাথদের লালনপালন এবং বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেনি। ইসলামে তাদের সহযোগিতা করা প্রত্যেক সক্ষম মুসলিমের জন্য অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব। যারা ইয়াতিমের প্রতি সদাচরণ করে না এবং দুঃস্থদের খাদ্য দান করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

অর্থাৎ 'তুমি কি এমন লোককে দেখেছ! যে দীনকে অস্বীকার করে। সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর সে মিসকিনদের খাবার দানে মানুষকে উৎসাহিত করে না।'[১৩]

মানুষের সেবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা সবচেয়ে বেশি খুশি হন; কারণ মানুষকে নিয়েই তো আল্লাহ্র সব আয়োজন। এ দুনিয়ার সবকিছুই তিনি মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন; যেমন তিনি বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

অর্থাৎ 'তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।'[১৪]

রাসুলুল্লাহ্ (সা.) সমস্ত সৃষ্টিকে আল্লাহ্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ঘোষণা করে সমাজসেবার প্রতি মানবজাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

الْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، وَأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ

---

১২. প্রত্যেক ধর্মেই মানবসেবার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বৌদ্ধধর্মমতে, কারও প্রতি হিংসা নয়; সকলের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শন এবং সকলের সুখ কামনা করা একজন বৌদ্ধের অবশ্যই পালনীয় শর্ত। এ কারণে প্রত্যেক বৌদ্ধকে তার মনোভাব এভাবে প্রকাশ করতে হয় : 'সবে সত্তা সুখীতা হন্তু' (অর্থাৎ জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক)। বুদ্ধের মতে, নির্বাণ লাভ করতে হলে সর্বজীবে দয়া, মঙ্গল, প্রেম ও মৈত্রীর ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি বলেছেন, 'মাতা যথা নিজং পুত্তং আয়ূসা এক পুত্তমনুরদখে এবম্পি সব্বভূতেসু মানুসম্ভাবয়ে অপরিমানং' অর্থাৎ মা যেমন নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও পুত্রের প্রাণরক্ষা করেন, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অসীম দয়াভাব জন্মাবে। দ্র. নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ : ধর্ম ও দর্শন* (ঢাকা : অবসর প্রকাশনী, ১৯৯০), পৃ. ৪৪; সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য নিজের সর্বস্ব এমনকি শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সমস্ত শরীর নিঃস্বার্থভাবে দান করা এবং দানের ফল পরিত্যাগ করা। হিন্দুধর্মেও পরোপকার ও দরিদ্রপালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ঋগ্‌বেদে রয়েছে, 'অখ স্বপ্নস্য নির্বিদেহভুঞ্জতশ্চ রেবতঃ। উভা তা বশ্রি নশ্যতঃ।' অর্থাৎ আমি স্বপ্ন ঘৃণা করি আর যে ধনবান লোক পরকে প্রতিপালন করে না তাকেও ঘৃণা করি। উভয়ই শীঘ্র নাশপ্রাপ্ত হয়। দ্র. ঋগ্‌বেদ, ১:১২০:১২; এ ধর্মমতে, মানবসেবা কেবল সামাজিক কর্তব্য বা পুণ্য কাজ নয়। এটা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি সাধনার চরম সোপান; অর্থাৎ ধর্মের অন্যান্য অনুশাসন ও নিয়ম পালন করে সাধক দেবত্বের স্পর্শ লাভ করার পরও মোক্ষ বা ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য আরও কিছু বাকি থাকে। তা হচ্ছে 'সর্বভূতহিত' সাধন। শ্রী রামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামীজি বলেন, 'আত্মনং মোক্ষার্থং জগদ্বিতায় চ' অর্থাৎ নিজের মোক্ষের জন্য জগৎহিতের সাধনা করতে হবে। দ্র. স্বামী বিবেকানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলি*, খ.৯, পৃ. ৪৮

১৩. আল-কুর'আন, ২ : ২৯

১৪. আল-কুর'আন, ২ : ২৯

অর্থাৎ 'সৃষ্টিজীব হলো আল্লাহ্‌র প্রতিপাল্য স্বরূপ। অতএব, যে ব্যক্তি সৃষ্টির সর্বাধিক কল্যাণ করবে, সে-ই হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়।'[১৫]

ইসলামের একজন অনুসারী আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করার পর তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো, আল্লাহ্‌র বান্দাদের অধিকার আদায় করা। আল্লাহ্ দয়ালু হিসেবে হয়তো স্বীয় প্রাপ্য ক্ষমা করে দিতে পারেন; কিন্তু মানুষের প্রাপ্য যদি কেউ আদায় না করে তা হলে তিনি ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না ঐ বান্দাহ তা ক্ষমা করে দেয়। বস্তুত, আন্তরিকতার সাথে মানুষের অধিকারসমূহ আদায় করা মুসলিম জীবনের অপরিহার্য শর্ত। এক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ এতটাই দৃঢ় যে, গৃহদ্বারে মানবেতর প্রাণী একটি কুকুরকে উপবাসী রেখে নিজে উদর পূর্ণ করে আহার গ্রহণ করা মুসলিমগণের জন্য না-জায়িয। এতিমের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন, যারা ক্ষুধার্তকে অন্নদানে বিমুখ এবং যারা প্রতিবেশীর প্রতি উদাসীন, সে সকল 'ইবাদতকারী[১৬] অভিশপ্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، فَكُّ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

অর্থাৎ 'সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করে নাই। তুমি কি জানো, বন্ধুর গিরিপথ কী? তা হচ্ছে : দাসমুক্তি অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্যদান ইয়াতিম আত্মীয়কে অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে।'[১৭]

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বর্ণিত 'আকাবা (الْعَقَبَةَ) শব্দের অর্থ হলো, পাহাড়ের বড়ো পাথর বা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা মাটি। শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য এ পাহাড়ের রয়েছে বিরাট ভূমিকা। অর্থাৎ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পাহাড় ও মাটির মাধ্যমে যেভাবে মানুষ শত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, ঠিক তেমনি অত্যাবশ্যক নেক আমলসমূহ আদায় করার পর আর্তমানবতার সেবার দ্বারাও আল্লাহ্ তা'আলার আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর্তমানবতার সেবার মধ্যে দাসমুক্তি এবং ক্ষুধার্তকে অন্নদান বিরাট সওয়াবের কাজ ও আল্লাহ্‌র আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার অনেক বড়ো মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

---

১৫. আবু বকর আহমদ ইবনু হোসাইন আল-খোরাসানি, *শু'আবু ঈমান* (রিয়াদ : মাকতাবাতু রুশদ, ২০০৩), খ.১৫, হাদিস নং ৭০৪৫ ও ৭১৯০, পৃ. ৪৯৫

১৬. ইবাদতের আভিধানিক অর্থ হলো, **أقصى غاية الخضوع والتذلل** তথা চূড়ান্ত বিনয় ও অসহায়ত্ব। দ্র. নাসিরুদ্দিন বায়দাভি, *আনওয়ারুল তানযিল ওয়া আসরারুত তা'ভিল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩; আলাউদ্দিন খাযিন, *লুবাবুত তা'ভিল (তাফিসীরুল খাযিন)* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৭), খ.১, পৃ. ২২; পারিভাষিক সংজ্ঞার্থে প্রদানে শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, **العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.** অর্থাৎ 'আল্লাহ্ যা ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন, এমন সব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কাজ ও কথার নাম 'ইবাদত। দ্র. তাকি উদ্দিন আহমদ ইবনু তাইমিয়্যাহ, তাহকিক : মুহাম্মদ যহাইর, *আল-উবুদিয়াতু* (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২০০৫), পৃ. ৪৪; ব্যাপক অর্থে বান্দাহ্‌র সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ যেমন 'ইবাদত, তেমনি তার সত্যবাদিতা, আমানতদারি, অঙ্গীকার পূরণ, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে সদাচার এবং সৎ ও ন্যায়নুগভাবে জীবনযাপন প্রভৃতিও 'ইবাদতরূপে গণ্য হবে। অধিকন্তু, এসব বিষয়ের সহায়ক উপায়-উপকরণও 'ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন, **فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة.** অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপায়-উপকরণের ব্যাপারে যেসব নির্দেশ করেছেন তাও 'ইবাদত।' দ্র. তাকি উদ্দিন আহমদ ইবনু তাইমিয়্যাহ, *আল-উবুদিয়াতু*,পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

১৭. আল-কুর'আন, ৯০ : ১১-১৬

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ...

অর্থাৎ 'পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পুণ্য নাই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবিগণের উপর ঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্‌প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে।'[১৮]

সমাজের প্রতিটি মানুষ অপরের কল্যাণের জন্য। পরস্পরকে আপদে-বিপদে সাহায্য ও সমবেদনা করা আর্তমানবতার সেবার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) দারিদ্র্যক্লিষ্ট, মিসকিন, নিঃস্ব ও বিধবাদের অধিকার অধিকতর সংহতকরণে তাঁর উম্মাহ্‌র সকল সদস্যকে তাদের প্রয়োজন পূরণে প্রচেষ্টা ব্যয় করার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং যারা বিধবা ও অভাবগ্রস্তদের খোঁজখবর রাখে ও দেখাশোনা করে তাদের অকল্পনীয় মর্যাদার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ

অর্থাৎ 'বিধবা ও অসহায়কে সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার ধারণা, তিনি আরও বলেন, এবং সে ঐ সালাত আদায়কারীর ন্যায় যার ক্লান্তি নেই এবং ঐ রোজা পালনকারীর ন্যায় যার রোজায় বিরতি নেই।'[১৯]

অন্য একটি হাদিসে তিনি বলেছেন,

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের অভাব দূর করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অভাব দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ্ তা'আলাও কিয়ামতের দিন তাঁর একটি বিপদ দূর করে দেবেন।'[২০]

আরেক হাদিসে তিনি বলেছেন, عُودُوا الْمَرِيضَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ অর্থাৎ 'অসুস্থ লোকের সেবা করো, ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও এবং বন্দিকে মুক্ত করো।'[২১] তিনি আরো বলেছেন, حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ... وعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ... অর্থাৎ 'এক মুসলিমের ওপর অপর মুসলিমের পাঁচটি অধিকার রয়েছে : ... এবং অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া... ।'[২২]

মানবসেবার গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদিসে কুদসিই যথেষ্ট। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

---

১৮. আল-কুর'আন, ২ : ১৭৭

১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি'আস-সহীহ*, খ.২, পূর্বোক্ত, বাবুন ফযলুন নাফাকাতি 'আলাল আহ্‌লি, হাদিস নং ৪৯৩৪, পৃ. ৪২৯

২০. মুসলিম ইব্‌নুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, খ.২, পূর্বোক্ত, বাবুন তাহরিমুয যুলমি, হাদিস নং ৪৬৭৭, পৃ. ৪৫৮; *সহিহ্ ইব্‌ন হিব্বান*, বাবুন ফযলু মিনাল বির্‌রি ওয়াল ইহসান, হাদিস নং ৫৩৪; আবু বকর আহমদ ইবনু হোসাইন আল-খোরাসানি, *শু'আবুল ঈমান*, খ.১০, পূর্বোক্ত, হাদিস নং ৭২০৮ ও ১০৬৩৬, পৃ. ৮৮

২১. আবু 'আওয়ানা, *মুস্‌তখ্‌রজ আবি 'আওয়ানা*, খ. ১৫, বাবুন বয়ানুস সুন্নাতি ফি দুখোলির রাজুলি, হাদিস নং ৬০৯৬, পৃ. ১৯

২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি'আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, বাবুন আমরু বি'ইত্তিবায়িজ জানায়িয, হাদিস নং ১১৮৩; মুসলিম ইবনুল হাজ্জাল আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, বাবুন মিন হক্কিল মুসলিম 'আলাল মুসলিমি রাদ্দুল সালাম, হাদিস নং ২১৬২

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي.

অর্থাৎ 'কিয়ামতের দিন নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, 'হে আদম সন্তান, আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার শুশ্রূষা করোনি।' বান্দা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো বিশ্বপালনকর্তা। কীভাবে আমি আপনার শুশ্রূষা করব? তখন তিনি বলবেন, 'তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল, অথচ তাকে তুমি দেখতে যাওনি। তুমি কি জানো না, যদি তুমি তার শুশ্রূষা করতে তবে তুমি তার কাছেই আমাকে পেতে?' 'হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে আহার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাও নি।' বান্দা বলবে, হে আমার রব, আপনি হলেন বিশ্ব পালনকর্তা, আপনাকে আমি কীভাবে আহার করাব?' তিনি বলবেন, 'তুমি কি জানো না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাদ্য দাওনি। তুমি কি জানো না যে, তুমি যদি তাকে আহার করাতে তবে আজ তা প্রাপ্ত হতে?' 'হে আদম সন্তান, তোমার কাছে আমি পানীয় চেয়েছিলাম, অথচ তুমি আমাকে পানীয় দাওনি।' বান্দা বলবে, 'হে আমার প্রভু, আপনি তো রাব্বুল আলামিন, আপনাকে কীভাবে পান করাব?' তিনি বলবেন, 'তোমার কাছে আমার অমুক বান্দা পানি চেয়েছিল কিন্তু তাকে তুমি পান করাওনি। তাকে যদি পান করাতে তবে নিশ্চয় আজ তা প্রাপ্ত হতে।'[২৩]

আর্তমানবতার সেবা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এবং প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁর জীবনের সমগ্র দিকই সেবামূলক কাজে ভরপুর। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে সর্বপ্রথম যখন ওহি আসে, তখন তিনি নিজের জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ সময় উম্মুল মু'মিনিন খাদিজাতুল কুবরা (রা.) তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বলেছিলেন,

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

অর্থাৎ 'কখনও নয়, আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহ্ আপনাকে কখনও অপমানিত করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়দের প্রতি দয়াশীল, পীড়িত মা ও আতুরদের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের জন্য উপার্জন করেন, আপনি অতিথিপরায়ণ এবং সত্যিকার বিপদাপদে সদা সাহায্যকারী।'[২৪]

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মু জামিল বিনতু হারব ইবনি উমাইয়্যাহ শত্রুতা করে মহানবি (সা.)-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত এবং সে তার বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করে সমস্ত আবর্জনা জমা করে মহানবি (সা.)-এর গৃহের আঙিনায় ফেলে আসত; কিন্তু দয়ার সাগর মুহাম্মদ (সা.) কখনও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি। অধিকন্তু, তার অসুস্থতার সময় তিনি তার সেবা করেছিলেন।[২৫] যে তায়িফবাসী প্রস্তরাঘাতে

২৩. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, খ.২, পূর্বোক্ত, বাবুন ফযলু 'ইয়াদাতিল মারীয, হাদিস নং ৪৬৬১, পৃ. ৪৪০

২৪. মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি' আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, বাবুন বদ্উল ওহি, খ.১, হাদিস নং ৩, পৃ. ২

২৫. আবু বাকর আহমদ বাইহাকী, *দালা'য়িলুন নুবুওয়াত*, পূর্বোক্ত, খ.২, হাদিস নং ৪৮৮, পৃ. ২৫৫

তাঁর পবিত্র দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল তিনি তাদের ধ্বংসের জন্য বদ্‌দু'আ না করে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে এ বলে দু'আ করেন, 'হে আমার পরওয়ারদিগার! তোমাকে ডাকি, অবিশ্বাসীরা আজ না বুঝে যে গুরুতর অপরাধ করেছে তার জন্য দয়া করে তুমি তাদের শাস্তি দিয়ো না। তাদের ক্ষমা করে দাও।'[২৬] অনুরূপভাবে, যে মক্কাবাসী একদিন নিজ মাতৃভূমি থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাদের ক্ষমা করে আবার আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন,

لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ إِذْهَبُوْا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতি আজ আমার আর কোনো ভর্ৎসনা নেই। যাও, আজ তোমরা সবাই মুক্ত।'[২৭]

অন্যের কাজে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রেও তিনি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। খাববাব ইব্‌ন আরত নামক জনৈক সাহাবি যুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর বাড়িতে অন্য কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষ ছিলেন না। মেয়েরা দুধ দোহন করতে জানতেন না। এজন্য হুযুর (সা.) প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে দুধ দোহন করে দিয়ে আসতেন।[২৮] হাবশা থেকে আগত প্রতিনিধি দলের লোকজনকে নিজহাতে সেবা যত্ন করেছিলেন। সাহাবিরা আপত্তি করলে বলেছিলেন, 'এরা আমার বন্ধুদের সেবা করেছেন, আমাকে নিজহাতে এদের সেবা-যত্ন করতে দাও।'[২৯]

অধিকন্তু, তিনি অসহায় ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ে এগিয়ে যেতেন। বর্ণিত আছে, একদা ইরাশা গোত্রের জনৈক ব্যক্তি আবু জাহলের নিকট তার উটের মূল্য দাবি করে; কিন্তু আবু জাহল তা পরিশোধ করতে গড়িমসি করে। লোকটি মক্কার অনেকের কাছে সাহায্য কামনা করে কিন্তু কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। মহানবি (সা.) একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আবু জাহলের কাছে ছুটে যান এবং তাকে ধমক দিয়ে ঐ ব্যক্তির পাওনা আদায় করে দেন।[৩০]

এভাবে বিভিন্ন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে তিনি সমাজসেবার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাঁর সাহাবিগণও এ আদর্শের যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। আল্লাহ্‌র 'ইবাদতের পরে মানবসেবাই ছিল তাদের ব্রত। বর্ণিত আছে, খিলাফত লাভের পূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) (৫৭৩–৬৩৪ খ্রি.) পাড়ার বকরিগুলোর দুধ দোহন করে দিতেন; কিন্তু খিলাফতের গুরুদায়িত্ব যখন তাঁর ওপর অর্পিত হয়, তখন এক মহিলা চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, কে তাঁর বকরির দুধ দোহন করে দেবে? এ দুশ্চিন্তার কথা হযরত আবু বকর (রা.) জানতে পেরে মহিলাকে বলে পাঠান,

---

২৬. গোলাম মোস্তাফা, *বিশ্বনবী* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, বিংশতিতম মুদ্রণ, ২০০৩), পৃ. ১৪৬

২৭. আল-ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব, *মুখতাসারু সিরাতিল রাসুল (সা.)* (সৌদিআরব : ওয়ারাতুল ও'উনুল ইসলামিয়া ওয়াল আওকাফ, ১৯৯৭), খ.১, পৃ. ৩৯৫; মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উমর আল-ওয়াকিদি, *আল-মাগাযি* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৬), খ.২, পৃ. ৮৩৫; আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যা* (কায়রো : মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যা, তা. বি.), খ.২, পৃ. ৪১১; আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্‌ন জারির আত-তাবারি, *তারিখুল উমাম ওয়াল-মুলুক* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ্‌, ১৯৮৬), খ.২, পৃ. ৫৫; আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইব্‌ন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* (বৈরুত : দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, ১৯৮৮), খ.৪, পৃ. ৩০১

২৮. ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা* (বৈরুত : দারু সাদির, তা. বি.), খ.৬, পৃ. ১০০

২৯. আল্লামা শিবলী নো'মানী ও অন্যান্য, *সীরাতুন নবী (সা.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬৬

৩০. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআফিরি, সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত, *সীরাতুন্নবী (সা.)* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৫), খ.১, পৃ. ৪৩-৪৪

بَلَي! لَعَمْرِيْ لَأَحْلِبَنَّهَا لَكُمْ، وإِنِّيْ لَأَرْجُوْ أن لَا يُغَيِّرَنِيْ مَا دَخَلْتُ فِيْهِ عَنْ خُلُقٍ كُنْتُ عَلَيْهِ

অর্থাৎ 'আমার জীবনের শপথ, আমি এখনও তোমাদের বকরিগুলোর দুধ দোহন করব। আমার একান্ত আশা, খিলাফতের দায়িত্ব আল্লাহ্‌র বান্দাদের সেবা থেকে আমাকে বিরত রাখবে না।' এরপর তিনি তাদের বকরিগুলোর দুধ দোহন করতেন।[৩১]

মদিনার শহরতলীর এক অন্ধ বৃদ্ধার বাড়িতে খিদমতের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ভোরে নিয়মিতভাবে প্রতিযোগিতা দিয়ে সাইয়্যিদুনা আবু বকর ও 'উমর (রা.) (৫৮৪–৬৪৪ খ্রি.)-এর যাতায়াত করতেন। ঘটনাটি হলো, আবু সালিহ আল গিফারি (রা.) (৫৫০–৬৫২ খ্রি.) বলেন, মদিনার শহরতলীতে এক অন্ধ বৃদ্ধা বাস করতেন। 'উমর (রা.) প্রতিদিন ভোরে গিয়ে তাঁর প্রয়োজনীয় খিদমত আঞ্জাম দিয়ে আসতেন; কিন্তু কয়েক দিন পর তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর পূর্বে কেউ এসে বৃদ্ধার খিদমত আঞ্জাম দিয়ে যান। লোকটিকে চেনার জন্য 'উমর (রা.) দারুণভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন। তাই রহস্য উন্মোচন করার জন্য একদিন খুব ভোরে উঠে তিনি সেখানে যান; গিয়ে দেখেন, খলিফা আবু বকর (রা.) তাঁর সেবা-যত্ন সেরে বেরিয়ে আসছেন। 'উমর (রা.) খলিফাকে সম্বোধন করে বলে ওঠেন, !أَنْتَ هُوَ لَعَمْرِيْ অর্থাৎ 'আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, হে খলিফাতুল রাসুল (সা.), তবে কি আপনিই প্রতিদিন আমার পূর্বে এসে বৃদ্ধার খিদমত করে যান?'[৩২]

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক বৃদ্ধা রমণীর বকরির দুধ দোহনের নিয়মিত দায়িত্ব পালন এবং মদিনার শহরতলীর অন্ধ বৃদ্ধার বাড়িতে খিদমতের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ভোরে নিয়মিতভাবে প্রতিযোগিতা দিয়ে সাইয়্যিদুনা আবু বকর ও 'উমর (রা.) এর যাতায়াত প্রভৃতি ঘটনা যুগে যুগে প্রত্যেক মুসলিমকে মানবসেবার প্রতি অনুপ্রেরণা দান করবে।

এভাবেই নানান বক্তব্যের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) ঈমানদারদেরকে অপরের দুঃখ-কষ্ট অপনোদন ও প্রয়োজন পূরণে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে মানবসেবা করে বিশ্ববাসীর সামনে অনুপম এক উপমা উপস্থাপন করেছেন। এসব ধর্মীয় আদর্শ, বাণী, প্রেরণা ও অন্তর্দৃষ্টি সমাজসেবার দার্শনিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

---

৩১. মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০), খ.৩, পৃ. ১৮৬; মুহাম্মদ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারিখ* (রিয়াদ : বায়তুল আফকারিদ দাওলিয়্যাহ,তা. বি.), খ.১, পৃ. ৩৯৭; আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারির আত-তাবারি, *তারিখুল রুসুল ওয়াল মুলুক* (রিয়াদ : বায়তুল আফকারিদ দাওলিয়্যাহ,তা. বি.), খ.২, পৃ. ২২১

৩২. মুহাম্মদ ইবনুল আসীর, *আল-কামিল*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৩৯৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন

মানবতাবোধ থেকে মানবসেবার উৎপত্তি। মানুষের মানবিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম গুণের মধ্যে মানবতাবোধ একটি মহৎ গুণ। মানুষের মানবতাবোধের কার্যকর পরিচর্যায় মানবতাবাদের বিকাশ। সুন্দর বিশ্বব্যবস্থা গঠনে মানবতাবাদ একটি মহান উপাদান। সমাজব্যবস্থার প্রত্যেকটি স্তরে এ মানবতাবোধের স্বচ্ছ প্রয়োগ সমাজের সংহতি, উন্নতি, প্রগতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সহায়ক। উক্ত তত্ত্বকথাগুলোর সার্থক প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় বিশেষ করে বস্তুতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নিগূঢ়ে যেখানে মানুষের আচরণ আত্মস্বার্থ লিপ্সায় কাতর; সেখানে তাঁর মানবসেবার দৃষ্টান্ত জাতির জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থার আদলে বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে নব্বই দশকের শেষভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মানবতার সেবায় ব্রতী হন। মসজিদভিত্তিক তাঁর সেবামূলক কর্মসূচি সমাজের জন্য একটি মডেল। ইসলামের সমাজব্যবস্থা বস্তুত মসজিদকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহানবি (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদিন[৩৩] মূলত মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করে গিয়েছিলেন। মসজিদ ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রত্যেক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। ইতিহাস[৩৪] পরিক্রমায় জানা যায়, মুসলিম সমাজব্যবস্থায় যতদিন তাদের কার্যাবলি মসজিদকেন্দ্রিক চলছিল, ততদিন পর্যন্ত মুসলিম সমাজব্যবস্থা মহানবি (সা.) এর নির্দেশিত পথেই ছিল। যখন হতে মুসলিমগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের কার্যাদি মসজিদবিমুখ হয়ে সম্পাদন করতে শুরু

৩৩. মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তিরোধানের পর যে চারজন প্রধান সাহাবি (রা.) তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে আরব রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে গেছেন তাঁরই মুসলিম জাহানের ইতিহাসে 'খুলাফায়ে রাশিদিন' নামে পরিচিত। তাঁরা ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম রাষ্ট্রের সর্ববিধ মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্ ও রাসুল (সা.) নির্দেশিত পন্থায় নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন, রাজ্যের শাসন কার্যাদী সুষ্ঠুভাবে পালন করে গেছেন বলে তাদের খুলাফায়ে রাশিদিন বা সত্য ও ন্যায়পথগামী খলিফা বলা হয়। তাঁরা হলেন, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলি (রা.)। তাদের সামষ্টিক শাসনকাল (৬৩২–৬৬১ খ্রি.)। অবশ্য ৮ম উমাইয়া খলিফা ওমর ইবন আব্দুল আজিজ (রা.) ইসলামি খিলাফতের নিয়মানুযায়ী নির্বাচিত ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হওয়ায় তাঁকেও খুলাফায়ে রাশেদিন হিসেবে গণ্য করা হয়। দ্র. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫), পৃ. ২৯ ও ৩৬; হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা : আইডিয়াল লাইবেরি, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮১), পৃ. ১; কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, দশম সংস্করণ, ১৯৮৭), পৃ. ২৯৬

৩৪. ইতিহাস হলো বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী, তাদের দেশ ও অঞ্চল, আচার-আচরণ, অভ্যাস-সংস্কৃতি, ব্যক্তিবর্গের কীর্তিকলাপ, তাদের বংশধারা, জন্ম ও মৃত্যু ইত্যাদি সম্পর্কে জানা। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হলো অতীতকালের নবি-রাসুল, পীর-আওলিয়া, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গ, কবি-সাহিত্যিক, রাজাবাদশা ও অন্যদের অবস্থাবলি। ইতিহাসচর্চার উদ্দেশ্য হলো অতীতকালের অবস্থাবলি ও ঘটনাবলি সম্পর্কে জানা। ইতিহাসবিদ্যার উপকারিতা হলো ঐসব ঘটনা ও অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, নসিহত হাসিল করা এবং যুগের পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের যোগ্যতা লাভ করা, যাতে অনুরূপ ক্ষতিকর ঘটনা থেকে বেঁচে থাকা যায় এবং অনুরূপ কল্যাণকর ঘটনা থেকে উপকৃত হওয়া যায়। দ্র. সিদ্দিক হাসান খান আল-কনৌজি, *আবজাদুল 'উলুম* (দিমাশ্‌ক : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৮), খ.২, পৃ. ১৩৭-১৩৮

করল, তখন থেকে মুসলিম সমাজ মহানবি (সা.) প্রদর্শিত পথ হতে ধীরে-ধীরে সরে যেতে লাগল। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আজকের মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রগুলো।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানবসেবা পরিচালনা করেন। মসজিদ, এতিমখানা, হাসপাতাল ও ধাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে মানবসেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। নিম্নে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

(ক) মসজিদ বায়তুশ শরফ প্রতিষ্ঠা

মসজিদ (اسم ظرف) স্থানবাচক বিশেষ্য। আরবি 'সাজাদা' (سجد) ধাতু হতে এর উৎপত্তি।[৩৫] শাব্দিক বিবেচনায় যেখানে 'সিজদা' করা হয় সে স্থানকেই মসজিদ বলা হয়।[৩৬] একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং জুম'আর সালাত আদায়ের নিমিত্ত নির্মিত গৃহই মসজিদ। এটি মসজিদের সংকীর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। মূলত মসজিদের অর্থ আরও ব্যাপক। মসজিদ কেবল সালাতের স্থান নয়, এতে সালাতসহ আরও বহু কাজ সম্পাদন করতে হয়। সেজন্যই প্রথম থেকে মসজিদ মুসলিম সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।[৩৭] ইসলামের শিক্ষা-সংস্কৃতি, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে মসজিদের ভূমিকা অপরিসীম। এজন্য রাসুলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে দীন প্রচারের অনুকূল পরিবেশে সামান্যতম সুযোগ পেয়েই সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে ইসলামি সমাজে মসজিদের ভূমিকা ও গুরুত্ব যে অগ্রগণ্য তা প্রমাণ করেছেন।[৩৮]

এ মসজিদে নববি ছিল মহানবি (সা.) এর প্রচারিত শিক্ষা ও আদর্শের সূতিকাগার এবং ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু। একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতি।[৩৯] বিশ্বনবি (সা.) বিশ্বকে আলোতে উদ্ভাসিত করে তোলার যে সোনালি যুগের সূচনা করেছিলেন এই মসজিদই ছিল তার কেন্দ্রবিন্দু।[৪০] মসজিদে নববি ছিল একাধারে ইসলামি রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট,

---

৩৫. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিম ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ১০০; সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫), পৃ. ১; এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ০৭; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামিয়াত* (ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃ. ১৪৯; মো. আবদুর রশীদ, *ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১১

৩৬. Edward William Lane, *Arabic English Lexicon* (London : Kitab Bhavan, 1872), p.1308; আবু 'আমর শিহাব উদ্দিন, *আল-মুনজিদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২১; Thomas Patrick Hughes, *A Dictionary of Islam* (Chicago : Kazi Publications, Inc. 1885), p. 328.; সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *বাংলাদেশের মসজিদ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ০৭; সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), পৃ. ২৩৯

৩৭. এ. এন. এম সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

৩৮. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০), খ.৫, ৩৪৫-৪৬; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামিয়াত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬

৩৯. এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম, *মদীনা শরীফের ইতিকথা* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৫), পৃ. ৪৩; *মসজিদ পাঠাগার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৪০. অধ্যক্ষ আবদুর রজ্জাক, *মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭), পৃ. ৯

বিশ্ববিদ্যালয়, বিচারালয় ও কয়েদখানা; এককথায়, সর্বকাজের মূল কেন্দ্রভূমি।[৪১] ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল কাজের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এ মসজিদ হতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো। তাই প্রাচীনকাল থেকে এ মসজিদ Muslim Community Center বা মুসলিমগণের একত্রিত হওয়ার স্থান হিসেবেও সমধিক পরিচিতি লাভ করে।[৪২] রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি খলিফাগণ তাঁর অনুসৃত নীতিতে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে এসেছেন। অনুরূপভাবে উমাইয়া ও আব্বাসি খলিফদের যুগে ও তার পরেও মসজিদ তার ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।

কিন্তু যুগের পরিবর্তনে পরবর্তী সময় নানা কারণে মসজিদকেন্দ্রিক সামাজিক অবদান ও উন্নয়নের ধারা ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে; যার ফলে মুসলিম উম্মাহ্ও পদে পদে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার হতে থাকে। যা দুঃখজনক হলেও অতীব সত্য। এ কারণে শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমাজসেবা ও সামাজিক মর্যাদায় মসজিদের ইমামগণ অনেকটাই পিছিয়ে পড়েন। আমাদের পূর্বসুরিদের মতো প্রকাশ্য ও বাস্তব উভয় দিক দিয়ে মসজিদ আবাদকরণের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখি তাহলে আমাদের জন্য বহুমুখী সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত হবে, অলৌকিক সাহায্যের পথ রচিত হবে এবং অন্যের দ্বারস্থ আমাদের হতে হবে না। যেমন আল্লামা ইকবাল (রহ.) বলেছেন,

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو - اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

অর্থাৎ ‘তুমি যদি বদরের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারো, তাহলে আকাশ থেকে এখানও ফেরেশতা অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়।’[৪৩]

ইসলামে মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব অপরিসীম; কেননা, আল্লাহ্ তা‘আলা মসজিদকে নিজের ঘর হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا অর্থাৎ ‘নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে ডেকো না।’[৪৪] আল্লাহ্ তা‘আলা মসজিদ নির্মাণ, আবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণকে মু’মিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

অর্থাৎ ‘আল্লাহ্র মসজিদসমূহ শুধু সেই ব্যক্তি নির্মাণ করে থাকে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনের ওপর ঈমান এনে থাকে, নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না।’[৪৫]

---

৪১. আ. ফ. ম. আবুবকর সিদ্দীক, *মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ৩০; মওলানা আবদুল খালেক, *নামায* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬), পৃ. ২৩১; ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *সীরাত বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.৫, পৃ. ৩৬৯-৩৭৩; এ.টি.এম. রফিকুল হাসান, *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তিন মসজিদ* (কলকাতা : লেখা প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. xv

৪২. মুনির আল-বা‘লা বাকী, *আল-মওরিদ* (বৈরুত : দারুল ‘ইলম লিল-মালাঈন, ১৯৯৮), পৃ. ৫৯৩; ইলয়াস আনতুন ইলয়াস, *কামুসুল মাদারাসি* (বৈরুত : তাওযি দারুল-জিল, তা. বি.), পৃ. ৪৮৫; *The Encyclopedia of Americana*, Vol-19, Danbury, 1829, p. 495

৪৩. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্ অনূদিত ও সম্পাদিত, *কুতবে জমান শাইখুল আরব ওয়াল-আজম আল্‌রামা শাহ্ হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রহ.* (চট্টগ্রাম : আল্লামা শাহ্ ইউনুস রহ. একাডেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫), পৃ. ৩৩৯

৪৪. আল-কুর’আন, ৭২ : ১৮

৪৫. আল-কুর’আন, ৯ : ১৮

আলোচ্য আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে তাদের মু'মিন হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, যারা সালাত আদায়ের মাধ্যমে মসজিদকে প্রাণবন্ত রাখবে, মসজিদকে পরিচ্ছন্ন রাখবে, মসজিদের সংস্কার করবে এবং সর্বোপরি, আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে।'[৪৬]

মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কারের অবারিত ফযিলতের কথা ব্যক্ত করে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) একাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত 'উসমান (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র ('ইবাদতের) উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।'[৪৭] শুধু তাই নয়, মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতাকারীদের জন্যও জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

> অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে পাখির বাসা পরিমাণ কিংবা তার চেয়েও ছোট মসজিদে নির্মাণ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রসাদ নির্মাণ করবেন।'[৪৮]

আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বলেন, যারাই মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করবে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অংশগ্রহণের পরিমাণ অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। এটা সদকায়ে জারিয়া; অর্থাৎ মু'মিনদের যে সমস্ত আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরও চলমান থাকে তন্মধ্যে অন্যতম হলো মসজিদ নির্মাণ। তাই বলা যায়, ইসলামে মসজিদের নির্মাণ, সংস্কার ও আবাদ করার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর এ আদেশ ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহাবিরা স্ব স্ব এলাকায় মসজিদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। যুগে যুগে আল্লাহ্র ওলিরাও তাদের অনুকরণেই পরবর্তীকালে মুসলিম বিশ্বে অসংখ্য মসজিদ গড়ে তোলেন। মহানবি (সা.) এর সকল কর্মের কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'মসজিদে নববি'। অনুরূপভাবে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) তাঁর সর্বাধিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে 'মসজিদ বায়তুশ শরফ'কে নির্বাচন করেছেন। 'আসহাবে সুফ্ফা'র আদলে 'মসজিদ বায়তুশ শরফ' সংলগ্ন মাদ্রাসা ও এতিমখানা গড়ে তুলেছেন। হাসপাতালসহ বিচিত্র সব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'মাসিক মদীনা'র সম্পাদক মওলানা মহিউদ্দীন খান বলেছেন,

> 'আমার দৃষ্টিতে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বড়ো দিক হলো বায়তুশ শরফ নামক মসজিদভিত্তিক প্রকল্পগুলো। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বায়তুশ শরফ নামক মসজিদগুলোর সুউচ্চ মিনার যেন আমাদের জাতীয় মর্যাদার আকাশচুম্বী প্রতীক হয়ে আছে।'[৪৯]

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদে নববির আদলে ৭৫টি 'মসজিদ বায়তুশ শরফ' প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু মসজিদ পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর ভক্তবৃন্দ এসব মসজিদ 'বায়তুশ শরফ' কে প্রদান করেন। ফলে মসজিদগুলো 'মসজিদ বায়তুশ

---

৪৬. ইমাম কুরতুবি, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন* (কায়রো : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৪), খ.৮, পৃ. ১৮৯

৪৭. আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, খ.১, পূর্বোক্ত, বাবুন মা জাআ ফি ফযলি বুনয়ানিল মসজিদ, পৃ. ৩৪; আবু 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪১

৪৮. আবু 'আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, পূর্বোক্ত, বাবুন ছওয়াবু মু'আল্লিমিন নাস খয়রা, হাদিস নং ২৩৮, পৃ. ৪৪৩

৪৯. মওলানা মহিউদ্দীন খান, 'তাঁর কীর্তির মধ্যেই তিনি শুকতারার মত জেগে থাকবেন', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া* (স্মরণ সংখ্যা ১), ১৯ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মে ১৯৯৮, পৃ. ৩৭

শরফ’ নাম ধারণ করে মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজসেবায় অগ্রণী ভূমিকা রাখছে এবং তরিকতের কেন্দ্র হিসেবেও পরিচালিত হচ্ছে। নিম্নে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মসজিদগুলোর তালিকা উল্লেখ করা হলো:[৫০]

১. মসজিদ বায়তুশ শরফ,বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।
২. মসজিদ বায়তুশ শরফ, বাস টার্মিনাল, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
৩. মসজিদ বায়তুশ শরফ, সরওয়াতলী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।
৪. মসজিদ বায়তুশ শরফ, ইন্দ্রপুল, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৫. মসজিদ বায়তুশ শরফ, আলমদার পাড়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৬. মসজিদ বায়তুশ শরফ, কাজী পাড়া, হাইদগাঁও, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
৭. মসজিদ বায়তুশ শরফ, কাটগড় বি.ও.সি’র মোড়, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৮. মসজিদ বায়তুশ শরফ, রাসুলাবাদ, চৌধুরীপাড়া, মৌলভীর দোকান, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
৯. মসজিদ বায়তুশ শরফ, পশ্চিম ঢেমশা, ছিটুয়াপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১০. মসজিদ বায়তুশ শরফ, উত্তম রামপুর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১১. মসজিদ বায়তুশ শরফ, দেওদীঘি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১২. মসজিদ বায়তুশ শরফ, উত্তর তুলাতলী, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৩. মসজিদ বায়তুশ শরফ, রূপকানিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৪. মসজিদ বায়তুশ শরফ, দক্ষিণ তুলাতলী (নতুনপাড়া), সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৫. মসজিদ বায়তুশ শরফ, বান্দরবান রাস্তারমাথা, কেরানীহাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৬. মসজিদ বায়তুশ শরফ, চরপাড়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।
১৭. মসজিদ বায়তুশ শরফ, আখতরাবাদ (কুমিরাঘোনা), লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৮. মসজিদ বায়তুশ শরফ, বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
১৯. মসজিদ বায়তুশ শরফ, পুটিবিলা, এমচর হাট, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২০. মসজিদ বায়তুশ শরফ, দরগামুড়া, পশ্চিম কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২১. মসজিদ বায়তুশ শরফ, গর্জনীয়া পাড়া, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২২. মসজিদ বায়তুশ শরফ, পূর্ব কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৩. মসজিদ বায়তুশ শরফ, লোহাগাড়া সদর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৪. মসজিদ বায়তুশ শরফ, বিবাড়ী, পদুয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৫. মসজিদ বায়তুশ শরফ, রাজাঘাটা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৬. মসজিদ বায়তুশ শরফ, খয়রাতি পাড়া, আধুনগর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৭. মসজিদ বায়তুশ শরফ, আধুনগর সিকদার পাড়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৮. মসজিদ বায়তুশ শরফ, ধামির ঘোনা, চুনতি, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
২৯. মসজিদ বায়তুশ শরফ, আন্তা পুকুরপাড়, ধামির ঘোনা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩০. মসজিদ বায়তুশ শরফ, কাথরিয়া, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম।
৩১. মসজিদ বায়তুশ শরফ, শরীফ পাড়া, সোলতানপুর, রাউজান, চট্টগ্রাম।
৩২. মসজিদ বায়তুশ শরফ, হেদায়েত আলী চৌধুরী বাড়ি, পশ্চিম রাউজান, রাউজান, চট্টগ্রাম।

---

৫০. *কার্যক্রম তালিকা*, বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম, পৃ. ১-৫

৩৩. মসজিদ বায়তুশ শরফ, লিচুবাগান, চন্দ্রঘোনা, পার্বত্য চট্টগ্রাম।
৩৪. মসজিদ বায়তুশ শরফ, পোকখালী, ঈদগাঁও, চট্টগ্রাম।
৩৫. মসজিদ বায়তুশ শরফ, ভাটিয়ারী, বানুর বাজার, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
৩৬. মসজিদ বায়তুশ শরফ, সীতাকুন্ড বাজার, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
৩৮. মসজিদ বায়তুশ শরফ, ঈদগাঁও বাজার, ঈদগাঁও, কক্সবাজার।
৩৯. মসজিদ বায়তুশ শরফ, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।
৪০. মসজিদ বায়তুশ শরফ, জালিয়াপালং, উকিয়া, কক্সবাজার।
৪১. মসজিদ বায়তুশ শরফ, রাজাপালং, উখিয়া, কক্সবাজার।
৪২. মসজিদ বায়তুশ শরফ, রতনাপালং, উখিয়া, কক্সবাজার।
৪৩. মসজিদ বায়তুশ শরফ, টেকনাফ বাজার, কক্সবাজার।
৪৪. মসজিদ বায়তুশ শরফ, টি এন্ড টির মোড়, কক্সবাজার।
৪৫. মসজিদ বায়তুশ শরফ, চিরিঙ্গা, চকরিয়া, কক্সবাজার।
৪৬. মসজিদ বায়তুশ শরফ, গোয়াতলী, চকরিয়া, কক্সবাজার।
৪৭. মসজিদ বায়তুশ শরফ, বড়ঘোপ, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।
৪৮. মসজিদ বায়তুশ শরফ, কৈয়ারবিল, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।
৪৯. মসজিদ বায়তুশ শরফ, মধ্য কৈয়ারবিল, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।
৫০. মসজিদ বায়তুশ শরফ, উত্তরধুরং, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।
৫১. মসজিদ বায়তুশ শরফ, পুটিবিলা, মহেশখালী, কক্সবাজার।
৫২. মসজিদ বায়তুশ শরফ, বাস টার্মিনাল, বান্দরবান সদর, বান্দরবান।
৫৩. মসজিদ বায়তুশ শরফ, ধনমিয়ার পাহাড় মসজিদ, তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি।
৫৪. মসজিদ বায়তুশ শরফ, ধনমিয়ার পাহাড়, তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি।
৫৫. মসজিদ বায়তুশ শরফ, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, রিজার্ভ বাজার, পুরানা বাস স্ট্যান্ড, রাঙ্গামাটি।
৫৬. মসজিদ বায়তুশ শরফ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৫৭. মসজিদ বায়তুশ শরফ, ফেনী মহিপাল, ফেনী।
৫৮. মসজিদ বায়তুশ শরফ, ফাজিরপুল, ফেনী।
৫৯. মসজিদ বায়তুশ শরফ, হারিছ চৌধুরীবাজার, চর জব্বার, নোয়াখালী।
৬০. মসজিদ বায়তুশ শরফ, কড়িহাটি, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
৬১. মসজিদ বায়তুশ শরফ, দাম বাহার, লাকসাম, কুমিল্লা।
৬২. মসজিদ বায়তুশ শরফ, বেতিহাটি, লাকসাম, কুমিল্লা।
৬৩. মসজিদ বায়তুশ শরফ, গাজীমুড়া, লাকসাম, কুমিল্লা।
৬৪. মসজিদ বায়তুশ শরফ, বিজলী রোড, নতুন বাজার, চাঁদপুর।
৬৫. মসজিদ বায়তুশ শরফ, ভৈরব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
৬৬. মসজিদ বায়তুশ শরফ, পূর্বটাট্টিউল, কুলাউড়া, মৌলভী বাজার।
৬৭. মসজিদ বায়তুশ শরফ, ১৪৯/এ, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা।
৬৮. মসজিদ বায়তুশ শরফ, সাভার, ঢাকা।
৬৯. মসজিদ বায়তুশ শরফ, কাঁচপুর, সোনাপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

৭০. মসজিদ বায়তুশ শরফ, মুসলিম টেক, জিরানী, কাশিমপুর, গাজীপুর।

৭১. মসজিদ বায়তুশ শরফ, রূপসা স্ট্যান্ড রোড, রূপসা ঘাট, খুলনা।

৭২. মসজিদ বায়তুশ শরফ, রেজওয়ান নগর ভেলুপাড়া, ঈশ্বরদী, পাবনা।

৭৩. মসজিদ বায়তুশ শরফ, হাসলা, কালিয়া, নড়াইল।

৭৪. মসজিদ বায়তুশ শরফ, সাপলেজা, শিলারগঞ্জ, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর।

৭৫. মসজিদ বায়তুশ শরফ, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

(খ) এতিমখানা প্রতিষ্ঠা

এতিম আরবি শব্দ। এটি একবচন, বহুবচনে আইতাম (أيتام); শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, নিঃসঙ্গ, অনাথ, পিতৃহীন, Orphan, Parentless।[৫১] যার পিতা অথবা মাতা অথবা উভয়ই মারা গেছে তাকে এতিম বলে।[৫২] মানুষের মধ্যে পিতা মারা গেলে এতিম বলা হয়; আর জীবজন্তুর ক্ষেত্রে মাতা মারা গেলে এতিম বলা হয়।[৫৩] মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছোটো জন্তু, পিতামাতা যে কোনো একজন হারা পাখির বাচ্চাকেও এতিম বলা হয়।[৫৪] আল্লামা রাগেব আল-ইস্পাহানি (রহ.) (মৃ. ১১০৮ খ্রি.) বলেন, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই যে শিশু পিতৃহীন হয়, তাকে এতিম বলে।[৫৫] আরবি ভাষায় বিখ্যাত অভিধান প্রণেতা ইবনে মন্‌জুর (১২৩২–১৩১১ খ্রি.) বলেন,

> اليتيم: الذي يموت أبوه حتى يبلغ الحلم، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم، واليتيمة ما لم تتزوج، فإذا تزوجت زال عنها اسم اليتيمة
>
> অর্থাৎ 'যার পিতা মারা গেছে, বালেগ হওয়া পর্যন্ত সে এতিম হিসেবে গণ্য হবে। বালেগ হওয়ার পর তাকে আর এতিম বলা যাবে না। আর মেয়ে সন্তান বিয়ের আগ পর্যন্ত এতিম থাকে। বিয়ের পর আর এতিম থাকে না।'[৫৬]

ইসলাম মানবতার ধর্ম। তাই ইসলামে এতিমের লালনপালন, শিক্ষাদীক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং মহাপুণ্যের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবি (সা.) বাল্যকালে সবাইকে হারিয়ে সর্বদিক দিয়ে এতিম ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এতিম জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى.... فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

---

৫১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯), পৃ. ১১৪৪

৫২. Dr. Rohi Baalaki, *AL-Mawrid* (Lebanon : Dar El-ilm Lilmalayin, Eigth Edition, 1996), p. 1251

৫৩. মুহাম্মদ ইবন আবু বকর ইবন আবদুল কাদির আল-রাযি, *মুখতারুস সিহাহ* (বৈরুত : দারুল ফিক্‌র আরবি, ১৯৯৭), পৃ. ৩২৩; ড. মুহাম্মদ রওয়াস কিলাজি, *মু'জামু লুগাতিল ফুক্‌হা* (বৈরুত: দারুল নফায়িস, ১৯৮৮), পৃ. ৫১৩

৫৪. প্রফেসর মওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন ও অন্যন্য কর্তৃক সম্পাদিত, *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০), খ.১, পৃ. ৩৪২

৫৫. আল্লামা রাগেব আল-ইস্পাহানি, *আল মুফরদাত ফি গরীবিল কুর'আন* (কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তাওফিকিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৫৫১

৫৬. ইবনু মন্‌জুর, *লিসানুল আরব* (বৈরুত : দারু সাদের, তা. বি.), খ.১২, পৃ. ৬৪৫; কাযি নাসিরুদ্দিন বায়দাবি, *তাফসিরে বায়দাবি* (দেওবন্দ : কুতুবখানা মুজতাবায়ি, তা. বি.), খ.১, পৃ. ৪২

অর্থাৎ ‘তিনি কি আপনাকে এতিমরূপে পাননি? অতঃপর আশ্রয় দিয়েছেন।....তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং, আপনি এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না।’[৫৭]

আল্লাহ্ তা‘আলা আল-কুর’আনের বিভিন্ন স্থানে সমাজের সকল মানুষকে এতিম, দুঃস্থ ও মজলুম মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে বিভিন্নভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। এতিমদের হক আদায় না করা ও মিসকিনদের খাবার না দেয়ার প্রতি ভর্ৎসনা করে কুর’আন মজিদে ইরশাদ হয়েছে,

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

অর্থাৎ ‘তুমি কি এমন লোককে দেখেছ, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? সে তো ঐ ব্যক্তি যে এতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর সে মিসকিনদের খাবার দানে মানুষকে উৎসাহিত করে না।’[৫৮]

যারা দুনিয়ার জীবনে এতিম, মিসকিন ও বন্দিদের উপকার করে, আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের আখিরাতে জান্নাত ও জান্নাতের বহু নিয়া‘মত দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এতিম ও মিসকিনদের প্রতি সহায়তা দান জান্নাতি মানুষের স্বভাব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করেন, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا অর্থাৎ ‘তারা পৃথিবীর জীবনে খাদ্যদ্রব্যের প্রতি নিজেদের প্রয়োজন আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকিন, এতিম ও কয়েদিদের আহার প্রদান করে।’[৫৯]

রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এতিমের লালনপালন ও অভিভাকত্বগ্রহণ এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ, মায়া-মমতা দেখানো ও স্নেহপরায়ণ হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এর জন্য মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

مَنْ عَالَ ثَلَاثَةً مِنْ الْأَيْتَامِ كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ كَهَاتَيْنِ أُخْتَانِ وَأَلْصَقَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى

অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি তিনজন এতিমের প্রতিপালন করবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে রাতে আল্লাহ্‌র ‘ইবাদত করে, দিনে রোযা রাখে এবং মাসব্যাপী আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে। রাসুল (সা.) বললেন, আমি এবং সে (এতিমের প্রতিপালনকারী) জান্নাতের মধ্যে এভাবে থাকব। একথা বলে তিনি তাঁর দুই আঙুল তথা তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি মিলিয়ে দেখালেন।’[৬০]

এ হাদিসে এটাই প্রতীয়মান হয়, যে ব্যক্তি জান্নাতে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথি হতে চায় সে যেন এই হাদিসের ওপর আমল করে এবং এতিম প্রতিপালনের প্রতি ব্রতী হয়; সার্বিক দিক থেকে তার প্রতি গুরুত্ব দেয়; কারণ আখিরাতে এর চেয়ে উত্তম আর কোনো স্থান হতে পারে না। এতিম প্রতিপালন ও তাদের প্রতি সদয় হওয়াতে অত্যধিক সওয়াব হাসিল হয়। হযরত আবু ‘উমামা বাহেলি (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন,

مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

৫৭. আল-কুর’আন, ৯৩ : ৬, ৮-৯

৫৮. আল-কুর’আন, ১০৭ : ১-৩

৫৯. আল-কুর’আন, ৭৬ : ০৮

৬০. আবু ‘আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, বাবুন হক্কুল এতিম, হাদিস নং ৩৬৭০, পৃ. ৭৬

অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো এতিমের মাথায় হাত বোলায় (এতিমের) মাথায় যত চুলের ওপর তার হাতটি অতিক্রম করবে আল্লাহ্‌ তা‘আলা প্রত্যেকটি চুলের বিনিময়ে একটি করে ছওয়াব প্রদান করবেন। আর এতিমের প্রতি সে যদি ভালো ব্যবহার করে তাহলে এই দুই অঙ্গুলির ন্যায় সে এবং আমি জান্নাতে অবস্থান করব। একথা বলে তিনি তাঁর দুই আঙুল তথা তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি মিলিয়ে দেখালেন।’[৬১]

শুধু তাই নয়, রাসুলুল্লাহ্‌ (সা.) মিসকিন ও এতিমদের জন্য সম্পদ ব্যয় করতেও উদ্‌বুদ্ধ করেছে। তিনি বলেছেন, وَإِنَّ هذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أعْطى مِنْهُ الْمِسْكِيْنَ والْيَتِيْمَ وابْنَ السَّبِيْلِ অর্থাৎ ‘এই সম্পদ হলো চিত্তমোহিনী ও সুস্বাদু[৬২]। সুতরাং সে-ই ভাগ্যবান মুসলিম যে এই সম্পদ থেকে মিসকিন, এতিম ও মুসাফিরকে দান করে।’[৬৩]

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) জন্মের আড়াই বছর বয়সে পিতাকে হারিয়ে এতিম হন। তাই এতিমের প্রতি অকৃত্রিম মায়া, মমতা ও ভালোবাসা থাকাই স্বাভাবিক। এতিম হয়ে জন্মগ্রহণ, অতঃপর এতিম হয়ে বেড়ে ওঠা, কত যে কষ্ট ও বেদনাদায়ক তা তিনি হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অধিকন্তু, এতিম লালন-পালনের ব্যাপারে কুর’আন-হাদিসে যে বিস্ময়কর ফযিলতের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে তাতে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এতিমের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন ১৫টি এতিমখানা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে পিতা-মাতাহারা এতিম শিশুদের কুড়িয়ে এনে তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করেছেন। শুধু তা-ই নয়, এতিমদের পুথিগত বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল কাজও শিক্ষা দেয়ার প্রতিও তিনি গুরুত্বারোপ করেন; যাতে ভবিষ্যৎ জীবনে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বনির্ভর জীবন-যাপন করতে পারে। তাঁর এ ধরনের মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন সমাজকল্যাণ, শিশু ও মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ডা. মোজাম্মেল বলেন,

> “‘আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ’ কর্তৃক পরিচালিত ‘বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা’র ১৮ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন হতে যাচ্ছে শুনে আমি আনন্দিত। ‘বায়তুশ শরফ’ দীনি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিত এবং এর কর্মকাণ্ড অতি ব্যাপক। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এতিমদের লেখাপড়ার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মহান উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের প্রত্যেক অঞ্চলে এ জাতীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়।”[৬৪]

‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে’র তৎকালীন সমাজকল্যাণমন্ত্রী ব্যারিস্টার রাবেয়া ভুঁইয়া ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ‘বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা’ পরিদর্শনে এসে অশ্রুসজল নয়নে এতিমদের উদ্দেশে বলেছিলেন,

> ‘তোমাদের জন্য আমি কিছু করতে পারব কি না জানি না; তবে তোমাদের এতটুকু আশ্বাস দিয়ে যেতে পারি যে, এতিম হয়ে তোমরা একবার এখানে এসেছিলে কিন্তু আর কোনো দিন

---

৬১. আবু আবদিল্লাহ আহমদ ইবন্ হাম্বল, *মুসনদে আহমদ* (রিয়াদ : মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালাতি, ২০০১), খ.৫, পৃ. ২৪৮

৬২. সম্পদের প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষা, লোভ ও লালসা থাকার কারণে একে সতেজ-সবুজ-সুস্বাদু ফলের সঙ্গে তুলানা করা হয়েছে। শুকনো ও শক্ত জিনিসের চেয়ে সবুজ ও সতেজ জিনিসের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি। একইভাবে তিক্ত বস্তুর চেয়ে সুস্বাদু বস্তু বেশি লোভনীয়। দুটির তুলনা একসঙ্গে উপস্থিত করলে অধিকতর বিস্ময় ও অভিভূতি বোঝানো হয়। দ্র. ইব্‌ন হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি শরহু সহিহিল বুখারি* (বৈরুত : দারুল মা‘রিফ, ১৯৫৯), খ.৩, পৃ. ৩৩৬

৬৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল বুখারী, *আল-জামি‘আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, বাবুন আস-সাদাকাতু ‘আলাল ইয়াতামা, হাদিস নং ১৩৯৬

৬৪. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) : জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০

এতিম হবে না। তোমরা পিতৃহীন নও; বরং তোমরা যে পিতা পেয়েছ এদেশে আর কোনো সন্তানের এমন পিতা আছে বলে আমার মনে হয় না।'[৬৫]

নিম্নে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এতিমখানাগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো:

১. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

এটি চট্টগ্রাম জেলার প্রাণকেন্দ্র ধনিয়ালাপাড়া, ডি. টি. রোডে 'কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফে' অবস্থিত। হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) তাঁর একান্ত ভক্ত-মুরিদদের সহযোগিতায় ১৪ই মার্চ, ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ' হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। এর রেজি. নং ৭৮০/৭৯। উল্লেখ্য যে, জনৈক মুরিদ কর্তৃক মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর শহরে বাসভবনের জন্য প্রদত্ত অনুদানের জমিতে, মুরিদদের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ২১০ জন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে। এতিমখানার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (এম. এ.) মাদ্‌রাসা'র সম্মানিত শিক্ষক মওলানা মুহাম্মদ আব্দুশ শাকুর।[৬৬]

২. সাতকানিয়া বায়তুশ শরফ খেদমত কমিটি এতিমখানা, চট্টগ্রাম

এটি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া থানাধীন পশ্চিম ঢেমশা রোজমর পাড়ায় অবস্থিত। সাতকানিয়ার বিশিষ্ট দানবীর, ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী 'বায়তুশ শরফ দরবারে'র একনিষ্ঠ খাদেম মরহুম আলহাজ নূর আহমদ সওদাগরের দানে এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং একই বছর 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ' হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। এর রেজি. নং ১৩৫৯/৮৮। বর্তমানে এখানে ৫৫ জন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন 'বায়তুশ শরফ আদর্শ আখতরিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা'র ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আলহাজ মওলানা কফিল উদ্দিন।[৬৭]

৩. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

এটি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত উত্তর রামপুরায় অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজহিতৈষী আলহাজ নুরুল ইসলামের আন্তরিক সহযোগিতায়, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন; তবে এটি এখনও 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ' হতে রেজিস্ট্রেশন হয়নি। বর্তমানে এখানে ৫২ জন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে।[৬৮]

---

৬৫. মোহাম্মদ আমান উল্লাহ্ খান, 'অশ্রুবন্যায় প্লাবিত একটি তিরোধান', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া* (স্মরণ সংখ্যা ১), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

৬৬. জনাব মওলানা আবদুশ শাকুর, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক, বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা ও শিক্ষক, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (এম. এ.) মাদ্‌রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৬৭. জনাব মওলানা কফিল উদ্দিন, অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), বায়তুশ শরফ আদর্শ আখতরিয়া ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্‌রাসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৬৮. জনাব মওলানা সালামত উল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক, বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৪. আধুনগর শাহ্ জব্বারিয়া এতিমখানা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

এটি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া উপজেলাধীন আধুনগরে অবস্থিত। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক আলহাজ মওলানা আশরফ আলী (রহ.)-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ' হতে ctg-945/81 নং-এ রেজিস্ট্রেশন হয়। বর্তমানে এখানে ১৮ জন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে।[৬৯]

৫. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা, চিববাড়ি, সাতকানিয়া

এটি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সাতকানিয়া উপজেলার চিববাড়ি নামক স্থানে অবস্থিত। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ মোহাম্মদ সোলায়মান সওদাগরের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ০৭ ও ১৭০ জন।[৭০]

৬. দরগাহমুড়া বায়তুশ শরফ শাহ্ জব্বারিয়া এতিমখানা, পশ্চিম কলাউজান, চট্টগ্রাম

এটি চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানাধীন পশ্চিম কলাউজানের দরগাহমুড়া এলাকায় অবস্থিত। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি এখনও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ হতে রেজিস্ট্রেশন হয়নি। বর্তমানে এখানে ২৫ জন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে।[৭১]

৭. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কক্সবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র বায়তুশ শরফ রোডে অবস্থিত। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মরহুম মাস্টার সিরাজুল ইসলাম ও মওলানা তাহেরুল ইসলামসহ অন্যদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ' হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। এর রেজি নং-০৩/৯০। বর্তমানে ১৫০ জন এতিম কারিগরি প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।[৭২]

৮. কুতুবদিয়া বায়তুশ শরফ শাহ্ জব্বারিয়া এতিমখানা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার

এটি কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া থানার অন্তর্গত বড়ঘোপ নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় কতিপয় সমাজহিতৈষীর সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ৪ঠা মে, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ' হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। এর রেজি. নং ৫৮/৯৪। বর্তমানে এখানে ৩০ জন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে।[৭৩]

---

৬৯. জনাব মওলানা মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক, আধুনগর শাহ্ জব্বারিয়া এতিমখানা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭০. হাফেজ মওলানা শহীদুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক, বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা ও হেফযখানা, চিববাড়ি, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭১. জনাব মওলানা আবদুল মন্নান, তত্ত্বাবধায়ক, দরগাহমুড়া বায়তুশ শরফ শাহ্ জব্বারিয়া এতিমখানা, পশ্চিম কলাউজান, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭২. জনাব মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, মহাপরিচালক, কক্সবাজার বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, কক্সবাজার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭৩. জনাব হাফেজ মওলানা আবু সৈয়দ, তত্ত্বাবধায়ক, কুতুবদিয়া বায়তুশ শরফ শাহ্ জব্বারিয়া এতিমখানা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৯. মধ্য কৈয়ারবিল বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার

কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত কুতুবদিয়া থানার মধ্য কৈয়ারবিল নামক স্থানে এটি অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ' হতে এখনও রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়নি। বর্তমানে এখানে ৫০ জন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে।[৭৪]

১০. উত্তর গাঁথার ছড়া বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা, লংগদু

এটি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির লংগদু থানাধীন গাঁথার ছড়ায় অবস্থিত। স্থানীয় দানশীল ও সমাজসেবকদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ' হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। এর রেজিঃ নং ৪২/৯১। বর্তমানে এখানে ৭০ জন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে এবং পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মওলানা ফোরকান আহমদ।[৭৫]

১১. বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি

এটি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির পুরান বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন রিজার্ভ বাজারে অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজসেবক ও দানবীরদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং একই বছর 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ' হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। এর রেজি নং ৪৪/৯১। বর্তমানে এখানে ৬০ জন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব মওলানা ছরওয়ার আলম।[৭৬]

১২. খাগড়াছড়ি বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা, আরামবাগ, খাগড়াছড়ি

এটি পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি-র খাগড়াছড়ি সদর থানার অন্তর্গত আরামবাগ নামক স্থানে অবস্থিত। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে 'সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ' হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। এর রেজি. নং ১৪৯/৯৮। বর্তমানে এখানে ১৫০ জন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে। তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন 'বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা'র সুপার জনাব মওলানা আবু ওসমান।[৭৭]

---

৭৪. জনাব মুহাম্মদ আবু ছৈয়দ, শিক্ষক, কুতুবদিয়া বায়তুশ শরফ শাহ্ জব্বারিয়া এতিমখানা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭৫. জনাব মওলানা ফোরকান আহমদ, সুপারিনটেনডেন্ট, উত্তর গাঁথার ছড়া বায়তুশ শরফ আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা ও পরিচালক, উত্তর গাঁথার ছড়া বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা, মাইনীমুখ, লংগদু, রাঙ্গামাটি থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭৬. জনাব মওলানা ছরওয়ার আলম, তত্ত্বাবধায়ক, বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রিজার্ভ বাজার, পুরান বাস স্ট্যান্ড, রাঙ্গামাটি থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭৭. জনাব মওলানা আবু ওসমান, সুপারিনটেনডেন্ট, বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া আদর্শ দাখিল মাদ্‌রাসা, আরামবাগ, খাগড়াছড়ি থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১৩. বায়তুশ শরফ লহরি জব্বারিয়া এতিমখানা, উত্তর পদুয়া, চৌদ্দগ্রাম

এটি কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার অন্তর্গত উত্তর পদুয়ার লহরি নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় কতিপয় সমাজহিতৈষী ও শিক্ষানুরাগীর আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ০১/০১/১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ৫০ জন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে।[৭৮]

১৪. বায়তুশ শরফ শাহ্ আবদুল জব্বার (রাহ.) এতিমখানা, নাজিরপুর

এটি পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার কলারদোয়ানিয়ায় অবস্থিত। স্থানীয় বিশিষ্ট 'আলিমে দীন মওলানা সুলতান আহমদ ও অন্যদের সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে ৩০ জন এতিম প্রতিপালিত হচ্ছে।[৭৯]

(গ) হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা

মানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (সা.) ধর্মপ্রচারকের পাশাপাশি একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকও ছিলেন। ইসলামি শরি'আতের প্রচার-প্রসারের পাশাপাশি তিনি স্বাস্থ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবিগণকে চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চায় অনুপ্রাণিত করেন। ফলশ্রুতিতে হুমায়ন বিন ইসহাক, ঈসা ইবন ইয়াহিয়া ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক আবু আলি ইবন সিনার মতো কালজয়ী চিকিৎসকের উদ্ভব হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, ৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে মুসলিমগণই বিশ্বের প্রথম হাসপাতাল স্থাপনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসার গোড়াপত্তন করেন। এই মুসলিম বিজ্ঞানীদের রচিত গ্রন্থসমূহের ওপর ভিত্তি করে গবেষণা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ আজ ক্লোনিং পদ্ধতির মতো চিকিৎসাবিজ্ঞানে অবিশ্বাস্য উন্নতি সাধন করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলিম চিকিৎসকগণ বিভিন্ন কারণে তাদের সেই পুরানো ঐতিহ্য আজ ধরে রাখতে পারেননি। ফলে তারা বর্তমানে একেবারেই পশ্চাৎপদ এবং পর মুখাপেক্ষী। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম চিকিৎসকগণের অবস্থাও শোচনীয়। তাই বিত্তবানরা অধিকতর উন্নত চিকিৎসাসেবা গ্রহণের উদ্দেশে ইউরোপ আমেরিকায় গমন করেন। পক্ষান্তরে, অসংখ্য গরিব, দুস্থ, অসহায় ও সমাজে অবহেলিত এতিম ও বিধবা উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অকালে প্রাণ হারাচ্ছেন।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এই গরিব রোগীদের কথা ভেবেছিলেন। কারণ সত্যিকারের পীর-মুর্শিদগণ তাদের জীবনে নবিগণের উত্তম আদর্শই বাস্তবায়ন করেছেন। নবিগণের অনুরূপ তাঁরাও দীনের প্রচার প্রসারের সাথে সাথে অবহেলিত জনপদের সেবার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; কারণ তরিকতের মূলকথা সৃষ্টির সেবা। যেমন বলা হয় : طریقت بجز خدمت خلق نیست অর্থাৎ 'তরিকতের কাজ সৃষ্টির সেবা করা।' রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ অর্থাৎ 'সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি সেই, যে মানুষের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়।'[৮০]

---

৭৮. জনাব মওলানা মুহাম্মদ আবু কাসেম, সভাপতি, বায়তুশ শরফ লহরি জব্বারিয়া এতিমখানা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৭৯. জনাব মওলানা সুলতান আহমদ, সভাপতি, বায়তুশ শরফ শাহ্ আবদুল জব্বার (রহ.) এতিমখানা, নাজিরপুর, পিরোজপুর থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৮০. আত-তাবারানি, *আল-মু'জামুল আওসাত*, খ.১৩, হাদিস নং ৫৯৪৯, পৃ. ৩১১

তাই মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্তমানবতার সেবার উদ্দেশ্যে যুগের চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে সারা দেশে ০৮টি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিম্নে সেগুলোর বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো:

১. বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতাল, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, কক্সবাজার

এটি কক্সবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্রে বায়তুশ শরফ রোডে 'বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে' অবস্থিত। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) চক্ষু চিকিৎসার সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানেও এ হাসপাতালে চক্ষু অপারেশনসহ প্রয়োজনীয় বিবিধ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।[৮১] এ মহতী কাজে 'ব্রিটেনের রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দ্যা ব্লাইন্ড' এর অঙ্গসংস্থা 'সাইটসেভার্স ইন্টারন্যাশনাল' যাবতীয় আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। চক্ষু চিকিৎসার প্রয়োজনীয় অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে ছানি অপারেশন, ইন্ট্রাসকুলার লেন্স বা ILO অর্থাৎ চোখের ভিতর অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম লেন্স সংযোজন, চোখের বিভিন্ন ধরনের অপারেশন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে চশমার পাওয়ার নির্ণয়ের ব্যবস্থাসহ চোখের সব রোগের চিকিৎসা করা হয়।

হাসপাতালের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো জনগণের অন্ধত্ব নিবারণ। দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা ও চিকিৎসার মাধ্যমে দৃষ্টিজনিত সমস্যার সমাধানকল্পে এতদঞ্চলের প্রতিটি এলাকায় PSP (Patient Screening Programme) চক্ষু শিবির পরিচালনা করা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষার পর জটিল রোগীদের নিজস্ব পরিবহণে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দানের পর পুনরায় হাসপাতালের নিজস্ব খরচে রোগীদের নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেয়া হয়। এখন 'কক্সবাজার বায়তুশ শরফ হাসপাতাল'টি দক্ষিণ চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের শ্রেষ্ঠ চক্ষু হাসপাতাল।[৮২] আর্তমানবতার সেবায় এ হাসপাতাল অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইনডোর ও আউটডোর মিলে এ পর্যন্ত প্রায় ১৪ লাখ মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। চোখের অপারেশন হয়েছে ৫০ হাজারেরও অধিক রোগীর।[৮৩]

২. বায়তুশ শরফ শিশু হাসপাতাল, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, কক্সবাজার

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার চিকিৎসা সেবায় কিছুটা উন্নতি হলেও দক্ষিণ চট্টগ্রাম, বান্দরবান, পার্বত্য জেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকা, মহেশখালী, সেন্টমার্টিন, সোনাদিয়া প্রভৃতি দ্বীপাঞ্চলসহ উপকূলবাসীর নিকট উন্নত চিকিৎসা সুদূরপরাহত ছিল। এতদঞ্চলে কোনো শিশু হাসপাতাল না থাকায় এতিম ও গরিব শিশু-কিশোররা বিনা চিকিৎসায় মানবেতর জীবন যাপন করত। তাই মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) জাতিধর্মনির্বিশেষে উক্ত এলাকার আপামর জনগণের চিকিৎসার ক্ষেত্রে

---

৮১. কে.এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.)-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৮২. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ, এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের স্মৃতিচারণ', *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক শাহ্সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৮৩. *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, 'আর্তমানবতার সেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত : ১৪ লাখ মানুষের চোখের আলো ফিরিয়ে দিলো কক্সবাজার বায়তুশ শরফ চক্ষু হাসপাতাল', ১৩ বর্ষ, ১৯৩ সংখ্যা, ৯ই ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃ. ৪

বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে ‘কক্সবাজার বায়তুশ শরফ শিশু হাসপাতাল’ নামে আরও একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৪]

এই শিশু হাসপাতালের মাধ্যমে ফ্রান্সের একটি সাহায্য সংস্থার তত্ত্বাবধানে রিকেট (Ricket) রোগাক্রান্ত দুটি শিশু মোহাম্মদ আলি হোসেন ও মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনকে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও জটিল অপারেশনের মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। বর্তমানে হাড় জোড়া ও পঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফ্রান্সের বেসরকারি সংস্থা Aid Medical Development এর সহযোগিতায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে; যা হাড় ভাঙা ও পঙ্গু রোগীদের বিশেষ চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে, ‘কক্সবাজার বায়তুশ শরফ শিশু হাসপাতাল’ ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৬০ শয্যাবিশিষ্ট ‘কক্সবাজার বায়তুশ শরফ হাসপাতালে’ উন্নীত হয়।[৮৫]

৩. বায়তুশ শরফ দারুশ শেফা দাতব্য চিকিৎসালয়, ফার্মগেট, ঢাকা

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) জাতিকে সরল সঠিক পথে পথ প্রদর্শনের পাশাপাশি মানবসেবারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তিনি রাজধানীর বুকে ফার্মগেটস্থ ‘বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স মসজিদে’র নীচতলায় ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে ‘বায়তুশ শরফ দারুশ শেফা ক্লিনিক’ নামে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।[৮৬] আলহাজ ইউসুফ আলি ও আলহাজ্ব তাহের সোবহান (জন্ম ১৯৩৪ খ্রি.) সহ আরও কয়েকজন মিলে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গিয়ে হাসপাতালের জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে আনেন।

হাসপাতালটির উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে’র তৎকালীন স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী ডা. আজিজুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম (১৯২৮–২০১৩ খ্রি.), ‘বায়তুল মোকার্‌রম মসজিদে’র খতিব মওলানা ওবায়দুল হক (রহ.)[৮৭] (১৯২৮–২০০৭ খ্রি.), ‘মাসিক মদিনা’র সম্পাদক মওলানা মুহিউদ্দিন

---

৮৪. *দৈনিক পূর্বকোণ*, ‘কক্সবাজারে বায়তুশ শরফ শিশু হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন’, ১০ অক্টোবর, ১৯৯২, পৃ. ৪; মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, জাকিয়া ছুফিয়ান, ‘চিকিৎসা সেবায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.)’, *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক শাহ্‌সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭-১৭০

৮৫. তথ্যদাতা : আলহাজ মাস্টার সিরাজুল ইসলাম, মহাপরিচালক, কক্সবাজার বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স; মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, ‘মানবসেবার প্রাণ পুরুষ হুজুর কেবলা (রহ.)’, *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

৮৬. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, জাকিয়া ছুফিয়ান, ‘চিকিৎসা সেবায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.)’, *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক শাহ্‌সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭-১৭০; মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের আয়না*, পূর্বোক্ত, পৃ.১২৭

৮৭. তিনি সিলেট জেলার জকীগঞ্জ থানাধীন বারঠাকুরী গ্রামে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মওলানা জহুরুল হক এবং মাতা জোবেদা খাতুন। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ‘দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা’য় ভর্তি হয়ে ১৯৪৮ ও ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে দাওরায়েহাদিস ও তাফসির পাস করেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি দেশ-বিদেশে বহু দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় চল্লিশ বৎসর অধ্যাপনা করেন। ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাস থেকে বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ ঢাকার ‘বায়তুল মুকার্‌রম’-এর খতিব হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি ‘ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড’ এর শর‘ঈ সুপারভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও আজীবন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি মাদ্‌রাসার

খান (১৯৩০–২০১৬ খ্রি.) এবং ফ্রান্সের একটি প্রসিদ্ধ হাসপাতালে কর্মরত বাংলাদেশি কার্ডিয়োলজিস্ট ডা. ওবায়দুর রহমান। হাসপাতালটির উদ্‌বোধনী ভাষণে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বলেন,

> 'মসজিদটির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য নিচে মার্কেট করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরে সম্পূর্ণ অংশে ক্লিনিক করা হয়। এখানে ধনী বা বিত্তশালী রোগী এবং গরিব ও দরিদ্র, এ দুই শ্রেণির রোগী চিকিৎসার জন্য আসবে। যারা ধনী ও বিত্তবান তাদের কাছ হতে ন্যায্য টাকা নিয়ে চিকিৎসা করা হবে এবং এ টাকা দিয়ে গরিব ও দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হবে।'[৮৮]

এ ক্লিনিকের মাধ্যমে হাজার হাজার ধনী লোক চিকিৎসা সেবা নেওয়ার পাশাপাশি অগণিত গরিব, দুঃস্থ, অসহায়, এতিম এবং বিধবা প্রভৃতি সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী চিকিৎসা সেবা পেয়ে ধন্য হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞ লোকের অভাবে 'আন্‌জুমনে ইত্তেহাদে'র পক্ষে হাসপাতালটি চালু রাখা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে এটি নামমাত্র ভাড়ায় 'ব্রেন এন্ড মাইন্ড হাসপাতাল' নামে একটি মানসিক চিকিৎসা হাসপাতাল হিসেবে চালু রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিমাসে ১০০০ থেকে ২০০০ রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধপত্র দেয়া হচ্ছে।[৮৯]

৪. বায়তুশ শরফ অ্যালোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) তরিকতচর্চার পাশাপাশি মানবসেবাকে তরিকতের অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন। তাই তাঁর সারাটি জীবন ওয়ায-নসিহত, তরিকতের তা'লিম, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে জাতিধর্মনির্বিশেষে দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন। গরিব-দুঃখী, অসহায়, অসুস্থ মানুষের সেবার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম 'চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্সে' ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুশ শরফ দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র' চালু করেন।[৯০] উক্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক পর্যায়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকেন্দ্র হিসেবে চালু করা হয়েছিল। পরবর্তিকালে হোমিও এবং অ্যালোপ্যাথিক উভয় প্রকারের চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ দাতব্য চিকিৎসালয় অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে লক্ষাধিক রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দিয়েছে।[৯১]

পাঠ্য কিতাব নূরুল আনওয়ার, আকাইদ, শরহে বেকায়া, কাফিয়া ইত্যাদির ব্যাখ্যাগ্রন্থও রচনা করেন। তিনি ৬ই অক্টোবর, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. মওলানা এস. এ. আমিনুল ইসলাম, *বাংলার শত আলেমের জীবনকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৩

৮৮. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, শাহজাহান মানিক, 'দুঃস্থ মানবতার চিকিৎসা সেবায় বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.)', *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক শাহ্‌সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৩-১৭৪

৮৯. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের আয়না*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৯০. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, শাহজাহান মানিক, 'দুঃস্থ মানবতার চিকিৎসা সেবায় বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.)', *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক শাহ্‌সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৩

৯১. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, জাকিয়া ছুফিয়ান, 'চিকিৎসা সেবায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.)', *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক শাহ্‌সূফী হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রাহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৫. বায়তুশ শরফ ডেন্টাল কেয়ার, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

এটি বায়তুশ শরফের প্রাণকেন্দ্র ধনিয়ালাপড়া, 'বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রামে' অবস্থিত। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে গরিব ও অসহায় রোগীদের স্বল্প খরচে বা বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে অভিজ্ঞ দুজন ডাক্তার জনাব রায়হান আলী ও ইয়াকুব আলীর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রায় ৫০,০০০০ এর অধিক রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।[৯২]

৬. বায়তুশ শরফ দাতব্য চিকিৎসালয়, রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা

এটি খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত রূপসা স্ট্যান্ড রোড নামক স্থানে অবস্থিত। স্থানীয় একদল বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজসেবকের আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ২০শে মার্চ, ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। গরিব, এতিম, দুস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণে আর্ত মানবতার সেবার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত চিকিৎসালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়মিতভাবে একজন এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে প্রায় ৩০,০০০ গরিব জনসাধারণকে ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া আর্থিক অসচ্ছল রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হয়।[৯৩]

৭. বায়তুশ শরফ আখতরিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়, নাজিরপুর, পিরোজপুর

এটি পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার কলারদোয়ানিয়ায় অবস্থিত। স্থানীয় একদল সমাজহিতৈষীর আন্তরিক সহযোগিতায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সপ্তাহে একদিন, শুক্রবার একজন এমবিবিএস ডাক্তারের মাধ্যমে রোগীদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ করে আসছে। এ পর্যন্ত ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ গরিব, দুঃখী ও অসহায় রোগীদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে ।[৯৪]

(ঘ) ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন

'ইসলামি ব্যাংকিং' পরিভাষাটি বিংশ শতাব্দীর উদ্ভাবন। ষাটের দশক থেকে বিশ্বের অর্থনৈতিক মানচিত্রে সুদমুক্ত ইসলামি শরি'আহ্ সম্মত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। সমকালীন বিশ্বে 'ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা' এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। এর ইনসাফপূর্ণ আদর্শ, বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলামি ব্যাংকিং সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের চেয়ে ভিন্ন। 'ইসলামি ব্যাংক' ইসলামি অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা এর মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির সকল পর্যায়ে ইসলামি শরি'আহ্র নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকাণ্ডের সকল স্তরে সুদ বর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

---

৯২. জনাব মুহাম্মদ আব্দুল খালেক, *অফিস সেক্রেটারি*, বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৯৩. আলহাজ জাফর আহমদ রাজা, সাংগঠনিক সম্পাদক, খুলনা বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, খুলনা সদর, খুলনা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

৯৪. মওলানা সুলতান আহমদ, সভাপতি, বায়তুশ শরফ আখতরিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়, নাজিরপুর, পিরোজপুর থেকে সংগৃহীত তথ্য।

ইসলামি ব্যাংকের পরিচয়

১. ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী আর্থসামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামি শরি'আতের নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকই হচ্ছে ইসলামি ব্যাংক।[৯৫]

২. 'ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)' ইসলামি ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করেছে। সংজ্ঞার্থটি হলো, Islami Bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations. অর্থাৎ 'ইসলামি ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার উদ্দেশ্য, আইন-কানুন[৯৬] ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামি শরি'আতের নীতিমালা মেনে চলে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণ বর্জন করে।'[৯৭]

৩. ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে 'ইসলামি ব্যাংকিং আইন' পাশ করা হয়; এ আইনে ইসলামি ব্যাংকের নিম্নরূপ সংজ্ঞার্থ দেয়া হয়েছে, Islamic Banking means any company; Islamic Banking business means banking and holds a valid licence. Operations for not involve any element which is not approved by the Religion of Islam. অর্থাৎ 'ইসলামি ব্যাংক এমন একটি কোম্পানি যা ইসলামি ব্যাংকিং কারবারে নিয়োজিত, আর ইসলামি ব্যাংকিং কারবার হলো এমন কারবার যার লক্ষ্য ও কার্যক্রমের মধ্যে এমন কোনো উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করেনি।'[৯৮]

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ভূমিকা

আলিমগণ কুর'আন ও হাদিসের আলোকে সুদ সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন; কিন্তু 'সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা' প্রবর্তনের কথা কেউ সেভাবে উল্লেখ করেননি। অক্টোপাসের ন্যায় আকড়ে ধরা সুদের নিগড় থেকে বাংলাদেশের জনগণকে রক্ষাকল্পে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)। ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তিনি সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ নিয়েছেন। সুদের অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করার কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন। ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে 'বায়তুশ শরফ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান' এ দেশে সর্বপ্রথম 'সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা' শীর্ষক দুদিন ব্যাপী একটি জাতীয় ফলপ্রসূ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ ব্যাংকে'র তৎকালীন ডেপুটি গভর্নর এম.

---

৯৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরিফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংকব্যবস্থা* (ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, অক্টোবর ১৯৯৬), পৃ. ২৬

৯৬. আরবি 'কানুন' শব্দটি গ্রিক শব্দ থেকে এসেছে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি আইন, নিয়ম, সূত্র, বিধি, বিধান, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। দ্র. ড. গালিব আলি আদ-দাওআদি, *আল-মাদ্খাল ইসলা ইলমিল কানুন* (আম্মান : দারু ওয়াঈল লিত্ তিবাআতি ওয়ান্ নাশরি, ২০০৪), পৃ. ১০; পারিভাষিক সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে মান্নাউন কাত্তান (১৯২৬–১৯৯৯) বলেন, কানুন বলা হয় ঐসব নীতি, বিধি ও নিয়মের সমষ্টিকে, যা কোনো জাতির চিন্তাশীল বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য প্রণয়ন করেন। দ্র. মান্না খলিল আল-কাত্তান, *তারিখুল তাশরিইল ইসলামি* (কায়রো : মাকতাবতু ওয়াহাবাহ, ২০০১), পৃ. ১২

৯৭. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরিফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৯৮. *লজ অব মালয়েশিয়া*, অ্যাক্ট নং ২৭৬, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই মার্চ রাজকীয় অনুমোদনপ্রাপ্ত, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত, পৃ. ৮

খালেদ খান। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ের প্রবীণ অধ্যাপকগণ এবং সোনালী ব্যাংকের তৎকালীন অফিসার এম. আজিজুল হক।[৯৯]

এতে সভাপতিত্ব করেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)। এই সেমিনারে বিশিষ্ট ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, ইসলামি চিন্তাবিদ, উলামায়ে কিরাম, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী এবং শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া পরবর্তীকালে আরও কিছু আর্থ-সামাজিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন, ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো (IERB), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM) এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ইসলামিক ব্যাংকার্স অ্যাসোসিশেয়ন এ জাতীয় সেমিনারের অয়োজন করে। আরও উল্লেখ্য যে, 'বায়তুশ শরফে' ইসলামি ব্যাংকিং সিস্টেমের ওপর আয়োজিত সেমিনারের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন বিশিষ্ট ইসলামি ব্যাংকিং কনসালটেন্ট জনাব মুহাম্মদ আজিমুল হক ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোর 'আল-আযহার ইউনিভার্সিটি' প্রাঙ্গণে 'ইসলামিক ব্যাংকিং এন্ড ইকনমিক্স' শীর্ষক ৪৫ দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক কোর্সে যোগদান করেন; যা পরবর্তীকালে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় ছিল যুগান্তকারী এক পদক্ষেপ।

১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংকে'র একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যৌথ উদ্যোগের সম্ভাবনা নিরীক্ষণ-মূল্যায়নের জন্য ঢাকায় আসে এবং প্রস্তাবিত ইসলামি ব্যাংকে 'ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)' উদ্যোক্তা হিসেবে মূলধন বিনিয়োগের অনুকূলে সুপারিশ করেন। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফলে ইসলামি আদর্শে উদ্‌বোদ্ধ দেশ-বিদেশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ইসলামি ব্যাংক ও ইসলামি সংস্থা বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকের ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব আবদুর রাজ্জাক লস্কর এবং ঢাকায় নিযুক্ত বাংলাদেশে সৌদি আরবের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও 'ইসলামি সম্মেলন সংস্থা'র সাবেক সহকারী মহাসচিব মরহুম শেখ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল-খতিব (রহ.)-এর কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তবে ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রমকে সর্বজনীন ও গতিশীল করার লক্ষ্যে তাদের প্রয়োজন ছিল এমন এক ব্যক্তিত্বের সমর্থন যার রয়েছে দেশময় খ্যাতি এবং ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা।

তাই উদ্যোক্তাগণ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সাহেবের শরণাপন্ন হলে সাথে সাথেই তিনি এ মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তখন তিনি 'বায়তুশ শরফে'র ভক্ত-অনুরক্তদের নিয়ে 'বায়তুশ শরফ ফাউন্ডেশন' নামে একটি লিমিটেড কোম্পানি গঠন করেন। এটি ১২ই জুলাই, ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি আইনে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীকালে এই কোম্পানির সদস্যদের নিকট থেকে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা চাঁদা নিয়ে শেয়ার ক্রয়ের জন্য দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ইসলামি ব্যাংকে বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের মধ্যে 'বায়তুশ শরফ ফাউন্ডেশন লিমিটেড' এর শেয়ারই সবচেয়ে বেশি ছিল।[১০০] তাঁর উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দেশবরেণ্য আলেমে দীন মওলানা মহিউদ্দীন খান বলেন,

৯৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, 'বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.)-এর পবিত্র জীবনধারা', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭

১০০. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, 'যেখানে আমার স্বপ্নেরা ভিড় জমায়', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

'ইসলামি ব্যাংকসহ আরও কয়েকটি উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে এগুলির সফল বাস্তবায়নের প্রধান কান্ডারি বায়তুশ শরফের পীর সাহেবের নিজের জীবন যাত্রা সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে, তা অনুধাবন করে বারবার মহাকবি ইকবারের সেই মহান দরবেশের কথাই মনে পড়ে; যিনি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঘটঘুটে আঁধার রাতে তাঁর আদর্শের চেরাগখানি অতিকষ্টে জ্বালিয়ে রেখে দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষকে পথের দিশা বলে দিতেন।'[১০১]

এভাবে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে সফলতার দিকে এগিয়ে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' ১৩ই মার্চ, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি আইনের আওতায় বাংলাদেশে লাইসেন্স লাভ করে। অবশেষে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ৩০শে মার্চ, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২ই আগষ্ট, ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে এর প্রধান শাখা রাজধানী ঢাকার ৭৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় তিনতলা বিশিষ্ট একটি ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে। এটি বাংলাদেশে সুদমুক্ত এবং শরি'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত প্রথম ইসলামি ব্যাংক।[১০২]

ইসলামি শরি'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এদেশের কিছুসংখ্যক ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি মুসলিম দেশসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা ইসলামি ব্যাংক সংস্থা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুসলিম মনীষীগণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেন এবং এ ব্যাংকের মূলধনে অংশীদার হন। ফলে এটি একটি অনন্যসাধারণ আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।[১০৩] 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়েছে। এ নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ায় প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের বাস্তব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।[১০৪]

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও স্পন্সর ডাইরেক্টর ছিলেন।[১০৫] বহুবছর ব্যাংকটির পরিচালনা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে'র বার্ষিক রিপোর্ট (১৯৮৩–২০০০ খ্রি.) এর মতে, ব্যাংকের বাংলাদেশি উদ্যোক্তাগণ হলেন:[১০৬]

---

১০১. মহিউদ্দীন খান, 'তাঁর কীর্তির মধ্যেই তিনি শুকতারার মত জেগে থাকবেন', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া* (স্মরণ সংখ্যা ১), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

১০২. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.)-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯; রায়হান আযাদ, 'বায়তুশ শরফের রূপকার শাহসূফী হযরত মাওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) স্মরণে', *দৈনিক কর্ণফুলী*, ২৬ মার্চ, ২০১২, পৃ. ৪

১০৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরিফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬

১০৪. *দৈনিক ঈশান*, আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, 'পীর-ই-বায়তুশ শরফ : একজন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব', ২৮ মার্চ, ১৯৯৮, পৃ. ২

১০৫. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক আহমদ, 'এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের স্মৃতিচারণ', *আধ্যাত্মিক ও সমাজ সংস্কারক বায়তুশ শরফের পীর সাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১০৬. *Annual Report 1983*, Islami Bank Bangladesh Limited; *বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৯৭ খ্রি.*, জনসংযোগ বিভাগ, ঢাকা, পৃ. ৬; *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি-২০০১*, পৃ. ১০

ক্রম.	উদ্যোক্তাগণের নাম	ক্রম.	উদ্যোক্তাগণের নাম
০১	মরহুম মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক লস্কর	১৩	ইঞ্জিনিয়ার মোস্তফা কামাল আনোয়ার
০২	মরহুম মফিজুর রহমান	১৪	অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
০৩	ব্যারিস্টার তমিজুল হক	১৫	সিরাজুদ্দৌল্লা
০৪	মরহুম মোহাম্মদ ইউনুছ	১৬	শাহ্ আবদুল হান্নান (প্রতিনিধি, ইবনে সিনা ট্রাস্ট)
০৫	মরহুম মুহাম্মদ সফিউদ্দিন দেওয়ান	১৭	এ. কে. এম. নাজির আহমদ (প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)
০৬	মুহাম্মদ বশির উদ্দিন	১৮	অধ্যাপক মুহাম্মদ শরিফ হুসাইন (প্রতিনিধি, ইসলামিক ইকনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো)
০৭	মুহাম্মদ হোসেন	১৯	মরহুম মুহাম্মদ নুরুজ্জামান
০৮	মরহুম নাসিরুদ্দীন আহমদ	২০	আবুল কাশেম
০৯	মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন	২১	ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ দাউদ খান
১০	মরহুম মুহাম্মদ মালেক মিনার	২২	এ. কে. ফজলুল হক
১১	জাকির উদ্দিন আহমদ	২৩	মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (প্রতিনিধি, বায়তুশ শরফ ফাউন্ডেশন লিমিটেড, চট্টগ্রাম)
১২	এম. এ. রশিদ চৌধুরী		

এ ব্যাংকের বিদেশি উদ্যোক্তাগণ হলেন:[১০৭]

ক্র.	উদ্যোক্তাগণের নাম	ঠিকানা
০১	ইসলামি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক	সৌদি আরব
০২	কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস (কেএসসি)	কুয়েত
০৩	জর্দান ইসলামিক ব্যাংক	জর্ডান
০৪	ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন	দোহা, কাতার
০৫	বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক	বাহরাইন
০৬	ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং এস. এ.	লুক্সেমবার্গ
০৭	আল-রাজি কোম্পানি ফর কারেন্সি এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কমার্স	সৌদি আরব
০৮	শায়খ আহমদ সালেহ্ জামজুম	সৌদি আরব
০৯	মরহুম শায়খ ফুয়াদ আবদুল হামিদ আল-খতিব	সৌদি আরব
১০	দুবাই ইসলামিক ব্যাংক	সংযুক্ত আরব-আমিরাত
১১	পাবলিক ইনস্টিটিউশন ফর সোস্যাল সিকিউরিটি	কুয়েত
১২	মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস, ডিপার্টমেন্ট অব মাইনর অ্যাফেয়ার্স	কুয়েত
১৩	মিনিস্ট্রি অব আওকাফ অ্যান্ড ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স	কুয়েত

উল্লেখ্য যে, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এর শরি'আহ্ কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি আমৃত্যু শরি'আহ্ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান

১০৭. পূর্বোক্ত।

পদে সমাসীন ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ‘স্যোসাল ইনভেস্টম্যান্ট ব্যাংক লিমিটেড’ এর উপদেষ্টা ও শরি‘আহ্ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এ সবই ইসলামি অর্থনীতি বিকাশে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান হিসেবে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে।

(ঙ) কবরস্থান স্থাপন

আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র কুর’আনে এরশাদ করেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ ‘জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।’[১০৮] আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষকে ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাই মৃত্যুকালে মানুষকে সম্মানের সাথে দাফন করতে হয়। আল্লামা ইমাম সিরাজুদ্দিন মুহাম্মদ সাজাওয়ান্দি লিখিত ‘*সিরাজি*’ গ্রন্থে বলেন,

> ‘মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে ধারাবাহিকভাবে চারটি হক সম্পর্কিত হয়। প্রথমত, অপব্যয় ও কার্পণ্য ব্যতীত মধ্যপন্থায় তার কাফন ও দাফনকার্য সম্পাদন করতে হবে।’[১০৯]

মুসলিমগণের জন্য এটি একটি বিশাল সম্মানের বিষয়। আত্মীয়স্বজন, পরিবারপরিজন, পাড়াপ্রতিবেশী, এমনকি দেশের গণ্যমান্য লোকজন পর্যন্ত একজন মুসলিমকে জানাযার নামায পড়ে সম্মানের সাথে শেষবিদায় জানিয়ে একটি নির্দিষ্ট ঠিকানা কবরস্থানে দাফন করে আসে। কবরস্থানও মুসলিমগণের কাছে সম্মানিত স্থানের একটি; কারণ এ স্থানে প্রত্যেকেরই মুরব্বি এবং আত্মীয়স্বজনসহ সর্বস্তরের লোক শায়িত আছেন। তাই এর প্রতি মুসলিম সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। ‘বায়তুশ শরফে’র মরহুম পীর হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে দুটি বায়তুশ শরফ কবরস্থান স্থাপন করেন। সেগুলো হলো : [১১০]

১. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স সংলগ্ন কবরস্থান, ১৪৯/এ, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা।
২. কাচপুর বায়তুশ শরফ মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান, সোনাপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।

(চ) পোস্ট অফিস স্থাপন

১৯৮৬/৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ‘কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ’ ধনিয়ালাপাড়ায় ‘বায়তুশ শরফ পোস্ট অফিস’ এর কার্যক্রমের শুভ উদ্‌বোধন করা হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন পোস্ট মাস্টার জেনারেল (পিএমজি) জনাব মহিউদ্দিন আহমদ।[১১১]

এভাবে তিনি সেবামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথা মসজিদ, এতিমখানা, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়, ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন, কবরস্থান ও পোস্ট অফিস স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে আজীবন মানুষের সেবা করে গেছেন। এগুলোর মাধ্যমে তিনি প্রকৃত তরিকত চর্চার স্বরূপ উন্মোচন করে গেছেন। তাঁর এসব সেবামূলক কর্মকাণ্ড বর্তমান ও অনাগত জাতির পথপ্রদর্শকদের জন্য প্রেরণার বাতি হিসেবে তাদের হৃদয়কে আন্দোলিত করবে।

---

১০৮. আল-কুর’আন, ৩ : ১৮৫

১০৯. মওলানা মুহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ্ ও অন্যান্য, *কাশফুল রাজি ফি হল্লে সিরাজি* (ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ১৭

১১০. জনাব মওলানা জাফর আহমদ, ইমাম ও খতিব, ঢাকা বায়তুশ শরফ মসজিদ কমপ্লেক্স, ফার্মগেইট, ঢাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১১১. শাহ্সুফি মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন (রহ.), প্রয়াত পীর, বায়তুশ শরফ দরবার, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আর্তমানবতার সেবা

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন সমাজসেবার মহান প্রতিভূ। তাই তিনি আধ্যাত্মিকতা চর্চার পাশাপাশি আর্তমানবতার সেবা করে গেছেন আপন কাজে ও কর্মে। মানবসেবার কাজে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তাঁর জীবনের অমর কীর্তিসমূহের মধ্যে সমাজসেবা একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। শেখ সা'দি (রহ.) (১১৭৫–১২৯৬ খ্রি.) এর ভাষায়,

طریقت بجز خدمت خلق نیست - بتسبیح وسجاده ودلق نیست

'সার্বক্ষণিক তসবিহ-তাহলিল জপ করা, জায়নামাজ নিয়ে বসে থাকা এবং ছেঁড়া বস্ত্র পরিধান করার নাম তরিকত ও তাসাওউফ নয়। মানবতার সেবা ব্যতীত তরিকত কল্পনা করা যায় না।'[১১২]

এটা ছিল তাঁর সেবাকর্মের মূল প্রণোদনা। তাই তিনি আধ্যাত্মিক চর্চা তথা সার্বক্ষণিক আল্লাহ্‌র 'ইবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। কুর'আনে বহু আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা আর্তমানবতার সেবার প্রতি মানুষদের উৎসাহিত করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ অর্থাৎ 'তাদের (ধনীদের) ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক।'[১১৩] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অর্থাৎ 'আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের।'[১১৪]

অনুরূপভাবে, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) থেকে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর মধ্যেও আর্তমানবতার সেবার দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। সেকালে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর আর্তমানবতা সেবার অনন্য উপমা খুঁজে পাওয়া যায় হযরত খাদিজা (রা.) এর প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তিতে; প্রথম অহি গ্রহণে ভীত-সন্ত্রস্ত স্বামীকে অভয় দিতে গিয়ে যা তিনি বলেছিলেন। যেমনটি উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) সূত্রে ইমাম বুখারি (রহ.) এর সহিহ্ বুখারি শরিফে বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে আশ্বস্ত করতে গিয়ে হযরত খাদিজা (রা.) বলেছেন,

كَلَّا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ

অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র শপথ। তিনি কখনোই আপনাকে অপমানিত করবেন না; কারণ, আপনি নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুর্বল-দুঃখীদের সেবা করেন, বঞ্চিত ও অভাবীদেরকে উপার্জনক্ষম করেন, মেহমানদারি করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন।'[১১৫]

---

১১২. শেখ সাদি, *বুস্তান* (তেহরান : জাভিদান প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৬), পৃ. ৫৫

১১৩. আল-কুর'আন, ৫১ : ১৯

১১৪. আল-কুর'আন, ৭০ : ২৪

১১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি'আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৩

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর মধ্যে রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সামাজিক জীবনের সে আদর্শ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি কোমল হৃদয়ের একজন লোক ছিলেন। মানুষের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হওয়া ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুঃখী মানুষ দেখলে তাঁর হৃদয় মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। তিনি প্রতিনিয়ত মানুষের উপকারের চিন্তা করতেন। অভাবীদের অভাব মোচন, গৃহহীনদের আশ্রয় প্রদান, নিরন্ন মানুষকে অন্নদান ও বস্ত্রহীনদের বস্ত্রদান এবং রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসার সুব্যবস্থা ইত্যাদির চিন্তায় তিনি বিভোর থাকতেন। দেশ ও জাতির সেবা নিয়ে তিনি সবসময় চিন্তা করতেন। তা সমাধানে সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। মানবতার সেবায় তিনি যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন নিম্নে তা তুলে ধরা হলো:

১. দুর্গতদের সেবা

কুর'আন মজিদ ও হাদিস শরিফের এ মর্মবাণী উপলব্ধি করে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) শুধু শিক্ষা-দীক্ষা ও তরিকতের খিদমতে সীমাবদ্ধ না থেকে আর্তমানবতার সেবায়ও নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি ছিলেন দুর্গত মানুষের পরম বন্ধু। তিনি বলেছেন,

> 'যারা হক্কানি বুযুর্গ তাদের কর্মতৎপরতা শুধু অযিফার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়: বরং দেশ, সমাজ ও জনগণের কল্যাণে তাদের সমগ্র জীবন উৎসর্গীকৃত হয়ে থাকে।'[১১৬]

তাই তাঁর সারাটি জীবন ওয়ায-নসিহত, তরিকতের তা'লিম, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে জাতিধর্মনির্বিশেষে দুঃস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে এসেছেন; ছুটে গেছেন স্বশরীরে ত্রাণ সামগ্রীসহ ঔষধপত্র নিয়ে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস কবলিত এলকায় বহুবার। আর্তমানবতার সেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তিনি জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

২৩শে মে, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে উড়ির চর, সন্দ্বীপ, সোনাগাজী, নোয়াখালী চরকেরামত, কোম্পানিগঞ্জ, সিলেটের হবিগঞ্জ, মৌলভী বাজার, টেকনাফ, কক্সবাজারসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাজার-হাজার মানুষ ও গবাদি পশুর মৃত্যুতে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এই ভয়াবহ অবস্থা পর্যক্ষেণ করে বাংলাদেশ সরকার ২৮শে মে, '৮৫ খ্রিষ্টাব্দে 'জাতীয় শোক দিবস' ঘোষণা করে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ৬০ সদস্যবিশিষ্ট এক স্বেচ্ছাসেবী যুব কাফেলা নিয়ে ছুটে যান সন্দ্বীপের উড়িরচর সংলগ্ন নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে। সেখানে তিনি সোয়া দুই লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী এবং ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নগদ অর্থ প্রদান করেন।[১১৭]

নদীমাতৃক বাংলাদেশ মৌসুমি অঞ্চলে অবস্থিত বিধায় বর্ষ শুরু হওয়ার সাথে-সাথে অনেক সময় প্রকৃতি বিরূপ আকার ধারণ করে। তেমনি ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ভেসে যায় বাংলা মায়ের পূর্বাঞ্চল। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা'র ছাত্র-শিক্ষক, 'আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ' ও 'আন্‌জুমনে নওজোয়ানে'র কর্মীসহ ৫০ সদস্যবিশিষ্ট এক স্বেচ্ছাসেবী যুব কাফেলা নিয়ে ছুটে যান চকরিয়ায়। সেখানকার বদরখালী, ভেওলা, বইকলী, ফাসিয়াখালী, কাকরা, পহরচাঁদা,

---

১১৬. মুহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রাহ. এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

১১৭. আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) : জীবন ও আদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৯-৭৪; মুহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রাহ. এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭

কুতুববাজার, কোণাখালী, নাপিতপাড়া, মাইজগাঁ হিন্দুপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের হাজার হাজার বন্যাকবলিত নিরন্ন মানুষের মধ্যে লক্ষ-লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।[১১৮]

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় ঢাকার রূপগঞ্জে ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকায় বৃষ্টি ছাড়াই ভয়াবহ বন্যার সূত্রপাত ঘটে। মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র এবং তিতাস নদীর স্বাভাবিক ঢেউ রূপ নেয় উত্তাল তরঙ্গে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্দেশে ছুটে যান। ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে, ভোল্লাহ্ প্রাথমিক বিদ্যালয় আশ্রয় শিবির, আনন্দপুর, হরষপুর, মজলিসপুর, ২১শে সেপ্টেম্বর উত্তর রাসুলপুর, দক্ষিণ রাসুলপুর, সিন্ধুরা, ২২শে সেপ্টেম্বর সরাইল ইউনিয়ন কোট্টাপাড়া, সৈয়দ টোলা, তালশহর, নবিনগর প্রভৃতি বন্যাদুর্গত এলাকায় তিনি ১ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বি. বাড়িয়ায় সর্বনাশা বন্যায় হরশপুর নামক হিন্দুপ্রধান এলাকায় বন্যাদুর্গতদের মাঝে স্বহস্তে ত্রাণ বিতরণের সময় বৃষ্টির পানি ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় তাঁর ডানহাত অবশ হয়ে যায়। ফলে দীর্ঘদিন মুষ্টিবদ্ধ করতে পারেন নাই। বিদেশে চিকিৎসার পর তাঁর হাত সুস্থ হয়।[১১৯]

২৯শে এপ্রিল, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে দিবাগত রাত্রে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে যে ভয়াবহ প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়েছে তা বাংলাদেশের মানুষ এখানও ভুলতে পারছে না। এ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসে শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে লক্ষ-লক্ষ মানুষ ও গবাদিপশু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সমুদ্রের অতল গহ্বরে নিমিষের মধ্যে তলিয়ে গেল বাংলার বিশাল জনপদ। উপকূলীয় অঞ্চল মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল। তিনি ত্রাণ বিতরণের জন্য স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে দুভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম কাফেলা বাঁশখালীতে এবং দ্বিতীয় টিম কুতুবদিয়ায়। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) তাঁর নেতৃত্বে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি দল লক্ষাধিক টাকার ত্রাণসামগ্রী নিয়ে বাঁশখালীর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। সেখানে পৌঁছে স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা তিনি নিজ হস্তে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করলেন। মওলানা ফজলুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে দ্বিতীয় টিম কুতুবদিয়া অঞ্চলে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে। তাছাড়া ৩০ সদস্যের কর্মীবাহিনী ও মেডিক্যাল টিম নিয়ে ১৫ই মে, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান পেকুয়া উপজেলার মগনামা ইউনিয়নে এবং ১৬ই মে ঈদগাঁও অঞ্চলের গোমতলী এলাকায় ত্রাণসামগ্রী ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে।[১২০]

১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, প্রবল বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বাঁশখালী, আনোয়ারা, কুতুবদিয়াসহ নিম্নাঞ্চলগুলো প্লাবিত হয়ে অনেক ঘর-বাড়ি, দোকানপাট এবং শস্যখেতের ক্ষতি হয়। এসময়ও আক্রান্ত সর্বহারা মানুষের সাহায্যের জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী নিয়ে দুর্গত অঞ্চল সফর করেন।

তিনি সকল ধর্মের মানুষকে উদারহস্তে দান করতেন। তিনি ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে খুলনার রূপসা ঘাটস্থ খ্রিষ্টানপাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে সহস্তে অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী প্রদান করেন। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত চকরিয়ার কাকারা ইউনিয়নের হিন্দুপাড়ায়, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে সমুদ্র উপকূলবর্তী

---

১১৮. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২-৫৫

১১৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, ড. আ. ন. ম. রঈস উদ্দিন, 'রসুলে করীমের মানব সেবার সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে মোজাদ্দেদ', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭; মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

১২০. মুহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ্ আবদুল জব্বার রাহ. এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮-১৭০

চট্টগ্রামের বাঁশখালীর জেলেপাড়ায় শত-শত হিন্দু পরিবারকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। অমুসলিমদের কেন সাহায্য করছেন এরূপ প্রশ্ন করা হলে, তিনি রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিম্নোক্ত হাদিস পাঠ করে শোনান।

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ

> অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি নিজে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী (না-খেয়ে) অভুক্ত থাকে সে প্রকৃত মু'মিন নয়।'[১২১]

এখানে রাসুলুল্লাহ্ (সা.) প্রতিবেশীর হকের কথা বলেছেন। তবে নির্দিষ্ট করে মুসলিমগণের কথা বলেননি। সুতরাং, আমি আমার ঈমানি দায়িত্ব ও রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাত হিসেবে বিপদগ্রস্থ অমুসলিমদের সাহায্য করছি। এমনও হতে পারে একদিন তারাও নবির আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্ম কবুল করবে।[১২২] তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হয়েছে। এ ধরনের আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে শতাধিক হিন্দু, চাকমা, টিপরা ও খ্রিষ্টান পবিত্র কালেমা পাঠ করে মুসলিম হয়েছেন। অন্তত এক ডজন হিন্দু ও খ্রিষ্টান নওমুসলিমকে তিনি ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। খ্রিষ্টধর্ম থেকে আগত 'প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজে'র এক নওমুসলিম কর্মকর্তা জনাব আবদুর রহীমের জন্য (মি. জর্জ এন্থনি) নিজ গ্রামের বাড়িতে বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

তাছাড়া অক্টোবর ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে আগত পর্যটক, সুদূর নাইজেরিয়ার তরুণ, গার্মেন্টস ব্যবসায়ী, পিএইচ.ডি. গবেষক ওমাম নাজকিয়াক 'মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন' নাম নিয়ে তাঁর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম রেলস্টেশন সংলগ্ন 'হোটেল গোল্ডেন ইন' হতে তিনি পর-পর তিনদিন এসে তাঁর কাছ থেকে দীনি তা'লিম নেন। প্রফেসর ড. মঈনুদ্দিন আহমদ খান (১৯২৬–২০২১ খ্রি.) ও ডা. মোহাম্মদ এমদাদ (১৯৩৫–২০০৩ খ্রি.) এর সহযোগিতায় পাহাড়ি উপজাতির চাকমা, টিপ্রা, মার্মা এবং আফ্রিকান নিগ্রো উপজাতিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করান। বহু বছর তাদের পরিবার পরিজনকে সাহায্য করেন। ধর্মশিক্ষার জন্য প্রকাশ করেন *'ত্রিপুরা ভাষায় ইসলাম শিক্ষা'*।[১২৩] সত্যই বলা হয়ে থাকে,

ہر کہ خدمت کرد، او مخدوم شد - ہر کہ خود را دید، او محروم شد

> অর্থাৎ 'যে জন করিবে সেবা, সেবিত হবেন নিশ্চ;, যে জন দেখিবে নিজেকে, বঞ্চনা তার কপালে রয়।'[১২৪]

তাঁর সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রখ্যাত কবি আসাদ বিন হাফিজের মন্তব্য সত্যিই প্রণিধানযোগ্য,

> 'মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ সাধনায় মরহুম পীর মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সাহেব যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তাঁর কোনো দ্বিতীয় নজির নেই। আর্ত মানবতার সেবায় মাদার তেরেসা যে অবদান রেখেছেন মরহুম পীর মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার

---

১২১. আবু বাকর আহমদ বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বাবুন মা জাআ ফি ফযলিল মনিহাতি, হাদিস নং ৩১১৭, পৃ. ১৫৫

১২২. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ,'জলোচ্ছ্বাসের দেশে', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৭; মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

১২৩. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

১২৪. উদ্ধৃত : আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, *আমার জীবনকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৩

(রহ.) সাহেবের অবদান এদেশে তার চাইতেও বেশি। কিন্তু আফসোস! এ দেশের মানবসমাজ সেভাবে তাঁকে জানতে পারেনি প্রচারের অভাবে।’[১২৫]

মওলানা আবদুল জব্বার (রহ.) কর্তৃক বিভিন্ন সময় বন্যার্তদের প্রদত্ত ত্রাণসামগ্রীর তালিকা:[১২৬]

তিনি ১৯৮৫-১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে বন্যার্তদের মাঝে নিম্নোক্ত ত্রাণসামগ্রীসমূহ বিতরণ করেন:

(ক) পোশাক পরিচ্ছদ					
ক্র.নং	**ত্রাণসামগ্রীর নাম**	**পরিমাণ**	**ক্র.নং**	**ত্রাণসামগ্রীর নাম**	**পরিমাণ**
০১	শাড়ি	৪২৬টি	০৯	কোট	৯৪টি
০২	লুঙ্গি	৫৬০টি	১০	কম্বল	৩০টি
০৩	প্যান্ট	৩৯৬টি	১১	টুপি	১৫৬টি
০৪	শার্ট ও পাঞ্জাবি	১,৮৯০টি	১২	জায়নামাজ	৫০টি
০৫	শিশু পোশাক (ফ্রক, প্যান্ট ও শার্ট)	৭১৩টি	১৩	শপিং ব্যাগ	৫০০টি
০৬	গেঞ্জি ও সোয়েটার	**৭১০টি**	১৪	গামছা	২৫টি
০৭	মেয়েদের পোশাক (ওড়না, ব্লাউজ ও স্কার্ফ)	৪৪১টি	১৫	সাদা ও সিট কাপড়	৫ থান
০৮	বালিশ	১০০			
(খ) খাদ্যসামগ্রী					
ক্র.নং	**ত্রাণসামগ্রীর নাম**	**পরিমাণ**	**ক্র.নং**	**ত্রাণসামগ্রীর নাম**	**পরিমাণ**
০১	চাল	১০০ মণ	০৬	আলু	১৫ মণ
০২	ডাল	৫ ”	০৭	লবণ	৮ মণ
০৩	চিড়া	১২ ”	০৮	হলুদ	১০০ প্যা.
০৪	গুড়	৩ ”	০৯	মরিচ	১০০ ”
০৫	সোয়াবিন তৈল	৫ ”			
(গ) তৈজসপত্র					
ক্র.নং	**ত্রাণসামগ্রীর নাম**	**পরিমাণ**	**ক্র.নং**	**ত্রাণসামগ্রীর নাম**	**পরিমাণ**
০১	কলসি	৫০টি	১১	ডেকচি	১০০
০২	প্লেট	৩১১টি	১২	চাটাই	১০০
০৩	পেয়ালা	২০০টি	১৩	চামচ	২১৬
০৪	মগ/ গ্লাস	২৪৩টি	১৪	সুতলি	৪ বাণ্ডিল
০৫	বদনা	৫০টি	১৫	তার	৫০০ ”
০৬	চেরাগ (কুপিবাতি)	১০০টি	১৬	দা	৫০ খানা

১২৫. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ, ‘প্রখ্যাত কবি আসাদ বিন হাফিজের সাক্ষাৎকার’, *শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া*, ১০ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ৫৫

১২৬. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

০৭	হারিকেন	৫০টি	১৭	খন্তা	৬ খানা
০৮	দিয়াশলাই	১৭ গ্রোস	১৮	ওয়াটার পট	৫০
০৯	জগ	২৬০টি	১৯	ঔষধপত্র	২,০০০/-
১০	বালতি	১০০টি	২০	নগদ	২৫,০০০/

এভাবে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন যুগ-যুগ ধরে। এ আর্তমানবতার সেবার জন্য তিনি হয়েছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় ও বরণীয়। 'সমাজসেবা অধিদপ্তর' সহ আরও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পেয়েছেন স্বীকৃতি। মহান আল্লাহ্ তাঁর এ মহতী কাজের উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন! প্রসঙ্গত কবি আল মাহমুদ বলেন, 'মানবকল্যাণে বাংলাদেশে তাঁর মতো উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি আমি খুব কমই দেখেছি। মানবতার উপকার সাধনে প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোনো তুলনা নেই।'[১২৭]

তিনি আরও বলেন,

'তার কাছে শিখেছিলাম কী করে নিজের আত্মাকে কেবল
মানুষের জন্য দরদি করে তুলতে হয়;
তিনি ছিলেন আর্ত-পীড়িত নিঃসম্বল মানুষের আশ্রয়।'[১২৮]

একই কথা শুনি নুরুল মোস্তাফা রঈসীর কণ্ঠেও :

'অনাথ এতিমের পিতা তিনি আজ, অন্ধজনের আলো
দুর্জনে ডেকে মুছে দেন তার রিপুর কালিমা-কালো।
বন্যা খরায়, ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়, তিনি অসহায়ের পাশে
নিজ হাতে দেন খাদ্য, বস্ত্র সুবিপুল আশ্বাসে।'[১২৯]

২. গরিব অসহায়দের সেবা

মুসলিম সর্বসাধারণের আধ্যাত্মিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার পাশাপাশি গরিব ও সহায়হীনদের প্রতি তিনি ছিলেন বড়োই সংবেদনশীল। তাদের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে তাদের উপার্জনাক্ষম ও স্বাবলম্বী করে তোলার বিষয়ে তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি ছিলেন অনন্য দানবীর; বিশেষ করে এতিম, অসহায়, বিধবা ও দুস্থ মহিলাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ ছিল। তিনি তাদের অকাতরে সাহায্য করতেন। তিনি অসংখ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। অগণিত এতিমকে তিনি আপন পিতার মত লালন-পালন ও প্রশিক্ষিত করে সমাজে মর্যাদার সাথে পুনর্বাসিত করেছেন। হাজারো অভাবগ্রস্ত মানুষের অভাব মোচন করেছেন। সন্তানের লালন-পালনে অক্ষম অনেক দুঃখিনী

---

১২৭. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আল-মাহমুদ, 'মানবতার পীঠস্থান : বায়তুশ শরফ', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

১২৮. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *নিবেদিত কবিতা* (চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ্ শরফ একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৪১

১২৯. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আবু নোমান মুহাম্মদ তারেক, 'বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব (রহ.)-এর পবিত্র জীবনধারা', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

বিধবা মায়ের পর্ণকুটিরে পৌঁছে যেত তাঁর দান। তাঁর অর্থানুকূল্যে অসংখ্য এতিম ও অভাবী বালক জ্ঞানার্জন করে স্বনির্ভর হয়েছে।[১৩০] কবির ভাষায়,

'বিশ্বমানবের কল্যাণে
আপন অস্তিত্বের সন্ধানে
তরিকতের পথে এগিয়ে চলো শরিয়তের বিধান মেনে
দুস্থজনকে কোলে তুলে নাও মানবতার আলিঙ্গনে।'[১৩১]

৩. অসচ্ছল আলিম-'উলামাদের সেবা

পবিত্র রমযানে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর দানের দুয়ার খুলে যেত। একদিকে তিনি লোকদের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করতেন আর অন্যদিকে দুহাতে তা দান করে দিতেন। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে 'বায়তুশ শরফে'র মরহুম পীর মওলানা কুতুব উদ্দিন (রহ.) বলেন,

> 'হুজুর কেবলার (রহ.) জুব্বার পকেট ছিল একটা দরিয়া, তাঁর দয়ার পানি কখনও শূন্য হতো না।'[১৩২]

তিনি যখন ই'তিকাফ থাকতেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আলিম-উলামা এবং ইমাম-মুয়াজ্জিন দলে দলে তাঁর নিকট যাকাতের টাকা সংগ্রহের জন্য ছুটে আসতেন। তাদের হাতে থাকত একটি রেজিস্ট্রার খাতা। তাতে লেখা থাকত পূর্ববর্তী বছরে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ। তিনি তা দেখে পূর্বের সমপরিমাণ কিংবা তার চেয়ে বেশি টাকা প্রদান করতেন। অনেক সময় তিনি বিশ্বস্ত খাদেমের মাধ্যমে দেশের দূর অঞ্চলের এতিমখানা, মাদ্‌রাসার গোরাবা ফান্ড (দরিদ্র তহবিল) এবং কোনো অভাবী বুযুর্গ আলিম কিংবা বিধবার নামে ডাকঘরে মানিঅর্ডারের মাধ্যমে যাকাতের বা দানের টাকা প্রেরণ করতেন।[১৩৩] তাই বিদগ্ধজন তাঁকে 'বাংলার হাতেম' হিসাবে অভিহিত করেন।

৪. উদ্‌বাস্তু ও শরণার্থীদের সেবা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৮, ১৯৮০ ও ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বার্মার তৎকালীন সামরিক জান্তা কর্তৃক মুসলিম নিধনের কার্যক্রম শুরু হলে লক্ষ-লক্ষ অসহায় মুসলিম নর-নারী ও আবালবৃদ্ধবনিতা বাংলাদেশের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সে সময় উদ্‌বাস্তুদের মাঝে বড়ো অঙ্কের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছিলেন। সমাজের বিত্তশালীদেরকে তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।[১৩৪]

---

১৩০. মীযানুল করীম, 'মানবসেবা ছিল যার কাছে ধর্মেরই অংশ', *দৈনিক নয়া দিগন্ত*, ২৫ মার্চ, ২০১০, পৃ. ৮; মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ তাহের, 'যাঁর জীবন ও কীর্তি ছিল অসাধারণ', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪

১৩১. উদ্ধৃত : মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, জাকিয়া ছুফিয়ান, 'আমার দিশারী', *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫

১৩২. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

১৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪

১৩৪. *দৈনিক আজাদী*, 'শরণার্থীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন বায়তুশ শরফের পীর সাহেব', নভেম্বর, ১৯৭৮, পৃ. ৪; *দৈনিক আজাদী*, আ. ম. কাজী মুহাম্মদ হারুন-উর-রশীদ, 'পীরে বায়তুশ শরফ : এক মহান ব্যক্তিত্ব', ২৫শে মার্চ, ১৯৯৯, পৃ. ৪

উল্লেখ্য, তিনি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে 'চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমাজ কল্যাণ ফেডারেশন' কর্তৃক মসজিদভিত্তিক সমাজ বিপ্লব ও সমাজসেবায় অবদানের জন্য শ্রেষ্ঠ সমাজসেবক হিসেবে স্বর্ণপদক লাভ করেন।[১৩৫] 'আমেরিকা বাইয়োগ্রাফিকেল ইনস্টিটিউট' হতে একটি চিঠি ৩১শে মার্চ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স চট্টগ্রামে' পৌঁছে। চিঠির ভাষামতে, সমাজসেবায় অনন্য অবদানের জন্য উক্ত ইনস্টিটিউট তাঁকে মনোনীত করেছে এবং *'ইন্টারন্যাশনাল ডাইরেক্টরি অর ডিসটিংগুইশড লিডারশিপ'* গ্রন্থে প্রকাশের জন্য তাঁর জীবনী আহ্বান করেছেন।[১৩৬] তাছাড়া ইসলামি সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম ২৬শে ডিসেম্বর, ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে 'সমাজ ও মানবসেবা এবং আধ্যাত্মিক সংস্কারে'র ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করে।[১৩৭] প্রখ্যাত কবি আল-মাহমুদ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর সমাজসেবা সম্পর্কে বলেন,

> 'খ্রিস্টান জগতে এ ধরনের (সেবামূলক) কাজের জন্য আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও পুরস্কার রয়েছে। সেখানে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এর মতো সন্তানদের মানবাত্মার উজ্জীবকরূপে পুরস্কৃত করা হয়। বলা হয় পিস্ মেকার বা শান্তির প্রতিষ্ঠাতা।'[১৩৮]

এভাবে তিনি জাতির সংকটময় মুহূর্তে সব ধর্মের মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করে ইসলামের সৌন্দর্য বিকশিত করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে মুসলিমগণ যেভাবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন তেমনি অমুসলিমগণও ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে মুসলিমগণ তাদের ঈমানকে আরও শানিত করেছে; আর অমুসলিমগণ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

---

১৩৫. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ আলাউদ্দীন, 'তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমাজসেবক', *ইসলামি রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, ৩০৬

১৩৬. মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ সম্পাদিত, *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫-৯৬

১৩৭. *দৈনিক সংগ্রাম*, বিশেষ ক্রোড়পত্র, ২৬শে ডিসেম্বর, ২০০৩, পৃ. ৮

১৩৮. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ আলাউদ্দীন, 'তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমাজসেবক', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৬

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইসলামি মিশনারি ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রম

গরিব-অসহায় মুসলিমগণকে খ্রিষ্টাধর্মে ধর্মান্তরিত করার গোপন ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের দিকে তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামি মিশনারি কার্যক্রম শুরু করেন। তাদের স্বনির্ভর করার মহান লক্ষ্যে তিনি বৃত্তিমূলক বহু কার্যক্রমও পরিচালনা করেন। এর মাধ্যমে একদিকে গরিব-অসহায় মুসলিম স্বনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি ধর্মান্তরিত হওয়া থেকেও রক্ষা পায়; অপরদিকে, তিন পার্বত্য জেলার অনেক অমুসলিমের ইসলাম গ্রহণের পথ সুগম হয়। নিম্নে তাঁর প্রবর্তিত ইসলামি মিশনারি ও বৃত্তিমূলক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

(ক) ইসলামি মিশনারি কার্যক্রম

মুসলিম জাতির শতধাবিভক্তি, দারিদ্র্যপীড়ন এবং সামাজিক কুসংস্কার ইত্যাদির সুযোগে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান মিশনারি ও ওরিয়েন্টালিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তারা দিন দিন ধর্মান্তরিত হচ্ছে। কোনো-কোনো মুসলিম দেশে খ্রিষ্টান জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং পাক-ভারতে খ্রিষ্টানদের প্রচারকার্য জোরেশোরে চলছে। পাকিস্তান আমলেই এদেশে খ্রিষ্টান পাদ্‌রিদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। নৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে খ্রিষ্টান মিশনারিরা তাদের জাল বিস্তার করতে তৎপর হয়। পাদ্‌রি পায়ারের শান্তি দ্বীপের নামে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হলে আইয়ুব সরকার তাকে সাহায্য করে। তখন মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) (১৮৯৬–১৯৬৯ খ্রি.) 'খাদেমুল ইসলাম জামায়াত' এর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে 'আঞ্জুমানে তাবলীগুল কোরআন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সংগঠনের মাধ্যমে আলিম-'উলামাদের ঐক্যবদ্ধ করে তাদের এ অপতৎপরতার বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে উঠলে একপর্যায়ে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। বর্তমানে তারা আবার তৎপর হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে অসংখ্য এনজিও এবং খ্রিষ্টান মিশনারি সংস্থা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সাহায্য ও জরুরি ত্রাণ ইত্যাদির আড়ালে খ্রিষ্টবাদের প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে এবং মুসলিমদের খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করছে। তারা বাংলাদেশের সীমান্তে একটি স্বাধীন খ্রিষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, প্রতিবছর ৭ লক্ষ বাংলাদেশিকে খ্রিষ্টান বানানোর পরিকল্পনা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরও একটি লেবানন সৃষ্টির দীর্ঘমেয়াদি চক্রান্ত নিয়ে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। মানবতার নামে নানান প্রকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, ব্যাপকভাবে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও তা বিনামূল্যে বিতরণ, দেশী পত্রিকার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার, হাসপাতাল-ক্লিনিক নির্মাণ ও বিদ্যালয় স্থাপন করছে এবং খেত-খামার, সংস্থা-সোসাইটি ও কল-কারখানায় অত্যন্ত কৌশলে কাজ করে চলছে।

অশিক্ষিত দরিদ্র পশ্চাৎপদ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে যেভাবে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারিত হচ্ছে তাতে প্রতীয়মান হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রাম খ্রিষ্টান অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। স্বনামে ও ছদ্মনামে সেবার দোহাই দিয়ে এ দেশের মানুষের ঈমান-আকিদার ওপর আঘাত

এনে ধর্মান্তরিত করছে। এ সংস্থাগুলোর নাম দেখে প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝার উপায় নেই। সেবার নামে যে সব খ্রিষ্টান মিশনারি দেশে তাদের অশুভ তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে তাদের মধ্যে দ্যা সালভেশন, সেবা, প্রশিকা, নিজেরা করি, কারিতাস, গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, এমসিসি, হেলথ কেয়ার, ভলান্টিয়ার সার্ভিস, রিলিফ কমিশন, হুম টু কন্ট্রাস, ব্রাদার্স, ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন, ফাদার ক্লাইস সমাচার ও ফুড ফর দ্যা হাংরি ইন্টারন্যাশনাল অন্যতম।[১৩৯]

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এই পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে ছিলেন জানে-প্রাণে চিন্তা-চেতনায়, মননে-সাধনায় ইসলাম, মুসলিম ও আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে সর্বোতভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন। তিনি সত্যিই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, অমুসলিম মিশনারিদের অপতৎপরতা, নৈরাজ্যবাদ আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির সবুজ-শ্যামল বাগানে ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দেয়ার জন্য শক্তি, প্রযুক্তি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মিডিয়াকে ব্যবহার করছে। তা আজ বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলিমগণের ভৌগোলিক সার্বভৌমত্ব ও নিজস্ব সংস্কৃতির অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক সমস্যা ও ভয়ংকর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে মহাশক্তিধর মার্কিন ও ব্রিটিশদের মিশনারি অপতৎপরতা রুখে দেয়ার মানসে বাংলাদেশের ঢাকা হতে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেকগুলো ইসলামি মিশনারি কার্যক্রমের গোড়াপত্তন করেন। মূলত এ ইসলামি মিশনারি কার্যক্রমগুলো মসজিদভিত্তিক প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হয়। প্রত্যেক প্রকল্পে রয়েছে মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, হিফজখানা, স্কুল ও হাসপাতাল। এই মসজিদভিত্তিক মিশনারি কায়দায় শিক্ষা পরিকল্পনার সাথে সাথে সেবা তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের মধ্যেও ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা লক্ষণীয়। নিম্নে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামি মিশনারি কেন্দ্রগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো:[১৪০]

১. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ডিটি রোড, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।
২. আখতরাবাদ (কুমিরাঘোনা) বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, বায়তুশ শরফ রোড, কক্সবাজার।
৪. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, পুরানা স্ট্যান্ড রোড, রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি।
৫. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ১৪৯/এ নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা।
৬. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, উত্তর গাঁথের ছড়া, লংগদু, পাবর্ত্য জেলা।

বাস্তবিকই খ্রিষ্টান মিশনারির প্রতিপক্ষ হিসেবে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বিন্দুর মধ্যে সিন্দুর চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। এটা ইসলামের জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর পিছনে তিনি লক্ষ-কোটি টাকা খরচ করে আমাদের বিবেককে নাড়া দিয়ে গেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ্! তাঁকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বহু ইসলামি মিশনারি সংস্থা গড়ে উঠেছে। খ্রিষ্টানদের অপতৎপরতা সাময়িক সময়ের জন্য হলেও কিছুটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া এবং রূপসা থেকে পাথোরিয়া পর্যন্ত তিনি সত্যের ঝান্ডা নিয়ে ঘুরেছিলেন।

---

১৩৯. মাওলানা মুহাম্মদ সালমান ও মাওলানা লিয়াকত আলী, *হজরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা : আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৫৫

১৪০. মো. শাহিনুজ্জামান, *গঠন-প্রকরণে বাংলাদেশে সূফীবাদের বিকাশ (১৯৭১–২০০০)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

(খ) বৃত্তিমূলক কার্যক্রম

দক্ষ জনশক্তি জাতীয় উন্নয়নের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিজ্ঞান[১৪১] ও প্রযুক্তির নতুন-নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নকৌশল ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ব্যাবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত অসম ও প্রতিকূল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ অসম-প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি ও শ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাত্রদের ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করার পাশাপাশি যুগোপযোগী বৃত্তিমূলক, কারিগরি শিক্ষা, হস্তশিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে দ্রুত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা আজ সময়ের দাবি; যাতে ছাত্ররা সমাজজীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা কাটিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও বেকারত্ব নিরসনে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কার্পেন্ট্রি, টেইলারিং, হেয়ার কাটিং, প্যাকেজিং, প্রেস কম্পোজিটর্স ও ছাপাখানা ইত্যাদির প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলেন।[১৪২] এক্ষেত্রে তিনি প্রায়ই হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত এ হাদিসটি বলতেন যে,

أقبل رسول الله ﷺ من غزوة تبوك فاستقبله سعد ابن معاذ الأنصاري، فصافحه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: ما هذا الذي اكتبت يداك؟ فقال: يا رسول الله اضرب بالمرو المسحاة فأنفقه على عيالي. قال فقبل النبي ﷺ يده وقال: هذه يد لا تمسها النار أبدا

'রাসুলুল্লাহ্ (সা.) তাবুক যুদ্ধ থেকে ফিরলে হযরত সা'দ ইব্‌ন মা'য (রা.) তাঁকে স্বাগত জানালেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাথে মুসাফাহা করলে উক্ত সাহাবির হাতকে শক্ত অনুভব করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার হাত এত শক্ত কেন? উক্ত সাহাবি জবাবে বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (সা.)'! আমরা কৃষক মানুষ, চাষাবাদের লাঙল কোদালের কাজ করে পরিবারের খাদ্য উৎপাদন করি। এজন্য আমাদের হাত শক্ত হয়ে যায়।' রাসুলুল্লাহ্ (সা.) সাথে-সাথে ঐ হাতখানায় চুম্বন করলেন এবং বললেন, هٰذِهٖ يَدٌ لَا تَمُسُّهَا النَّارُ اَبَدًا 'যে হাত পরিবারের খাদ্য উৎপাদনে শক্ত হয়েছে ঐ হাতকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না।'[১৪৩]

১৪১.বিজ্ঞান শব্দটি ইংরেজি Science; একটি ল্যাটিন শব্দ Scienta থেকে এসেছে। এর অর্থ জ্ঞান (Knowledge), জানা (To Know), বিশেষ জ্ঞান (Special Knowledge)। দ্র. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১৪), পৃ. ৮৭০; *Bangala-English Dictionary* (Dhaka : Bangla Academy, 28th Reprint, 2010), p. 542; ইসলামি পরিভাষ*a*য়, 'ইলম (**علم**) ও হিকমত (**حكمة**) এ দুটি শব্দই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 'বিজ্ঞান' শব্দটি নিছক জানা বা জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর অর্থ আরও ব্যাপক ও গভীর। বিজ্ঞান একটি বিমূর্ত ধারণা। এ বিমূর্ত ধারণাকে সংজ্ঞায়িত করা বেশ কষ্টসাধ্য বৈই কি, তদুপরি, অনুসন্ধানের বিভিন্ন পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও নিজস্ব স্বকীয়তা খুঁজতে 'বিজ্ঞান' শব্দের সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। দ্র. আহমেদ ইয়াসমিন ও রাখি বর্মণ, *গবেষণা পদ্ধতি ও সামাজিক পরিসংখ্যান* (ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৫), পৃ. ৮৫; ইমাম গাযালীর মতে, যে অভিজ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর নিদর্শন এবং বান্দা ও সৃষ্টি জীবের কর্মসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় সেটাই বিজ্ঞান। দ্র. আবু হামিদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-গাযালী, *ইহইয়াউ 'উলুমিদ দীন* (কায়রো : মুস্তফা হালাবি, ১৯৩৯), খ.১, পৃ. ৩৯

১৪২. আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ এর কার্যক্রমের বিস্তারিত তালিকা, ১৯৯৮, পৃ. ১০-১৫

১৪৩. আল্লামা ইবনুল হাজার আল-আসকালানি, *আল-ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবাহ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৫), খ.৩, পৃ. ৮৬; ইবনুল আসির, *উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফাতিস সাহাবা* (বৈরুত : দারু ইব্‌ন হাযম, ২০১২), খ.১, পৃ. ৪২৪-২৫

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) প্রতিষ্ঠিত কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলো হলো:

১. কার্পেন্ট্রি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

এতিম শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বী করার নিমিত্তে কারিগরি প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে 'কার্পেন্ট্রি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে তাদেরকে কাঠ দ্বারা নির্মিত আধুনিক ডিজাইনের ফার্নিচার, বার্নিশ, রং এবং বাজারজাত করণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হতো। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কার্পেন্ট্রি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো হলো: [১৪৪]

১. বায়তুশ শরফ এতিমখানা কার্পেন্ট্রি সেন্টার, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।
২. উত্তর গাঁথারছড়া এতিমখানা কার্পেন্ট্রি সেন্টার, গাঁথারছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি।
৩. রাঙ্গামাটি বায়তুশ শরফ এতিমখানা কার্পেন্ট্রি সেন্টার, রাঙ্গামাটি।

২. টেইলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

এতিম শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বী করার নিমিত্তে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজার জেলায় পাঁচটি 'টেইলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেন। এতে অভিজ্ঞ টেইলারের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। টেইলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয় হাজারো শিক্ষার্থী। বর্তমানেও এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত টেইলারিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো হলো: [১৪৫]

১. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ধনিয়ালাপাড়া, ডি. টি. রোড, চট্টগ্রাম।
২. আখতরাবাদ দরবার শরিফ, বড়হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
৩. রাঙ্গামাটি বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, পুরানা বাস স্ট্যান্ড, রাঙ্গামাটি।
৪. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, বায়তুশ শরফ রোড, কক্সবাজার।
৫. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, গাঁথারছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

৩. হেয়ার কাটিং (চুল কাটা) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

১লা জুলাই, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা'র ছাত্রদের স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে চুল কাটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করা হয়। 'আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশে'র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব গোলাম কিবরীয়া সাহেব এটির উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, অনেকে চুল কাটাকে সমাজের নিম্নশ্রেণির পেশা মনে করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ঠিক না। কারণ রাসুলুল্লাহ্ (সা.) কোনো কাজকে নীচু মনে করেননি। এজন্য সৌদিআরবসহ বহু মুসলিম দেশে মুসলমানেরা চুল কাটার কাজ করে। এ সম্পর্কে আমাদের ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে কোনো বৈধ কর্মকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এটির আলোকে পরবর্তীকালে কক্সবাজার ও রাঙ্গামাটিতে আরও দুটি 'হেয়ার কাটিং (চুল কাটা) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' চালু করা হয়।[১৪৬]

---

১৪৪. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *শতফুল ফুটিতে দাও* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ১৫ নভেম্বর, ১৯৯৬), পৃ. ২০

১৪৫. *দৈনিক নয়া বাংলা*, 'জব্বারিয়া এতিমখানার সেলাই প্রশিক্ষণ উদ্‌বোধন', ২২ মার্চ, ১৯৮০, পৃ. ১

১৪৬. সম্পাদক, বায়তুশ শরফ সংবাদ, *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, জুলাই, ১৯৮৮, পৃ. ৫৪

১. বায়তুশ শরফ জব্বারীয়া এতিমখানা চুল কাটা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ধনিয়ালাপাড়া, ডিটি. রোড, চট্টগ্রাম।
২. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, বায়তুশ শরফ রোড, কক্সবাজার।
৩. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, গাঁথারছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।[১৪৭]

৪. প্যাকেজিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

এতিম শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার নিমিত্তে ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'প্যাকেজিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' নামে আরও একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। এতে তাদের বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট তৈরীকরণ ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্যাকেজিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো হলো:[১৪৮]

১. বায়তুশ শরফ প্যাকেজিং ম্যাকিং কাম প্রোডাকশন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।
২. বায়তুশ শরফ প্যাকেজিং ম্যাকিং সেন্টার, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, বায়তুশ শরফ রোড, কক্সবাজার।

৫. প্রেস কম্পোজিটর্স ট্রেনিং সেন্টার

যুগোপযোগী গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও মাসিক দ্বীন-দুনিয়া প্রভৃতি প্রকাশনা ও প্রচারের কার্যাবলি সম্পাদন এবং সেক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য তিনি জুন ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে 'বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ প্রেস' নামে একটি ছাপাখানা চালু করেন। বর্তমানেও প্রেসটির কার্যক্রম চালু রয়েছে। তাছাড়া ২০শে রমযান, ১৪১৪ হিজরি মোতাবেক ১৫ই মার্চ, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সোমবার 'বায়তুশ শরফ কম্পিউটার এণ্ড অফসেট প্রিন্টার্স' নামে আরও একটি ট্রেনিং সেন্টার উদ্‌বোধন করা হয়। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এটির উদ্‌বোধন করেন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মীর মোহাম্মদ নুরুল হুদা, আবুল হোসেন চৌধুরী, অ্যাডভোকেট আব্দুল হালিম, কারি মো. আবদুল হক, হাফেয কারি ইবরাহিম (১৯২০–২০১০ খ্রি.) ও মওলানা নুরুল ইসলাম (১৯৫৩–২০০০ খ্রি.) প্রমুখ।[১৪৯]

৬. নওমুসলিম পুনর্বাসন

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর বহুমুখী কর্মতৎপরতায় অনুপ্রাণিত হয়ে শতাধিক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঘর-বাড়ি, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের অধিকাংশকে অসহায় জীবন যাপন করতে হয়। এজন্য তিনি তাদের পুনর্বাসিত করার জন্য নানান ধরনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।[১৫০]

৭. ত্রাণ তহবিল গঠন

দুঃস্থ পরিবারের বাসগৃহ মেরামত, অভাবী কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতাকে আর্থিক সহায়তা দান, গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা দানের নিমিত্তে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) আশির

---

১৪৭. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *শতফুল ফুটিতে দাও*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৮

১৪৮. শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর একান্ত খাদেম মুহাম্মদ শাহ্‌জাহান (হাতিয়া) থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১৪৯. সম্পাদক, বায়তুশ শরফ সংবাদ, *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, এপ্রিল, ১৯৯৩, পৃ. ৫৬; মুহাম্মদ শাহজাহান, শাহ্ *আবদুল জব্বার রাহ্ এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২

১৫০. আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী, রাহবারে বায়তুশ শরফ ও সভাপতি, বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

দশকের দিকে ত্রাণ তহবিল গঠন করেন। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপদের সময়ে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ, বিভিন্ন মসজিদ ও মাদ্‌রাসায় সহায়তা প্রদানের জন্য ‘ত্রাণ কমিটি’ নামে স্থায়ী সবল সেবাসংস্থা গড়ে তোলেন।[১৫১]

৮. মৎস্য চাষ

আমিষ জাতীয় খাদ্যতালিকায় মাছের অবস্থান শীর্ষে। চাহিদার তুলনায় মাছের জোগানও বাংলাদেশে অনেক কম। তাই মাছের চাহিদা মেটানোর জন্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বাগেরহাট ও নাটোরে পাঁচটি ‘মৎস্য চাষ প্রকল্প’ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘মৎস্য চাষ প্রকল্প’গুলো হলো :[১৫২]

১. বড় হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

১. উত্তর গাঁথার ছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি।

২. পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

৩. ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট।

৪. নাটোর।

৯. ফলের বাগান

স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রতিদিন একজন লোকের কমপক্ষে ১৫০-২০০ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন; কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমান মাথাপিছু ফলের উৎপাদন মাত্র ৭০-৭৫ গ্রাম। তাহলে চাহিদা অনুয়ায়ী জোগান বলতে গেলে অর্ধেক বা তার চেয়ে আরও কম। তাই ফলের জোগান বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি জেলায় দুটি ফলের বাগান প্রতিষ্ঠা করেন। সেগুলো হলো :[১৫৩]

১. বড় হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

২. বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, গাঁথার ছড়া, লংগদু, রাঙ্গামাটি।

১০. কৃষিসেচ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। গ্রীষ্মকালে দেশের অধিকাংশ কৃষি কৃত্রিম সেচের ওপর নির্ভর করে। তাই মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়ায় নিজ এলাকায় একটি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করেন।[১৫৪]

---

১৫১. বাহরুল উলুম শাহ্ সুফি মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, প্রয়াত পীর, বায়তুশ শরফ, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১৫২. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *শতফুল ফুটিতে দাও*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

১৫৩. মওলানা নুরুল ইসলাম (রহ.), সাবেক খতিব, বায়তুশ শরফ কেন্দ্রীয় জামে' মসজিদ ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১৫৪. হাফেয কারি রহমত উল্লাহ্, শিক্ষক, কুমিরাঘোনা আখতরিয়া ইবতেদায়ি মাদ্‌রাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

১১. ডেইরী ফার্ম

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) যুগসচেতন একজন ব্যক্তি ছিলেন। বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় পুষ্টির জোগান অনেক কম। তাই পুষ্টির অভাবে প্রতিবছর অনেক মানুষ অকালে মৃত্যুবরণ করে অথবা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। তিনি মানুষের পুষ্টি মেটানোর জন্য রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু থানাধীন মাইনীমুখে একটি ডেইরি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে কিছুটা হলেও পুষ্টির জোগান দেয়া সম্ভব হয়েছিল; তবে বর্তমানে ফার্মটির কার্যক্রম আর চালু নেই।[১৫৫]

১২. লজেন্স ফ্যাক্টরি

১লা জুন, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা লজেন্স ফ্যাক্টরির উদ্‌বোধন করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী। এ উপলক্ষ্যে ভাষণে তিনি বলেন, এতিমরা যাতে ভবিষ্যতে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে সেজন্য মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর এ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তিনি ভিক্ষার চেয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গৌরবজনক বলে মন্তব্য করেন।[১৫৬]

১৩. গৃহনির্মাণ প্রকল্প

৩০শে বৈশাখ, ১৩৮৭ বাংলা মোতাবেক ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন। তাঁর নেতৃত্বে 'আন্‌জুমানে নওজোয়ানে'র উদ্যোগে ধনিয়ালাপাড়া মহল্লা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তরে এতিম গরিব অসহায় ও দুস্থ পরিবারের জন্য বহু গৃহনির্মাণ এ প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত হয়েছে।[১৫৭]

১৪. শিশু পুনর্বাসন ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু থানায় ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে 'শিশু-কিশোর পুনর্বাসন ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র' স্থাপন করেন। উত্তর গাঁথের ছড়া 'বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা ও মাদ্‌রাসা'র একটি প্রকল্পের অধীনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' ৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকার অর্থানুকূল্যে একটি নতুন ভবনের ব্যবস্থা করে। ২৩শে অক্টোবর, ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এই নবনির্মিত ভবনের উদ্‌বোধন করেন।[১৫৮]

১৫. অন্যান্য প্রশিক্ষণ

এছাড়াও ডেইরি, পোলট্রি ফার্ম প্রশিক্ষণ, ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ, তাঁতশিল্প প্রশিক্ষণ, বন্যপশু পালন প্রশিক্ষণ, বনায়ন প্রশিক্ষণ, ফার্নিচার তৈরি প্রশিক্ষণ, বোর্ড প্যাকেজ মেকিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বুক বাইন্ডিং এবং মৌচাক চাষ প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।[১৫৯]

---

১৫৫. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *শতফুল ফুটিতে দাও*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

১৫৬. *দৈনিক নয়া বাংলা*, 'বায়তুশ শরফের লজেন্স ফ্যাক্টরির উদ্‌বোধন', ৩রা জুন, ১৯৮৪, পৃ. ১

১৫৭. *দৈনিক পূর্বতারা*, 'আনজুমনে ইত্তেহাদের গৃহনির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে', ৩০শে বৈশাখ, ১৩৮৭, পৃ. ১

১৫৮. *দৈনিক গিরিদর্পণ*, 'লংগদুতে শিশু পুনর্বাসন ও ঘূণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের নতুন ভবন উদ্‌বোধন', ২ নভেম্বর, ১৯৯৩, পৃ. ১

১৫৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ সাইফুল হক সিরাজী, 'পাক ভারত উপমহাদেশের বিরলপ্রজ সংস্কারক পীরে বায়তুশ শরফ (রাহ.)', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮

মোদ্দাকথা, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সারাজীবন কল্যাণ ও ঈমানের পথে মানুষকে আহ্বান করেছেন। শরি'আত ও তরিকতভিত্তিক তাঁর জ্ঞান-গবেষণা এবং মানবসেবায় তাঁর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা বাংলাদেশে একটি নীরব বিপ্লবের সূচনা করেছে। তিনি মানবকল্যাণে ও জ্ঞান সাধনায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। মানবকল্যাণে তিনি তাঁর সবকিছু উজাড় করে গেছেন। বাংলার ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি যে আলো জ্বালিয়ে গেছেন সে আলো কখনও নিভে যাওয়ার নয়। তাঁকে স্মরণ করে সকলেই আলোকিত হবে। মানুষের বোধ, চেতনা, উপলব্ধি ও উদ্‌বোধনের জন্যই তাঁর স্মরণ প্রয়োজন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুফিবাদের বিকাশে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ভূমিকা

- প্রথম পরিচ্ছেদ : সুফিবাদের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সুফিবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ : কুর'আন-সুন্নাহ্ ও মনীষীদের দৃষ্টিতে সুফিবাদ
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ সুফি তরিকাহ্সমূহ
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ : সুফিবাদের বিকাশে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুফিবাদের বিকাশে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ভূমিকা

তাসাওউফ হচ্ছে ইলমে শরি‘আতের তথা ইলমে জাহেরের রুহ বা আত্মা। আত্মা ছাড়া শরীরের যেমনি কোনো মূল্য নেই, তেমনি শরি‘আত ও তাসাওউফের সমন্বয় যার মধ্যে ঘটেনি, সে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। এই জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে এই পৃথিবীতে নবি করে পাঠানোর প্রাক্কালে উল্লেখযোগ্য চারটি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তন্মধ্যে তাযকিয়ায়ে নফ্স তথা ইলমে তাসাওউফের চর্চা অন্যতম। এর দ্বারা তিনি মানুষকে কলুষমুক্ত করবেন; দূষিত চরিত্র থেকে ফিরিয়ে রাখবেন; মানুষের ভেতরের ক্লেদকে কুসুমে রূপান্তরিত করবেন; মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন; যার ভেতর-বাইর হবে পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ ও নিষ্কলুষ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

অর্থাৎ ‘আল্লাহ্ তা‘আলা অবশ্যই মু’মিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে তাদের নিকট রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাদের পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।’[১]

কাজেই আত্মার পরিশুদ্ধ করা এবং এ উদ্দেশ্যে তার ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা দীনের একটি অপরিহার্য কর্তব্য ও সর্বাপেক্ষা বড়ো জিহাদ। আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা ফরযে ‘আইন তথা অত্যাবশ্যক; কেননা, আত্মা ত্রুটিযুক্ত ও কলুষিত হলে বান্দার কোন ‘আমলই নিষ্কলুষ ও পবিত্র হতে পারে না। অনুরূপভাবে, আত্মার পরিশুদ্ধি ছাড়া কারও পক্ষে সত্যিকার অর্থে ঈমানের স্বাদ লাভ করা, দীনের বিধি-বিধান প্রতিপালন করা, দীনের ওপর অটল ও অবিচল থাকা এবং সর্বোপরি, আল্লাহ্ তা‘আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়।

তাই মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) নিজের আত্মা পরিশুদ্ধ করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষ তথা মুরিদদের আত্মা পরিশুদ্ধ করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তাদেরকে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করতেন; যাতে তারা সবসময় আল্লাহ্ তা‘আলার প্রেম ও রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভালোবাসায় নিমগ্ন থাকতে পারেন। এজন্য তিনি নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন সেটাই এই অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

---

১. আল-কুর’আন, ৩ : ১৬৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুফিবাদের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মানুষ ও জিন জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হচ্ছে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ 'আমি মানুষ ও জিনকে আমার 'ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।'[২] আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রদত্ত গুণাবলির যথার্থ বিকাশ ও উন্নতির মাধ্যমেই মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চাসনে সমাসীন হতে পারে; 'ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করে প্রভুর নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পারে। আল্লাহ্র 'ইবাদতই মানবজাতির প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। 'ইবাদতকার্য সম্পাদনের জন্যই তিনি যে নীতিমালা দিয়েছেন তা শরি'আত নামে পরিচিত। শরি'আতের বিধি-বিধানকে যথাযথভাবে পালন ও ষোলোকলায় পূর্ণ করার জন্য আত্মার পরিশুদ্ধির প্রয়োজন।

'ইবাদতের স্বাদ আস্বাদনের যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে প্রভুর সান্নিধ্য লাভের পথকে সুষমামণ্ডিত করাকে সুফিবাদ বলে। আত্মার বিশুদ্ধীকরণ ও পূর্ণতা দানের মধ্যেই এর সফলতা নিহিত। কুর'আনে ইরশাদ হচ্ছে, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا অর্থাৎ 'যে আত্মাকে বিশুদ্ধ করেছে সেই সফল হয়েছে, আর যে তা কলুষিত করেছে সে ব্যর্থমনোরথ হয়েছে।'[৩] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরি (রহ.) (৬৪১–৭২৮ খ্রি.) বলেন,

> قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل، وقد خاب من دساها قال : من أهلكها وأضلها وحملها على معصية الله.
>
> অর্থাৎ 'যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করতে পেরেছে এবং তাকে আল্লাহ্র 'ইবাদতে নিয়োজিত করতে পেরেছে, সে-ই সফল হয়েছে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আত্মাকে ধ্বংস করল, বিপথগামী করল এবং তাকে আল্লাহ্র নাফরমানির কাজে নিয়োজিত করল, সে ব্যর্থ মনোরথ হলো।'[৪]

মূলত, তাসাওউফ বা আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে ইসলামের প্রাণ ও মগজ। এটি শরি'আতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শরি'আতের সাথে এর সম্পর্ক নামাযের আরকান ও আহকামের ন্যায়।[৫] এটা ছাড়া শরি'আত অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে।

সুফি শব্দের উৎপত্তি ও নামকরণ

'সুফি' শব্দের উৎপত্তি ও এর নামকরণ প্রসঙ্গে বিদগ্ধ 'আলিম ও সুফিগণের মধ্যেও নানান মত প্রচলিত রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

---

২. আল-কুর'আন, ৫১ : ৫৬

৩. আল-কুর'আন, ৯১ : ৯-১০

৪. মহিউস্ সুন্নাহ আল-বাগাভি, *মা'আলিমুত তানযিল* (রিয়াদ : দারু তাইয়িবাহ, ১৯৯৭), খ.৮, পৃ. ৪৩৯; আহমদ আবু ইসহাক আছ-ছা'লাভি, *আল-কাশফু ওয়াল বায়ান 'আন তাফসিরিল কুর'আন* (জেদ্দা : দারুত তাফসির, ২০১৫), খ.১০, পৃ. ২১৪

৫. ড. মোহাম্মদ মোস্তাফা কামাল, *আত্-তাসাওউফ ওয়া আহমিয়াতুহু ফিল ইসলাম* (প্রবন্ধ), Journal of Islamic University Studies, Part A, Volum 7, No 2, June 1999; আবু বকর জাবির আল-জায়াইরি, '*আকিদাতুল মু'মিন* (জেদ্দা : দারুস সুলুক, ১৯৮৭), পৃ. ১৮১

▪ ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয্‌যাহাবি (১৯১৫–১৯৭৭ খ্রি.)-এর মতে, 'সুফি' (صوفي) শব্দটি 'সুফ' (صوف) শব্দ থেকে উৎগত।[৬] 'সুফ' অর্থ পশম (Wool) আর 'তাসাওউফ' অর্থ পশমি বস্ত্র পরিধান করা।[৭] পূর্ববর্তী নবি-রাসুল ও সাহাবিগণের অনেকেই পশমের পোশাক পরিধান করতেন।[৮] এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাবি'ঈ হাসান আল-বাসারি (৬৪১–৭২৮ খ্রি.) (রহ.) বলেন, أدركت سبعين بدريا ما كان لباسهم إلا الصوف অর্থাৎ 'আমি সত্তর জন বদরি সাহাবিকে দেখেছি, যাদের পোশাক ছিল কেবল পশমের।'[৯] তাদের অনুসরণে ইসলামের প্রথম পর্যায়ের সত্যনিষ্ঠ বুযুর্গ লোকদের অনেকেই সাধারণ পশমের পোশাক পরিধান করতেন; তাই তাদের 'সুফি' বলা হতো।[১০] এ মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। নাজমুদ্দিন কুবরি (মৃ. ১২২১ খ্রি.) ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন (রহ.) (১৩৩২–১৪০৬ খ্রি.)-সহ অনেকেই এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[১১] J. Spencer Trimingham (১৯০৪–১৯৮৭ খ্রি.) বলেন,

> 'The Term Sufi was first applied to Muslim ascetics who clothed themselves in coarse garments of wool (Suf) from it comes the tasawwuf for Mysticism.'[১২] অর্থাৎ 'সুফি পদবাচ্যটি সর্বপ্রথম মুসলিম সাধকদের ওপর প্রয়োগ করা হতো যারা মোটা পশমি পোশাক পরিধান করতেন। আর মরমিবাদ থেকেই তাসাওউফ শব্দটি উৎপত্তি লাভ করে।'

দার্শনিক Reynold A. Nicholson (১৮৬৮–১৯৪৫ খ্রি.) ও R. Graves (১৮৯৫–১৯৮৫ খ্রি.)-সহ অনেকেই অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।[১৩] এ শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্নমত থাকলেও উদ্ধৃত ব্যাখ্যাটি সর্বাধিক প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য।

▪ কেউ কেউ বলেন, 'সুফি' শব্দটি 'সুফ্‌ফা' الصُّفَّةِ থেকে উদ্ভূত। সুফিগণ যেহেতু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে 'আহলুস সুফ্‌ফা'র[১৪] নিকটবর্তী, তাই তাদের সুফি নামে অভিহিত করা হয়।[১৫]

---

৬. ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয্‌যাহাবি, *আত্-তাফসির ওয়াল মুফাস্‌সিরুন* (কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৬), খ.২, পৃ. ৩৩৭

৭. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৪৯৪

৮. আবু হাফস 'উমার আস-সুহরাওয়ার্দি, *'আওয়ারিফুল মা'আরিফ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৯), খ.১, পৃ. ২১১; আবু সা'ঈদ মুহাম্মদ খাদিম, *বারিকাতুন মাহমুদিয়্যাতুন ফি শারহিত তারিকাতিল মুহাম্মদিয়্যাহ* (কায়রো : মাতবা'আতুল হালভি, ১৯২১), খ.১, পৃ. ২৭৪; ইহসান ইলাহি যাহির, *আত-তাসাওউ : আল-মানশা' ওয়াল মাসাদির* (লাহোর : ইদারায়ে তরজুমানুস সুন্নাহ, তা. বি.), পৃ. ১৯ ও ২২

৯. আবু সা'ঈদ মুহাম্মদ খাদিম, *বারিকাতুন মাহমুদিয়্যাতুন ফি শারহিত তারিকাতিল মুহাম্মদিয়্যাহ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ২৭৪

১০. গোলাম সোলায়মান আলী সরকার, *ইবনুল আরাবি ও জালাল উদ্দিন রুমি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ১২; Sayed Abdul Hai, *Muslim Philosophy* (Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1982), p.141

১১. আবদুর রহমান ইবনু খালদুন, *তারিখু ইবনি খালদুন* (বৈরুত : দারু কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯২), খ.১. পৃ. ৪৬৭; নাজমুদ্দিন কুবরি, *আদাবুস সুফিয়ান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮; ড. মুহাম্মদ হুসাইন আয্‌যাহাবি, *আত্তাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ৩৩৭; সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬), পৃ. ৬৮৬

১২. J. Spencer Trimingham, *The Sufi Orders in Islam* (Oxford : Oxford University Press, 1982), p. 3

১৩. Reynold A. Nicholson, *The Mystics of Islam* (London : George Bell & Sons Ltd.,1914), p. 3; Idris Shah Graves, *The Sufis* (New York : Doubledy & Company, 1994), p. xvi

- কারও কারও মতে, 'সুফি' শব্দটি আরবি صفاء শব্দ থেকে উৎপত্তি। صفاء শব্দের অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতা। সুফিগণের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও আচরণ-ব্যবহার যেহেতু অধিকতর নিষ্কলুষ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তাই তাদের এ নামে অভিহিত করা হয়। এ অর্থে 'সুফি' শব্দটি মানুষের উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরে সেটি اسم علم (নামবাচক) রূপে পরিগণিত হয়। আল্লামা নুরুদ্দিন আবদুর রহমান জামি (রহ.) (১৪১৪–১৪৯২ খ্রি.), আবুল ফাতহি আল-বসতি (রহ.) (৯৪২–১০১০ খ্রি.) ও দাতাগঞ্জে বখশ (রহ.) (১০০৯–১০৭২ খ্রি.) প্রমুখ এ-মতকেই সমর্থন করেছেন।[১৬]

- আল্লামা লুৎফি জুম'আ (১৮৮৬–১৯৫৩ খ্রি.) তাঁর '*তারিখু ফালাসাফাতিল ইসলাম ফিল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি*' নামক গ্রন্থে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'সুফি' শব্দটি গ্রিক 'সুইউ সুফিয়া' (ثُيُوْ صُوْفِيَا) শব্দ থেকে এসেছে। গ্রিক ভাষায় এ শব্দটির অর্থ প্রভুর জ্ঞান; কেননা সুফিও একজন বিজ্ঞানী। তিনি প্রভুর জ্ঞান সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন, কারণ যিনি প্রকৃত অর্থেই সুফি, তিনি আত্মসাধনার মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্যর উন্মোচন করার অনুশীলনে নিমগ্ন থাকেন। তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টি কৌশলের রহস্যভেদ উদ্ঘাটনে সক্ষম হন। আর এটাই হলো প্রভু প্রদত্ত জ্ঞান।[১৭]

- কারও কারও মতে, 'সুফি' শব্দটি 'সফ' صَفٌّ শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'সফ' শব্দের অর্থ সারি, পঙ্ক্তি ও কাতার। যেহেতু সুফিগণ অন্তরের নিষ্কলুষতার দিক থেকে প্রথম কাতারভুক্ত লোক, তাই তাদের এ নামে অভিহিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবুল কাসিম আল-কুশায়রি (রহ.) (৯৮৬-১০৭৪ খ্রি.) বলেন,

إِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الصَّفِّ فَكَأَنَّهَا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ بِقُلُوْبِهِمْ مِنْ حَيْثُ المحَاضَرَةِ مِنَ اللهِ تَعَالى

অর্থাৎ 'যারা ঐশী প্রেম, আধ্যাত্মিক অগ্রগতি ও ধর্মের দিক দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটবর্তী, তারাই সুফি।'[১৮]

- অধ্যাপক ড. রেনল্ড এ. নিকলসন (১৮৬৮–১৯৪৫ খ্রি.) ও কিছুসংখ্যক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, 'সুফি' শব্দটি গ্রিক 'Sophist' শব্দ থেকে উদ্ভূত। গ্রিক ভাষায়, 'সোফিস্ট' শব্দের অর্থ জ্ঞানী।

---

১৪. الصفة শব্দের অর্থ চালা, শামিয়ানা ও তাঁবু। যে সকল সাহাবি (রা.) সবকিছু ত্যাগ করে রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট চলে এসেছিলেন, তাঁদের বসবাসের জন্য তিনি মসজিদে নববির পাশে একটি চালা তৈরি করে দিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা সর্বক্ষণ থাকতেন। এ কারণে তারা 'আহলুস সুফ্ফাহ' নামে খ্যাতি লাভ করেন। দ্র. মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, *ইল্‌মে তাসাউফের হাকীকত* (ঢাকা : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ্ শরফ একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ১২; আবু হাফস 'উমার আস-সুহরাওয়ার্দি, শামস বেরেলভি অনূদিত, *আ'ওয়ারিফুল মা'আরিফ* (দিল্লি : ফরিদ বুক ডিপো, ২০০১), পৃ. ২০২

১৫. ড. আহমদ আলী, *তাসাউফের স্বরূপ* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৯), পৃ. ৪০

১৬. ড. আবদুল লতীফ মুহাম্মদ আল-আবদ, *আল-তাসাওউফ ফিল ইসলাম* (কায়রো : জামেয়া আল-কাহেরা কুল্লিয়্যাত দারুল উলুম, ১৯৮৬), পৃ. ১৪; ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা* (বগুড়া : সাহিত্য সোপান, ২০০৬), পৃ. ২৪৪; ফকীর আবদুর রশীদ, *সূফী দর্শন* (ঢাকা : হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৬), পৃ. ২৬; আলী হাজবিরী দাতা গঞ্জেবখশ, মুহাম্মদ সিরাজুল হক অনূদিত, *কাশফুল মাহ্জুব* (ঢাকা : ইসলামিয়া কোরআন মহল, ১৯৯৯), পৃ. ৪৬; খালিক আহমেদ নিযামি, *তারিখে মাশায়েখে চিশত* (দিল্লি : নাদ্ওয়াতুল মুসান্নিফিন, ১৯৬৩), পৃ. ১৮

১৭. Dr. T. J. De Boer, *History of Philosophy in Islam* (London : Luzac & Co., 1961), p. 61; মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা* (ঢাকা : নবরাগ প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ১

১৮. মুফতী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *তাসাওউফ ও তরীকত : প্রসঙ্গ কথা* (ঢাকা : বাড কম্প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশন্স, ২০১৭), পৃ. ৩৯-৪০; শায়খ আবদুল কাদির শাযলি, মুহাম্মদ আকরাম আল-আযহারি অনূদিত, *হাকায়িক আন আল-তাসাওউফ* (লাহোর : যাভীয়া ট্রেডার্স, ১৯৯৮), পৃ. ২৭

সুফিগণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের সাগর। আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে যাঁরা জ্ঞানবান, তাঁরা শুধু জ্ঞানীই নন, মহাজ্ঞানীও বটে।[১৯] পবিত্র কুর'আনে তাদেরকে 'উলুল আল্‌বাব' أُولُو الْأَلْبَابِ বলা হয়েছে।[২০] বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ আবুর রাইহান মুহাম্মদ আল-বিরুনি (৯৭২–১০৪৮ খি.) এ-মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[২১]

'সুফি' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিমতের মধ্য দিয়ে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যিনি পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে সাধনা-আরাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করেন, তিনিই সুফি।

উল্লেখ্য, এ সব মূল ধাতু ও تصوف (তাসাওউফ) শব্দের মাঝে আপাতত جنسية এর পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়; তবে ছরফ শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী এগুলো اشتقاق اكبر[২২] এ পর্যায়ভূক্ত। উপরিউক্ত মতামতের সবগুলোর অর্থ সুফিগণের জীবনে প্রতিফলিত হয়। ঐসব ধাতু থেকে 'তাসাওউফ' ও 'সুফি' উভয় শব্দের উৎপত্তির বর্ণনা রয়েছে; তবে শব্দ দুটির অর্থগত পার্থক্য এই যে, তাসাওউফ হলো, এ পথযাত্রীর চলার পদ্ধতি ও এ বিষয়ে সূচনা মাত্র। আর যার মাঝে তাসাওউফের সবগুণ পাওয়া যায় তাকে সুফি বলা হয়। সুতরাং, 'সুফি' শব্দটি তাসাওউফের পরিণত অবস্থার চূড়ান্ত নাম।[২৩]

সুফিবাদের স্বনামে আত্মপ্রকাশ

হযরত মুহাম্মদ (সা.), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবে'ঈন মনেপ্রাণে ও তাদের কর্ম-সাধনায় ছিলেন আল্লাহ্‌র সমীপে উৎসর্গিত-প্রাণ; কিন্তু তাদের কাউকে সুফি বলা হতো না। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত সুফি শিহাবুদ্দীন আল-সুহরাওয়ার্দি (১১৪৪–১২৩৪ খ্রি.) (রহ.) বলেন, রাসুলুল্লাহ্ (সা,)-এর যুগে এ শব্দের ব্যবহার ছিল না।[২৪] তবে সে সময় অধিক দীনদার ব্যক্তিদের عَابِدٌ (ইবাদতকারী), زَاهِدٌ (দুনিয়ার প্রতি বিরাগী), نَاحِبٌ (ক্রন্দনকারী), مُقَرَّبٌ (নৈকট্য লাভকারী), صَابِرِيْنَ (ধৈর্যশীল), أَبْرَارٌ (পুণ্যবান) প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হতো।[২৫]

ইতিহাসবিদ ইবনু খালদুন (রহ.)-এর মতে, হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'সুফি' শব্দের ব্যবহার শুরু হয়; কিন্তু আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে এ কথা বলা যায় যে, তাবি'ঈদের যুগেই সর্বপ্রথম প্রচলিত

---

১৯. ফকির আব্দুর রশীদ, *সূফী দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২; ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪), পৃ. ১৭১

২০. আল-কুর'আন, ২ : ৭

২১. আস-সাইয়্যেদ আবিন নাসর আহমদ আল-হুসাইনি, *আল-ফালসাফাতুল হিন্দিয়্যাহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

২২. দুশব্দের মূলধাতুতে যদি অধিকাংশ বর্ণের মাঝে মিল পাওয়া যায় এবং অমিল বর্ণদ্বয়ের মাখরাজ একই হয়, তবে তাকে اشتقاق اكبر বলে। দ্র. সায়্যিদ আমীন, *মা'আরিবুত তালাবা* (মায়ানমার : দারুল উলুম মুহাম্মদিয়া, তা. বি.), পৃ. ৫৬; মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দিন আল-হানফি, *হাশিয়াহ্ শায়খ যাদাহ্ আলা তাফসির আল কাযি আল-বায়দাভি* (ইস্তাম্বুল : হাকিকাত কিবাবিভি, ১৯৯৪), ৯৪; আহমদ ইবন আলি, *মারাহ আল-আরওয়াহ* (দিল্লি : মাকতবায়ে থানভিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৫

২৩. সায়্যিদ ওয়াজহাতুর রাসুল কাদিরি, *আহলে তাসাউরে জিহাদ* (লাহোর : রেযা একাডেমি, তা. বি.), পৃ. ২৯

২৪. 'উমার সুহরাওয়ার্দি, *'আওয়ারিফুল মা'আরিফ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

২৫. আবদুল করিম কুশাইরি, *আর-রিসালাতুল কুরাইশিয়্যাহ ফি 'ইলমিত তাসাওউফ* (কায়রো : দারুল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা, ২০১৯), খ.১, পৃ. ৬; ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

অর্থে এ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। তবে ইসলামের ইতিহাসে কে সর্বপ্রথম ‘সুফি’ নামে পরিচিত লাভ করেন, এ বিষয়ে বিশিষ্ট আলিম ও ইতিহাসবিদদের একাধিক মতামত পাওয়া যায়। যেমন ;

(ক) আল্লামা নুরউদ্দিন আবদুর রহমান জামি (রহ.) (১৪১৪–১৪৯২ খ্রি.)-এর মতে, শেখ আবু হাশিম আল-সা‘দ বিন আহমদ কুফি (রহ.) সর্বপ্রথম সুফি পরিচয়ে ভূষিত হন।[২৬] মওলানা ‘আবদুর রহমান আল-জামি (রহ.)ও এ মত পোষণ করেন।[২৭] কারও কারও মতে, তিনি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস সুফইয়ান আছ-ছাওরি (১৩১৫–১৩৭৬ খ্রি) (রহ.)-এর সমসাময়িক ছিলেন। সুফিয়ান আছ-ছাওরি তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন, لولا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقائق الرياء অর্থাৎ ‘আবু হাশিম (রহ.) না হলে আমি রিয়া (‘ইবাদতে প্রদর্শনেচ্ছা) সম্পর্কিত সূক্ষ্ম বিষয়গুলো জানতাম না।’[২৮]

(খ) আবার কেউ কেউ কুফার রসায়নবিদ জাবির বিন হাইয়ান (রহ.) (৭২১–৮১৩ খ্রি.)-কে প্রথম সুফি হিসেবে অভিহিত করেন। বিখ্যাত ফরাসি প্রাচ্যবিদ মেসিনিয়নও এ-মত পোষণ করেন।[২৯] অবশ্য যাকেই প্রথম সুফি বলা হোক না কেন, হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে ‘সুফি’ নামটি সাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এ সময় বহু মুসলিম মনীষীকে তাদের নামের সাথে ‘সুফি’ শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়।[৩০]

(গ) কোনো কোনো ইতিহাসবিদের মতে, শায়খ ‘আবদুকা (অর্থাৎ ‘আবদুল করিম) (মৃ. ৮২৫ খ্রি.)-ই সর্বপ্রথম বাগদাদে ‘সুফি’ নামে পরিচিত লাভ করেন।[৩১] বিখ্যাত সুফি আল-হারিছ আল-মুহাসিবি (মৃ. ৮৫৭ খ্রি.) বলেন, ‘আবদুকা একশ্রেণির শী‘আ[৩২] সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা নিজেদেরকে ‘সুফি’ নামে অভিহিত করতেন।

(ঘ) কেউ কেউ হাসান আল-বসরি (রা.) (৬৪২–৭২৮ খ্রি.)-কে ‘সুফিবাদের জনক’ বলে থাকেন।[৩৩] তাঁর অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবনযাপন বহুকাল পর্যন্ত সুফিদের প্রভাবিত করেছে। সুফিবাদের ক্রমবিকাশে তাঁর প্রভাব ছিল স্থায়ী এবং অনবদ্য।[৩৪]

প্রথম পর্যায়ের সুফি সাধকগণ শরি‘আতের কঠোর অনুগামী ছিলেন। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের অনুসরণে নামায, রোযা, প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদি তারা গভীর নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করতেন। তাছাড়া তাদের ‘ইবাদত ছিল সুন্নাত-অনুসৃত; বিদ‘আত ও কুসংস্কারমুক্ত। যুহ্‌দ (দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ চরিত্র), তাকওয়া (আল্লাহ্‌ভীতি) ও ইখলাস (একনিষ্ঠতা)-ই ছিল তাদের ভূষণ। আত্মসংশোধন ও চরিত্রসংশোধন এবং

২৬. আল্লামা নূরউদ্দিন আবদুর রহমান জামি, *নাফাহাতুল উন্‌স* (করাচি : মদিনা পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৮২), পৃ. ১৭৭-৭৮

২৭. মুফতি আহমদ শফী, *ফুয়ুযাতে আহমদিয়্যাহ* (চট্টগ্রাম : মাকতাবাতুল মাদানী, তা.বি.), পৃ. ১৪

২৮. ‘উমার সুহরাওয়ার্দি, *‘আওয়ারিফুল মা‘আরিফ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৫৯-৬৩

২৯. আহমদ মুহাম্মদ সবরি, *দায়িরাতুল মা‘আরিফিল ইসলামিয়্যাহ* (জেরুজালেম : মাকতাবাতুন নুর, ২০২০), খ.৬, পৃ. ৪১৯

৩০. ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৯

৩১. ইবনুন নাজ্জার আল-বাগদাদি, *যায়লু তারিখি বাগদাদ* (বৈরুত : মু‘আস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬), খ.১, পৃ. ২৫৩

৩২. শী‘আ মুসলিমগণের কতকগুলো উপদলের মধ্যে এক বৃহৎ দলের নাম। রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা.) ন্যায়ত খলিফা হওয়ার দাবিদার ছিলেন–এ মতবাদের ভিত্তিতে এ দলের উদ্ভব হয়। তারা ‘খিলাফত বনাম গণসমর্থনের ভিত্তি’তে নির্বাচিত খলিফার আনুগত্য স্বীকার করতে রাজি নয়; এমনকি কুরাইশ হলেও না। তাদের মত হলো : আহলুল বায়ত (নবি পরিবার) অর্থাৎ হযরত আলী ও ফাতিমা (রা.)-এর বংশোদ্ভূতগণই ইমামতের অধিকারী। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭

৩৩. ড. মো. ইবরাহীম খলিল, *সূফীবাদ এবং প্রধান প্রধান সূফী ও তাদের অবদান* (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশনা, ২০১৩), পৃ. ৮৭

৩৪. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ৫৫৯

পূর্ণ নিষ্ঠা, ভয় ও ভালোবাসা সহকারে আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদত ও তাঁর দীনের প্রচার-প্রসার এবং এভাবে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক উন্নয়নই ছিল তাদের একান্ত উদ্দেশ্য।[৩৫]

পরবর্তীকালে মিশরের জগৎ বিখ্যাত সুফি আবুল ফয়েজ সওবান বিন ইবরাহিম যুননুন মিসরি (রহ.) (৭৯৬–৮৫৯ খ্রি.) সুফিবাদকে একটি পৃথক শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য তাকে 'সুফিবাদের জনক' বলা হয়। তিনি সর্বসাধারণের নিকট 'সুফিবাদ'কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করে এর সংজ্ঞার্থ প্রদান করেন। তিনি সুফিবাদকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। এর ব্যাবহারিক রূপের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি একে সাধনার উপযোগী হিসেবে নিয়ন্ত্রণ ও রূপদান করার গৌরব অর্জন করেন।[৩৬] সুফি-সাধকদের মধ্যে হযরত যুননুন মিসরি (রহ.) (৭৯৬-৮৫৯ খ্রি.)-ই সর্বপ্রথম জ্ঞান-সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পরম সত্তার অনুভূতি জাগ্রত করার প্রয়োজনীয়তা এবং গভীর অনুরাগ সৃষ্টি করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।[৩৭] তখন সুফিবাদ ইসলামের একটি পৃথক শাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

সুফিবাদের পরিচয়

সুফিবাদ ইসলামের একটি পৃথক শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর মুসলিম মনীষীগণ তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে এর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। এখানে প্রধান কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো:

১. 'কাশফুজ জুনুন'-গ্রন্থকার আল্লামা মুস্তফা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রহ.) (১৬০৮–১৬৫৭ খ্রি.) বলেন, هو علم يعرف به كيفية ترقي اهل الكمال من النوع في الإنسان في مدراج سعاداتهم অর্থাৎ 'মানুষের মধ্যে বিশেষ বিশেষ উন্নত প্রণালীর স্তরসমূহ অতিক্রম করে কামালিয়াতের যোগ্যতা হাসিলের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার নাম 'ইলমে তাসাওউফ বা সুফিবাদ।'[৩৮]

২. শায়খুল ইসলাম আল্লামা যাকারিয়া আনসারি (রহ.) (মৃ. ১৫২২ খ্রি.) বলেন,

    التَّصَوُّفُ عِلْمٌ تُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ تَزْكِيَةِ النُّفُوسِ، وَتَصْفِيَةُ الأَخْلَاقِ وَتَعْمِيرُ الظَّاهِرِ وَالبَاطِنِ لِنَيْلِ السَّعَادَةِ الأَبَدِيَّةِ

    অর্থাৎ 'সুফিবাদ হচ্ছে সেই বিদ্যার নাম, যাতে চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জনের জন্যে আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির জ্ঞান আলোচিত হয়ে থাকে।'[৩৯]

৩. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি (রহ.) (১০৫৮–১১১১ খ্রি) বলেন, 'আল্লাহ্ তা'আলার ওপর পূর্ণ ভরসা করে সর্বপ্রকার বাতিল ধ্যান-ধারণা হতে মনকে মুক্ত করে নিষ্ঠার সাথে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রেম অর্জন করাকে সুফিবাদ বলে।'[৪০]

---

৩৫. ড. আহমদ আলী, *তাসাউফের স্বরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৩৬. ফকির আবদুর রশিদ, *সূফী দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৩৭. চৌধুরী শামসুর রহমান, *সুফিদর্শন* (ঢাকা : বিদ্যা প্রকাশ, ২০০২), পৃ. ৫২

৩৮. শিহাবুদ্দিন আল-আলুসি, *রূহুল মা'আনি* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪), খ.১৮, পৃ. ১৫৭

৩৯. আবদুল করিম ইব্‌ন হাওয়াযিন কুশাইরি, *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ* (কায়রো : দারুত তাবা'আতিল 'আমিরাহ, ২০১৮), পৃ. ৭

৪০. ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার, 'তাসাউফের তত্ত্বজ্ঞান : একটি সমীক্ষা', *কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাকা : বিশ্ববিদ্যালয়, জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬, পৃ. ১১

৪. ‘আবদুল্লাহ ইবনু মু‘আবিয়া আল-গাদিরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আরয করেন, وَمَا تَزْكِيَةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ؟ অর্থাৎ ‘ব্যক্তি কর্তৃক তার নফ্সের তাযকিয়াহ বলতে কী বোঝায়?’ তিনি উত্তর দেন, أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ অর্থাৎ ‘ব্যক্তির নফ্সের তাযকিয়া হলো, সে এই মর্মে বিশ্বাস পোষণ করবে যে, সে যেখানেই থাক না-কেন, আল্লাহ্ তা‘আলা তার সাথেই রয়েছেন।’[৪১]

উপরিউক্ত সংজ্ঞার্থসমূহ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, সুফিবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ‘তাযকিয়াতুন্-নফ্স’[৪২] বা ‘আত্মশুদ্ধি’। যে ব্যক্তি এ বিদ্যা অর্জনে ব্রতী হন এবং নিজেকে পবিত্র আত্মার অধিকারী করতে সক্ষম হন তিনিই প্রকৃত সুফি।[৪৩] সুতরাং, সুফিবাদ হলো একপ্রকার বিশেষ সাধাণার নাম, যার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো পার্থিব জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ বা বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তরকে সর্বক্ষণ আল্লাহ্র স্মরণ ও প্রেমে নিবদ্ধ রাখা। এর ফলে (সুফিদের ধারণানুসারে) এক পর্যায়ে বান্দাহ্র সাথে আল্লাহ্র মিলন ঘটে। এভাবে সে অপার্থিব তৃপ্তি লাভ করে। শাইখ মা‘রুফ আল-কারখি (৭৫০–৮১৫ খ্রি.) (রহ.) বলেন, التصوف هو الأخذ بالحقائق، واليأس مما في أيدي الخلائق অর্থাৎ ‘তাসাওউফ হলো হাকিকত তথা আল্লাহ্ তা‘আলার নিগূঢ় রহস্যসমূহ অবলম্বন করে সৃষ্টির সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাওয়া।’[৪৪]

সুফিবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ

মুসলিম দর্শনের বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর উৎপত্তির ন্যায় সুফিবাদও পবিত্র কুর’আনের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে; কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকেই সুফিবাদকে বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শন, খ্রিষ্টীয় ও নিয়োপ্লেটোনিক দর্শন এবং পারসিক দর্শনের প্রভাবজাত প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই সমস্ত পণ্ডিত কুর’আনিক উৎসকে স্বীকার করতে রাজি নন। এদের মধ্যে ভনক্রেমার, এইচ মর্টেন, ব্রাউন, নিকলসন প্রমুখের নাম

৪১. ইমাম তবরানি, *আল-মু‘জামুস সগির* (বৈরুত : আল-মকতাবুল ইসলামি, ১৯৮৫), খ.১, পৃ. ৩৩৪

৪২. বিশিষ্ট মুফাসসির আল্লামা শিহাবুদ্দিন আল-আলুসি (রহ.) (১৮০২–১৮৫৩ খ্রি.) তাযকিয়াতুন্-নাফ্স-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, **الاستقامة على التوحيد وإخلاص العمل لله تعالى والتبري عن الشرك.** অর্থাৎ ‘তা হলো তাওহিদের ওপর অটল থাকা, নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ‘আমল করা এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকা।’ দ্র. শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আলুসি, *রূহুল মা‘আনি*, পূর্বোক্ত, খ. ১৮, পৃ. ১৫৭; মোটকথা, অন্তরকে সকল প্রকার আত্মিক রোগ তথা কুফ্র, শির্ক, আল্লাহ্ তা‘আলা ব্যতীত অন্যের ওপর ভরসা করা, গিবত, অহংকার, ক্রোধ, কৃপণতা, লোভ, হিংসা, দুনিয়ার মোহ, লৌকিকতা প্রভৃতি থেকে পবিত্র করা এবং তদস্থলে ভালো ও সৎ গুণাবলি তথা ইখলাছ, তাক্ওয়া, তাওয়াক্কুল, সবর ও শোক্র প্রভৃতি দ্বারা অন্তরকে পরিপূর্ণ করা। দার্শনিক যাকারিয়া আনসারির মতে, আত্মশুদ্ধি, পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত জীবন গঠন, রুহ ও কলবের পবিত্রতা, আল্লাহ্ তা‘আলার প্রতি মুহাব্বত, ইখলাস, ভিতর ও বাহিরকে পরিচ্ছন্ন-পবিত্রকরণ ও একাগ্রচিত্ততা ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা‘আলার রেজামন্দি অর্জনের লক্ষ্যে শরি‘আতের পূর্ণ আনুগত্যই তাযকিয়াতুন্-নফ্স। শুধু রাতের শেষভাগে তাহাজ্জুদ আদায় করার সময়েই নয়; বরং জীবন-মৃত্যু, বিশ্বাস-প্রত্যয়, চালচলন, আচার-আচরণ, কথাবার্তা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, পরিবার ও সমাজ, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি, লেনদেন, আদান-প্রদান, আয়-ব্যয়, উপার্জন, উৎপাদন, বিবাহশাদি, নৈতিকতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শয়ন-স্বপন, ওঠা-বসা তথা সমগ্র জিন্দিগির সকল কাজে ও কর্মে আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়া, আল্লাহ্ তা‘আলার নির্দেশিত সকল কাজ ও কর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করাই হচ্ছে প্রকৃত ৎপক্ষে তায্কিয়াতুন্-নফ্স। দ্র. ‘আলি আশ্-শারবিজি কাসিম আন্-নুরি, *আল্-আযকার* (রিয়াদ : মাক্কাতুল মুকাররামা, ২০০৩), পৃ. ২৩

৪৩. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদ্ভী, *সুফীতত্ত্ব ও সুফীয়ায়ে কেরাম* (চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, ২০১২), পৃ. ২১

৪৪. আবুল কাসিম কুশাইরি, *আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭; আবু সা‘ঈদ মুহাম্মদ খাদিমি, *বারিকাতুন মাহমুদিয়্যাতুন ফি শারহিত তারিকাতিল মুহাম্মদিয়্যাহ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ৩৩৬

উল্লেখযোগ্য।[৪৫] অপরপক্ষে, আল্লামা আল-কুশাইরি থেকে আরম্ভ করে আল্লামা ইকবাল পর্যন্ত বহু মুসলিম চিন্তাবিদ কুর'আনকে সুফিবাদের মূল উৎস বলে নির্দেশ করেছেন। কাজেই সুফিবাদের উৎপত্তি সম্পর্কে মোট চারটি মতবাদ বিদ্যমান; যেমন : (১) বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের মতবাদ (২) খ্রিষ্টীয় ও নিয়োপ্লেটোনিক প্রভাব মতবাদ (৩) পারসিক প্রভাব মতবাদ এবং (৪) ইসলামি মতবাদ।[৪৬] সুফিবাদের উৎস, বিকাশ ও বিভক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে এ উক্তিটি যথার্থ মনে হয়,

> Asceticism and mysticism conveying diverse meaningful articulations (exhibitions) did always take resort to almost the 'Super Religious' performances and formalities, over and above religious tenets and function as per practical concerns. Hence, ascetic or mystic orders and their particular practices are, sometimes, considereed to be the anti-religious in the place of `Super Religious' and for the matter Extra Religious. অর্থাৎ অর্থাৎ 'সন্ন্যাসবাদ ও বৈরাগ্যবাদ বৈচিত্র্যময় ও নানা অর্থ প্রদর্শন করত, যা সর্বদা অতিধার্মিক, লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতার আশ্রয় গ্রহণ করত; যেগুলো ধর্মীয় মূলনীতির অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে প্রচলিত ছিল। কাজেই সন্ন্যাস কিংবা বৈরাগ্যবাদী রীতিনীতি মাঝেমধ্যে অতিধার্মিকতার স্থলে ধর্ম-বিরোধী হিসেবে গণ্য হতো।'

নিম্নে সুফিবাদ সম্পর্কিত মতবাদগুলো পর্যালোচনা করা হলো:

(ক) বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব মতবাদ

এইচ. ভি. মর্টন (H. V. Morton) (১৮৯২–১৯৭৯ খ্রি.) ও ইগনেক গোল্ডজিহর (Ignác Goldziher) (১৮৫০–১৯২১ খ্রি.) এই মতবাদের পরিপোষক। তাদের মতে, সুফিবাদ বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এ মতবাদ অনুসারে মুসলিমগণ ভারতীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন এবং বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হন। ফলে মুসলিমগণের মধ্যে সুফিবাদ জন্ম লাভ করে। এ দৃশ্যমান জগৎ যে ক্ষণস্থায়ী ও অলীক, তা সুফিগণ বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শন থেকে গ্রহণ করেছেন। আর ভারতীয় যোগী ও ঋষিদের কঠোর সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধন মুসলিমগণের মধ্যে কঠোর সংযম ও কৃচ্ছ্রসাধনের স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। এ মতবাদের প্রকৃতির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুফিবাদ, বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শন থেকে উদ্ভূত। তবে তাদের এ দাবি যুক্তিসংগত নয়। কারণ ভারতীয় ভাবধারা মুসলিমগণের নিকট পৌঁছানোর পূর্বেই সুফিবাদের উৎপত্তি হয়েছিল।[৪৭]

অথচ খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে মুসলিম চিন্তাবিদরা ভারতীয় ভাবধারার সাথে পরিচিত হওয়ারই সুযোগ পাননি। তার পূর্বেই সুফিবাদের উৎপত্তি ঘটেছে। ইমাম হাসান আল-বসরি (৬৪১–৭২৮ খ্রি.), হযরত আবু হাশিম মক্কি (রহ.) (মৃ. ৭৭৭ খ্রি.), হযরত যাবির ইব্ন হাইয়ান (৭২১–৮১৩ খ্রি.), হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (৭১৮–৭৭৭ খ্রি.), হযরত রাবেয়া আল্-বসরি (৭১৩–৮০১ খ্রি.) প্রমুখ সুফির আবির্ভাব ও সাধনা প্রমাণ করে যে, সুফিবাদ ভারতীয় দর্শন নয়, ইসলামের আধ্যাত্মিক শিক্ষারই অনিবার্য পরিণতি।

---

৪৫. নাজির আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন, ১৯৮৯), পৃ. ২৯১; মুহাম্মদ আবদুল মালেক ও মুহাম্মদ আবদুল লতিফ 'ইসলামে সুফি দর্শন', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৭, পৃ. ২২-২৩

৪৬. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৪৭. ফকীর আবদুর রশীদ, *সূফী দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

(খ) খ্রিষ্টীয় ও নিয়োপ্লেটোনিক প্রভাব মতবাদ

আলফ্রেড ভনক্রেমার (১৮২৮–১৮৮৯ খ্রি.) ও নিকলসন প্রমুখ পণ্ডিতের মতে, যখন মুসলিমগণ নিয়োপ্লেটোনিক খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচারকগণের সংস্পর্শে আসেন, তখনই ইসলামে সুফিবাদের অভ্যুদয় ঘটে। এ সমস্ত নিয়োপ্লেটোবাদী দার্শনিকগণ গ্রিক দর্শনের আলোকে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন।[৪৮] জাস্টিনিয়ানের দ্বারা এ সমস্ত দার্শনিকের পর তারা নওশেওয়ানের রাজসভায় আশ্রয় লাভ করেন এবং সেখানে তাদের মতবাদ প্রচার করতে থাকে। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগে খ্রিষ্টীয় মরমিবাদ ও গ্রিক দর্শন মুসলিম চিন্তাবিদগণের নিকট বেশ সুপরিচিত হয়েছিল। মুসলিম হিজরি সনের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে নিয়োপ্লেটোবাদী খ্রিষ্টান মরমিবাদীগণ আরব ও সিরিয়ায় তাদের ধর্ম প্রচার করছিলেন এবং এদের সংস্পর্শে আসার ফলেই মুসলিমগণের মধ্যে সুফিবাদের জন্ম লাভ করে। নিকলসন এই মন্তব্য প্রচার করেন। তাদের মতে, সুফিবাদ গ্রিক দর্শনের সম্পৃক্ত ভাবধারায় উদ্ভূত।

তাদের মতবাদ ঐতিহাসিক ও মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের যুক্তিতে গ্রহণযোগ্য নয়। সুফি দর্শনের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতায় দেখা যায় যে, সুফিবাদের প্রভাব হযরত মুহাম্মদ (সা.), তাঁর সাহাবি (বিশেষত আহ্‌লুস সুফ্‌ফা) ও তাবে'ঈগণের মধ্যেই ঘটেছিল। জাগতিক কার্য সমাধা করেও তারা বাইরের চিন্তার সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেননি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে সুফিবাদ জনসাধারণের মধ্যে একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে।[৪৯]

(গ) পারসিক প্রভাব মতবাদ

ব্রাউন ও তাঁর অনুসারীদের মতে, পারসিকগণ ইসলামের সুফিবাদের প্রবর্তক। এ মতবাদ অনুসারে পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যখন মুসলিমগণ পারসিকদের সংস্পর্শে আসে তখনই ইসলামে সুফিবাদের সূত্রপাত ঘটে। পারসিকদের রাজনৈতিক পরাজয় তাদের মধ্যে নৈরাশ্য, কঠোর সংযম ও আধ্যাত্মবাদের সৃষ্টি করেছিল। পারস্য হলো সুফিবাদের দেশ। পরবর্তী অধিকাংশ সুফি পারস্যের বুকে জন্মগ্রহণ করেছিল। কাজেই পারসিকগণই সুফিবাদের প্রবর্তক।

'পারসিক প্রভাব মতবাদ'টি অনৈতিহাসিক। ইতিহাসের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না যে, সুফিবাদ পারস্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ সুফি দার্শনিক হযরত মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি (রহ.) (১১৬৫–১২৪০ খ্রি.) ও হযরত ইবনুল ফরিদ (রহ.) (১১৮১–১২৩৪ খ্রি.) আরবিভাষী ছিলেন, পারসিক রক্ত তাদের ধমনিতে ছিল না, কিন্তু সুফি দর্শনের ইতিহাসে তারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য অমরত্ব লাভ করেছেন। ইবনুল আরাবি সুফিবাদের সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করে একে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেন। বহু সুফি পারস্য দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন; কাজেই সুফিবাদ পারস্য দেশেই উদ্ভূত হয়েছে, এ মতবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি ও যৌক্তিকতা অত্যন্ত দুর্বল।

আসল কথা হলো, আরব জাতি পারসিকদের সংস্পর্শে আসার পূর্বেই সুফিবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 'সুফিবাদের বা ইসলামি মা'রিফতের আদিগুরু' বলে ধরা হয়। তিনি এবং তাঁর চার খলিফা নিঃসন্দেহে বাইরের প্রভাবমুক্ত ছিলেন। তাছাড়া হযরত রাসুল (সা.)-এর একদল শিষ্য যারা

৪৮. মোহাম্মদ আবদুল হালিম, *গ্রীক দর্শন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ২৯০

৪৯. ড. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬২

আসহাবে সুফ্ফা নামে পরিচিত, তারাও হযরত রাসুল (সা.)-এর আধ্যাত্মিক শিক্ষার পথ অনুসরণ করে মসজিদের এক কোণে আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। আর প্রথম মুসলিমগণ দেশ বিজয়ে ও ধর্মের অনুশাসন পালনে ব্যস্ত ছিলেন; ধর্মের আলোচনা, ধর্ম-তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ কিংবা বাইরের ধর্ম-প্রচারকগণের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করেননি, অথবা এ সকলের প্রয়োজন বোধ করেননি। কাজেই, সুফিবাদ পারসিক ভাবধারা হতে উদ্ভূত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, সুফিবাদ ইসলামেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পবিত্র কুর'আন ও হাদিসে এর বহু প্রামাণ্য দলিল রয়েছে।

(ঘ) ইসলামি মতবাদ

সুফিবাদ বা সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতা মূলত ইসলামের অবদান। মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনে বর্ণিত ভাববাদী আয়াতসমূহ থেকেই সুফি মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। তবে ভারতীয় বেদান্ত, নিয়োপ্লেটোনিক ও পারসিক মতবাদ স্রষ্টা ও সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে বটে, কিন্তু তা কেবল ভাবনারই বিষয়বস্তু হয়ে আছে চিরদিন; কখনও পরম সত্য ও সত্তায় পৌঁছতে পারেনি। তাদের কেউ পরমতত্ত্ব আবিষ্কারে সক্ষম হয়নি আজও; কারণ ইসলাম বহির্ভূত যেসব ধ্যানতত্ত্বের ধারণা প্রকাশ করা হয়েছে মূলত এগুলো প্রভুর সান্নিধ্য লাভের সত্যিকারের উপায় নয়। ইসলাম এসব পদ্ধতি বাতিল করে দিয়েছে। এমনকি খ্রিষ্টীয় যে ধ্যানতত্ত্ব রোহবানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদ (Monasticism) বলে পরিচিত, ইসলাম তাও নাকচ করে দিয়েছে।[৫০] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

> وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا
>
> অর্থাৎ 'আর বৈরাগ্য, তাতো তারা নিজেরাই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করেছে, আমি এটা তাদের ওপর আবশ্যক করিনি। কিন্তু যথাযোগ্যভাবে তারা তা পালন করেনি।'[৫১]

রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেছেন, لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِسْلَامِ অর্থাৎ 'ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই।'[৫২]

সুতরাং, সুফিবাদ একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামভিত্তিক মতবাদ। সুফিবাদের বিশ্ববিশ্রুত পাশ্চাত্য পণ্ডিত লুই ম্যাসিগনন (Louis Massignon) (১৮৮০–১৯৬২ খ্রি.) কুর'আনকে সুফিবাদের উৎপত্তি স্থল বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে বলেন,

> 'প্রতিনিয়ত আবৃত্তিকৃত, ধ্যান দ্বারা ধৃত, জীবনে আচরিত কুর'আন থেকেই ইসলামি মরমিবাদ উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করেছে।'[৫৩]

কুর'আনুল কারিমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى অর্থাৎ 'সে ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে।'[৫৪] এছাড়াও পবিত্র কুর'আনে আরও অনেক আয়াত রয়েছে যাতে

---

৫০. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৪৯৪

৫১. আল-কুর'আন, ৫৭ : ২৭

৫২. হুসাইন ইবন মাস'উদ, *শরহুস সুন্নাহ লিল-বাগাবি* (বৈরুত : আল-মকতাবিুল ইসলামি, ১৯৮৩), খ.২, পৃ. ৩৭১

৫৩. উদ্ধৃত : ড. মফিজ উল্যাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭), পৃ. ২৮০

৫৪. আল-কুর'আন, ৮৭ : ১৫

আধ্যাত্মিকতার দর্শন নিহিত রয়েছে। অনুরূপভাবে, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) নিজেই ছিলেন সুফিবাদের উৎস। তাঁর পুরো জীবনই সুফিবাদের আদর্শে ভরা।[৫৫]

আবু ইয়াহ্‌য়া আন্-নববি বলেন, 'সুফিবাদের উৎপত্তি হাদিসে জিবরাঈল থেকেই।' রাসুলুল্লাহ্ (সা.) থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো 'ইহ্সান' (إِحْسَانٌ)[৫৬] কী? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

> অর্থাৎ 'তুমি আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদত এভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি দেখতে না-পাও তাহলে মনে করবে যে, তিনি (আল্লাহ্) অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।'[৫৭]

ইমাম তিরমিযি (রহ.) (৮২৪–৮৯২ খ্রি.) রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর তাকওয়া পরহেযগারি ও আধ্যাত্মিকতার বর্ণনা দিয়ে 'আবওয়াবুয যুহুদে আন রসুলিল্লাহ' শিরোনামে হাদিসের একটি বিশাল অধ্যায়ও রচনা করেছেন।[৫৮] তিনি নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই মাঝেমধ্যে হেরাগুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এবং ধ্যান অবস্থাতেই হেরাগুহায় তিনি ওহি প্রাপ্ত হন এবং নবুয়ত লাভ করেন।[৫৯] শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি (রহ.) (১৮৭৯–১৯৫৭ খ্রি.)-এর মতে,

> ইসলামের 'আকাইদ, ফিক্‌হ, কালাম ও হাদিস প্রভৃতি যেমন নবিযুগ থেকে শুরু হয়ে পরবর্তীকালে চূড়ান্ত বিকাশ লাভ করেছে, তেমনি সুফিবাদও নবিযুগ থেকেই শুরু হয়। তারপর প্রয়োজন ও প্রেক্ষিত অনুসারে এ 'ইলম ক্রমান্বয়ে বিকশিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।[৬০]

সাহাবায়ে কিরামের সকলেই কমবেশি আধ্যাত্মিকতার পরশে সিক্ত ছিলেন।[৬১] সাহাবায়ে কেরামের একটি দল আধ্যাত্মিকতার তন্ময়তায়, তাকওয়া-পরহেযগারির অনুশীলনে ও জ্ঞানচর্চায় মসজিদে নববির একপাশে সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন। এর সাথে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদত ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। জাগতিক কাজে খুব কমই তারা নিয়োজিত হতেন। যখন যা ভাগ্যে জুটত তা আহার করেই তারা সন্তুষ্ট থাকতেন। তারা 'আহলুস সুফ্‌ফা' বলে অভিহিত ছিলেন।[৬২]

---

৫৫. D.S. Ahmad, *Asceticism, its Essence and Growth* (Index Islamicus, LXI, 1993), pp.47-55

৫৬. ইহ্সান শব্দটি বাবে (**إِفْعَال**)-এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এর অর্থ সৎকর্ম করা, সদ্ব্যবহার, নিষ্ঠার সাথে কাজ করা, উত্তম কাজ করা, সুন্দর করা, ভালো, অনুগ্রহ-দান, বদান্যতা, কল্যাণ ও পরোপকার ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায়, কারও সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করা ও তার উপকার করা এবং তার প্রতি উদারতার আচরণ অবলম্বন করার নামই ইহ্সান। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা, স্নেহ-মমতা, আল্লাহ্ তা'আলার কাজ উত্তমরূপে সম্পাদন করাকেও ইহ্সান বলে। সুতরাং, মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য উত্তমরূপে সম্পাদন করার নামই ইহ্সান। দ্র. ড. রুহি বা'লাবাকি, *আল-মাওরিদ* (আরবি-ইংরেজি) (বৈরুত : দারুল 'ইলম লিল মালায়িন, ২০০৫), পৃ. ৫০; লুইস মা'লুফ, *আল-মুনজিদ* (বৈরুত : আল-মাতবা'আতুল কাছুলিকিয়্যাহ, ১৯৫৬), পৃ. ৫২; মুহাম্মদ 'আলাউদ্দিন আল-আযহারি, *আরবি-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৫), খ.৩, পৃ. ৪৫

৫৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি'আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, খ.১, বাবুন সুওয়ালু জিবরাঈল আন-নবিয়্যা (সা.)..., হাদিস নং ৪৮, পৃ. ৫

৫৮. আবু 'ঈসা মুহাম্মদ তিরমিযী, *আস-সুনান*, পূর্বোক্ত, বাবুন আয-যুহ্‌দু 'আন রসুলিল্লাহ্, পৃ. ৫৬

৫৯. ড. মফিজুল্লাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০

৬০. মওলানা ড. মুশতাক আহমদ, *শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদনী রহ.* (ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৪), পৃ. ৪৫৬

৬১. মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন, *খাজা আবদুল মজিদ শাহ্ জীবন ও কর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

৬২. মুহাম্মদ নাজির আহাম্মদ, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, পুর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬

খোলাফায়ে রাশেদিনের পর রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এবং মুসলিম সমাজে সুফিভাব বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্য থেকে একদল নিঃস্বার্থ মুসলিম রাজনৈতিক বির্তক, জাগতিক সুখ-শান্তি ও বিলাসবহুল জীবন পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহ্র আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং সর্বকাজে তারা আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করতেন। আস্তে আস্তে এ দলের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মুসলিম সমাজে তারা অপরিসীম শ্রদ্ধার আসন দখল করেন।

আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গীয় এসব লোক কোনো বিদেশি ভাষা বা গ্রিক দর্শনের সংস্পর্শে আসেননি। আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যান ছাড়া অন্য কিছুর চিন্তা করার অবকাশও তাদের ছিল না। নিঃসন্দেহে এরা উঁচু মাপের সুফিসাধক ছিলেন; যদিও তারা বর্তমানের ন্যায় 'সুফি' নামে আখ্যায়িত ছিলেন না।[৬৩] যেমন হযরত আবু যর আল গিফারি (রা.) (মৃ. ৬৫২ খ্রি.) এবং হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) (মৃ. ৬৫৬ খ্রি.) ছিলেন আধ্যাত্মিকতার চরম পরাকাষ্ঠা। হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) কে বলা হতো 'রাসুলুল্লাহ্ (সা.) এর গোপন কথার ভান্ডার'। হযরত সালমান আল-ফারসি (রা.) (৫৬৮–৬৫৬ খ্রি.) এবং হযরত আবু দারদা (রা.) (৫৮০–৬৫২ খ্রি.) এর নামও কেউ কেউ আধ্যাত্মিকতার প্রথম কাতারে উল্লেখ করেন। তবে তারা সাহাবি নামে খ্যাত ছিলেন; কারণ সুফি নামের চেয়ে 'সাহাবা' নামই অধিক মর্যাদাপূর্ণ।[৬৪]

তাসাওউফের বিখ্যাত ইমাম, শায়খ আবুল কাসেম কুশাইরি (৯৮৬–১০৭২ খ্রি.) বলেন, 'মুসলিম বিশ্ব প্রথম যুগের মুসলিমগণের মধ্যে যাদের বুযুর্গ ভাবতেন তাদেরকে সাহাবা বলে অভিহিত করতেন।'[৬৫] তাদের পরবর্তী কালের অনুসারীদের তাবে'ঈন এবং তাদের পরবর্তী কালের অনুসারীদের তাবে'-তাবে'ঈন বলা হতো। এই তিন পর্যায় ও তিন স্তরের বুযুর্গদের সময়কে বলা হয় 'কুরুনে ছালাছা'।[৬৬] তাদের পরবর্তী কালের বুযুর্গদের 'আবেদ-যাহেদ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হতো। এর পরে 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' তাদের স্বদলীয় বুযুর্গদের 'সুফি' নামে আখ্যায়িত করলে হিজরি দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে তা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার লাভ করে।[৬৭]

কুর'আন ও হাদিসের মৌলিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে মরমিবাদের উৎপত্তি হয় তার তিনটি সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক সময়ব্যাপ্তি লক্ষণীয়। সুফিবাদের প্রথম যুগ হচ্ছে হিজরি তৃতীয় শতক মোতাবেক নবম শতাব্দীকাল। এ যুগ সুফিবাদের অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের যুগ। দ্বিতীয় যুগ খ্রিষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দী। এ শতাব্দী সুফিবাদের পুনর্বাসন, সমঝোতা ও বিজয়ের যুগ। তৃতীয় ও সর্বশেষ যুগ দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এ যুগ সুফিবাদের বিস্তার ও প্রসারের যুগ; কারণ এ যুগে সুফিগণ ইসলাম প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং সুফিবাদ প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাদের দীক্ষায় এদেশেও অনেক সুফির জন্ম হয়।[৬৮] এভাবে সুফিবাদ সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে।

---

৬৩. মুহাম্মদ নাজির আহাম্মদ, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬-২৯৭

৬৪. ড. মফিজুল্লাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১-৮২

৬৫. ড. মো. আবু ছালেহ পাটোয়ারী, *হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (রহ.), ইসলামী শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩), পৃ. ১৪৯

৬৬. সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনগণ যদিও সুফি নামে আখ্যায়িত ছিলেন না তবুও কর্মের দিক দিয়ে তারা সুফি ছিলেন। দ্র. মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, *ইলমে তাসাউফের হাকীকত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৬৭. আবদুর রহীম হাজারী, *সুফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২; আশরাফ আলী থানভী (রহ.), *তালীমুদ্দিন* (ঢাকা : এমদাদিয়া প্রেস, ১৯৮০), পৃ. ৬৩

৬৮. মুহাম্মদ নাজির আহমদ, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭), পৃ. ৩০০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুফিবাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সুফিবাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো 'তাযকিয়ায়ে নফস' তথা আত্মার পরিশোধন, পবিত্রকরণ ও উন্নতি সাধন করা। শিরক, কুফর ও ভ্রান্ত 'আকিদা-বিশ্বাস থেকে অন্তরকে পবিত্রকরণ। তেমনিভাবে নীতিহীনতা, অহংকার, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, রিয়া ও জাগতিক মোহ ইত্যাদি থেকে অন্তরকে পবিত্র করা এবং তদস্থলে একত্ববাদের সঠিক 'আকিদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা, তাওবাহ্, শোকর, সবর, যুহ্দ, তাওয়াক্কুল, মুহাব্বত, সাখাওয়াত (বদান্যতা), কানা'আত (অল্পে তুষ্ট থাকা), ইহ্সান, মুরাকাবা ইত্যাদি গুণ দ্বারা অন্তরকে সুসজ্জিত করা। কেননা, পূত-পবিত্র আত্মার দ্বারা পরম প্রেমময় সত্তার দর্শন লাভ সম্ভব হয়। এমন আত্মায় ঐশীবার্তা আসে, ইল্হাম হয়। তা দ্বারা বহু বিষয়ের অবগতি লাভ করা যায়।

- ড. তাহেরুল কাদরি (জন্ম ১৯৫১ খ্রি.) বলেন, সুফিবাদের উদ্দেশ্য মানুষকে আত্মিক উন্নতির এত উঁচু স্তরে পৌঁছে দেয়া যেখানে পৌঁছলে একজন প্রকৃত প্রেমিক খোদার প্রেমে দ্বিধাহীন চিত্তে নিজেকে বিলীন করে দিতে পারে। তখন তার এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কবির ভাষায়,

  افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر - کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر

  অর্থাৎ 'পরিশেষে, তার কান্নার জবাব আসে ঊর্ধ্বালোক থেকে, প্রেমাস্পদের সামনে থেকে পর্দা সরে যায়। শুরু হয় প্রেমালাপ।'[৬৯]

- তাসাওউফের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুফতি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্ বলেন, نَيْلُ السَّعَادَةِ الأَبَدِيَةِ অর্থাৎ 'চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জন।'[৭০]

- মওলানা আবদুর রাহীম হাযারি (জন্ম ১৯৩৬ খ্রি.) বলেন, সুফিবাদের উদ্দেশ্য আত্মার উন্নতি সাধন; কেননা উন্নত আত্মার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভ হয়। উন্নত আত্মায় ঐশীবার্তা আসে প্রত্যাদেশ হয়, ইলহাম বা দৈববাণী অবতীর্ণ হয়। এর দ্বারা বহু বিষয়ে অবগতি লাভ করা যায়।[৭১]

- হযরত আবদুল কাদির জিলানি (রহ.) (১০৭৭–১১৬৫ খ্রি.), হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশ্বন্দি (রহ.) (১৩২৭–১৩৮৮ খ্রি.), হযরত খাজা মু'ঈননুদ্দিন চিশতি (রহ.) (১১৪২–১২৩৫ খ্রি.) ও হযরত শায়খ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি (রহ.) (১১৪৫–১২৩৪ খ্রি.) প্রমুখ বুযুর্গের এ সকল পদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যেন সহজে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাদের ঐ তরিকাহ্গুলোতে কোথাও বিন্দু পরিমাণও শরি'আতের পরিপন্থি কিছু ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও পরকালের সফলতা লাভে মানুষকে সাহায্য করাই ছিল তাদের তরিকাহ্গুলো সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য।'[৭২]

---

৬৯. ড. তাহেরুল কাদরী, *তাসাউফের আসল রূপ* (চট্টগ্রাম : সনজরী পাবলিকেশন, ২০০৯), পৃ. ১৫৮-৫৯

৭০. মুফতি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্, *তাসাওউফ ও তরীকত : প্রসঙ্গ কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৭১. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

৭২. মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলভী, *খুতবাতে মাদানি* (দেওবন্দ : যমযম বুক ডিপো, ১৯৯৭), পৃ. ৬৬-৬৯

সুফিবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, জীবনবিধান ও জীবনদর্শন। ইসলাম সকল মানুষের, সর্বকালের ও সর্বদেশের সর্বজনীন ধর্ম এবং জীবনদর্শন। ইসলামের মূল লক্ষ্য মানুষের সমগ্র সত্তার বিকাশ সাধন ও সামগ্রিক শান্তি বিধান করা। ইসলামের লক্ষ্য তাই মানবজীবনের শুধু একটি বিশেষ দিক নয়। মানুষের জীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিকের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধনই ইসলামের লক্ষ্য। বলাই বাহুল্য, সুফিবাদ ইসলামের এই আত্মিক দিকের পরিণতি।

অন্য কথায়, ইসলামের পূর্ণ রূপই সুফিবাদ; কারণ সুফিবাদ ইসলামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এ দুই দিকের সমন্বিত রূপ। দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে যেমন পূর্ণাঙ্গ মানুষ, তেমিন যাহিরী ও বাতিনী উভয় দিকের সম্মিলনে হয় পূর্ণাঙ্গ ইসলাম। সুফিবাদ ইসলামের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ তথা শরি'আত ও হাকিকত এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করে। সেজন্য একজন সুফি একইসাথে শরি'আতপন্থি ধার্মিক ও হাকিকতপন্থি মরমি সাধক।[৭৩]

ইসলামের সাথে সুফিবাদের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) দীর্ঘ পনেরো বৎসর হেরাগুহায় নির্জনে সুফিবাদের সাধনা তথা মুরাকাবা[৭৪]-মুশাহাদা[৭৫] এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করেছিলেন এবং পেয়েছিলেন মানব-মুক্তির জীবন বিধান ইসলাম।[৭৬] বাস্তবিক অর্থে 'ইলমুল কালব থেকেই ইসলামের অভ্যুদয় হয়েছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, পবিত্র কুর'আন গ্রন্থাকারে মানবজাতির কাছে অবতীর্ণ হয়নি। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাল্‌বে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বাণী অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোর সংকলনই হলো, আল-কুর'আন।[৭৭] প্রকৃত অর্থে, 'ইলমুল-কল্‌ব থেকেই আল-কুর'আনের জন্ম। সুতরাং, সুফিবাদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক কত নিবিড়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

---

৭৩. ফকির আব্দুর রশীদ, *সূফী দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১

৭৪. মুরাকাবা সুফিদের একটি বিশেষ পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট সময়ে নির্জন এলাকায় কিংবা একান্তে বাহ্যিক শ্রবণ-দর্শন থেকে মনকে বিমুক্ত করে নিয়ে সম্পূর্ণ একাগ্রতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া। সুফিগণের দৃষ্টিতে, বাহ্যিক 'আমলের অনুশীলনের পর এ মুরাকাবাই হলো অভ্যন্তরীণ 'আমলের প্রথম অনুশীলন ও মূলভিত্তি।শায়খ আবুল হাসান আশ-শাযিলি (১১৯৪–১২৫৮ খ্রি.) বলেন, **عليك أيها السالق بطريق الأخرة بتحصيل ما أمرت به في ظاهرك، فإذا فعلت ذلك فاجلس على بساط المراقبة.** অর্থাৎ 'হে আখিরাতের যাত্রী, প্রথমে তোমার বাহ্য-সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি পালন করো। অতঃপর মুরাকাবার বিছানায় বসো।' দ্র. আহমদ ইবনু 'আইয়াদ, *আল-মাফাখিরুল 'আলিয়্যাতু ফিল মা'ছারিশ শাযিল্যিাহ্* (কায়রো : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০১৬), পৃ. ৬১

৭৫. মুরাকাবার মাধ্যমে আপন অস্তিত্বের বিলোপ ঘটাতে পারলে মানবাত্মা আল্লাহ্‌র জগতে বিরাজ করতে থাকে। ফলে মানবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলন ঘটে। এরূপ আত্মনিয়োগ ও সৃষ্টিতত্ত্বের চিন্তায় আত্মবিভোর হওয়াকেই 'মুশাহাদা' বলা হয়। এ অর্থে বিখ্যাত ফারসি মরমি কবি আমির খসরু (১২৫৩–১৩২৫ খ্রি.) বলেন,

من تو شُدم تو من شُدی- من تن شُدم تو جاں شُدی

تا کس نہ گوید بعد ازیں- من دیگرم تو دیگری

অর্থাৎ 'আমি যখন তোমাতে বিলীন হয়ে যাই, তুমি তখন আমাতে বিরাজমান থাকো। আর আমি যখন দেহ হয়ে যাই, তখন তুমি হয়ে যাও প্রাণ। কেউ যেন বলতে না-পারে যে, আমি ও তুমি পৃথক।'

৭৬. সৈয়দা তাহমিনা সুলতানা, *রাহ্‌তাল্লিল আলামীনের গৌরবময় জীবনকথা* (ঢাকা : সূফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃ. ৪২

৭৭. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৩৬০

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুয়তি জীবন ছিল তেইশ বৎসর। এর মধ্যে তেরো বৎসর তিনি মক্কায় এবং অবশিষ্ট দশ বৎসর মদিনায় অবস্থান করেন।[৭৮] তিনি মদিনায় হিযরত করার পরই নামায, রোজা, যাকাত ও হজসহ শরি'আতের যাবতীয় বিধানা নাযিল হয়; কিন্তু মক্কায় অবস্থানকালে তিনি কী শিক্ষা দিয়েছিলেন, সে বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি তখন সাহাবিদের 'ইলমুল-কল্‌বের শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যোগাযোগের পথ দেখিয়েছিলেন।[৭৯] এ কারণেই তাঁর কাছে অবতীর্ণ আল-কুর'আনের বহু আয়াতে আধ্যাত্মিকতার সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত খাঁটি ও প্রিয় বান্দা হতে চাইলে অবশ্যই নফ্‌সের মন্দ প্রবণতাগুলো দূর করতে হবে এবং যাবতীয় অশিষ্ট চরিত্রসমূহ সংশোধন করে নিতে হবে। তবেই তার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি প্রবল আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়ে একটি নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে এবং তার আচার-আচরণ হবে অত্যন্ত পরিশীলিত ও মার্জিত। এতে যেমন তার পার্থিব জীবন সুন্দর ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে, তেমনি তার পরকালীন জীবনও অত্যন্ত সুখ ও শান্তিময় হবে। নবুয়াতের চারটি মহান কর্তব্যের মধ্যে আত্মার পরিশুদ্ধীকরণ অন্যতম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

অর্থাৎ 'তিনি (রাসুল) তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন।'[৮০]

আলোচ্য আয়াতে يُزَكِّيهِمْ 'ইউযাক্কিহিম' শব্দ দ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছে; কেননা আত্মশুদ্ধি ছাড়া কোনো মানবাত্মারই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এই আত্মশুদ্ধি লাভের পদ্ধতিই সুফি-সাধনা। এই সুফিবাদ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়েই একদল সাহাবা জাগতিক মায়ার বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সার্বক্ষণিক সাহচর্যে বাস করতেন। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে নবির সাহচর্যে জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন। সুফিতত্ত্ব শিক্ষা করাই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।[৮১]

কাজেই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা এবং এ উদ্দেশ্যে তার ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা দ্বীনের অতি অপরিহার্য একটি কর্তব্য ও সর্বাপেক্ষা বড়ো জিহাদ। সকল 'আলিমের মতে, আত্মা পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা ফরযে 'আইন; কেননা আত্মা অপরিশুদ্ধ ও কলুষিত হলে বান্দার কোনো 'আমলই নির্দোষ ও পবিত্র হবে না। এরূপ অবস্থায় 'আমল করার অর্থ হলো ময়লাযুক্ত শরীরে সুন্দর ও পরিষ্কার পোশাক পরিধান করার মতোই।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি (রহ.) (১০৫৮–১১১১ খ্রি.) সুফিদর্শন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন,

'পরপারের যাত্রাপথে পীর কামিল ছাড়া কারও গত্যন্তর নেই; কেননা, মুর্শিদে কামিল ব্যতীত এই দুর্গম পথ অতিক্রম করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।'

---

৭৮. আফযালুর রহমান, *হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯), খ.১, পৃ. ২৪

৭৯. ফকির আবদুর রশীদ, *সূফী দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১-৪২

৮০. আল-কুর'আন, ৩ : ১৬৪; ৬২ : ২

৮১. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯-৮০

রাতের কালো আঁধারে তমসাচ্ছন্ন মহাসাগরে যেমন দিশারি ছাড়া পাড়ি দেয়া যায় না, আলো ছাড়া যেমন ঘোর অন্ধকারে কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় না, তদ্রূপ অবস্থারই সম্মুখীন হতে হয় তরিকতপন্থিকে তরিকতের অজ্ঞাত পথে। এই জীবন সাগরেও পথের দিশারি ছাড়া পথের দিশা মেলে না। সুতরাং, এর চেয়েও যা দুর্গম, দুর্বোধ্য, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত এবং দেশকালের বাইরে, এর জন্য তো মুর্শিদে কামিলের আবশ্যকতা অপরিহার্য।[৮২]

সুফিবাদ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে মুহাম্মদ ইদ্রিস হুশিয়ারপুরি (রহ.) বলেন,

> 'ফিক্‌হের মাযহাব চতুষ্টয়ের ন্যায় এখানেও ৪টি সিলসিলা[৮৩] ব্যাপক প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। ফিক্‌হের ক্ষেত্রে যেমন উত্তরকালীন লোকদের জন্য পূর্বকালীন মুজতাহিদ ইমামগণের তাকদিল ব্যতীত কোনো উপায় নেই; তদ্রূপ সুফিবাদের ক্ষেত্রেও স্বীকৃত বুযুর্গানে দ্বীনের ঐ তরিকত অনুসরণ ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই; যদিও ন্যূনতম শুদ্ধি ও সংশোধন, যা আখিরাতে মুক্তির উপায়, তা তরিকতের মাশায়িখ ও বুযুর্গদের অনুসরণ ব্যতিরেকেও অর্জিত হতে পারে। কিন্তু একজন পূর্ণ মু'মিন হিসেবে মানুষের কাছ থেকে যে বিষয়গুলো কাম্য এবং যে গুণাবলিকে ঈমানের পরিপূর্ণতা বলা হয়েছে, সে-সব গুণ কামিল বুযুর্গগণের সাহচর্য ব্যতীত অর্জিত হয় না।'[৮৪]

শায়খ যাকারিয়া আনসারি (রহ.) (১৪২০–১৫২০ খ্রি.) সুফিবাদ শিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে,

> 'সুফিবাদ মানবাত্মার বিশোধন শিক্ষা দেয়, নৈতিক জীবনকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছায়, স্থায়ী নিয়ামতের অধিকার অর্জনে সক্ষম করে তোলে এবং মানবের আত্মিক জীবন ও দৈহিক জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। সুফিবাদ বা সুফিদর্শনের সার বিষয়বস্তু হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা বিধান করা এবং এর অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে আত্মার চিরন্তন সুখ-শান্তি লাভ করা।'[৮৫]

এছাড়াও সুফিসাধনার মাধ্যমে জীবন, জগৎ ও জগৎ-স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষভাবে জানার সুযোগ হয়; সুযোগ হয় পরম সত্যে উপনীত হওয়ার; লাভ করা যায় পরম সত্তাকে পাওয়ার একটি আত্মিক উপকরণ। আত্মসাধনার মাধ্যমে প্রেমময় আল্লাহ্ তা'আলার পরম প্রেমোপলব্ধি করাই সুফি সাধনার অভীষ্ট লক্ষ্য। আল্লাহ্‌তে আত্মবিলীন তথা আল্লাহ্ তা'আলার রঙে রঞ্জিত হওয়া এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্বভাবে স্বাভাবিক হওয়াই সুফি সাধনার চূড়ান্ত স্তর। আত্মোন্নতির এই সর্বোচ্চ স্তরকেই বলা হয় 'ফানা ফিল্লাহ'।

---

৮২. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

৮৩. সিলসিলা শব্দের অর্থ জিনজির বা শিকল, সম্বন্ধ ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ। সুফিগণের পরিভাষায়, তরিকতের সিলসিলা অতীতকালে যে সব মান্য-বরেণ্য তরিকতপন্থি বুযুর্গানে দীন সমাজে থেকে মানুষের দীন ও দুনিয়ার সার্বিক উপকার সাধন করেছেন, তাদের কর্মময় জীবনে কুর'আন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস মান্য করার পর অবস্থা-কাল-পরিস্থিতি বিচার করে নিজের মিশন পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন কতকগুলো নীতি ও পদ্ধতি প্রচলন করে গেছেন, যেগুলো শরি'আত বিরুদ্ধ নয়; বরং ঐগুলো নিছক মুবাহ, মুস্তাহসান ও আফজলের পর্যায়ভুক্ত করে নিজের মিশনের মধ্যে একতা, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন, আর এই একতা ও শৃঙ্খলাই হচ্ছে 'সিলসিলা'র অন্যতম লক্ষ্যবস্তু। উক্ত বুযুর্গানে দীনের ভক্ত ও অনুগামীরা স্বীয় সিলসিলার নির্দেশিত নীতি, মত ও পথকে মুস্তাহসান ও আফজাল মনে করে ইমামের তাকলিদের মতোই শায়খের তাকদিল হিসেবে একনিষ্ঠভাবে পালন করে থাকে। দ্র. শাহ্ আবদুল আজিজ দেহলভি, *তাফসিরে আযিযি* (দিল্লি : এদারায়ে ইসলামিয়্যাহ, ১৮৫০), পৃ. ৫৫

৮৪. মুহাম্মদ ইদ্রিস হুশিয়ারপুরি, *খুতবাতে মাদানি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯, ৬২-৬৫

৮৫. মুহাম্মদ মনযুর নুমানী, *তাসাওউফ কাহাকে বলে* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯), পৃ. ২৬

সুফিবাদ মানুষকে আত্মসংযম শিক্ষা দেয় এবং ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরস্বার্থে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করে দেয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। ফলে সুফিবাদ সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। সুফিবাদ মানুষের সামনে স্রষ্টা, সৃষ্টি ও আমিত্বের রহস্যভেদ উন্মোচন করে দেয়। সুফিবাদের সৌজন্যে মানুষ তার দেশকালের সীমানায় আবদ্ধ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের উর্ধ্বে উঠে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উচ্চমার্গে পৌঁছায়। এইরূপ মানুষের মধ্যে তখন আর পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়না না থাকায় এই মাটির মানুষ তখন নুরের ফেরেশতাকেও ছাড়িয়ে যায়। এমন সোনার মানুষ দ্বারাই সামাজিক জীবন হয় সুখ ও শান্তির। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন হয় নিরুপদ্রব ও অনাবিল।[৮৬]

মোটকথা, আত্মার পরিশুদ্ধি ছাড়া কারও পক্ষে সত্যিকার অর্থে দীনের বিধিবিধান প্রতিপালন করা, দীনের ওপর অটল ও অবিচল থাকা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। এ কারণে পবিত্র কুর'আন ও হাদিসের বহু জায়গায় আত্মার মন্দ প্রবণতা দূরীকরণ ও তাকে পরিশুদ্ধীকরণের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেই প্রায়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর আত্মার পরিশুদ্ধি কামনা করে দু'আ করতেন। তিনি বলতেন,

اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا.

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! আমার আত্মায় সংযমশক্তি দান করুন। তাকে পরিশুদ্ধ করুন। আপনিই হলেন আত্মার সর্বাত্মক পরিশুদ্ধি দানকারী। আপনিই এর মালিক ও অভিভাবক।'[৮৭]

মোদ্দাকথা, দীনের বিধিবিধান যথার্থরূপে প্ররিপালনের জন্য আত্মার পশুত্বসুলভ ভাব এবং মন্দ প্রবণতা দূরীভূত করা একান্ত আবশ্যক। তা না হলে দীনের বিধিবিধান যতটুকু পালন করবে তা পণ্ডশ্রম ও বিফলে যাবে। তাই মানবজীবনে তাসাওউফ তথা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

---

৮৬. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

৮৭. মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *আস-সহীহ*, বাবুন আত-তা'ওওয়ায়ু মিন শর্‌রি মা 'আমিল..., পূর্বোক্ত, খ.১, হাদিস নং ৪৮৯৯, পৃ. ২৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুর'আন-সুন্নাহ্ ও মনীষীদের দৃষ্টিতে সুফিবাদ

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ ও জিন জাতিকে তাঁর 'ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুর'আনে এরশাদ হচ্ছে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ 'আমার 'ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।'[৮৮] সাধনার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ গুণ, উপকরণের বিকাশ ও উন্নতি সাধন করে শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চাসনে সমাসীন হতে পারে এবং 'ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করে প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। প্রভুর 'ইবাদতই মানবজাতির প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর এই 'ইবাদত করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে নীতিমালা দিয়েছেন তা শরি'আত নামে পরিচিত।[৮৯]

শরি'আতের বিধিবিধান যথাযথভাবে পরিপালন করে 'ইবাদতের স্বাদ আস্বাদনের যোগ্যতা অর্জন এবং প্রভুর সান্নিধ্য লাভের পথ সুষমামণ্ডিত করার যে সাধনা তা-ই সুফিবাদ, সুফিতত্ত্ব বা আধ্যাত্মিকতা। সুফিবাদ সম্পূর্ণ ইসলামসম্মত এবং এটি ইসলামের শিক্ষারই ফল।[৯০] তবে পবিত্র কুর'আন মজিদ ও হাদিস শরিফে সুফিবাদকে 'তাযকিয়া, আল-ইহ্সান ও হিক্মাহ' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমাদের দেশে যেমনি সালাতকে নামায, সাওমকে রোযা ও জান্নাতকে বেহেশত বলা হয়, তেমনি 'তাযকিয়ায়ে নফ্স'কে সুফিবাদ বলা হয়।[৯১]

সুফিবাদকে আবার 'ইল্মে তাসাওউফ, ইল্মে তরিকত, ইল্মে মা'রিফত, ইল্মুল আসরার, ইল্মে বাতিন, ইল্মে মুকাশাফা, ইল্মে লাদুনি[৯২], আধ্যাত্মিক বিদ্যা ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়।[৯৩] শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) (১৭০২–১৭৬২ খ্রি.) ও অন্যরা এটাকে 'আখলাকে ইহ্সান' তথা সৃষ্টির উপায় নামে অভিহিত করেছেন।[৯৪] অনেকে এটাকে 'আল্লাহ্প্রাপ্তির তত্ত্ব'ও বলেছেন।[৯৫]

ইহকালীন জীবনে যারা পবিত্র ও বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হবে, তারাই সফলতা লাভ করবে। আর পাপ ও পঙ্কিলতা দ্বারা আত্মাকে কলুষিতকারী ব্যক্তি কখনও সফলতা লাভ করতে পারবে না। সে সীমাহীন

---

৮৮. আল-কুর'আন, ৫১ : ৫৬

৮৯. ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, *ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৯০. অধ্যাপক কে. আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা : আলী পাবলিকেশনস, ১৯৮৫), পৃ. ১৫৯

৯১. মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ আশরাফী, 'ইসলামে তাসাউফের ভিত্তি : প্রামাণিক বিশ্লেষণ', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৯, পৃ. ১৪২

৯২. হযরত জুনায়েদ বাগদাদি (রহ.) (৮৩০–৯১০ খ্রি.) বলেন, যে ইলম নিশ্চিতরূপে গুপ্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভের অবলম্বন স্বরূপ হয় এবং তাতে কোনোরূপ সংশয় ও মতভেদ থাকে না, তাকে 'ইলমে লাদুনি' বলা হয়। ইলমে লাদুনি দ্বারা সকল গুপ্ত বিষয়ের রহস্য প্রকাশ পায়। ইমাম গাযালি (রহ.) (১০৫৮–১১১১ খ্রি.) বলেন, মানুষ রিয়াযাত ও মুজাহাদার দ্বারা ইন্দ্রিয় ও নফ্সকে যখন কাবু করতে সমর্থ হয়, তখন তার জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রবল হয় এবং নুরের জ্যোতিতে আলোকিত হয়। তখন সে বিনা চেষ্টায় ও বিনা চিন্তায় বিশেষ 'ইল্ম লাভ করে, এটাই 'ইল্মে লাদুনি। দ্র. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, 'ইলমে তাসাউফ প্রসঙ্গ কথা', *আল-ইহসান* (ঢাকা : বায়তুশ শরফ আন্জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ১৯৯৯), পৃ. ৬৫

৯৩. মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ আশরাফী, 'ইসলামে তাসাউফের ভিত্তি : প্রামাণিক বিশ্লেষণ', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

৯৪. মতিউর রহমান, *আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায়* (ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ০৭

৯৫. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, 'ইল্মে তাসাউফ প্রসঙ্গ কথা', *আল-ইহসান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হয়ে ইহকাল ও পরকালে চরমভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নি'আমত ও রহমত থেকে চিরবঞ্চিত হবে। পবিত্র কুর'আনে এ ধরনের যত আয়াত রয়েছে[৯৬] সে সব আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ তাফসিরগ্রন্থ জালালাইন, কবির, মাযহারি, ইবনে কাছির, রুহুল বয়ান, মা'রিফুল কুরআনসহ অনেক তাফসিরগ্রন্থে 'তাযকিয়ায়ে কলব' তথা অন্তর পরিশুদ্ধ ও সুফিবাদ অর্জন করার কথাই বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে, হাদিসশাস্ত্রে ইসলামি মূল বিষয়াদির বর্ণনায় হাদিসে জিবরাঈলে সুফিবাদকে 'ইহ্সান' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) (৫৮৩–৬৪৩ খ্রি.) থেকে বর্ণিত হাদিসে জিবরাঈলে বলা হয়েছে,

قَالَ مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

> অর্থাৎ 'হযরত জিবরাঈল (আ.) জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে ইহ্সান[৯৭] সম্পর্কে বলুন। রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার 'ইবাদত এমনভাবে করো, যেন তাকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাকে না দেখো, তবে সুনিশ্চিত তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।'[৯৮]

মূলত হাদিসে জিবরাঈলে তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে; **প্রথমত :** 'ইসলাম' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 'ইল্মে ফিকহ; কেননা এতে শরি'আতের বিধানাবলীর বর্ণনা আছে। **দ্বিতীয়ত :** 'ঈমান' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য 'আকাইদ যা কালাম শাস্ত্রের বিষয়বস্তু। **তৃতীয়ত :** 'ইহ্সান' শব্দ দ্বারা মূল উদ্দেশ্য সুফিবাদ; যার অর্থ খাঁটি মনে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে তাওয়াজ্জুহ তথা মনোনিবেশ করা। অনুরূপভাবে, বায়হাকি, মিশকাত, দারেমি প্রভৃতি গ্রন্থে রাসুল (সা.) থেকে বর্ণিত আছে,

الْعِلْمُ عِلْمَانِ : فَعِلْمٌ فِى الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللّٰهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ.

> অর্থাৎ 'ইল্ম দু' প্রকার : **এক.** কলবি 'ইল্ম ('ইল্মে তাসাওউফ) আর এটাই মূলত উপকারী 'ইল্ম। **দুই.** জবানি 'ইল্ম ('ইল্মে ফিকহ) যা মহান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দাহ্র জন্য দলিল।'[৯৯]

রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

> অর্থাৎ 'সাবধান! মানুষের দেহে একটি গোশতের টুকরো আছে। যদি তা শুদ্ধ হয় তবে সমস্ত দেহ শুদ্ধ হয়ে যায়, আর যদি তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পুরো দেহ নষ্ট হয়ে যায়। আর তা হলো কল্ব।'[১০০]

---

৯৬. মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) তাঁর '*তাসাউফ তত্ত্ব*' গ্রন্থে তাসাউফ সংক্রান্ত ৪২টির অধিক কুর'আন-হাদিস থেকে দলিল উপস্থাপন করেছেন। দ্র. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.), *তাছাওউফ তত্ত্ব* (ঢাকা : আল-আশরাফ প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ.১৪-২৬

৯৭. আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানি (রহ.) তাঁর বিখ্যাত বুখারি শরিফের শরাহ্ '*ফাতহুল বারি*' গ্রন্থে বলেন, ইহ্সান অর্থ বিশুদ্ধ ও বিনম্রভাবে 'ইবাদত করা। 'ইবাদতে সকল প্রকার জাগতিক চিন্তাভাবনা থেকে কল্বকে মুক্ত করে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে রুজু হওয়া। দ্র. মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, *কিতাব ও সুন্নাহ্র আলোকে তরীকতের মূলনীতি* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০০৮), পৃ. ২২

৯৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি'আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, খ.১, বাবুন সুওয়ালু জিবরাঈল আর-রাসুল.., হাদিস নং ৪৮, পৃ. ৪

৯৯. আবু মুহাম্মদ আবদিল্লাহ্ আদ-দারেমি, *আল-মুসনাদুল জামি'* (বৈরুত : দারুল বাশা'য়ির আল-ইসলামিয়া, ২০১৩), হাদিস নং ৩৭২

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) পুরো শরীরের 'আমলের ইসলাহ ও সংশোধনকে অন্তরের ইসলাহ ও সংশোধনের ওপর নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, অন্তরে ত্রুটি দেখা দিলে পুরো শরীরের 'আমলের মধ্যেও ত্রুটি ও বিপর্যয় দেখা দেয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ) বলেন,

> إن لله على العبد عبوديتين: عبودية باطنة، وعبودية ظاهرة، فله على قلبه عبودية، وعلى لسانه وجوارحه عبودية، فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لايقربه إلى ربه، ولايوجد له الثواب وقبول عمله.
>
> অর্থাৎ 'বান্দাহ্‌র ওপর আল্লাহ্ তা'আলার দুপ্রকারের 'ইবাদতের দায়িত্ব রয়েছে : **এক.** বাতিনি (অপ্রকাশ্য) 'ইবাদত ও **দুই.** যাহিরি (প্রকাশ্য) 'ইবাদত। বান্দাহ্‌কে যেমন তার কাল্‌বের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করতে হয়, তেমনি জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যোগেও তাঁর 'ইবাদত করতে হয়। বাতিনি 'ইবাদতের সারবিহীন 'ইবাদতের বাহ্যিক রূপের চর্চা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের সহায়ক নয়। তদুপরি, এ জাতীয় 'ইবাদতে সওয়াব পাওয়া যাবে না এবং এ 'আমল কবুলও হবে না।'[১০১]

এছাড়া আরও অনেক হাদিস রয়েছে যেগুলো সুফিবাদের প্রমাণ বহন করে। মূলত সুফিবাদ বা আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে দীন ইসলামের প্রাণ ও মগজ।[১০২] এটি শরি'আতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা ছাড়া শরি'আত অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। সুফিবাদকে অস্বীকার করা ইসলামকে অস্বীকার করারই শামিল বা নামান্তর।[১০৩] এজন্য মওলানা আশরাফ আলি থানভি (রহ.) (১৮৬৩–১৯৪৩ খ্রি.) তাঁর *'তাকাশ্‌শোফ'* গ্রন্থে লিখেছেন,

> 'প্রত্যেক মুসলিমের ঈমান ও আকিদা দুরস্ত এবং জাহেরি আমল ঠিক করার পরে, বাতেনি আমলের ইছলাহ তথা তাসাওউফ চর্চা করা ফরয।'[১০৪]

- *'দুর্‌রুল মুখতার'* গ্রন্থকার আল্লামা ইব্‌ন আবেদিন (রহ.) (১৭৮৪–১৮৩৬ খ্রি.) বলেন,

  > وَاعْلَمْ أَنَّ تَعَلُّمَ العِلْمِ يَكُوْنُ فَرْضَ عَيْنٍ وهُوَ بِقَدْرِ مَايَحْتَاجُ لِدِيْنِهِ. وفَرْضُ كِفَايَةٍ، وهُوَ مَا زَادَ عَلَيْهِ لِنَفْعِ غَيْرِهِ. ومَنْدُوْبًا، وهُوَ التَّبَحُّرُ فِيْ الفِقْهِ وعِلْمِ القَلْبِ.
  >
  > অর্থাৎ 'প্রয়োজনীয় 'ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরযে 'আইন। অপরকে শিক্ষা দেয়ার মানসে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 'ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরযে কিফায়া এবং বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করার মানসে শিক্ষা করা মুস্তাহাব। এইরূপ 'ইল্‌মে তাসাওউফ অবস্থাভেদে ফরযে 'আইন, ফরযে কিফায়া ও মুস্তাহাব।'[১০৫]

- হানাফি মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিক্‌হ গ্রন্থ *'দুর্‌রুল মুখতার'* এর শরাহ *'গায়াতুল আওতার'* গ্রন্থকার মওলানা মুহাম্মদ আহসান নানুতুবি (রহ.) বলেন, اصل علم اخلاق (تصوف) فرض ہے اور اس میں تجرید اکرنا مستحب ہے. অর্থাৎ 'ইল্‌মে দীন বলতে 'ইল্‌মে ফিকহ ও তাসাওউফ উভয় ধরনের জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত। তাই ফিক্‌হের জ্ঞানের মতো সুফিবাদের জ্ঞানার্জন করাও ফরয; তবে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা মুস্তাহাব।'[১০৬]

---

১০০. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *আল-জামি'আস-সহীহ*, পূর্বোক্ত, খ.১, বাবুন মন ইসতাবরাআ' লি-দীনিহি, হাদিস নং ৫০, পৃ. ৯০

১০১. ইবনুল কাইয়্যিম আজ-জাওযিয়্যাহ্, *বাদা'য়িউল ফাওয়া'য়িদ* (জেদ্দা : মাজমা'উল ফিক্‌হিল ইসলামি, ২০০৮), খ.৩, পৃ. ৭১০

১০২. ড. এ. বি. এম. সিদ্দিকুর রহমান, *সুফীবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

১০৩. মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ আশরাফী, 'ইসলামে তাসাউফের ভিত্তি : প্রামাণিক বিশ্লেষণ', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

১০৪. ড. তাহেরুল কাদরী, *তাসাউফের আসল রূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০

১০৫. ইবনু 'আবেদিন, *রদ্দুল মুখতার* (বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৬৬), খ.১, পৃ. ৯৯

১০৬. মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, *ইসলাম ও তাসাউফ* (ঝালকাঠি : নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ২০১০), পৃ. ১৫

♦ শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানি (রহ.) (১৮৭৯–১৯৫৭ খ্রি.) বলেন, 'সুফিবাদ ও তরিকত বিদ্'আত নয়; শরি'আত থেকে বিচ্ছিন্নও নয়। তরিকত হলো শরি'আতেরই খাদেম ও সেবক। এটি শরি'আতকে পূর্ণাঙ্গভাবে পালনে সাহায্যকারী শক্তি।'[১০৭]

♦ বিশিষ্ট দার্শনিক ইমাম গাযালি (রহ.) (১০৫৮–১১১১ খ্রি.) বলেন,
الدخول في التصوف فرض عين إذ لا يخلو احد من عيب أو مرض إلا الأنبياء عليهم السلام.
অর্থাৎ 'সুফিয়ায়ে কিরামের সাহচর্য লাভ করে সুফিবাদ অর্জন করা অবশ্যই কর্তব্য; কেননা আত্মিক রোগ ও দোষত্রুটি থেকে আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতীত কেউ মুক্ত নয়।'[১০৮]

♦ তিনি আরও বলেন, وكَذَالِكَ يَفْتَرِضُ عَلَيْهِ عِلْمُ اَحْوَالِ الْقَلْبِ مِنَ الْقَلْبِ والتَّوَكُّلِ والْخَشْيَةِ والرِّضَاءِ- অর্থাৎ 'অন্যান্য শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করা যেমন ফরয, অনুরূপভাবে অন্তরের অবস্থাসমূহের জ্ঞান, যেমন 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহ্ তা'আলার ওপর ভরসা করা), 'খশিয়ত' (খোদাভীতি) এবং রেযা বিল কাযা (আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা) প্রভৃতির জ্ঞানার্জন করাও ফরয।'[১০৯]

♦ আল্লামা কাযি সানাউল্লাহ্ পানিপথি (রহ.) (১৭৩০–১৮১০ খ্রি.) তাঁর বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ '*তাফসিরে মাযহারি*'-তে,
فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
আয়াতের টীকায় লিখেছেন যে, শরিয়তের যাহেরি হুকুম তথা নামায, রোযা প্রভৃতি যে ফরযে 'আইন তা সর্বজনবিদিত। তাই সেগুলোর 'ইল্ম রাখাও ফরযে 'আইন। অনুরূপভাবে বাতেনি 'আমলও সকলের জন্য ফরযে 'আইন। তাই বাতেনি 'আমল ও বাতেনি হারাম বস্তুর 'ইল্ম– যাকে পরিভাষায় 'ইলমে তাসাওউফ' বলা হয়, তা হাসিল করাও ফরযে'আইন।[১১০]

♦ মুহাম্মদ ইবনে আলি কাত্তানি (রহ.) (৯৫১–১০২৯ খ্রি.) বলেন, التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف অর্থাৎ 'সুফিবাদ সুন্দর ও মার্জিত চরিত্রকে বলা হয়, অর্থাৎ যার চরিত্র যত বেশি মার্জিত হবে, তিনি তত অধিক সুফিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সমাসীন হবেন।'[১১১]

♦ আল্লামা মোল্লা আলি কারি (রহ.) (১৫২৩–১৬০৬ খ্রি.) বলেন, 'শরি'আতের বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন না করলে মা'আরিফত লাভ যেমন সম্ভব নয়, তদ্রূপ 'ইল্মে মা'আরিফতও সঠিকভাবে না শিখলে শরি'আতের হুকুম-আহকামও যথাযথভাবে আদায় করা যায় না।' এই কারণেই ইমাম মালেক (রহ.) (৭১১–৭৯৫ খ্রি.) বলেছেন,
من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق
অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি শুধু 'ইল্মে ফিক্হ অর্জন করল অথচ 'ইল্মে তাসাওউফ শিক্ষা করল না, সে ব্যক্তি ফাসেক (পাপী)। আর যে ব্যক্তি সুফিবাদ শিক্ষা করল অথচ 'ইল্মে ফিকহ্ শিক্ষা করল না, সে ব্যক্তি জিন্দিক (কাফির)। আর যে ব্যক্তি উভয় প্রকার 'ইল্ম শিক্ষা করল, সে ব্যক্তি মুহাক্কিক

---

১০৭. মুহাম্মদ ইদরিস হুশিয়ারপুরি, *খুতবাতে মাদানি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬-৬৯
১০৮. মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, *ইলমে তাসাউফের হাকীকত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
১০৯. শায়খ ইসমাঈল হক্কি ইব্ন মুস্তফা, *তাফসিরে রুহুল বায়ান* (বৈরুত : দারু কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা. বি.), খ.৮, পৃ. ৯৩
১১০. মুফতি মুহাম্মদ শফি, মওলানা মহিউদ্দীন খান অনূদিত ও সম্পাদিত, *মা'আরিফুল কুর'আন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৭
১১১. আল্লামা ইবনুল কায়্যিম, *মাদারিজুস* সালিকিন (রিয়াদ : দারুস সমিঈ, ২০১১), খ.১, পৃ. ১৩৫

তথা প্রকৃত জ্ঞানী।’[১১২] গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে ইমাম মালিকের উক্তি যেন এই হাদিসের ব্যাখ্যাস্বরূপ। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) (৬০০–৬৭৮ খ্রি.) বলেন,

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ.

অর্থাৎ ‘আমি রাসুলুল্লাহ্ (সা.) থেকে জ্ঞানের দুটি থলে ভরেছি। এর মধ্যে একটি আমি সাধারণ মানুষের মাঝে বিতরণ করেছি; অপরটিকে সাধারণের মাঝে বিতরণ করলে আমার গলা কেটে দেয়া হবে।’[১১৩] এখানে প্রথম প্রকারের ‘ইল্‌ম বলতে ‘ইল্‌মে যাহেরি এবং দ্বিতীয় প্রকারের ‘ইল্‌ম বলে ‘ইল্‌মে বাতেনি তথা সুফিবাদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

♦ আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বিশিষ্ট সুফি আবুল হাসান শাজলি (রহ.) (১১৯৬–১২৫৮ খ্রি.) বলেন, مَن لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصراً على الكبائر وهو لا يشعر অর্থাৎ ‘যে ব্যক্তি আমাদের তরিকতের (আধ্যাত্মিক) পথের জ্ঞানার্জন না করে মারা গেল, সে যেন নিজের অজান্তে কবিরা গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থেকেই মারা গেল।’[১১৪]

♦ *‘মাযাহেরে হক’* গ্রন্থের ১ম খণ্ড ‘বাবুল ঈমান’ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, ‘এটা জানা কর্তব্য যে, ধর্মের ভিত্তি এবং পূর্ণতা ফিক্‌হ, ‘আকাইদ ও সুফিবাদের ওপর নির্ভর করে।’[১১৫] এ সম্পর্কে সুলতান বাহু (রহ.) (১৬৩০–১৬৯১ খ্রি.) বলেন,

علم باطن ھمچوں مسکہ علم ظاھر ھمچوں شیر- کئی بودے شیر مسکہ کئی بودے پیر پیر

অর্থাৎ ‘আধ্যাত্মিক জ্ঞান মাখন সদৃশ ও জাহিরি জ্ঞান দুধ সমতুল্য। দুধ ব্যতীত যেমন মাখন তৈরি করা যায় না, তেমনি কামিল পীরের সঙ্গ লাভ ব্যতীত মানুষের পক্ষে কখনও পূর্ণতায় পৌঁছা যায় না।’[১১৬] এই পূর্ণতা মানে ‘ফানা ফিশ শেখ’[১১৭] এর মাধ্যমে ‘ফানাফির রাসুল (সা.)’ এবং সর্বোচ্চ প্রাপ্তি ফানাফিল্লাহ তথা আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভ। যে আল্লাহ্‌কে রাজি করতে পেরেছে, সে দুনিয়া ও আখিরাতের মহাসাফল্য অর্জন করেছে।

♦ ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) (৭০০–৭৬৭ খ্রি.) বিশ্ববিখ্যাত আলিম ও ফকিহ হওয়া সত্ত্বেও দুই বছরের অধিককাল আওলাদে রসুল ইমাম বাকের (রহ.) (মৃ. ৭৩২ খ্রি.) এবং ইমাম জাফর সাদিক (রহ.) (৭০২–৭৬৫ খ্রি.) এর নিকট সুফিদর্শনে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বলেন, لَوْلَا السَّنَتَانِ لَهَلَكَ

---

১১২. মোল্লা আলি কারি, *মিরকাতুল মাফাতিহ শরহু মিশকাতিল মাসাবিহ* (দিল্লি : কুতুবখানা এশ‘আতে ইসলাম, তা. বি.), খ.২, পৃ. ১৯০

১১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল বুখারী, *আল-জামি‘আস-সহীহ*, বাবু হিফযিল ‘ইলম, খ.১, হাদিস নং ১১৭, পৃ. ১৫

১১৪. মওলানা মোহাম্মদ অবদুল জব্বার, *ইলমে তাসাউফের হাকীকিত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

১১৫. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৭

১১৬. মুহাম্মদ আবদুস সালাম, *মওলানা রুহুল আমীন : জীবন ও কর্ম* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ৩৩

১১৭. এই স্তরে সুফিসাধক পীরের নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন। পীরের সর্বপ্রকার গুণাবলি লাভ করা এবং নিজস্ব ইচ্ছা ও কামনা পীরের ইচ্ছায় পরিণত করাই এ স্তরের উদ্দেশ্য। পীরের সাথে মহব্বত সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এ স্তরে তাসাওরে শায়খ বা পীরের চেহারা ধ্যান করার ও উক্ত ধ্যানের মাধ্যমে আপন অস্তিত্ব বিলোপ করে পীরের অস্তিত্বে স্থিতিবান হওয়ার জন্য সুফি শিক্ষকগণ নির্দেশ দান করে থাকেন। দ্র. ফকির আব্দুর রশীদ, *সূফী দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬০-১৬১

نُعْمَانُ অর্থাৎ ‘(আমার জীবনে) যদি দুটি বৎসর না আসত, তবে নু‘মান (আবু হানিফা) ধ্বংস হয়ে যেত।’[১১৮]

মোদ্দাকথা, ‘ইল্‌মে ফিক্‌হের পাশাপাশি ‘ইলমে সুফিবাদ সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন করাও আবশ্যক। ফিক্‌হ বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের যথাযথ বিধান উপস্থাপন করত সুফিবাদের মাধ্যমে আত্মপরিচয় জ্ঞাত হয়ে আল্লাহ্ তা‘আলার নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া যায়। তাঁর মহত্ত্ব, বড়োত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।

১১৮. মওলানা সাইয়্যিদ শোয়াইব আহমদ, *ওযীফা শরিফ* (ঢাকা : মুহাম্মদিয়া জামিয়া শরিফ, ২০০২), পৃ. ৪৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ সুফি তরিকাসমূহ

সুফিগণের আধ্যাত্মিক অনুশীলনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিভিন্ন তরিকার উদ্ভব ঘটে। আর এসব তরিকার উদ্ভাবক ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধক ও পীর-মাশায়েখগণ। এ সব তরিকা বিভিন্ন পীর-পরম্পরায় হযরত আলি (রা.), হযরত 'উসমান (রা.) কিংবা হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। সব তরিকায় রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-কে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সুফি হিসেবে অভিহিত করে তাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উৎস বলে মনে করা হয়।[১১৯]

তরিকতের বিকাশ লাভের পর সুফি-সাধকগণের মাধ্যমে অসংখ্য তরিকার সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো তরিকা আবার একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়। বর্তমানে অনেক তরিকা বিলুপ্ত। 'ইসলামী বিশ্বকোষে' প্রায় দুশত তরিকার সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।[১২০] অনেকের মতে, এর সংখ্যা প্রায় তিনশ।[১২১] ভারতীয় উপমহাদেশে যে সব তরিকা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তন্মধ্যে কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, নক্‌শবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, কলন্দরিয়া, ওয়ায়সিয়া, সেনুসিয়া, জুনায়েদিয়া ও মুহাম্মদিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে প্রসিদ্ধ তরিকাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হলো :

কাদেরিয়া তরিকা

সর্বপ্রাচীন ও সুদূরপ্রসারী তরিকা বা সুফি-সংঘের নামই হচ্ছে কাদেরিয়া। এ তরিকায় আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান অত্যন্ত সহজ এবং শার'ঈ বিধিবিধানের অধিকতর কাছাকাছি হওয়ায় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।[১২২] বড়োপীর নামে অভিহিত শায়খ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি (রহ.) (১০৭৮–১১৬৬ খ্রি.) এর নামানুসারে এ তরিকার নাম দেয়া হয় 'কাদেরিয়া তরিকা'। তিনি ১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পারস্যের জেলান বা গিলান জেলার নিফ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[১২৩] তাঁর পিতার নাম আবু সালেহ এবং মাতার নাম উম্মুল খায়র ফাতেমা।[১২৪]

তিনি পিতার দিক থেকে হযরত হাসান (রা.) (৬৪১–৭২৮ খ্রি.) এবং মাতার দিক থেকে হযরত হোসাইন (রা.) (৬২৬–৬৮০ খ্রি.) এর বংশধর ছিলেন।[১২৫] নিজ জন্মস্থানে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে ১৮ বছর বয়সে বাগদাদ গমন করে ভাষাতত্ত্ব ও আইনশাস্ত্রসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর

---

১১৯. মাওলানা আবদুর রহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

১২০. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৪৫৪

১২১. মাওলানা আবদুর রহীম হাজারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

১২২. ড. মফিজুল্লাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯০

১২৩. আবদুর রহীম হাজারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১; মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, *খাজা আবদুল মজীদ শাহ ঃ জীবন ও কর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

১২৪. মাহবুবুর রহমান নান্নু, *হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)* (ঢাকা : রশীদ বুক হাউস, ১৯৯১), পৃ. ২৮

১২৫. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভি, *আখবারুল আখইয়ার ফি আসরারিল আবরার* (দেওবন্দ : কুতুবখানায়ে রহীমিয়্যাহ, ১৯১৫), পৃ. ২৯; মাহবুবুর রহমান নান্নু, *হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

জ্ঞানার্জন করেন।[১২৬] বাগদাদের তদানীন্তন বিখ্যাত সুফি আবুল খায়ের মুহাম্মদ বিন মুসলিম (রহ.) (মৃ. ১১৩১ খ্রি.) এর নিকট তিনি তাসাওউফ শিক্ষা গ্রহণ করেন। বাগদাদের হাম্বলি মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ কাজি আবু সা'দ মুবারক আল মুকার্‌রমির নিকট থেকে খিরকা[১২৭] লাভ করেন।[১২৮]

শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে তিনি বাগদাদের হাম্বলি মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন এবং পরবর্তীকালে এ মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন।[১২৯] এ সময় তিনি উক্ত মাদ্‌রাসায় কাদেরিয়া তরিকার একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করে আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও ইসলামি আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। তিনি মুসলিমগণকে জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে বদান্যতা, মহানুভবতা ও বিনয় অনুশীলন করতে বলেন। তাঁর প্রচারের ফলে বহু ইহুদি ও খ্রিষ্টান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।[১৩০]

১২৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গোলীয় নেতা হালাকু খান (১২১৮–১২৬৫ খ্রি.) কর্তৃক বাগদাদ আক্রান্ত হলে মাদ্‌রাসা ও খানকাহ উভয়ই ধ্বংস হয়।[১৩১] ১১৬৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাগদাদ নগরীতেই ইন্তিকাল করেন। তাঁর জীবদ্দশায় কাদেরিয়া তরিকা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রগণ বাগদাদে কাদেরিয়া তরিকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর শিষ্যগণ সমগ্র মুসলিম জাহানে এর বিস্তার ঘটান। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে : (১) গুনইয়াতুত তালিবিন (২) ফতহুর রাব্বানি (৩) ফতহুল গায়ব (৪) মালফুযাতে গাওসুল আযম ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৩২]

কাদেরিয়া তরিকার তা'লিম

এ তরিকার খাস তা'লিম হলো, কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর ১২টি হরফ। এই ১২টি হরফের মধ্যে নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান। তাওহিদের প্রকৃত রূপও এ কালিমা। এ বারো হরফের মধ্যে কোনো নোক্‌তা নেই। নোক্‌তাশূন্য হরফের সাহায্যে কালেমার সৃষ্টি কেন হলো, তা গভীর রহস্যময়। এ কালেমাকে চিনলে, জানলে ও সঠিকভাবে তাহকিক করে পড়লে ব্যক্তির নিকট সকল রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হয়ে

---

১২৬. এম. শাহ্‌জাহান বিন ফজল, *বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর জীবনী* (ঢাকা : মিনা বুক হাউস, ২০০০), পৃ. ৫৮

১২৭. খিরকা সুফিগণের দীর্ঘ অঙ্গাবরণ বিশেষ। সুফিগণ সাধারণত তাদের পরবর্তী খলিফাগণকে খিলাফত প্রদানের নিদর্শনস্বরূপ এটি পরিয়ে দেন।

১২৮. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯

১২৯. কারও মতে, তিনি শিক্ষা সমাপ্তির পর বাগদাদের 'নিজামুল মুলক বিশ্ববিদ্যালয়ে' ১১৩৪ খ্রিষ্টাব্দে হাম্বলি মাযহাবের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন এবং ৩৩ বছর অবধি এ মাদ্‌রাসায় অধ্যাপনা করেন। দ্র. মাওলানা আবদুল রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

১৩০. ড. মফিজুল্লাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯০

১৩১. ড. আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ. ১৯০; ফকির আবদুর রশীদ, *সূফী দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪-৭৫

১৩২. ড. মফিজউল্লাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯০

যায়। কালেমা প্রধানত দুভাগে বিভক্ত; এর একটি হলো 'ফানা'[১৩৩] (আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে লীন হওয়া), যাকে 'নুজুল বা অবরোহ' বলা হয়। আরেকটিকে বলা হয় 'বাকা'[১৩৪], যাকে 'উরুজ বা আরোহ' বলা হয়।

কালেমার প্রথম অংশ 'লা ইলাহা'-কে নফি, আর দ্বিতীয় অংশ 'ইল্লাল্লাহ্' কে ইসবাত বলা হয়। 'লা ইল্লাহ্' বলে শ্বাস গ্রহণ এবং 'ইল্লাল্লাহ্' বলে শ্বাস ত্যাগ করাই হচ্ছে নফি-ইস্‌বাতের যিকির। কাদেরিয়া তরিকাপন্থি সুফিগণ একক কিংবা সম্মিলিতভাবে উচ্চ স্বরে (জলি) অথবা নিম্নস্বরে (খফি) যিকির করে থাকে। এ তরিকায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শেষে কিছু নির্ধারিত ওয়াজিফা, বিশেষ সময়ে বিশেষ নিয়মে দরুদ শরিফ পাঠ করা এবং মুরাকাবা-মুশাহাদা অবস্থায় থাকার নিয়ম রয়েছে।

সুফি ফতেহ আলীর শিষ্য সুফি আহমদ আলি ওরফে জানশরিফ শাহ্ সুরেশ্বরী তাঁর *'সিররে হক জামে' নুর'* নামক গ্রন্থে কাদেরিয়া তরিকার সাধনা সম্পর্কে লিখেন,

> 'কাদেরিয়া তরিকার সাধনা কোনো লতিফার সহিত সম্পৃক্ত নহে; বরং খোদাপ্রেমিকের যেই স্থানে আল্লাহ্ শব্দের প্রভাব পড়িবে, সেখানেই যিকির জারি হয়। সেইখান হইতে তাহা সমস্ত শরীরে শিহরিত হয়। অতঃপর সেখানে বিশেষ অবস্থা ও নুরসমূহ বিচ্ছুরিত হইবার পর তজল্লি বা আলোক প্রভার বিকিরণ এবং উর্ধ্বজগতের ভ্রমণ সংঘটিত হয়।'[১৩৫]

বাংলাদেশে কাদেরিয়া তরিকার প্রসার

পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাংলাদেশেও কাদেরিয়া তরিকা যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং অন্যান্য তরিকতের ওপর এর বেশ প্রাধান্য রয়েছে। হযরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর শিষ্যগণ কর্তৃক প্রথমে ভারতে পরবর্তীকালে বঙ্গদেশে কাদেরিয়া তরিকার আবির্ভাব ঘটে।[১৩৬] রাজশাহীর হযরত শাহ্ মখদুম রুপোশ[১৩৭] (রহ.) ছিলেন কাদেরিয়া তরিকার একজন বলিষ্ঠ প্রচারক। ভারতীয় উপমহাদেশে হযরত

---

১৩৩. ফানা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ধ্বংস হওয়া, লীন হওয়া। সুফিদের পরিভাষায়, ফানা হলো আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে মানবসত্তা লীন হয়ে যাওয়া। কোনো ব্যক্তি যখন কঠোর সাধনার মাধ্যমে তাঁর মানবীয় আবেগ, ইচ্ছা ও চাহিদার মৃত্যু ঘটিয়ে আল্লাহ্র যাতের মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নিমজ্জিত করতে সক্ষম হয়, সেই ব্যক্তির অবস্থাকে 'ফানা' বলা হয়। দ্র. ড. আহমদ আলী, *তাসাউফের স্বরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

১৩৪. বাকা 'ফানা'র পরবর্তী তাসাওউফের সর্বোচ্চ স্তর। সাধক 'ফানা'র স্তরে নিজের মানবীয় ইচ্ছা, আবেগ ও চাহিদা তথা নিজের মানবীয় আত্মার বিলুপ্তি ঘটিয়ে আল্লাহ্র যাতের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেন। অতঃপর 'বাকা'র স্তরে পৌঁছে তিনি নিজেকে আল্লাহ্র যাতের মধ্যে খুঁজে পান। এ অবস্থায় তিনি এ জগতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পান না। তাঁর মনে হবে যে, জগতে যা কিছু আছে, সব এক আল্লাহ্র সত্তারই বহিঃপ্রকাশ। দ্র. ড. আহমদ আলী, *তাসাউফের স্বরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১

১৩৫. http://www.sureswardarbarsharif.ne/তরিকা-সমূহের-বর্ণনা/ Visitted on : ১৮.১০. ২০১৮

১৩৬. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সৈয়দ মুহাম্মদ গাউস কাদেরিয়া তরিকার প্রচলন করেন। তিনি সিরিয়ার আলেপ্পোতে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর ভারতের ঝাং জেলার উচ্ নামক স্থানে তাঁর সুফি-সাধনার কেন্দ্র ছিল। উচেই তিনি ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। উপমহাদেশে এ তরিকা সম্প্রসারণে সৈয়দ মির হায়াতুন নবি কাদেরি, বাহরুল শাহ্ দরিয়া, শাহ লতিফ বারি, শাহ্ লাল হোসেন লাহোরি, সৈয়দ মুকিম মাহকাম উদ্দিন এবং মীর মোহাম্মদ শাহ্ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দ্র. এ. এম. খলিলুর রহমান, *সূফীবাদ ও চারি তরীকার পীর* (ঢাকা : ১৯৮০), পৃ. ৪৯-৫৩

১৩৭. রুপোশ ফার্সী শব্দ। এর অর্থ হলো- আবরণকারী। হযরত শাহ্ মখদুম (রহ.) সর্বদা কালো পাগড়ি দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখতেন। এই কারণেই তাঁকে রুপোশ বলা হয়। দ্র. বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, *হযরত শাহ্ মখদুম (রহ.)-এর জীবনী* (ঢাকা : দি প্রিন্টার্স কম্পিউটার, ১৯৯৮), পৃ. ১৩

আবদুল কাদের জিলানির স্মরণে রবিউস্ সানি মাসের ১১ তারিখ উৎসব পালন করা হয়।[১৩৮] বর্তমানে বাংলাদেশে এ তারিখটি 'ফাতেহায়ে ইয়াযদাহম' নামে উদ্‌যাপন ও মূল্যায়ন করা হয়।

চিশতিয়া তরিকা

চিশতিয়া তরিকা ভারতীয় উপমহাদেশে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী একটি তরিকা। এ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত[১৩৯] থাকলেও খাজা মঈন উদ্দিন চিশতিই (রহ.) এ তরিকার প্রবর্তক হিসেবে সমধিক পরিচিত।[১৪০] তিনি ১১৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইরান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী জেলা সানজারের চিশ্‌ত নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই তিনি হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সমরকন্দ ও বোখারায় গিয়ে ইসলামি শিক্ষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভের জন্য খোরাসানের বিভিন্ন স্থানে গমন করেন। অতঃপর বাগদাদের উদ্দেশে ইরাক যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নিশাপুরের হারুন নামক স্থানে প্রখ্যাত সুফি খাজা ওসমান হারুনির (১১০৭–১২২০ খ্রি.) দরবারে হাজির হয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষা নেন তথা বায়'আত হন। খাজা ওসমান হারুনির সান্নিধ্যে তিনি প্রায় বিশ বৎসর অবস্থান করে আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে উপনীত হন।[১৪১]

এরপর হজ ও যিয়ারত সম্পাদন করে তিনি বাগদাদ গমন করেন। বাগদাদে তিনি শেখ নজমুদ্দিন কুবরা, শিহাবুদ্দিন সুহরাওয়ার্দি ও আওহাদ উদ্দিন কিরমানিসহ বিখ্যাত সুফি-সাধকদের সাথে পরিচিত হন।[১৪২] কারও কারও মতে, বাগদাদে অবস্থানকালে তিনি শায়খ আবদুল কাদের জিলানি (রহ.)-এর দরবারে প্রায় ৫৭ দিন অবস্থান করে তরিকতের দীক্ষা লাভ করেন।[১৪৩] ১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভারতের আজমিরে আগমন করেন। সেখানে খানকা স্থাপন করে বাকি জীবন ইসলাম-প্রচারের কাজে অতিবাহিত করেন। ১২৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সেখানেই ইন্তিকাল করেন।[১৪৪] ইন্তিকালের পর আজমীর শরিফে তাঁর রওজা শরিফ তীর্থস্থানে পরিণত হয়। তাঁর ইন্তিকালের পর ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিশতিয়া তরিকার

১৩৮. ড. আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১

১৩৯. কারও মতে, খাজা আবু ইসহাক এ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁর মুরশিদ খাজা মামশাদ উলুত দ্বিনাওয়ারির নির্দেশে চিশ্‌তে বসতি স্থাপন করেন। অন্য বর্ণনানুসারে, তিনি সিরিয়ায় বসবাস করেন এবং আকরা নামক স্থানে সমাহিত হন। খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (রহ.) দ্বাদশ শতক তথা ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরির সময় এ তরিকা ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন এবং আজমিরে এর প্রাণকেন্দ্র স্থাপন করেন। এখান থেকে এ তরিকা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমগণের আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কারও কারও মতে, খাজা মঈন উদ্দিন চিশতিই এর প্রতিষ্ঠাতা; তবে তিনি প্রতিষ্ঠাতা না হলেও তাঁর দ্বারাই এ তরিকা পৃথিবীব্যাপী সুখ্যাতি লাভ করে এবং ভারতীয় উপমহাদেশের লোকজন সাধারণত তাকে এর প্রতিষ্ঠাতা মনে করে এবং তাঁর নামানুসারেই এর কার্যক্রম পরিচালনা করে। দ্র. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস আদ-দেহলভি, *আল-কাওলুল* জামিল (করাচি : এডুকেশন প্রেস, সাঈদ কোম্পানী, ১৯৮৫), পৃ. ৬৩

১৪০. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি, *আল-কাওলুল জামীল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

১৪১. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫; শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস আদ-দেহলভী, *আখবারুল আখইয়ার* (কায়রো : আল-হায়'আতুল 'আমাতু লিদারিল কুতুবি ওয়াল ওছায়িকিল কওমিয়্যাহ, তা. বি.), পৃ. ৫০

১৪২. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৬

১৪৩. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪

১৪৪. ইন্তিকালের পর সবুজ অক্ষরে তাঁর কপালে 'আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর ভালোবাসায় মৃত্যুবরণ করেছেন' লেখাটি ভেসে উঠে। দ্র. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস আদ দেহলভী (রহ.), *আল-কাওলুল জামীল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৬

সম্প্রদায়ভুক্ত পীর-দরবেশগণ ইসলাম প্রচার করেন। পরবর্তীকালে অর্থাৎ মোগল আমলে দিল্লি চিশতিয়াপন্থিদের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।[১৪৫]

চিশতিয়া তরিকার তা'লিম

'আনাসিরে খামসা' (পঞ্চতত্ত্ব) পানি, আগুন, মাটি,[১৪৬] বায়ু ও নূর এর তা'লিম চিশতিয়া তরিকার খাস তা'লিম। এ পাঁচটি উপাদানকে 'পঞ্চতত্ত্ব' নামে অভিহিত করা হয়। সমুদয় সৃষ্টিজগতের মূল উৎস এ পঞ্চতত্ত্ব। এ পঞ্চতত্ত্বের পাঁচটি সিফাত রয়েছে। নবি করিম (সা.)-এর শিক্ষানুযায়ী হযরত আলী (রা.)-এর মাধ্যমে এ তা'লিম হযরত হাসান বসরি (রা.) লাভ করেন। সিনায় সিনায় এ তা'লিম হযরত ওসমান হারুনি (রহ.) পর্যন্ত চলে আসে।

চিশতিয়া তরিকামতে, পঞ্চভূত হচ্ছে জগতের মূল। এটিকে 'মান আরাফা নাফসাহু'র[১৪৭] তা'লিমও বলা হয়। এ তা'লিম লাভ না করা পর্যন্ত কেউ চিশতিয়া তরিকার অনুসারী হওয়ার উপযুক্ত হন না। এ তরিকাতেও নোক্তাবিহীন বারো হরফ বিশিষ্ট কালিমার যিকির করা হয়। এ তরিকামতে, যিকিরের নিয়ম হলো, তাহাজ্জুদের নামাজের পর চারজানু হয়ে বসবে এবং অতীতের পাপের কথা স্মরণ করে ১১ বার ইস্তিগফার এবং ১০ বার দরুদ শরিফ পাঠ করবে। দরুদটি হলো : 'আস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ্‌, আস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামু 'আলাইকা ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌।' তারপর নফি-এস্‌বাতের যিকির করবে। শুরুতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা' ২০০ বার পাঠ করবে। মাঝেমধ্যে 'মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্‌' বলবে। এরপর 'ইল্লাল্লাহ্‌' ৪০০ বার পাঠ করবে। অতঃপর 'আল্লাহু আল্লাহু' ৬০০ বার পাঠ করবে। তারপর কেবল 'আল্লাহ্‌' ১০০ বার পাঠ করবে।[১৪৮]

---

১৪৫. খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি, জেহাদুল ইসলাম অনূদিত, *দিওয়ান-ই-মঈন উদ্দিন* (ঢাকা : খাজা মঞ্জিল, ৫৯২ উত্তর শাজাহানপুর, ২০০০), পৃ. ৫০৯

১৪৬. মাটি ভূ-পৃষ্ঠের প্রাথমিক স্তরের ক্ষয় সাধনের ফলে যে ক্ষুদ্র কণা জমা হয় এবং তার সাথে জৈব পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে যে পদার্থ হয় তা-ই মাটি। দ্র. ড. এফ এম মনিরুজ্জামান, *বিপন্ন পরিবেশ ও বাংলাদেশ* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৭), পৃ. ১৯

১৪৭. নাফ্‌স আরবি শব্দ। এটি একবচন, বহুবচনে নুফ্‌সুন (**نفوس**) ও আনফুসু (**أنفس**); শাব্দিক অর্থ প্রবৃত্তি, প্রাণী ও মানুষ। নাফ্‌স হলো : মূলত মানুষের স্বভাবগত চাহিদা ও প্রবণতার নাম, যাকে এককথায় 'মানবপ্রবৃত্তি' বলা হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা মানব সৃষ্টি করার সময় তার স্বভাবের মধ্যে কতিপয় চাহিদা ও প্রবণতা দান করেছেন। এ চাহিদা ও প্রবণতাগুলো হলো : পানাহারের চাহিদা, যৌনলিপ্সা মেটানোর চাহিদা, আরাম-আয়েশের চাহিদা ও অন্যের ওপর কর্তৃত্ব চালানোর চাহিদা প্রভৃতি। এ চাহিদাগুলোকে এককথায় 'জৈবিক চাহিদা' বলা হয়। তদুপরি, এ চাহিদাগুলো যথেচ্ছা পূরণের নিমিত্তে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানবপ্রবৃত্তির মধ্যে লোভ-লালসার মতো জঘন্য অবশিষ্ট চরিত্রও দান করেছেন। বিশিষ্ট মুফাসসির আবুল কাসিম আয-যামাকশারি (১০৭৪–১১৪৩ খ্রি.) ও বাহাউদ্দিন আল-আবশিহি (১৩৮৮–১৪৪৮ খ্রি.) প্রমুখ বলেন,

قِيل لما خلق الله آدم عليه السلام عَجَنَ بطينته ثلاثة أشياء: الحرص والطمع والحسد، فهي تجري في أولاده إلى يوم القيامة فالعاقل يُخْفيها والجاهل يُبديها.

অর্থাৎ 'বলা হয়ে থাকে যে, আদম (আ.)-এর সৃষ্টির সময় আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর মাটির খামিরের মধ্যে তিনটি বিষয় দান করেছিলেন; এগুলো হলো : লোভ, লালসা ও হিংসা-বিদ্বেষ। কাজেই তা তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত বংশানুক্রমে সংক্রমিত হতে থাকবে; তবে বিবেকবান লোক তাকে প্রকাশ হতে দেবে না আর অজ্ঞ লোক তা প্রকাশ করবে।' দ্র. যামাখশারি, *রবি'উল আবরার* (বৈরুত : মু'আস্‌সাসাতুল আ'লমি, ১৯৮১), খ.১, পৃ. ২৬৪; মুহাম্মদ ইবন আহমদ আবিল ফতহি আল-আবশিহি, *আল-মুস্তাতরাফ ফি কুল্লি ফন্নি মুস্তাযরফ* (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩), খ.১, পৃ. ১৭৪

১৪৮. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, 'আমাদের সুফীআয়ে কেরাম', *অগ্রপথিক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ.৩৭৩-৩৭৫

এ তরিকার মুরিদরা এ যিকরকে '১২ তাসবিহের যিকর' নামে আখ্যায়িত করে থাকে। উল্লেখ্য যে, এ তরিকা অনুযায়ী নফি-ইস্‌বাতের যিকরের নিয়ম হলো : 'লা ইলাহা' এ ধ্বনি কাল্‌ব থেকে উঠিয়ে ডান কাঁধ দিয়ে বের করে দেবে এবং ডানে কিছুটা হেলতে হবে। আর 'ইল্লাল্লাহ্‌' বলার সময় কাল্‌বের ওপর সজোরে নিক্ষেপ করবে এবং বামে কিছুটা হেলতে হবে। এ তরিকায় 'পাসে-আন্‌পাস যিকরে'রও নিয়মাবলি রয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজশেষে ওয়াজিফা, মুরাকাবা ও মুশাহাদার ওপর জোর দেয়া হয়। এ তরিকায় কোনো কোনো শাখায় সামা'[১৪৯] (ঐশী প্রেমসঙ্গীত) এর প্রচলন রয়েছে। তাঁরা মনে করে যে, সামা'র দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রেম বর্ধিত হয়। এ কারণে তাঁরা একে 'আত্মার খোরাক' বলে আখ্যায়িত করেন। এ ছাড়া এ তরিকায় চিল্লাকুশির[১৫০] প্রচলনও রয়েছে।[১৫১]

বাংলাদেশে চিশতিয়া তরিকার প্রসার

১১৯৩ খ্রিষ্টাব্দে খাজা মঈন উদ্দিন চিশতি (রহ.) আজমিরে এসে খানকা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চিশতিয়া তরিকার প্রচার ও প্রসারের সূচনা করেন। তাঁর প্রধান প্রচারক হিসেবে খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কা'কি (১১৭৩–১২৩৫ খ্রি.), শেখ ফরিদ উদ্দিন মাস'উদ গঞ্জেশকর (রহ.) (১১৭৩–১২৬৬ খ্রি.) ও নিযাম উদ্দিন আউলিয়া[১৫২] (রহ.) (১২৩৮–১৩২৫ খ্রি.) চট্টগ্রামে এ তরিকা প্রচার করেন।[১৫৩] চট্টগ্রাম শহর থেকে এক মাইল উত্তরে মুলুক বাহারের পার্বত্য টিলার 'শায়খ ফরিদের চশমা' নামে একটি ঝরনা দেখা যায়। শেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার (রহ.) (১১৪৫–১২২১ খ্রি.) ১১৭৭ থেকে ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ফরিদপুর জেলা ভ্রমণ করেন। তাঁর নামনুসারে এ জেলার নামকরণ করা হয়।[১৫৪] চট্টগ্রামে গারাংগিয়া দরবার ও বায়তুশ শরফ দরবার এ তরিকার প্রচার-প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এ তরিকার কিছু অনুসারী প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট দিনে খাজা বাবার উরসের নামে গান, বাদ্য ও সামার আয়োজন করে। কারণ তাদের মতে, খাজার দরবারেও এ ধরনের গান-বাদ্য ও সামার আয়োজন করা হতো।[১৫৫]

---

১৪৯. সাধারণত সুফিদের আসরে সুললিত কণ্ঠে সুর করে গীত ভক্তিমূলক গানকেই 'সামা' বলা হয়।

১৫০. চিল্লাকুশি হলো নির্জনে আল্লাহ্‌র প্রেমে ধ্যানমগ্ন থাকা। জাগতিক সম্পর্ক ও মায়ামোহ ছিন্ন করে ৪০ দিন অথবা এর চেয়েও কম সময় অবধি আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন থাকার নামই চিল্লাকুশি।

১৫১. ড. ফকীর আবদুর রশীদ, *সূফী দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২-৭৩

১৫২. তাঁর আসল নাম মওলানা নিযামুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবন আলি আল-বুখারি (রহ.)। তাঁর উপাধি ছিল সুলতানুল মাশাইখ। তিনি 'নিযাম উদ্দিন আউলিয়া' নামে পরিচিত ছিলেন। ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বাদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং এখানেই ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৬

১৫৩. ড. গোলাম সাকলায়েন, *বাংলাদেশের সূফী-সাধক* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ৪৫

১৫৪. আবদুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২-১৩

১৫৫. ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ* (ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশনা, ২০০৯), পৃ. ৫৯

নক্‌শবন্দিয়া তরিকা

নকশবন্দিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হলেন শায়খ বাহাউদ্দিন মুহাম্মদ নক্‌শবন্দি[১৫৬] আল-বুখারি (রহ.)। তিনি ১৩১৭ খ্রিষ্টাব্দে বুখারা থেকে এক ফারসাখ[১৫৭] দূরবর্তী 'কুশক্ হিন্দওয়ান' নামক গ্রামে মুহার্‌রম মাসে জন্মগ্রহণ করেন।[১৫৮] তিনি বংশগত দিক থেকে হাসানি ও হোসাইনি ছিলেন। পিতা জালানুদ্দীনের ইন্তিকালের পর তিনি আঠারো বৎসর বয়সে বুখারা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী সাম্মাস নামক স্থানে প্রখ্যাত সুফি-সাধক মুহাম্মদ বাবা আল-সাম্মাসির নিকট আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর বিশিষ্ট খলিফা আমির কুলাল বাহাউদ্দিনকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব দেন।[১৫৯] বাবা সাম্মাসির অনুসারীগণ উচ্চ স্বরে যিকির করতেন; কিন্তু বাহাউদ্দিন নিম্নস্বরে যিকির করতেন। এতে আমির কুলালের মুরিদগণ অসন্তুষ্ট হয়ে আমির কুলালের কাছে অভিযোগ করেন। তিনি শায়খ বাহাউদ্দিনের খফি যিকিরকে সমর্থন করেন এবং তাঁকে খফি যিকিরের তা'লিম দেন।[১৬০]

খাজা আমির কুলাল থেকে শায়খ বাহাউদ্দিন বায়'আত ও খিলাফত প্রাপ্ত হন।[১৬১] শায়খ বাহাউদ্দিন বুখারায় ফিরে এসে বিবাহ করেন এবং বুখারার নিকটবর্তী যিওয়ারতুন এবং আনকিবতা গ্রামে সাত বৎসর খাজা আমির কুলালের বিশিষ্ট খলিফা আরিফ আল-কিরমানির নিকট তরিকতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বিশিষ্ট সাধক মাওরা-উন্নাহরের সুলতান খলিল দরবেশের নিকট দীর্ঘ বারো বছর পর্যন্ত আধ্যাত্মিকতার দীক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি হজ আদায় করে বুখারায় ফিরে আসেন। ১৩৮৮/৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বুখারায় মৃত্যুবরণ করেন। বুখারার 'কাসর এ আরেফান' নামক স্থানে তিনি সমাহিত আছেন।[১৬২]

নক্‌শবন্দিয়া তরিকার তা'লিম

এ তরিকার গুরুত্বপূর্ণ তা'লিম হলো ছয় লতিফা : কলব, রুহ, নাফ্‌স, সির, খফি ও আখফা। এর ওপর সাধনা করা।[১৬৩] আনাসিরে আরবা'আ (চার তত্ত্ব) তথা আব, আতশ, খাক, বাদ এর ওপর মুরাকাবা

---

১৫৬. নকশবন্দ শব্দের অর্থ চিত্রকর। তাঁর নামের নিগূঢ় অর্থ 'প্রকৃত পূর্ণতার রূপ হৃদয়ে ধারণকারী'। বাল্যকালে তিনি তাঁর পিতা মুহাম্মদ আল-বুখারির সাথে কারুকার্য খচিত নকশি কাপড় বয়ন করতেন। বংশগত এ কারুকার্য পেশা থেকে তাঁর নাম 'নক্‌শবন্দি' হতে পারে। তাসাওফপন্থিদের মতে, শায়খ বাহাউদ্দিন যখন তরিকত সাধনার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে উন্নীত হন, তখন যে দিকেই তাকাতেন সে দিকেই 'আল্লাহ্' শব্দটির অঙ্কিত প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠত; তাই তাঁকে নকশবন্দি বলা হতো। কারও কারও মতে, তিনি খফি যিকিরের মাধ্যমে মানব-হৃদয়ে আল্লাহ্‌র নামের প্রতিচ্ছবি অঙ্কনের আত্মিক শিক্ষা দেন এবং একটি তরিকা চালু করেন। তাই তাকে নকশবন্দি বলা হয়। দ্র. মাওলানা আবদুর রহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

১৫৭. এটি আরবি শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে তিন মাইল।

১৫৮. সুফী গোলাম মহিউদ্দিন, *হালাতে মাশায়েখে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া* (ঢাকা : খানকাহ শরীফ, নারিন্দা, ১৯৯৭), পৃ. ২০৭; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.২, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

১৫৯. সুফী গোলাম মহিউদ্দিন, *হালাতে মাশায়েখে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

১৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১২; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ১৮

১৬১. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

১৬২. কে. আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস* (ঢাকা : আলেয়া বুক ডিপো, ১৯৮৮), পৃ. ৩১০

১৬৩. খাজা আবদুল মজিদ শাহ্, *অজীফা ও তরীকত পীরগণের শাজারা* (নওয়াপাড়া : ফাইন আর্ট প্রেস, তা. বি.), পৃ. ১১

করা। এছাড়া এ তরিকায় আরো ১১টি মূলনীতি রয়েছে। সাধকগণ গভীর পরিশ্রমের মাধ্যমে এ মূলনীতিগুলোর অনুসরণ করে থাকেন। এ মূলনীতিগুলো হলো:[১৬৪]

(ক) হুশ দরদম (هوش دردم) : হুশ দরদম হলো, নিশ্বাস নিতে, বের করতে এবং মাঝখানে অর্থাৎ সর্বসময় নিশ্বাসকে আল্লাহ্‌র প্রতি অমনোযোগী হওয়া থেকে রক্ষা করা, যাতে প্রতিটি নিশ্বাসেই অন্তর আল্লাহ্‌র সাথে নিবদ্ধ থাকে।

(খ) নযর বরকদম (نظر برقدم) : নযর বরকদম হলো, চলার সময় কেবল পায়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা।

(গ) সফর দর ওয়াতন (سفر دروطن) : সফর দর ওয়াতন হলো, সৃষ্টিজগত থেকে আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সফর করা। কারও কারও মতে, মানবচরিত্র থেকে বের হয়ে বিশিষ্ট মালাকুতি চরিত্র ধারণের দিকে অগ্রসর হওয়া।

(ঘ) খালওয়াত দর আঞ্জুমান (خلوت در انجمن) : খালওয়াত দর আঞ্জুমান হলো, নিভৃতে আল্লাহ্‌র প্রতি মনঃসংযোগ করা।

(ঙ) ইয়াদ কর্দ (یادکرد) : ইয়াদ কর্দ হলো, সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকর করা।

(চ) বায গশত (بازگشت) : বাযে গশত অর্থ প্রত্যাবর্তন, ফিরে আসা। নকশবন্দিদের নিকট 'বাযে গশত' হলো, নিশ্বাস ছাড়ার পর যিকরকারী মুনাজাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

(ছ) নিগা দাশত (نگاه داشت) : নিগা দাশত অর্থ রক্ষা করা, সংরক্ষণ করা ও বহাল রাখা। নকশবন্দিদের নিকট 'নিগা দাশত' হলো, যে কোনোরূপ ভাবনা ও চিন্তার উদয় থেকে অন্তরকে রক্ষা করা।

(জ) ইয়াদ দাশত (یادداشت) : ইয়াদ দাশত বলতে বোঝানো হয়, যাতে ইলাহির জ্যোতি দর্শন লাভের মানসে দীর্ঘক্ষণ ধরে মনোনিবেশ করা।

(ঝ) ওকুফে যামি (وقوف زمانی) : ওকুফে যামানি হলো, সাধকের প্রতি দু বা তিন ঘন্টা পর পর নিজের অবস্থার মূল্যায়ন করা; অর্থাৎ সে ভেবে দেখবে যে, তার ঐ সময়টি কীভাবে অতিবাহিত হলো।

(ঞ) ওকুফে কালবি (وقوف قلبی) : ওকুফে কলবি হলো, সাধকের কিছুক্ষণ পর-পর নিজের কালবের অবস্থার মূল্যায়ন করা; অর্থাৎ সে ভেবে দেখবে যে, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তার মনঃসংযোগ কীরূপ ছিল।

(ট) ওকুফে 'আদাদি (وقوف عددی) : ওকুফে 'আদাদি হলো, নাফি-ইস্‌বাতের যিকরের ক্ষেত্রে বেজোড় সংখ্যা বজায় রাখার প্রতি খেয়াল রাখা।।

নক্‌শবন্দিয়া তরিকার তা'লিম রাসুলুল্লাহ্ (সা.) থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মাধ্যমে পীর পরম্পরায় হযরত বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ (রহ.) পর্যন্ত সিনায় সিনায়[১৬৫] এসে পৌঁছেছে। এসব তা'লিম লিপিবদ্ধাকারে ছিল না। হযরত বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দ (রহ.) তা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

---

১৬৪. ফরিদুদ্দিন আইদিন, *আত-তারিকাতুন নাকশবন্দিয়্যাহ বাইনা মাদীহা ওয়া হাদিরাহা* (ইস্তাম্বুল : লিত তাবা'আতি ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওযি', ২০০৬), পৃ. ১১৩-১৩০

বাংলাদেশে নক্শবন্দিয়া তরিকার প্রসার

নক্শবন্দিয়া তরিকার বিশিষ্ট পীর খাজা বাকি বিল্লাহ (রহ.) (১৫৬৩–১৬০৩ খ্রি.) পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাব্দে তুর্কিস্তান থেকে ভারতবর্ষে নক্শবন্দিয়া তরিকা নিয়ে আসেন।[১৬৬] তাঁর পীরের নির্দেশেই তিনি দিল্লিতে আগমন করেন এবং আজীবন ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানে ব্যাপৃত থেকে ভারতবর্ষের মুসলিমগণকে ধন্য করেন।[১৬৭] ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে খাজা বাকি বিল্লাহ দিল্লিতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমেই আস্তে আস্তে পরবর্তীকালে এ তরিকা বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। এদেশে এ তরিকার প্রচুর অনুসারী রয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক, চীন ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে এ তরিকার অনুসারী ছড়িয়ে আছেন।[১৬৮]

মুজাদ্দেদিয়া তরিকা

এ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন শায়খ আহমদ সিরহিন্দি আল-ফারুকি মুজাদ্দিদে আলফে সানি (রহ.)।[১৬৯] মুজাদ্দেদিয়া তরিকা নক্শবন্দিয়া তরিকারই সংস্কাররূপ।[১৭০] নক্শবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরিকার রীতিনীতি প্রায় একরকমই। নক্শবন্দিয়া তরিকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব খাজা বাকি বিল্লাহ (রহ.) থেকে নক্শবন্দিয়া তরিকার শিক্ষা ও খিলাফত লাভ করে শেখ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.) (১৫৬৪–১৬২৪ খ্রি.) সকল তরিকতের কামালিয়াত হাসিল করেছিলেন।[১৭১] তিনি ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দে জুম‘আর দিন ভারতের পূর্ব

---

১৬৫. সিনা-বসিনা আরবিতে একে ‘সাদরান ‘আন সাদারিন’ বলা হয়। এটি পূর্ববর্তীকালে ‘আলিমগণের মধ্যে বহুলপ্রচলিত একটি পরিভাষা। তখন এটি একটি সুন্দর ও যথার্থ অর্থ বহন করতো; অর্থাৎ সিনা পরস্পরায় ‘ইলমে দীন চলে আসার অর্থ ছিল, প্রত্যেক পরবর্তী ব্যক্তি পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের সংসর্গে থেকে সরাসরি ‘ইলমে দীন অর্জন করেছেন। বলাই বাহুল্য, ইসলামের প্রাথমিক যুগগুলোতে সরাসরি ‘ইলমে দীন অর্জন হাসিলের ক্ষেত্রে মাধ্যমরূপে বই-পুস্তকের ব্যবহার কম ছিল। শিক্ষকগণ তাঁদের পূর্ববর্তীগণের নিকট থেকে যা কিছু পড়তেন, শিখতেন এবং এভাবে যা কিছু নিজের বক্ষে ধারণ করতেন, তা-ই নিজ ছাত্রদেরকে পড়াতেন, শিক্ষা দিতেন ও ‘আমল করে দেখাতেন। ছাত্ররাও ঐভাবে তা সংরক্ষণ করতেন। যেমন : কুর‘আনের হাফিয্‌গণ নিজেদের বক্ষে কুরআন মাজিদ হিফাযত করেন। পরবর্তীযুগে যখন ‘ইলমে দীন সংকলিত হলো এবং সিনায় চলে আসার প্রত্যক্ষ ‘ইলম স্বয়ং সিনাধারীরাই মাধ্যম বানিয়ে ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এভাবে কারও সংস্পর্শে থেকে সরাসরি শিক্ষক থেকে ‘ইলমে দীন শিক্ষা করাপকে ‘সিনা-বসিনা’ শব্দে ব্যক্ত করা হয়। দ্র. ড. আহমদ আলী, *তাসাউফের স্বরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

১৬৬. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

১৬৭. মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, *খাজা আবদুল মজীদ শাহ : জীবন ও কর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

১৬৮. এ. কে. এম. নাজির আহমদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আগমন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

১৬৯. ‘মুজাদ্দিদ’ আরবি শব্দ; এর অর্থ সংস্কারক। ‘আলফে সানি’ অর্থ দ্বিতীয় সহস্রাব্দ। ‘মুজাদ্দিদে আলফে সানি’ অর্থ হিজরি দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক। দ্র. ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০; আকবরি ফেৎনায় জর্জরিত মুসলিম সমাজে, ইসলামি রীতিনীতি ও বিধিবিধানকে বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে সংস্কার সাধন করে প্রকৃত অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে যুগান্তরকারী ও ঐতিহাসিক অবদানের জন্য এবং আধ্যাত্মিক তরিকতসমূহের মধ্যেও সংস্কার সাধনের কারণে তিনি ‘দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ’ নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। তাই তাঁকে ‘ফারুকি’ বলা হয়। দ্র. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ১৯; মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

১৭০. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

১৭১. ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দিক, *বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)* (ঢাকা : হেরাল্ড প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৯৮৮), পৃ. ১৯

পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত সরহিন্দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[১৭২] তাঁর পিতা শায়খ আবদুল আহাদও উঁচু পর্যায়ের আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি কুর'আনুল করিম মুখস্থ করেন এবং মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের থেকে শরি'আত ও তরিকতের জ্ঞানার্জন করেন।[১৭৩]

পিতার নিকট থেকে তিনি চিশতিয়া তরিকার খিলাফত এবং কাদেরিয়া তরিকারও সবক গ্রহণ করেন; তবে তৎকালীন কাদেরিয়া তরিকার বিখ্যাত শায়খ হযরত শাহ্ সিকান্দার (রহ.) (১৩৩৫–১৩৯০ খ্রি.) থেকে এ তরিকার খিলাফত লাভ করেন। আধ্যাত্মিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি সম্রাট আকবর (১৫৪২–১৬০৫ খ্রি.)-এর রাজধানী আগ্রায় চলে আসেন। সেখানে তাঁর জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিছুদিন আকবরাবাদে (আগ্রা) অবস্থান করেন। তারপর তাঁর পিতা তাঁকে সিরহিন্দে নিয়ে যান। পথিমধ্যে আকবরের বিশেষ প্রিয় এক শায়খ সুলতানের কন্যার সাথে শায়খ আহমদ (রহ.)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয়।[১৭৪]

তিনি ১০০৭ হিজরিতে পিতার মৃত্যুর পর হজের সফরে যাওয়ার সময় দিল্লিতে এসে নকশ্বন্দিয়া তরিকার বিখ্যাত সাধক খাজা বাকি বিল্লাহ (রহ.) থেকেও এ তরিকার খিলাফত লাভ করেন। পরবর্তীকালে আস্তে-আস্তে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্রাট আকবরের দীনি ইলাহি ফেতনায় আক্রান্ত ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থায় ফিরে আনতে সক্ষম হন। উচ্চপর্যায়ের আধ্যাত্মিকতার কারণেই আল্লাহ্র অপার করুণায় তিনি এ কঠিন আন্দোলনে সফলকাম হন। এজন্য তাঁকে তাদের অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁকে প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং দালাল 'আলিমগণের চক্রান্তের মুকাবিলাও করতে হয়েছিল।[১৭৫] এ মহান সাধক ১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে সিরহিন্দে ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।[১৭৬]

মুজাদ্দেদিয়া তরিকার তা'লিম

শেখ আহমদ সিরহিন্দি 'ওয়াহদাতুশশুহুদ'[১৭৭] মতবাদ প্রচার করেন। এক্ষেত্রে তিনি সুফিগণকে কুর'আন-হাদিস অনুসরণ করার পরামর্শ দেন। তিনি মনে করেন, ধর্ম ও দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো

---

১৭২. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের ধর্মীয় নীতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি* (ঢাকা : এম. আবদুল্লাহ্ এন্ড সন্স, ২০০৫), পৃ. ১১৩; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ৯০

১৭৩. ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দিক, *বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪; মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের ধর্মীয় নীতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ৯০

১৭৪. ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দিক, *বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১৭৫. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, *ইসলামের ধর্মীয় নীতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯-১২৩; মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯

১৭৬. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

১৭৭. হুলুল ও ওয়াহ্দাতুল ওয়াজুদের মধ্যবর্তী একটি মতবাদ হলো ওয়াহদাতুশ শুহুদ। শায়খ মুজাদ্দিদে আলফে ছানি (রহ.) (১৫৬৩–১৬২৪ খ্রি.)-ই সর্বপ্রথম এ মতবাদ প্রবর্তন করেন। তিনি এ মতবাদ দ্বারা হুলুল ও ওয়াহদাতুল ওয়াজুদের প্রবর্তক মনসুর হাল্লাজ ও ইবনু 'আরবি এবং তাঁদের অনুসারীগণের বিভিন্ন আপত্তিকর বক্তব্যের একটি যৌক্তিক-সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ মতবাদে স্রষ্টা ও সৃষ্টির পার্থক্য এবং সৃষ্টির পৃথক অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয় না; কিন্তু সুফিগণ কঠোর সাধনার মাধ্যমে এমনভাবে আল্লাহ্তে পূর্ণ মনঃসংযোগ করেন, তাতে সৃষ্টিজগৎ তাঁদের কাছে পূর্ণ বিস্মৃত থাকে। এরূপ পূর্ণ মনঃসংযোগের ফলে এমন অবস্থারও সৃষ্টি হয় যে, কখনও তাঁরা নিজের সত্তা ও

তাওহিদ। তাই তিনি তাওহিদ প্রতিষ্ঠাকল্পে 'ওয়াহদাতুশ শুহুদ' মতবাদ প্রচার করেন। নকশ্‌বন্দিয়ার মতো মুজাদ্দেদিয়া তরিকার তা'লিম হলো 'লতায়িফে সিত্তাহ'[১৭৮] 'আনাসিরে আরবা'আ,[১৭৯] ও 'হাযরাতুল খামস'[১৮০] এর মুরাকাবা; তবে তিনি হাযরাতুল খামসকে নতুন নিয়মে লিপিবদ্ধ করেন; যেমন নশ্‌কবন্দিয়া তরিকার মতে, সায়ির ইলাল্লাহকে বেলায়তে সুগরা এবং সায়ির ফিল্লাহকে বেলায়তে কুবরা নামকরণ করেন। তিনি বেলায়তে উলিয়া বা ঊর্ধ্বস্থিত বেলায়তকে পর্যায়ভুক্ত মকাম বলে মন্তব্য করেন।[১৮১] এ তরিকার সমর্থক সুফিগণ যিকরে খফি তথা নিঃশব্দ যিকরের পক্ষপাতী। ঐশী প্রেমমূলক সামা সংগীত এতে নিষিদ্ধ; তবে বাদ্যহীন হামদ-না'তকে সমর্থন করা হয়েছে।[১৮২]

বাংলাদেশে মুজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রসার

বাংলাদেশে মুজাদ্দিদে আলফে সানি (রহ.)-এর অনেক ভক্ত ও মুরিদ রয়েছে। তাঁর ভক্ত ও মুরিদের মাধ্যমে এ তরিকা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়ও এ তরিকার অনুসারী রয়েছে। এ তরিকার বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন শাহ্ আবদুর রহিম শহিদ (রহ.)। তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে ঢাকায় এসে এ তরিকার প্রচার-প্রসার করেন। তিনি ঢাকায় 'মিঞা সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। তাই এখনও ঢাকার সেই এলাকার নাম 'মিঞা সাহেবের ময়দান'। চট্টগ্রামে শাহ্ সুফি আমানতুল্লাহ তাঁর খলিফা ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে এ তরিকা ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে।[১৮৩] চট্টগ্রামে বিশেষ করে গারাংগিয়া দরবার ও ধনিয়ালাপাড়া বায়তুশ শরফে এখনও এ তরিকতের অনুসরণ করা হয়। তাঁদের মাধ্যমে হাজারো মানুষ এ তরিকার ছবক নিয়ে তাঁদের জীবনকে ধন্য করছেন।[১৮৪]

সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা

সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা মূলত কাদেরিয়া তরিকা থেকে উদ্ভূত একটি তরিকা। বাগদাদের নিজামিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ও প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ শেখ জিয়া উদ্দিন আবু নজিব আবদুল কাদির সোহরাওয়ার্দি (রহ.) এ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইরানের জীবাল প্রদেশের সোহরাওয়ার্দ নগরে ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে

আল্লাহ্ সত্তার মধ্যে, কখনো স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগতের মধ্যে পার্থক্যের কথাও বিস্মৃত হয়ে যান। দ্র. ড. আহমদ আলী, *তাসাউফের স্বরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

১৭৮. লাতায়িফে সিত্তাহ হলো, কলব, রুহ, নাফ্‌স, সির, খফি এবং আখফা। এগুলোকে 'আলামে আম্‌র'ও বলা হয়।

১৭৯. আনাসিরে আরবা'আ হলো, আব (পানি), আতশ (আগুন), খাক (মাটি) এবং বাদ (বাতাস)। এগুলোকে 'আলামে খালকও বলা হয়।

১৮০. হাযারাতুর হামস হলো, সা'য়ির ইলাল্লাহ্, সা'য়ির ফিল্লাহ্, সা'য়ির 'আনিল্লাহ্, 'আলাম-ই মিছাল ও 'আলাম-ই শাহাদত।

১৮১. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

১৮২. ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, *বাংলাদেশে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

১৮৩. মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

১৮৪. ড. মো. বদিউর রহমান রচিত *মুসলিম দর্শনের ইতিহাস* গ্রন্থের, প্রথম খণ্ডের ৪৩৫ পৃষ্ঠার ৩৫ ও ৩৬ নাম্বারে উল্লিখিত পীর ভ্রাতৃদ্বয় হযরত শাহ্ সুফি মওলানা আবদুল মজিদ চাটগামী (রহ.) ও হযরত মওলানা আবদুর রশীদ সিদ্দিকী (রহ.) সাতকানিয়ায় গারাংগিয়ায় মোজাদ্দেদিয়া তরিকানুসারে শিষ্যদের দীক্ষা প্রদান করেছেন। এ ছাড়া মোহাম্মদ আমান উল্লাহ খান রচিত *'কুতুব আলম হযরত শাহ্‌সুফী মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.)-এর মহিমাময় জীবন'* নামক গ্রন্থে ৬০০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার শাজারানামায় ৪২, ৪২, ও ৪৩ নাম্বারে বর্ণিত পীরত্রয় হযরত মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.), হযরত আবদুল জব্বার (রহ.) ও হযরত মওলানা কুতুবুদ্দীন (রহ.) এই তরিকার প্রচার ও প্রসারে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন এবং কেউ কেউ এখনও অবদান রাখছেন।

জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তারপরে তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র ইমাম শিহাব উদ্দিন ওমর বিন আবদুল্লাহ্ সোহরাওয়ার্দি (১১৪৪–১২৩৪ খ্রি.) এ তরিকার বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। এ কারণে তাঁকে এ তরিকার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়।[১৮৫] তিনি শাফেয়ি মাযহাবের একজন পণ্ডিত ছিলেন এবং বিশ্ববিখ্যাত মরমি কবি শেখ সা'দি (রহ.) (মৃ. ১২৯৬ খ্রি.) এর উস্তাদ ছিলেন।[১৮৬] অনেক দূরদূরান্ত থেকে শ্রোতারা তাঁর আলোচনা শোনার জন্য তাঁর খানকাতে আগমন করতেন। মুসলিম শাসকগণ তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ১২৩১ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র হজ পালন করতে গিয়ে কবি ওমর বিন আল-ফরিদ (রহ.)-এর সংস্পর্শে আসেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে *'আওয়ারিফুল মা'আরিফ'*-নামক গ্রন্থটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

সোহরাওয়ার্দী তরিকার তা'লিম ও প্রসার

এ তরিকার তা'লিম অনেকটা কাদেরিয়া তরিকার মতো; তবে সাতটি 'লতিফার জন্য কালিমা ও আল্লাহ্‌র নামে সংযুক্ত পদ্ধতি এ তরিকার বৈশিষ্ট্য।[১৮৭] আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারতে এ তরিকার অনুসারী রয়েছে।[১৮৮] শেখ বাহাউদ্দিন মুলতানি (মৃ. ১২৬৬ খ্রি.) এ তরিকা ভারতে প্রচার করেন। তিনি ইমাম শেখ বাহাউদ্দিন সোহরাওয়ার্দির প্রধান খলিফা ছিলেন। ইমাম সোহরাওয়ার্দির ৭০ জন শিষ্যের সমাধি দেবগাঁও-এ বিদ্যমান।[১৮৯] উনবিংশ শতাব্দীতে আফ্রিকার সেনোসিয়া তরিকা সোহরাওয়ার্দিয়া তরিকা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে করা হয়।[১৯০]

মুহাম্মদিয়া তরিকা

এ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন শহিদ সৈয়দ আহমদ বেরলভি (রহ.)। তিনি ভারতের অযোধ্যার অন্তর্গত রায়বেরেলি জেলায় ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১৯১] তাঁর পিতার নাম সায়্যিদ মুহাম্মদ ইরফান। বেরেলিতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে লক্ষ্ণৌতে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর দিল্লি গমন করেন। সেখানে তৎকালীন বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস মুজাহিদ ও আধ্যাত্মিক সাধক শাহ্ আবদুল আযিয মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) (১৭৪৬–১৮২৩ খ্রি.)-এর সান্নিধ্যে এসে আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও খেলাফত লাভ করেন।[১৯২] পাক ভারত উপমহাদেশের হাজারো লোক তাঁর হাতে আধ্যাত্মিক শিক্ষার বায়'আত নেন এবং ইংরেজ-বিরোধী জিহাদে তাঁর মুজাহিদ বাহিনীতে শরিক হন। অনেক অমুসলিমও তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৯৩]

১৮৫.ড. মফিউল্লাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

১৮৬. ড. আবদুল করিম, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪), পৃ. ১৮৯; মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

১৮৭.ড. মফিউল্লাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৯০

১৮৮.কে. আলী, *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০

১৮৯.মাওলানা আবদুর রাহীম হাযারী, *সূফীতত্ত্বের আত্মকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

১৯০.ড. মফিউল্লাহ কবির, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পূর্বোক্ত, পৃ.২৯০

১৯১. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৮৯; ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, আবদুল মওদুদ অনূদিত, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

১৯২. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৮৯

১৯৩. ড. আবদুল করিম, *বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫০

সাইয়্যেদ আহমদ শহিদ (রহ.) (১৭৮৬–১৮৩১ খ্রি.) ছিলেন একদিকে একজন আধ্যাত্মিক সাধক এবং অন্যদিকে একজন তেজস্বী সৈনিক ও ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের বিশ্বখ্যাত সেনাপতি। শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে তিনি ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে ঐতিহাসিক বালাকোটের ময়দানে শাহাদত বরণ করেন।[১৯৪] হযরত সৈয়দ আহমদ (রহ.) ছিলেন ফানাফির রসুলের অন্যতম উদাহরণ। তাই তিনি তাঁর তরিকার নাম দেন 'তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া'। এ তরিকার মূল উদ্দেশ্য হল চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নকশ্‌বন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া এ চার তরিকার আমলের সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা; মানুষকে সঠিক ইসলামি আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দেয়া।

বাংলাদেশে এ তরিকা

সৈয়দ আহমদ (রহ.)-এর মুজাহিদ বাহিনীতে বাংলাদেশের অনেক মুজাহিদও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নোয়াখালীর মওলানা ইমাম উদ্দিন বাঙালি (রহ.) (মৃ. ১৮৫৭ খ্রি.), চট্টগ্রামের সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরি (রহ.) (১৭৯০–১৮৫৮ খ্রি.) এবং মওলানা কেরামত আলি জৌনপুরি (রহ.) (১৮০০–১৮৭৩ খ্রি.) অন্যতম। সৈয়দ আহমদ (রহ.) শাহাদত বরণ করার পর তাঁরা এদেশে ফিরে আসেন এবং তাঁর তরিকা ও আদর্শের প্রচার-প্রসার করেন; তবে কেরামত আলী জৌনপুরি (রহ.)-এর তরিকা বাংলাদেশে জৌনপুরি সিলসিলা নামে পরিচিতি লাভ করে। বাংলাদেশের বহুলপরিচিত ফুরফুরা সিলসিলা এ তরিকার সাথে সংশ্লিষ্ট; কেননা ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকি (রহ.) (১৮৪৬–১৯৩৯ খ্রি.) এর পীর সুফি ফতেহ আলী (রহ.) (১৮১৫–১৮৮৬ খ্রি.)ও ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী সুফি নূর মোহাম্মদ নিজামপুরি (রহ.) (১৭৯০–১৮৫৮ খ্রি.) এর বিশিষ্ট খলিফা। আর তিনি ছিলেন সৈয়দ আহমদ (রহ.)-এর খলিফা। তাই ছারছিনা ও ফুরফুরার পীর সাহেবগণ মুরিদেরকে বায়'আত করানোর সময় চার তরিকার সাথে 'আওর মুহাম্মদিয়া' বলে উল্লেখ করে এ তরিকারও বায়'আত করিয়ে থাকেন।[১৯৫]

এমদাদিয়া তরিকা

হাজি এমদাদ উল্লাহ মুহাজির মক্কি (রহ.) (১৮১৭–১৮৯৯ খ্রি.) এ তরিকার মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি চিশতিয়া সাবেরিয়া কুদ্দুসিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন; তবে পাক-ভারত উপমহাদেশে হাকিমুল উম্মাত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এই তরিকার প্রসারে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।[১৯৬]

---

১৯৪. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা* (ঢাকা : প্রফেসর'স বুক হাউস, ১৯৭০), পৃ. ২২; আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.১, পৃ. ৮৯

১৯৫. ড. মো. আবু ছালেহ পাটোয়ারী, *হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (র.) ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪-৭৫

১৯৬. হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবি (রহ.) ১৯ মার্চ, ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে তিনি কুর'আন মাজিদ হিফ্য করে ফারসি এবং আরবি ভাষা থানাভবনে মওলানা ফত্‌হ্ মুহাম্মদের নিকট অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে 'দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা'য় ভর্তি হয়ে দওরায়ে হাদিস পাস করেন। হাদিস, তাফসির, ফিক্‌হ, তাসাওউফ, তাজবিদ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি চার শতকেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি হযরত রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি থেকে সুলুকের তালকিন এবং হযরত হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি থেকে খেলাফত লাভ করেন। উপমহাদেশ ও বহির্বিশ্বের শত শত লোক তাঁর নিকট বায়'আত হয়ে যাহিরি ও বাতিনি ফয়েয লাভ করেন। তিনি 'হাকিমুল উম্মত' ও

তিনি ভারতের যুক্ত প্রদেশের মুজাফ্‌ফর নগর জেলার থানাভবন শহরে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১৯৭] ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি পিতার সাথে মক্কায় গমন করে স্বীয় পিতার পীরভাই হাজি এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি (রহ.)-এর নিকট বায়'আত হন। তিনি দেশে ফিরে এসে 'খানকায়ে এমদাদিয়া' প্রতিষ্ঠা করেন।[১৯৮]

বাংলাদেশে এমদাদিয়া তরিকা

বাংলাদেশে মওলানা থানভির অসংখ্য ভক্ত ও মুরিদ রয়েছেন; বিশেষ করে কিশোরগঞ্জের মওলানা আতাহার আলী (রহ.) (১৮৯১–১৯৭৬ খ্রি.), ফরিপুরের মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) (১৮৮৪–১৯৬৯ খ্রি.), ফেনীর মওলানা মোহাম্মদ উল্ল্যাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.) (১৮৯৬–১৯৮৬ খ্রি.), শায়খ ইসহাক, চট্টগ্রামের হাবিবুল্লাহ (রহ.) (মৃ. ১৯৪৩ খ্রি.), মওলানা জাফর আহমদ 'উসমানী ও মওলানা মাজহারুল হক প্রমুখ তাঁর খলিফাগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[১৯৯] উপরিউক্ত তরিকাসমূহ ছাড়া বাংলাদেশে আরো কিছু তরিকা রয়েছে; তবে সেগুলো তেমন প্রসিদ্ধ নয়।

বাংলাদেশে প্রচলিত কয়েকটি তরিকা

বাংলাদেশে তরিকতপন্থিদের মধ্যে কাদেরিয়া, চিশতিয়্যাহ, ছাবেরিয়া, নকশেবন্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়্যাহ প্রভৃতি তরিকার অনুশীলন হয় বেশি এবং বিভিন্ন এলাকায় এগুলোর প্রায় শতাধিক শাখা-প্রশাখা চালু রয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো : ওয়াইসিয়্যাহ, মাসুমিয়্যাহ, সুরেশ্বরী, জৌনপুরী, মাইজভান্ডরী, আমীরভান্ডারী, আটরশী, এনায়েতপুরী, চন্দ্রপুরী, দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, কুতুববাগী, মীর্জারখীল, নাগাইশী, মুনিরিয়্যাহ, ছিরিকোটিয়্যাহ, ছারছীনা, ফুরফুরা, চরমোনাই, ফুলতলী, আজমগড়ী ও বায়তুশ শরফ প্রভৃতি।[২০০]

বাংলাদেশে বহু তরিকার প্রচলন থাকলেও শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কাদেরিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরিকা অনুসরণ করতেন এবং ভক্ত-মুরিদদেরও তা শিক্ষা দিতেন। এ তা'লিমের জন্য তিনি প্রতিবছর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করতেন। বর্তমানেও এই কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মুজাদ্দিদে মিল্লাত' উপাধিতে ভূষিত হন। দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করার পর ২০ জুলাই, ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. আবদুল কায়ূম, *তারীখে আদবিয়ানে মুসলমানে পাকিস্তান ও হিন্দ* (পাঞ্জাব : পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, ১৯৭২), পৃ. ৪০৯-১৯

১৯৭. খাজা আযীযুল হাসান মজযূব, *আশরাফ চরিত* (ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০), পৃ. ১৫

১৯৮. দেওয়ান নুরুল ইসলাম, *আমাদের সুফীয়ায়ে কেরাম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

১৯৯. মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন, *খাঁজা আবদুল মহীদ শাহ্ : জীকন ও কর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

২০০. ড. আহমদ আলী, *তাসাউফের স্বরূপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুফিবাদ বিকাশে শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন মুহাক্কিক একজন আলিম ও মুহাদ্দিস। তিনি সমাজসেবক এবং সমাজসংস্কারকও ছিলেন। তাঁর ছিল অনেক বড়ো বড়ো পরিচয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হলো তিনি উচ্চমাপের একজন আধ্যাত্মিক সাধক। তাঁর বেলায়ত সম্পর্কে গারাংগিয়া দরবারের ছোটো হুজুর মওলানা আবদুর রশীদ (রহ.) বলেন, লোকেরা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে চিনতে সক্ষম হয়নি। তাঁর রুহানি শক্তি প্রয়োগ করলে ইসলামদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতেন; কিন্তু এটি পার্থিব জগৎ। তাই তাঁকে এমন অস্বাভাবিক কিছু করতে নিষেধ করা হয়েছে। জাগতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাঁকে এখানকার প্রচলিত পথই অবলম্বনের আদেশ করা হয়েছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক ও রুহানি শক্তি লক্ষ করে স্বীয় মুর্শিদ তাকে 'হাদিয়ে যামান' অর্থাৎ যুগের সৎপথ প্রদর্শক এবং 'কুতুবল আকতাব' অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির সংরক্ষকদের প্রধান' উপাধিতে ভূষিত করেন।[২০১]

রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দৌহিত্র ইমাম হাসান (রা.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الْأَحْزَانِ، دَائِمَ الْفِكْرَةِ অর্থাৎ 'রাসুলুল্লাহ্ সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার দীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য সর্বদা উদ্গ্রীব ও চিন্তামগ্ন থাকতেন।'[২০২] মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর মধ্যেও এই গুণটি ছিল। তাঁর চিন্তা-চেতনায় সব সময়ই প্রবহমান ছিল দীনহারা ও আল্লাহ্ভোলা মানুষদের কথা। তিনি অহর্নিশ চিন্তা করতেন কীভাবে মানুষকে আল্লাহ্মুখী করা যায়। মানবকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটানোর চিন্তা ও পরিকল্পনায় তিনি অহোরাত্রি ব্যয় করতেন।

বায়তুশ শরফের বিভিন্ন মাহফিলে তবররুক[২০৩] বিতরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তিনি বলেন, 'জীবনে যে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' যিকির করেনি, সে যদি তবররুকের অসিলায় এসে যিকির ও ওয়ায-নসিহতে শরিক হয়, সেটা অনেক বড়ো সফলতা। বান্দাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এনে তাঁর সাথে সম্পর্ক করিয়ে দেয়াই আমার উদ্দেশ্য।'[২০৪] পরিবার-পরিজনের প্রতি না-ঝুঁকে তিনি আজীবন নিজের আরাম-আয়েশ কুর'বান করে স্বীয় পীর-মুর্শিদের দেয়া দায়িত্ব পালনে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বান্দাদের খেদমতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তাসাওউফ চর্চায় তাঁর গৃহীত বহুমাত্রিক কর্মসূচির নাতিদীর্ঘ বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

---

২০১. ড. মুঈনুদ্দীন আহমদ খান, 'মাওলানা শাহ সূফি শেখ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার স্মরণে', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া* (স্মরণ সংখ্যা ১), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

২০২. ইমাম বায়হাকি, *দালায়িলুন নবুয়্যতি*, বাবু জামি' সিফাতি রসুলিল্লাহ (সা.), হাদিস নং ২৩৬; আল্লামা বাগাভী, *শরহুস সুন্নাহ*, খ.১৩, পৃ. ২৭১

২০৩. তবররুক হলো পুণ্যবান ব্যক্তির স্পর্শ-পূত খাদ্যাদি। দ্র. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১), পৃ. ৫৪০

২০৪. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ লোকান্তরিত', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া* (স্মরণ সংখ্যা ১), ১৯শ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, মে ১৯৯৮, পৃ. ৫৩; *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

১. দীনি তা'লিম ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন

আত্মার পরিশুদ্ধিই ইসলামি শিক্ষার মূলমন্ত্র। আত্মার উন্নতীকরণ ও শরি'আতের বিধানাবলির প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য যে জ্ঞানচর্চা করা হয় তা-ই আধ্যাত্মিক শিক্ষা। এটি ইসলামি শিক্ষার মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন একজন উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক সাধক। সমাজে আধ্যাত্মিকতার নামে প্রচলিত ভণ্ডামি উৎখাত করে তাসাওউফের সঠিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। তাই তিনি শরি'আতের যাহেরি 'ইলম প্রচার-প্রসারের জন্য মাদ্‌রাসা-মসজিদ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রসারের জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাসাওউফের চর্চা ও প্রসারের জন্য ১৮৮টি দীনি তা'লিমকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।[২০৫] বছরান্তে 'কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফে' 'কাদেরিয়া তরিকার তা'লিমি সপ্তাহ' নামে সপ্তাহব্যাপী মাহফিল ও প্রশিক্ষণের প্রবর্তন করে দেশবরেণ্য আলেমগণকে হাতে কলমে ইল্‌মে তাসাওউফ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

২. দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ছিলেন রাসুলের আদর্শে আদর্শবান মহান একজন সালিক তথা আধ্যাত্মিক পুরোধা। তিনি রাসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপরে অর্পিত দায়িত্বকে গভীর অভিনিবেশের সাথে পাঠ করেছেন। তা থেকে তিনি উপলব্ধি করেন যে, কালিমাযুক্ত পাপ পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত মনকে যতদিন পর্যন্ত যিকির-মুরাকাবা-মুশাহাদা দ্বারা পরিষ্কার করা যাবে না ততদিন এ জাতির ভাগ্যোন্নয়ন হবে না। তিনি মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করার প্রায় সময় উক্ত কথা বলতেন। কেননা এ মাদ্‌রাসাগুলোই আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্র। যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দা'ঈ এবং আদর্শবান নাগরিক তৈরিতে এর বিকল্প নেই। তাই তিনি শহর থেকে শুরু করে গ্রামের প্রত্যন্তাঞ্চলে এবং বিপৎশঙ্কুল পাহাড়-পর্বতেও দীনি তা'লিম কেন্দ্রের পাশাপাশি শতাধিক মাদ্‌রাসা-মক্তব, একাডেমি গড়ে তুলে ইসলামি শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার বাস্তব রূপ প্রদান করেন।

৩. শিক্ষকতা

তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের পাশাপাশি শিক্ষকতার মাধ্যমেও দীনি শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার প্রসার ঘটিয়েছেন। শিক্ষকতাকেই তিনি সেবা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি 'পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া কামিল মাদ্‌রাসা' এবং নিজ প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্‌রাসা'য় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত মানুষ গড়ার কারিগরের ভূমিকা পালন করেন। অসংখ্য ছাত্র তাঁর কাছ থেকে ইল্‌মে যাহের ও ইল্‌মে বাতেন শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দীনি শিক্ষাবিস্তার, আধ্যাত্মিকতা চর্চা এবং সমাজ সংস্কারে অসামান্য অবদান রাখেন। এঁদের মধ্যে আছেন : চট্টগ্রাম 'ছিপাতলী জামেয়া মুঈনীয়া কামিল মাদ্‌রাসা'র প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল মওলানা আজিজুল হক আল-কাদেরী (১৯৪০–২০১৯ খ্রি.), 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্‌রাসা'র সাবেক উপাধ্যক্ষ মওলা ছগীর আহমদ উসমানী, শায়খুল হাদিস শেরে মিল্লাত মুফতি ওবায়দুল হক নঈমী (১৯৪৩–২০২০ খ্রি.), 'ওয়াজেদীয়া কামিল মাদ্‌রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ মুফতি ইনামুল হক, সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা জিয়াউল হক খান (১৯৪৩–১৯৯২ খ্রি.) এবং সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা আবদুস সত্তার আনওয়ারী (১৯৫১–২০১৪ খ্রি.)।

২০৫. ড. সিরাজুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২৬, পৃ. ২৮৬

এছাড়াও 'রাঙ্গুনীয়া আলমশাহপাড়া কামিল মাদ্‌রাসা'র সাবেক অধ্যক্ষ মওলানা আ. ন. ম. শামসুল আলম চৌধুরী (জন্ম ১৯৫১ খ্রি.), ঢাকার সদরঘাট ও পটুয়াখালীর 'বদরপুর দরবার শরিফে'র পীর আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ আবদুর রব চিশতী (মৃ. ২০১২ খ্রি.), 'রাঙ্গুনীয়া দরবার-এ বেতাগী আস্তানা শরীফে'র সাজ্জাদাশিন পীর মওলানা মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান আলী শাহ্ (১৯৩৩–২০০৯ খ্রি.), 'সাতকানিয়া মির্জাখীল দরবার শরীফে'র গদ্দিনাশিন মওলানা মুহাম্মদ আরেফ বিল্লাহ্ এবং 'বোয়ালখালী চরণদ্বীপ দরবার শরীফে'র পীর মওলানা জাফর আহমদ চরণদ্বীপী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২০৬]

৪. ওয়ায-নসিহত

জনসাধারণের মাঝে ইসলামি শিক্ষা, আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতার প্রচার ও প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ওয়ায-নসিহত। হিদায়তের পথে আহ্বান করার জন্য নসিহত আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত একটি মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ 'আপনি উপদেশ দিন, নিশ্চয় উপদেশ মু'মিনদের উপকারে পৌঁছবে।'[২০৭] তিনি আরও বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ অর্থাৎ 'আপনি আপনার প্রভুর পথে আহ্বান করুন হিকমত ও সুন্দর নসিহতের মাধ্যমে।'[২০৮]

সুতরাং, মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে আহ্বান করা এবং জনসাধারণের মাঝে ইসলামি শিক্ষা, আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতার প্রচার করার জন্য ওয়ায-নসিহত আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত একটি কার্যকর পদ্ধতি। এ সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে ওয়ায মাহফিল তথা ধর্মীয় সভা ইসলাম প্রচারের একটি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। পূর্বঘোষিত নির্ধারিত স্থান ও সময়ে এরূপ মাহফিলে দা'ঈ ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা তুলে ধরার সুযোগ লাভ করেন এবং সমবেত শ্রোতামণ্ডলীও এর মাধ্যমে সঠিক হিদায়াত লাভে সমর্থ হন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের এ পদ্ধতি ব্যাপক ফলপ্রসূ হিসেবে গণ্য এবং আজ পর্যন্ত এ ধারাটি বহুলপ্রচলিত।'[২০৯]

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) প্রসিদ্ধ একজন ওয়ায়েয ও বাগ্মি ছিলেন। তাসাওউফের প্রচার ও প্রসারের জন্য তিনি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়ায নসিহত করেন। মাহফিলের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করেন। তিনি সভা-সমাবেশ ও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-এ অংশগ্রহণ করে জাতি-গঠনমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তাছাড়া মক্কাশরিফ, মদিনা শরিফ, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, বুলগেরিয়া, ইরাক, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান এবং ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফরকালে গুরুত্বপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী ওয়ায-নসিহত করে ইলমে তাসাওউফের প্রসার ঘটিয়েছেন। কুর'আন-হাদিসের দলিল, বোধগম্য উপমা ও উদাহরণ দিয়ে মানুষের কাছে তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ইসলামের

---

২০৬. আ. ম. ম. শামসুল আলম চৌধুরী, সাবেক অধ্যক্ষ, রাঙ্গুনীয়া আলমশাহপাড়া কামিল মাদ্‌রামা, চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত তথ্য।

২০৭. আল-কুর'আন, ৫১ : ৫৫

২০৮. আল-কুর'আন, ১৬ : ১২৫

২০৯. ড. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, *ইসলামী দাওয়াহ বিস্তারে ও ধর্মীয় সামাজিক সংস্কারে আবদুল আউয়াল জৌনপুরী (১৮৬৭–১৯২০)-এর অবদান* (কুষ্টিয়া : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. থিসিস, ১৯৯৮), পৃ. ১৬৬

বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরতেন। তাঁর ওয়ায শুনে বহু পথহারা মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে এবং অসংখ্য হিন্দু, খ্রিষ্টান, চাকমা,[২১০] টিপরা[২১১] এবং আফ্রিকান নিগ্রো ইসলাম কবুল করেন।[২১২]

৫. আধ্যাত্মিকতা চর্চা

তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনার পুরোধা। মানুষের আত্মায় শুদ্ধতা ও সৌন্দর্যের চাষবাসই ছিল তাঁর মূল সাধনা। মহানবি (সা.) এর মিশন وَيُزَكِّيهِمْ অর্থাৎ 'আত্মার পরিশুদ্ধীকরণ'ই ছিল তাঁর মহান ব্রত। ফলে বায়'আত, তরিকার অযিফা পাঠ, সালাতুত্ তাহাজ্জুদ, কিয়ামুল লাইল,[২১৩] ইহ্য়াউল লাইল[২১৪] এবং যিকির ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি মুরিদদের আত্মাকে শুদ্ধতাদানে সচেষ্ট ছিলেন। লক্ষ-লক্ষ মানুষ তাঁর অসিলায় কাদেরিয়া তরিকার মাধ্যমে হেদায়ত প্রাপ্ত হন।

৬. ইসলামি সাহিত্য রচনা

সাহিত্য মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্য সাধনা ইসলামি শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামের প্রচার কেবল ওয়ায-নসিহতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কোনো জটিল ও কঠিন বিষয়ের ইসলামভিত্তিক সুষ্ঠু সমাধান ওয়ায-নসিহতের মাধ্যমে দেয়া গেলেও এর স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী সমাধানের জন্য এসব বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করা একান্ত আবশ্যক। তাই মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে উন্মুক্ত ওয়ায-নসিহত ও ভক্ত মুরিদদের মাঝে দীনি তা'লিম প্রদানের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনায়ও উদ্যোগী হন।

---

২১০. চাকমা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত চাকমাদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়। নিজেদের মধ্যে তারা 'চাঙমা' নামে পরিচিত। তারা পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের প্রধান। সমাজের প্রধান হলেন রাজা আর গ্রামের প্রধান কারবারি। চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। দ্র. অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, এ. কে. শেরাম, 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', *সপ্তবর্ণা* (বাংলাদেশ : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৯), ৭ম শ্রেণি, পৃ. ৪৯

২১১. টিপরা পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রামগড়, রাঙ্গামাটি, কাপ্তাই এবং চট্টগ্রাম জেলা, বৃহত্তর কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় মহাজাতির অংশ। তাদের ভাষার নাম 'ককবরক'। ত্রিপুরা সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। ছেলেরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। ত্রিপুরারা বর্তমানে সাধারণভাবে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী; কিন্তু তারা এখনও তাদের প্রাচীন লোকজ ধর্মের নানা দেব-দেবীর পূজা অর্চনা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি করে। দ্র. অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪

২১২. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, 'একনজরে হাদিয়ে যামান শাহসূফী আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ছাহেব (রহ.)-এর জীবনপঞ্জী', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪

২১৩. কিয়ামুল লায়ল অর্থ রাতের সালাত। একে 'সালাতুল লাইল'ও বলা হয়। দ্র. মাহমুদ আবদুল লতিফ 'আবিদাহ, *আল-জামি' লি আহকামিস সালাত*(ওমান : দারুল ওয়াদাহ, ২০০৪), খ.৩, পৃ. ৭২; পরিভাষায় সাধারণত 'কিয়ামুল লায়ল' বলতে বোঝানো হয় সালাতুল 'ইশার পর থেকে রাতের অধিকাংশ সময় (মতান্তরে ঘণ্টাখানিক সময়) সালাতের মধ্যে অতিবাহিত করা। অনেকেই 'কিয়ামুল লাইল' ও 'ইহ্য়াউল লাইল' দুটি সমার্থক পরিভাষা হিসেবেও ব্যবহার করে থাকেন। দ্র. হাসান ইব্ন 'আম্মার ইবন্ আলী শুরুনবুলারী, *মারাকিউল ফালাহ ফি শরহে নুরুল ইযা* (বৈরুত : আল-মাকাতাবাতুল 'আসরিয়্যাহ, ২০০৫), পৃ. ১৭৪

২১৪. ইহয়াউল লাইল অর্থ রাত্রি জাগরণ; পরিভাষায় 'ইহয়াউল লাইল' বলতে বোঝানো হয় সালাতুল 'ইশার পর থেকে ফজর পর্যন্ত পুরো রাত কিংবা রাতের অধিকাংশ সময় সালাত, যিকর, কুর'আন তিলাওয়াত ও 'ইলম চর্চা প্রভৃতি 'ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করা। দ্র. ড. আহমদ আলী, *সালাতুত তারাবীহ* (ঢাকা : মাকতাবাতুস সালাম, ২০২১), পৃ. ১৬

ইলমে তাসাওউফের প্রশিক্ষণের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি শরি'আত, তরিকত, মা'রিফত ও হাকিকত ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ, সম্পাদনা ও সংকলন করেন। তন্মধ্যে *'ইল্‌মে তাছাউফের হাকীকত, আল-ইহ্‌সান তথা তরীকত তত্ত্ব, সূফীবাদ ও সূফীতত্ত্ব, কুরআন ও হাদীসের আলোকে জিকরুল্লাহর গুরুত্ব, শরীয়ত ও তরীকতের আদাব* এবং *কিতাব ও সুন্নাহের আলোকে তরীকতের মূলনীতি'* ইত্যাদি তাসাওউফ ও তরিকত সম্পর্কিত গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো অধ্যয়ন করার মাধ্যমে অগণিত সাধারণ শিক্ষিত মানুষ সরল-সঠিক পথের সন্ধান পাচ্ছে। এছাড়া '*মাসিক দ্বীন দুনিয়া*' ও '*মাসিক শিশু কিশোর দ্বীন দুনিয়া*' নামে আরও দুটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। উল্লেখ্য যে, প্রকৃত ইল্‌মে তাসাওউফ গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন বায়তুশ শরফ ইসলামি গবেষণা কেন্দ্র, বায়তুশ শরফ লাইব্রেরি। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে শতাধিক ধর্মীয় পুস্তক।[২১৫]

৭. বিভিন্ন মাহফিল জারি

শিক্ষকের সান্নিধ্য ব্যতীত শিক্ষার উন্নতি সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে সত্যনিষ্ঠ পীর-মুর্শিদের সান্নিধ্য ব্যতীত আত্মার উন্নতি ও পরিশুদ্ধি লাভ করা যায় না। কিন্তু কর্মব্যবস্ততার কারণে সব মানুষ আপন পীর-মুর্শিদের সান্নিধ্যে আসতে সক্ষম হয় না। তাই মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মানুষের সুবিধার্থে প্রতিবছর জানুয়ারি মাসে লোহাগাড়া আখতরাবাদ (কুমিরাঘোনা) 'বার্ষিক ইছালে সাওয়াব মাহফিলে'র আয়োজন করেন। এ মাহফিলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত লক্ষ লক্ষ ভক্ত-অনুরক্তদের যিকির-আযকার এবং তা'লিম-তরবিয়্যাত প্রদান করা হয়।

তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় মাহফিল তথা বড়োপীর হযরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ.) (১০৭৮–১১৬৬ খ্রি.)-এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কক্সবাজারে ফাতেহা-এ-ইয়াজদাহুম, খুলনার বাগেরহাটে ঐতিহাসিক ষাটগম্বুজ মসজিদ প্রাঙ্গণে এবং হযরত খান জাহান আলী (রহ.) (১৩৬৯–১৪৫৯ খ্রি.) এর মাজারে চৈত্রপূর্ণিমার পূর্বাপর ৩ দিনব্যাপী অনুরূপ মাহফিল, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) উপলক্ষ্যে 'চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফে' আয়োজিত চারদিনব্যাপী তামাদ্দুনিক প্রতিযোগিতা, পবিত্র লায়লাতুল বরা'আত (শবে বরাত), পবিত্র লায়লাতুল কদর (শবে কদর), মিরাজুন্নবি (সা.) মাহফিল, মুহার্‌রম বা আশুরা দিবস পালন, খাজা গরিবে নওয়াজ (রহ.)-এর ওফাত দিবস পালন এবং পবিত্র মাহে রমযানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এসব দীনি তা'লিমি কেন্দ্র ও মাহফিল অদ্যাবধি চালু আছে এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রসার ও সমাজে ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠায় সুদূরপ্রসারী অবদান রাখছে।[২১৬]

৮. তাবলিগে দীন

তিনি মানুষের ধারে-ধারে গিয়ে দীনের দা'ওয়াত দিয়েছেন। তীব্র শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা উপেক্ষা করে মাহফিলে মাহফিলে রাতের পর রাত কাটানোর ফলে, অনিদ্রা, অনিয়মিত খাদ্য গ্রহণ ও বিশ্রামের অভাবে তিনি বহু মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সীমাহীন কষ্টসহিষ্ণু মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) এসব হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলেন বলেই জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাবলিগে দীনের কাজ

---

২১৫. কে. এম. মাহফুজুল করিম, *পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (র.)-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

২১৬. মওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৭-৪২১

করে গেছেন অত্যন্ত ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে। তাঁর এই দীনি তাবলিগ শুধু স্বদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং 'বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ'-এর মসজিদ ভিত্তিক মানবকল্যাণমূলক সংগঠনের শাখা-প্রশাখা এবং কার্যক্রম মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কাদেরিয়া তরিকার আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও দীনি তাবলিগের জন্য তিনি সশরীরে সে সব দেশে সফর করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মাঝে প্রচার করেছেন ইসলামের অমীয় বাণী।

৯. সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম

মুসলিমগণ যতদিন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-গবেষণায় নিমগ্ন ছিল ততদিন তারা সারা বিশ্বে বিজয়ের পতাকা উড্ডীন করেছিলেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়োই পরিতাপের বিষয় হলো, এখন মুসলিমগণের সে ঐতিহ্য, মান-মর্যাদা, সে অবস্থা ও অবস্থান আর নেই; বরং তা শুধু ইতিহাসের পাতায় ধূলিধূসরিত হয়ে আছে। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) উপলব্ধি করেছিলেন মুসলিমগণের সে হারানো ঐতিহ্য ও মান-মর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা। তাই তিনি 'বায়তুশ শরফে' ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বায়তুল হিক্‌মাহ্‌' এর আদলে 'বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান' নামে একটি সমৃদ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠান।[২১৭]

এ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ের ওপর সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেন। সেমিনারে সুফি ব্যক্তিত্ব, 'ইল্‌মে তাসাওউফ ও সুফিবাদের বিভিন্ন দিক নিয়েও প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হতো। যেমন : *Sufi Approach to Islam and its Effects on the Medieval Muslim Bengal Society, হযরত হাসান বসরী (রা.) এর পরিচিতি এবং তাঁর দৃষ্টিতে মন্দের ধারণা*, *বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে সূফীদের ভূমিকা*, *শাহ্‌ সূফী নিজামপুরী (রহ.) ও তাঁর কর্মজীবন*, *মনসুর হাল্লাজের সর্বাত্মক প্রেম ও ব্যক্তিমানস*, *মওলানা জালাল উদ্দিন রুমির প্রেম ও ভক্তির রূপরেখা ও আধুনিকতার উত্তরকালে সূফীবাদ অনুশীলন : একটি সমীক্ষা* এবং *মুজাদ্দিদে-ই-আলফে সানীর আধ্যাত্মিকতা* ইত্যাদি।[২১৮] এসব সেমিনারে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও ইসলামি চিন্তাবিদগণ উপস্থিত থাকতেন এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করতেন।

১০. খানকা তথা আধ্যাত্মিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

'খানকা' একটি ফারসি শব্দ। 'খান' অর্থ ফকির-দরবেশ, 'কাহ' অর্থ স্থান। সুতরাং, খানকা সুফি-দরবেশদের জন্য নির্দিষ্ট গৃহ বা আস্তানা।[২১৯] প্রাচীনকাল থেকে মুসলিম সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে সুফিদের খানকাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এটা হাসপাতাল বা আশ্রয়স্থানরূপেও কাজ করত; যেখানে বৃদ্ধ, জরাগ্রস্ত এবং অসুস্থ ব্যক্তিরা আশ্রয় লাভ করত। তারা উপযুক্ত চিকিৎসা, ভালো সেবা-শুশ্রূষা ও আন্তরিক যত্ন-পরিচর্যা লাভ করত। অধিকন্তু এ খানকাগুলো ছিল মানবতার ভিত্তি। আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান ছাড়াও খানকাগুলো শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করত।

---

২১৭. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী ও জাকিয়া সুফিয়ান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩

২১৮. মুহাম্মদ শাহজাহান, *শাহ আবদুল জব্বার রাহ. এর জীবন ও অবদান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯-৭৮

২১৯. আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২৬, পৃ. ৪৯৯-৫০১; খান বাহাদুর আবদুল হাকিম সম্পাদিত, *বাংলা বিশ্বকোষ*, পূর্বোক্ত, খ.২, পৃ. ২৫০

বর্তমানেও বাংলাদেশে কিছু-কিছু পীরের দরবারে খানকা আছে। সেখান থেকে তারা তাদের তরিকতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে থাকেন; তন্মধ্যে 'বায়তুশ শরফ দরবার' অন্যতম।

এ দরবারের প্রতিষ্ঠাতা শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.)। তিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে চট্টগ্রামের কদমতলীতে অবস্থিত 'রৌশন মসজিদ'কে কেন্দ্র করে 'খানকায়ে বায়তুশ শরফ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেখান থেকে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ধনিয়ালাপাড়ায় (যেখানে বর্তমান 'কেন্দ্রীয় বায়তুশ শরফ' অবস্থিত) স্থানান্তর করা হয়। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বাংলাদেশের বহু জেলায় খানকা তথা আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ খানকাগুলোর মাধ্যমে বহু লোক সিরাতুল মুস্তাকিমের খোঁজ পেয়ে সমাজের আলোকিত মানুষে পরিণত হয়েছে।

১১. বায়'আত

বায়'আত শব্দের অর্থ আনুগত্যের শপথ ও নিজের আমিত্বকে পীরের হাতে বিক্রি করা এবং পীর-মুর্শিদকে নিজের শিক্ষাগুরু হিসেবে মান্য করা। এছাড়াও নেতৃত্ব মেনে নেয়া, অঙ্গীকার, লেনদেন, চুক্তি ও ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[২২০] তাসাওউফের পরিভাষায়. কোনো পীর-মুর্শিদের হাত ধরে আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে তাওবাহ্ করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মান্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করাকে বায়'আত বলে।[২২১] এ বায়'আতের মাধ্যমে মুরিদ যেভাবে আ'মালে সলেহা সম্পন্ন করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হন, ঠিক তেমনি নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ বর্জন করে আত্মশুদ্ধি লাভেরও অঙ্গীকারবদ্ধ হন। ইসলামি জীবন-জিজ্ঞাসার পূর্ণতা ও স্থিতিশীলতার জন্য সত্যনিষ্ঠ পীরের কাছে বায়'আত হওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মানুষের আত্মিক রোগের আধ্যাত্মিক চিকিৎসক ছিলেন। তিনি মানুষকে কীভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা যায় সেই চিন্তায় সব সময় বিভোর থাকেন। সেজন্য তিনি কোনো ধর্মীয় ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণ করলে সমসাময়িক বিষয়ে আলোচনা করতেন। আলোচনা শেষে পীর, মুরিদ, বায়'আত, 'ইল্‌মে তাসাওউফের বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতেন। ফলে উপস্থিত তাওহিদি জনতা তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। বায়'আত করানোর পর তিনি তরিকতের অযিফার তা'লিম দিতেন। এ বায়'আতের মাধ্যমে তিনি অসংখ্য বিপথগামী মানুষকে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের কাতারে শামিল করে দেন। আল্লামা জালাল মুহাম্মদ উদ্দিন রুমি (রহ.) (১২০৭–১২৭৩ খ্রি.) বলেন,

چوں تو ذات پیر را کردی قبول - ہم خدا در ذاتش آمد ھم رسول

> অর্থাৎ 'যদি তুমি কোনো ওলি বুযুর্গের হাতে বায়'আত হও, তবে এটিই হবে তোমার জন্য আল্লাহ্ এবং তার রাসুলকে পাওয়ার সর্বোত্তম উপায়।'[২২২]

---

২২০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭

২২১. মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, *কিতাব ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তরীকতের মূলনীতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

২২২. উদ্ধৃত: মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, *নির্বাচিত ভাষণ* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০১৭), পৃ. ২৬৫

১২. যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি

একজন শিক্ষকের কৃতিত্ব যেভাবে যোগ্য ছাত্র গঠনের ওপর নির্ভর করে ঠিক একজন পীরের কৃতিত্ব নির্ভর করে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি রেখে যাওয়ার ওপর। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) সেক্ষেত্রে শতভাগ সফল হয়েছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় অনেক যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করে গেছেন। তাঁরা বহুকাল ধরে ওয়ায-নসিহত, শিক্ষা-দীক্ষা, তা'লিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে দেশ ও সমাজে আলোর মশাল জ্বালিয়ে গেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আলিমদের অনেকে এখনও আলোকিত করে যাচ্ছেন। তাদের অনেকেই আধ্যাত্মিকতা চর্চায় উচ্চমার্গে পৌঁছে মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন : বায়তুশ শরফের মরহুম পীর শাহ্ সুফি মওলানা মুহাম্মদ কুতুব উদ্দিন (১৯৪২–২০২০ খ্রি.), মওলানা আবদুল লতিফ (১৯৪৭–২১১০ খ্রি.), মওলানা শামসুল ইসলাম হেলালী (১৯৪৩–১৯৯৯ খ্রি.) এবং মওলানা আবদুল মোমেন (১৯৫২–১৯৯৭ খ্রি.)।

এছাড়াও মওলানা সৈয়দ আহমদুল হক (১৯৩৯–২০১০ খ্রি.), মওলানা বদিউর রহমান (১৯১৭–১৯৯১ খ্রি.), মওলানা বদিউর আলম চৌধুরী (জন্ম ১৯৩৮ খ্রি.), মওলানা তাহেরুল ইসলাম (জন্ম ১৯৪৭ খ্রি.), মওলানা নুরুল ইসলাম (১৯৫৩–২০২০ খ্রি.), মওলানা আশরাফ আলী (১৯৫১–২০০৭ খ্রি.), ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (জন্ম ১৯৬০ খ্রি.), মওলানা মামুনুর রশীদ নূরী (জন্ম ১৯৫৯ খ্রি.), মওলানা জাফর আহমদ (জন্ম ১৯৫৪ খ্রি.), মওলানা আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক (জন্ম ১৯৫৩ খ্রি.) ও বায়তুশ শরফের বর্তমান পীর শায়খ মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী (জন্ম ১৯৬৫ খ্রি.) প্রমুখ।

১৩. দু'আ ও মুনাজাত

রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ 'দু'আ ইবাদতের সারনির্যাস।'[২২৩] মানুষ মনের আকুতি প্রকাশ, হৃদয়ের আকুলতা-ব্যাকুলতা ও নিজের চাওয়া-পাওয়ার জন্য প্রভুর কাছে যে ঘনিষ্ঠ আবেদন করে তা-ই দু'আ।[২২৪] আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যার ঘনিষ্ঠতা যত বেশি সে দু'আ করে তত বেশি। কারণ দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্ তা'আলার অলিদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ঘনিষ্ঠতার কারণে সমাজের সাধারণ মানুষ নিজেদের বিপদাপদ এবং বিভিন্ন সমস্যায় দু'আর জন্য তাদের কাছে ছুটে আসে। তাদের দু'আর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা বিপদাপদ থেকে মানুষকে উদ্ধারও করেন।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) আল্লাহ্ তা'আলার মকবুল একজন বান্দা ছিলেন। সর্বদা বিগলিত হৃদয়ে করুণ আকুতি নিয়ে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে রোনাজারি করতেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে এবং বিপদাপদে তাঁর কাছে দু'আর জন্য আসত। তিনি তাদের সমস্যার কথা আগ্রহের সাথে মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, সুষ্ঠু পরামর্শ দিতেন এবং সমাধানের জন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দু'আ-মুনাজাত করতেন। তাঁর হৃদয়স্পর্শী দীর্ঘ মুনাজাত ছিল মুক্তিপাগল জনতার আরাধ্য বস্তু। এভাবেই তিনি মানুষের আত্মাকে বিশুদ্ধ খোদাপ্রেমে ও নবিপ্রেমের ধারায় সিক্ত করে তুলতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর কবি আল মাহমুদ যথার্থই বলেছেন,

---

২২৩. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা আত-তিরমিযি, *জামি' তিরমিযি* (ঢাকা : মাকতাবাতুল ফতহি বাংলাদেশ, তা. বি.), বাবুন মিনহু, পৃ. ১৫৫

২২৪. ড. আহমদ আলী, *তাযকিয়াতুন নাফস* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৬), পৃ. ২৩৬

‘তিনি তো ছিলেন ঈমান ও তৌহিদের নিশান। ......
....তিনি আমাকে
দুটি মাত্র উপদেশ ঠিকমতো মেনে চলতে শিখিয়েছিলেন।
এক. সিজদায় মাথা ঠেকিয়ে রাখার সময় রক্ত-মাংসসহ
নিজের ভেতরটাকে একেবারে উবুড় করে দেয়া।
দুই. কবির অহংকার ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো ফেলে দিয়ে একেবারে
আল্লাহ্ প্রেমিকদের ভিড়ে ফতুর হয়ে মিশে যাওয়া।’[২২৫]

এভাবে শাহ্ সুফি মওলানা মুহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) মানুষের মনোজগতে আধ্যাত্মিকতার প্রচার করে গেছেন। ইতোমধ্যে লক্ষাধিক তরিকতপন্থি অবালবৃদ্ধবনিতা এ দরবারের শামিয়ানায় সমবেত হয়ে কাদেরিয়া তরিকার মাধ্যমে আপন দীন ও ঈমানকে সুদৃঢ় করেছে। এর মাধ্যমে সমাজের কল্যাণে নিরন্তন কাজ করে যাচ্ছেন।

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) অনুসৃত তরিকা

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কাদেরিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় কামিল ছিলেন। মওলানা সৈয়দ মোনছরম শাহ্ খোরাসানি (রহ.)[২২৬] (মৃ. ১৯৫২/৫৩ খ্রি.) এর নিকট হতে তাঁর পীর শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) ‘কাদেরিয়া তরিকার’ দীক্ষা পান এবং খেলাফতপ্রাপ্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি ফুরফুরার পীর হযরত মওলানা আবু বকর সিদ্দিকি (রহ.) (১৮৪৬–১৯৩৯ খ্রি.) এর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করেন এবং ‘তরিকায়ে মুজাদ্দেদিয়া নক্‌শবন্দিয়া’ এর খেলাফতপ্রাপ্ত হন। এ দিক থেকে তিনি স্বীয় পীর শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) থেকে কাদেরিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া তরিকা উভয় তরিকার খিলাফত ও অনুমতিপ্রাপ্ত হন। নিম্নে তাঁর অনুসৃত তরিকাদ্বয়ের শাজারা উল্লেখ করা হলো:

কাদেরিয়া তরিকার শাজারা[২২৭]

১. শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)। তিনি এ তরিকায় খিলাফত প্রাপ্ত হয়েছেন।
২. তিনি তাঁর পীর হাদিয়ে যামান শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) থেকে।
৩. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা সৈয়দ মোনছরম শাহ্ কাদেরি মুজাদ্দেদি (রহ.) থেকে।
৪. তিনি তাঁর পীর আরেফে রাব্বানি শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ জামালুদ্দিন (রহ.) থেকে।
৫. তিনি তাঁর পীর হযরত আবদুল বাছির (রহ.) থেকে।

---

২২৫. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, *নিবেদিত কবিতা* (চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ্ শরফ একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৪০

২২৬. তিনি ছিলেন যুগ শ্রেষ্ঠ একজন আলিম ও অতি উচ্চ পর্যায়ের অলি। তাঁর পিতার নাম মওলানা সৈয়দ আবদুল্লাহ শাহ (রহ.)। ‘ইল্‌মে দীন শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পিতার সাথে ২০/ ২৫ বৎসর বয়সে খোরাসান থেকে পাকিস্তানের পেশোয়ার আগমন করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। প্রথমে ‘পেশোয়ার মাদ্‌রাসা’য় পরে ‘দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্‌রাসা’ থেকে হাদিস পাঠ সমাপ্ত করেন। তিনি হযরত শাহ্ সৈয়দ জামালুদ্দিন কাদেরি (রহ.)-এর হাতে বায়‘আত গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫২/ ৫৩ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র হজের মৌসুমে মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন এবং জান্নাতুল বকিতে তাকে দাফন করা হয়। দ্র. মোহাম্মদ আমান উল্লাহ্ খান, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০-৩৫, ৬৬২

২২৭. মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, *শরি‘আত ও তরিকতের আদাব* (চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমি, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৮), পৃ. ৪৮

৬. তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ্ মোহাম্মদ শের (রহ.) থেকে।
৭. তিনি তাঁর পীর হযরত মিয়া আহমদ আলীশাহ (রহ.) থেকে।
৮. তিনি তাঁর পীর হযরত দরগাহি (রহ.) থেকে।
৯. তিনি তাঁর পীর হযরত জামালুল্লাহ (রহ.) থেকে।
১০. তিনি তাঁর পীর হযরত কুতুবুদ্দিন হক্কানি (রহ.) থেকে।
১১. তিনি তাঁর পীর হযরত খাজা মোহাম্মদ যোবাইর (রহ.) থেকে।
১২. তিনি তাঁর পীর হযরত খাজা মোহাম্মদ নকশবন্দি (রহ.) থেকে।
১৩. তিনি তাঁর পীর হযরত মোহাম্মদ মাসুম ফানা (রহ.) থেকে।
১৪. তিনি তাঁর পীর হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (রহ.) থেকে।
১৫. তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ্ সেকান্দর (রহ.) থেকে।
১৬. তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ্ কুতবে দাওরান শাহ্ কামাল কাহতিলি (রহ.) থেকে।
১৭. তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ্ ফোজাইল (রহ.) থেকে।
১৮. তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ্ গদা রহমান ইবনে মাহবুব আলি (রহ.) থেকে।
১৯. তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ্ শামসুদ্দীন আরেফ (রহ.) থেকে।
২০. তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ্ আবুল ফজল (রহ.) থেকে।
২১. তিনি তাঁর পীর শাহ গদা রহমান ইবনে আবুল হাসান (রহ.) থেকে।
২২. তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ্ শামসুদ্দীন ছাহরায়ি (রহ.) থেকে।
২৩. তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ্ মোহাম্মদ আকিল (রহ.) থেকে।
২৪. তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ্ কামেল বাহাউদ্দিন (রহ.) থেকে।
২৫. তিনি তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শাহ্ আবদুল ওহাব (রহ.) থেকে।
২৬. তিনি তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শাহ্ শরফুদ্দিন কওয়াল (রহ.) থেকে।
২৭. তিনি তাঁর পীর হযরত সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক বাগদাদি (রহ.) থেকে।
২৮. তিনি তাঁর পীর হযরত মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানি (রহ.) থেকে।
২৯. তিনি তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শাহ্ আবু ছালেহ জংগি (রহ.) থেকে।
৩০. তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ্ আবদুল্লাহ জিলি (রহ.) থেকে।
৩১. তিনি তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শায়খ ইয়াহইয়া জাহেদ (রহ.) থেকে।
৩২. তিনি তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শায়খ মোহাম্মদ শাহ্ (রহ.) থেকে।
৩৩. তিনি তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শাহ্ দাউদ মোরেছ (রহ.) থেকে।
৩৪. তিনি তাঁর পীর হযরত মুসা মোরেছ (রহ.) থেকে।
৩৫. তিনি তাঁর পীর হযরত আবদুল্লাহ মোরেছ (রহ.) থেকে।
৩৬. তিনি তাঁর পীর হযরত সুমা জুন (রহ.) থেকে।
৩৭. তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ্ আবদুল্লাহ মহজ (রহ.) থেকে।
৩৮. তিনি তাঁর পীর হযরত ইমাম হাসান মোসান্না (রহ.) থেকে।
৩৯. তিনি তাঁর পীর হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলি (রা.) থেকে।
৪০. তিনি তাঁর পীর হযরত আলি ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে।
৪১. তিনি সৈয়্যদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) থেকে।

নক্‌শবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরিকার শাজারা[২২৮]

১. শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)। তিনি এ তরিকার খেলাফত প্রাপ্ত হয়েছেন।
২. তিনি তাঁর পীর হাদিয়ে যামান শাহ্ সুফি মওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) থেকে।
৩. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকি (রহ.) থেকে।
৪. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা ফতেহ আলী বরদাওয়নি (রহ.) থেকে।
৫. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা নুর মোহাম্মদ নিজামপুরি (রহ.) থেকে।
৬. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা মুজাদ্দিদ সৈয়দ আহমদ শহিদ বেরলভি (রহ.) থেকে।
৭. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) থেকে।
৮. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) থেকে।
৯. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা শেখ আবদুর রহিম মুহাদ্দিস দেহলভি (রহ.) থেকে।
১০. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদি (রহ.) থেকে।
১১. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা মুজাদ্দিদে আলফে সানি (রহ.) থেকে।
১২. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা বাকি বিল্লাহ (রহ.) থেকে।
১৩. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা মুহাম্মদ আমকানকি (রহ.) থেকে।
১৪. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা দরবেশ (রহ.) থেকে।
১৫. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা যাহেদ (রহ.) থেকে।
১৬. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা ওবায়দুল্লাহ আহরার (রহ.) থেকে।
১৭. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা ইয়াকুব চারখি (রহ.) থেকে।
১৮. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা আলি উদ্দিন আত্তার (রহ.) থেকে।
১৯. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারি (রহ.) থেকে।
২০. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা সৈয়দ আমির কলাল (রহ.) থেকে।
২১. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা মুহাম্মদ বাবা শাম্মাছি (রহ.) থেকে।
২২. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা আযিযানে আলি রামিতান (রহ.) থেকে।
২৩. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা মাহমুদ আবুল খাইর ফাগানভি (রহ.) থেকে।
২৪. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা আরিফ রেওগরি (রহ.) থেকে।
২৫. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা আবদুল খালেক গজদওয়ানি (রহ.) থেকে।
২৬. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা আবু ইউসুফ হামদানি (রহ.) থেকে।
২৭. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা আবু ঘ্যালি ফারমেদি (রহ.) থেকে।
২৮. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা ইমাম আবুল কাশেম কুরাইশি (রহ.) থেকে।
২৯. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা আবু আলি আদ্দাক্কাক (রহ.) থেকে।
৩০. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা শায়খ আবুল কাশেম নাসিরাবাদি (রহ.) থেকে।
৩১. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা খাজা আবু আলি রুদবারি (রহ.) থেকে।
৩২. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা হযরত খাজা জুনাইদ বাগদাদি (রহ.) থেকে।

---

২২৮. শাহ্‌সুফী মওলানা মীর মুহাম্মদ আখতর, *দা'ওয়াতে মুস্তাজাবাত* (চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ২০১০), পৃ. ১-৭

৩৩. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা শায়খ আবুল হাসান সিররি সকতি (রহ.) থেকে।

৩৪. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা শায়খ মারুফ কারখি (রহ.) থেকে।

৩৫. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা ইমাম মুসা আলি রেজা (রহ.) থেকে।

৩৬. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা ইমাম মুসা কাজেম (রহ.) থেকে।

৩৭. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) থেকে।

৩৮. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা কাসেম বিন মুহাম্মদ বিন আবু বকর (রহ.) থেকে।

৩৯. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা সালমান ফারেসি (রা.) থেকে।

৪০. তিনি তাঁর পীর হযরত মওলানা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে।

৪১. তিনি সৈয়্যদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) থেকে।

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) গতানুগতিক সুফিবাদ চর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও মূলনীতি অনুসরণ করে সুফিবাদ চর্চায় নবধারা সৃষ্টি করেন। তাঁর মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মবাদ চর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়।

উপসংহার

উপসংহার

শাহ্ সুফি মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে (৫ই শাওয়াল, ১৩৫১ হিজরিতে) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৫ মার্চ, ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে (২৬ই জিলকদ, ১৪১৮ হিজরিতে) ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বছর ১ মাস ২৪ দিন। তাঁর এই ৬৫ বছরের মধ্যে ২০ বছর অতিবাহিত হয় শৈশব-যাপন, শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানার্জনে। বাকি ৪৫ বছর থেকে ব্যক্তিগত আহার-নিদ্রা ও মানবীয় অন্যান্য প্রয়োজন পূরণে যদি অন্তত ২০ বছরও বাদ দেয়া হয় তাহলে মূল কার্যকালের অবশিষ্ট থাকে মাত্র ২৫ বছর। এই ২৫ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়পরিসরে শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার, মানবসেবা ও সুফিবাদ বিকাশে অসামান্য অবদান রেখে দেশ ও জাতিকে বহুমুখী সেবা দিয়ে গেছেন।

তিনি 'পাঁচলাইশ ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা' এবং 'বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা'য় হাদিসের অধ্যাপনা করেছেন মোট ২৪ বছর। ফলে তাঁর কাছে যারা 'সিহাহ্ সিত্তাহ'সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছেন তাদের সংখ্যা প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) জন। বৃহত্তর চট্টগ্রামে যেসব প্রবীণ আলিমে দীন আলিয়া মাদ্রাসায় 'ইল্‌মে হাদিসের পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন এবং বর্তমানে যারা আছেন তাদের অনেকে তাঁরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিষ্য।

অধ্যাপনার পাশাপাশি শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমেও শিক্ষার বিস্তারে তিনি অনন্য অবদান রেখেছেন। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) শিক্ষার্থী দীনি ও জাগতিক শিক্ষার্জন করে মানবসেবার মহান ব্রত নিয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে তারা অসামান্য অবদান রেখে যাচ্ছেন।

আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে তিনি একাধিক বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র যেমন কার্পেন্ট্রি, টেইলারিং, হেয়ার কিটিং, প্যাকেজিং ও প্রেস কম্পোজিটার্স ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করেছেন। সেখান থেকে প্রতিবছর প্রায় ২,০০০ (দুই হাজার) শিক্ষার্থী যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে ০৮ (আট)টি হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রতিবছর প্রায় ১,০০০০০ (এক লক্ষ) মানুষ স্বল্প ও বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা পেয়ে আসছে।

উপরিউক্ত শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ ২০,০০০ (বিশ হাজার) চাকরিজীবী প্রত্যেকেই এক একটি পরিবারের অর্থনৈতিক জোগানদাতা। সে হিসেবে প্রত্যেক পরিবারের ৫ জন করে সদস্য থাকলে মোট ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহ তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। অধিকন্তু, বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' ও 'আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর অবদান অনস্বীকার্য। উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটিতে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকটময় মুহূর্তে পিতৃমাতৃহীন এতিম শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৫ (পনেরো)টি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন; বিশেষ করে মহান স্বাধীনতা

যুদ্ধে আহত ও নিহত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের যখন কোথাও ঠাঁই হচ্ছিল না তখন তিনি এসব এতিমখানায় আশ্রয় প্রদান করেন। এসব এতিমখানায় প্রতিবছর হাজারের অধিক অনাথ শিশু লালিতপালিত হয়। এখান থেকে তারা উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখছে।

তিনি ছিলেন সমাজসেবারার মহান প্রতিভূ। আর্তমানবতার সেবা নিজের সমগ্র জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। যেখানে মানবতা বিপন্ন হয়েছে সেখানেই ছুটে গেছেন আপন শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী ত্রাণসামগ্রী নিয়ে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি আপৎকালে তিনি লক্ষাধিক মানুষের মাঝে কোটি টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে আর্তমানবতার সেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

ইসলামি মিশনারি কার্যক্রম তথা মসজিদ, মাদ্‌রাসা, হিফ্‌যখানা, এতিমখানা ও হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে তিনি তিন পার্বত্য জেলায় খ্রিষ্টান মিশনারিদের অপতৎপরতা থেকে হাজার হাজার মুসলিমকে রক্ষা করেন। দেশের আলিম-‘উলামাদেকে ঐক্যবদ্ধ করে ‘ইত্তেহাদুল উম্মাহ’র মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। ইসলামবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যেমন শির্‌ক ও বিদ্‘আত উচ্ছেদ করে তদস্থলে ধর্মীয় মাহফিলের প্রচলন করেন। সর্বোপরি, দেশ ও জনগণের স্বার্থবিরোধী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং ও সভা-সমাবেশ, প্রয়োজনে রাজপথে আন্দোলনের মাধ্যমে তা প্রতিহত করার আজীবন সংগ্রাম করে যান।

ইসলামে নবসৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার যুগোপযোগী সমাধানের নিমিত্তে তিনি ‘ইসলামি গবেষণাগার’ প্রতিষ্ঠা করেন। এর তত্ত্বাবধানে শতাধিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এসব সেমিনারের মধ্য দিয়ে ‘বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা’, ‘আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম’ ও ‘ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড’ এর মতো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং যুগ-সমস্যার বহু সমাধা দিতে সমর্থ হয়।

ইসলামি সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার মানসে প্রতিবছর ঈদে মিলাদুন্নবি (সা.) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, কচিকাঁচা ছেলে-মেয়েদের দ্বারা পরিবেশিত ‘পাখপাখালির আসর’, শানে মুস্তফা (সা.) ও বিষয়ভিত্তিক রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা সর্বোপরি, গুণিজন সংবর্ধনার আয়োজন। তিনি ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশবরেণ্য ২০ জন গুণী ব্যক্তিত্বকে স্বীয় পেশায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সংবর্ধনা প্রদান করেন। এসব অনুষ্ঠান পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতিরোধ এবং ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তাছাড়া মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধীকরণ এবং মৃত ব্যক্তিদের কবরে সওয়াব প্রেরণের নিমিত্তে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দুই শতাধিক যিকির মাহফিল, দীনি তা‘লিমকেন্দ্র ও ইছালে সওয়াব মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেন। এসব যিকিরের মাহফিল ও দীনি তা‘লিমকেন্দ্র থেকে হাজার হাজার মানুষ দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শিক্ষার্জন করে তাদের জীবনকে ধন্য করছেন। উল্লেখ্য, তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে এবং ইসলামের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে শতাধিক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

জীবনের শেষনিশ্বাস পর্যন্ত ‘ইলমে তাসাওউফের খিদমতও আঞ্জাম দিয়ে গেছেন এ মহান আধ্যাত্মিক সাধক। ঐ সময়ে যারা তাঁর মুরিদ হয়ে ঈমান-‘আমলকে সংশোধন করেছেন তাদের সংখ্যা ৫,০০০০০ (পাঁচ লক্ষের)ও অধিক। তন্মধ্যে অনেকেই চারিত্রিক পরিশীলন ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন করে

কামালিয়াত অর্জন করেছেন। তিনি ইসলামের প্রচার-প্রসার, সমাজ ও সভ্যতার সংশোধনে যেসব ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সেমিনারে বক্তৃতা প্রদান করেন সেগুলোর সংখ্যা অগণিত ও অসংখ্য।

এতসব কর্মব্যস্ততার ভেতরেও তিনি দেশ ও জাতির জন্য রেখে গেছেন অমূল্য প্রকাশনা। তিনি ধর্মদর্শন, সুফিবাদ ও তরিকত ইত্যাদি শিরোনামে ছোটো-বড়ো ২৬টি গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করেন। এসব রচনাবলিতে রয়েছে বিভিন্ন সূরার তাফসির, হাদিসের ব্যাখ্যা, ঈমান ও 'আকিদাহ্সম্পর্কীয় বহু জটিল বিষয়ের বিশ্লেষণ ও সমাধান। তাছাড়া বিভিন্ন মাস'আলা-মাসা'ঈল, আধ্যাত্মিকতা এবং পীর-আওলিয়ার জীবনচরিতসহ অনেক তথ্যের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে।

এমন বিস্তৃত পরিধিসম্পন্ন ব্যক্তি-বিশেষত, যাদের জীবনে বহু সদ্গুণের সমাবেশ ঘটে- তাদের প্রধান গুণ কোন্টি সেটি চিহ্নিত করা গবেষকদের জন্য জটিল হয়। মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে নিয়ে গবেষকরা এ সমস্যায় আবর্তিত হয়েছেন বেশি। তাই তাঁকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে সমকালীন শীর্ষস্থানীয় 'উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গিতেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, মওলানা মহিউদ্দীন খান তাঁকে বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা আলেমে দীন, পথপ্রদর্শক, সুন্নাতে নববির একনিষ্ঠ অনুসারী এবং সৈয়দ আহমদ শহিদের (রহ.) সংস্কার আন্দোলনের একজন সার্থক সিপাহ্সালার হিসেবে ব্যক্ত করেছেন।[১]

আল্লামা সুলতান যওক নদভী তাঁকে আযিমত (শরি'আ পরিপালনে প্রান্তিক স্তর) ও হামিয়্যাত (সুন্নাতের ত্রাণকর্তা) এর শ্রেষ্ঠ ধারক-বাহক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২] প্রফেসর ড. আ. ন. ম. রঈস উদ্দীন তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিনয় ও সৎসাহসের কথা বর্ণনা করেছেন।[৩] অধ্যক্ষ মওলানা মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন তাঁকে ইনসানিয়্যাত ও মানবতাবোধের প্রতীক হিসেবে অভিধায়িত করেছেন।[৪] অনেকে তাঁকে বিদগ্ধ হাদিস বিশারদ, জ্ঞানীগুণীদের পৃষ্ঠপোষক, আধ্যাত্মিক রাহ্বার (পথপ্রদর্শক) ও মহান সমাজসংস্কারক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উপরিউক্ত গুণাবলির সবই তাঁর চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এমন ব্যক্তিত্বের মূল প্রকৃতি নিরূপণে গবেষক ও সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন পর্যালোচনায় প্রমাণিত হয়, তিনি স্বীয় মুর্শিদের প্রদাঙ্ক অনুসরণ করে বাংলাদেশের অনগ্রসর এলাকাসমূহে ইসলামি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি মানবসেবার একজন অগ্রসেনানীর ভূমিকা পালন করেছেন। অনৈসলামিক কার্যকলাপের প্রতিরোধ করে সমাজে ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুন প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদান রেখেছেন। ইসলামের প্রচার-প্রসারে সম্ভাব্য সব পন্থাই তিনি অবলম্বন করেছেন এবং সকল ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অপার করুণায় অভূতপূর্ব সফলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি সমাজ সংশোধন ও

১. মওলানা মহিউদ্দীন খান, 'তাঁর কীর্তির মধ্যেই তিনি শুকতারার মত জেগে থাকবেন', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, স্মরণ সংখ্যা-১, মে, ১৯৯৮, পৃ. ৩৭

২. আল্লামা সুলতান যওক নদভী, 'বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব খানকায় বসে দেশ ও জাতির সেবা করে গেছেন', *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, স্মরণ সংখ্যা-১, মে, ১৯৯৮, পৃ. ৩৯; আল্লামা সুলতান যওক নদভী, 'তিনি খানকায় বসে দেশ ও জাতির সেবা করে গেছেন', *দৈনিক ইনকিলাব*, ২রা এপ্রিল, ২০১৩, পৃ. ৪

৩. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, আ. ন. ম. রঈস উদ্দীন, 'রসুলে পাকের সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে মোজাদ্দেদ', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

৪. মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী সম্পাদিত, অধ্যক্ষ মওলানা মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন, 'শরিয়তের প্রকৃত অনুসারী ছিলেন তিনি', *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯

সংস্কারের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার একনিষ্ঠ বান্দা এবং নবিজীর প্রিয় উম্মত হওয়া সম্ভব। তাঁর অসমাপ্ত কার্যাবলি এবং পরিচালিত মিশনসমূহ তাঁর যোগ্যতম উত্তরসূরি তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র মওলানা আবদুল হাই নদভী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছেন এবং তাঁর প্রদর্শিত পথকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই মহান ধর্মীয় পথপ্রদর্শক আত্মজীবনের অন্তিম মুহূর্তেও নিজের কল্যাণধর্মী প্রতিভাগুলোকে পরিপূর্ণ কার্যকর রেখেছেন। জীবনযুদ্ধের কোনো পর্যায়ে হতোদ্যম না হয়ে আরাধ্য স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন আকাঙ্ক্ষায় সর্বপ্রকার ঝড়-তুফানের মুখেও আশার আলো জ্বালানোর নিরন্তর সাধনায় অনড় ও অবিচল থেকেছেন। এই তুলাদণ্ডের পরিমাপে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) বিংশ শতাব্দীর অন্যতম 'শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদ' তথা সমাজসংস্কারক। তিনি চিরকাল মুসলিম উম্মাহ্র ইতিহাসে তাঁর সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ডের মধ্যেই শুকতারার মতো জ্বলতে থাকবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সকল কর্মপ্রচেষ্টা কবুল করুন এবং তাঁকে তাঁর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে বেহেশতের উচ্চ আসনে সমাসীন করুন। তাঁর কবরকে নুরের বাগানে পরিণত করুন; আর সমাজের পথহারা মানুষকে তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতার সুশীতল ছায়ায় ফিরে আসার তাওফিক দিন। আমিন!!

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা উৎস

০১.	আইয়ূব, অধ্যাপক হাসান	:	*ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি*, অধ্যাপক মওলানা আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ্ অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪
০২.	আখতর, শাহ্‌সুফী মওলানা মীর মুহাম্মদ	:	*দা'ওয়াতে মুস্তাজাবাত*, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আন্‌জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ২০১০
০৩.	আজাদ, রায়হান	:	*চট্টগ্রামের একশ মুসলিম মনীষা*, চট্টগ্রাম : সেন্টার ফর রিচার্স এন্ড পলিসি স্টাডিজ, ২০১৬
০৪.	আজিজ, ডা. মো. আনোয়ারুল ও অন্যান্য	:	*শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন*, ঢাকা : আহছানিয়া মিশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৬
০৫.	আনিসুজ্জামান	:	*মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৯
০৬.	আবদুল্লাহ্, মুফতি মোহাম্মদ	:	*তাসাওউফ ও তরীকত : প্রসঙ্গ কথা*, ঢাকা : বার্ড কম্প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশন্স, ২০১৭
০৭.	আব্দুল্লাহ্, ড. মুহাম্মদ	:	*স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২
০৮.	আব্দুল্লাহ্, ড. মুহাম্মদ	:	*বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬
০৯.	আমীন, রুহুল	:	*মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন, ১৯৮৯
১০.	আলমগীর, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ	:	*ইতিহাসের আলোকে আমাদের শিক্ষার ঐতিহ্য ও প্রকৃতি*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭
১১.	আলম, ড. এ. কে. এম. নুরুল	:	*ইসলামী দা'ওয়ার মর্মকথা ও ইসলামী শিক্ষার তাৎপর্য*, ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২
১২.	আলম, ড. রশীদুল	:	মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, বগুড়া : সাহিত্য সোপান, ২০০০
১৩.	আল-কাদেরী, ড. তাহের	:	*তাসাউফের আসল রূপ*, চট্টগ্রাম : সনজরী পাবলিকেশন, ২০০৯
১৪.	আল-মুতী, আবদুল্লাহ্	:	*আমাদের শিক্ষা কোন পথে*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৯৬
১৫.	আলী, মোহাম্মদ আজহার	:	*শিক্ষর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬
১৬.	আলী, ড. আহমদ	:	*বিদ'আত*, চট্টগ্রাম : রিলেটিভ পাবলিকেশন্স, ২০১৩
১৭.	আলী, ড. আহমদ	:	*তায্‌কিয়াতুন নাফস*, ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার, ২০১৬
১৮.	আলী, ড. আহমদ	:	*যুবদাতুল বায়ান ফী ঈদাহিল কুরআন*, ঢাকা : প্রচ্ছদ প্রকাশন, ২০১৯
১৯.	আলী, ড. আহমদ	:	*তাসাউফের স্বরূপ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৯
২০.	আলী, ড. আহমদ	:	*সালাতুত তারাবীহ*, ঢাকা : মাকতাবাতুস সালাম, ২০২১
২১.	আলী, প্রফেসর মোঃ আনসার	:	*শিক্ষানীতি পরিক্রমা*, ঢাকা : মিতা ট্রেডার্স, ১৯৯৫
২২.	আলী, মোহাম্মদ ইলিয়াস	:	*যুগে যুগে শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষার উত্তরণ*, ঢাকা : জাগরণী প্রকাশনী, ১৯৯৯

২৩. আলী, অধ্যাপক কে. : *ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৭০

২৪. আলী, অধ্যাপক কে. : *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : আলী পাবলিকশেনস, ১৯৮৫

২৫. আলী, অধ্যাপক কে. : *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকা : আলী পাবলিকেশনস, ১৯৮৫

২৬. আলী, মেহরাব : *দিনাজপুরে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯১

২৭. আলী, ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব : *রাজশাহীতে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২

২৮. আশরাফ, কে. এম. : *হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবনচর্চা*, কলিকাতা : কলিকাতা পাবলিকেশার্স, ১৯৯৪

২৯. আস-সুহরাওয়ার্দী, আবু হাফস : *আ'ওয়ারিফুল মা'আরিফ*, 'উমার শামস বেরলভি অনূদিত, দিল্লি : ফরিদ বুক ডিপো, ২০০১

৩০. আসাদ, আবুল : *একশবছরের রাজনীতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০১৪

১৬. আহমদ, মাও. মমতাজ উদ্দিন : *মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

৩১. আহমদ, মওলানা মুশতাক : *তাহরীকে দেওবন্দ*, ঢাকা : শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৮

৩২. আহমদ, মাওলানা ড. মুশতাক : *শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র)*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আযহার, ২০১৪

৩৩. আহমদ, নাজির ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন : *মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস*, ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন, ১৯৮৯

৩৪. আহমদ, মওলানা সাইয়্যিদ শোয়াইব : *ওযীফা শরিফ*, ঢাকা : মুহাম্মদিয়া জামিয়া শরিফ, ২০০২

৩৫. আহমেদ, সিরাজ উদ্দিন : *শেখ মুজিবুর রহমান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০

৩৫. আহসান, সৈয়দ আলী : *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা : গোল্ডেন বুক হাউস, ১৯৬৭

৩৭. ইউসুফ, ফজলুল হাসান : *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫

৩৮. ইহ্‌সান, সায়্যিদ মুফতি মুহাম্মদ আমীমুল : *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা : কুতুবখানায়ে রশিদিয়া, ১৯৯২

৩৯. আহাদ, অলি : *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব বিতান, ১৯৯৭

৪০. ইউসুফ, ফজলুল হাসান : *বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫

৪১. ইলিয়াছ, মোহাম্মদ : *লোহাগাড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, চট্টগ্রাম : মোহাম্মদ ফিজনূর রহমান, ২০১৫

৪২ ইসলাম, এ. এন. এম. সিরাজুল : *ইসলামে মসজিদের ভূমিকা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৩

৪৩. ইসলাম, মুহাম্মদ নুরুল : *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : জমজম প্রকাশনী, ১৯৮৮

৪৪. ইসলাম, মুহাম্মদ নুরুল : *ইসলামের ধর্মীয় নীতি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি*, ঢাকা : এম. আবদুল্লাহ্ এন্ড সন্স, ২০০৫

৪৫	ইসলাম, আমিনুল	:	*মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫
৪৬.	ইসলাম, ড. আমিনুল	:	*মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪
৪৭.	ইসলাম, মুস্তফা নূর উল	:	*সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭
৪৮.	ইয়াসমিন, আহমেদ ও রাখি বর্মণ	:	*গবেষণা পদ্ধতি ও সামাজিক পরিসংখ্যান*, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৫
৪৯	ইয়াহইয়া, আবুল ফাতাহ	:	*ইসলামের দৃষ্টিতে পীর-মুরীদী*, ঢাকা : ফাতওয়া ও গবেষণা বিভাগ, জামিয়া দীনিয়া, ১৯৮৮
৫০.	উদ্দিন, ড. আ. ই. ম. নেছার	:	*ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫
৫১.	উদ্দীন, ড. এমাজ	:	*রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৯৬৪
৫২.	উদ্দিন, মাওলানা মুহাম্মদ কুতুব	:	*কিতাব ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ত্বরীকতের মূলনীতি*, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০০৮
৫৩.	উদ্দীন, মওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত	:	*ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আবরার, ২০০৭
৫৪	উমর, বদরুদ্দীন	:	*ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৭
৫৫.	কবির, ড. মফিজ উল্লাহ	:	*মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৭
৫৬.	করিম, ড. আবদুল	:	*বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস*, মোকাদ্দেসুর রহমান অনুদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩
৫৭.	করিম, ড. আবদুল	:	*মুসলিম বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯
৫৮.	করিম, কে. এম. মাহফুজুল	:	*পীর মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে অবদান*, চট্টগ্রাম : হোমল্যান্ড পাবলিকেশন্স, ২০০৪
৫৯.	কিসমতি, জুলফিকার আহমদ	:	*চিন্তাধারা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮
৬০.	কিসমতি, জুলফিকার আহমদ	:	*আজাদী আন্দোলনে আলেম সমাজের সংগ্রামী ভূমিকা*, ঢাকা : প্রফেসর'স বুক হাউস, ১৯৭০
৬১.	খলিল, ড. মো. ইবরাহীম	:	*ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশনা, ২০১৫
৬২.	খলিল, ড. মো. ইবরাহীম	:	*সূফীবাদ এবং প্রধান প্রধান সূফী ও তাদের অবদান*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশনা, ২০১৩
৬৩.	খাঁ, মোহাম্মদ আকরাম	:	*মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস*, ঢাকা : আজাদ অফিস, ১৯৬৫
৬৪.	খান, আনসার আলী	:	*বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০০৬
৬৫.	খান, আব্বাস আলী	:	*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০০
৬৬.	খান, মোহাম্মদ আমান উল্লাহ	:	*কুতুবুল 'আলম হযরত শাহ্‌সুফি মাওলানা মীর মোহাম্মদ আখতর (রহ.) এর মহিমাময় জীবন*, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ২০১১

৬৭. খান, কে. এম. রাইছউদ্দিন : *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*, ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ২০০৭

৬৮. খলিল, ড. মোঃ ইব্রাহীম : *ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রশাসন, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১৫

৬৯. খালেক, মওলানা আবদুল : *নামায*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬

৭০. গঞ্জেবখশ, আলী হাজবিরী দাতা : *কাশফুল মাহ্জুব*, মুহাম্মদ সিরাজুল হক অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিয়া ক্বোরআন মহল, ১৯৯৯

৭১. গফুর, আবদুর : *আমার কালের কথা*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০০০

৭২. গুপ্ত, সুরজিৎ দাশ : *ভারতবর্ষ ও ইসলাম*, কলিকাতা : সঙ্কর প্রকাশন, ১৩৮৩

৭৩. চাকমা, নীরুকুমার : *বুদ্ধ : ধর্ম ও দর্শন*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনী, ১৯৯০

৭৪. চৌধুরী, আবদুল হক : *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮

৭৫. চৌধুরী, আবদুল হক : *বন্দর শহর চট্টগ্রাম*, ঢাকা : গতিধারা প্রকাশনী, ২০০৯

৭৬. চৌধুরী, দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন : *জালালাবাদের কথা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩

৭৭. চৌধুরী, হাসান আলী : *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : আইডিয়াল লাইবেরি, ১৯৮১

৭৮. ছদরুদ্দীন : *বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮১

৭৯. জব্বার, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল : *শরি'আত ও তরিকতের আদাব*, চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৮

৮০. জামান, ড. হাসান : *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য*, ঢাকা : সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৬৭

৮১. জাহাঙ্গীর, ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : *বঙ্গীয় রাজনীতিতে উলামার ভূমিকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫

৮২. তাফতাযানি, সা'আদুদ্দিন : *শরহে আকাইদ*, মওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের ও অন্যান্য অনূদিত, ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.

৮৩. তালিব, আব্দুল মান্নান : *বাংলাদেশে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪

৮৪. থানভী, আশরাফ আলী : *শরীঅত ও তরিকত*, আবদুল মাজিদ ঢাকুবী অনূদিত, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭

৮৫. নদভী, আবুল হাসান আলী : *ইসলামি রেনেসাঁর অগ্রপথিক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২

৮৬. নদভী, আবুল হাসান আলী : *ভারতবর্ষের মুসলিমদের অবদান*, আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন অনূদিত, চট্টগ্রাম : সেন্টার ফর রিসার্চ দ্যা কুর'আন এন্ড সুন্নাহ, ২০০৪

৮৭. নদভী, মুহাম্মদ আবদুল হাই ও জাকিয়া সুফিয়ান : *হযরত আল্লামা শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) : জীবন ও আদর্শ*, চট্টগ্রাম : আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, ২০১২

৮৮. নদভী, মুহাম্মদ আবদুল হাই : *ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা*, চট্টগ্রাম : আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, ২০১৫

৮৯.	নদ্ভী, মুহাম্মদ আবদুল হাই	:	*সুফীতত্ত্ব ও সুফীয়ায়ে কেরাম*, চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, ২০১২
৯০.	নববি, আবু যাকারিয়া ইয়াহয়া	:	*আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযব*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৪ নভেম্বর, ২০১০
৯১.	নান্নু, মাহবুবুর রহমান	:	*হযরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ.)*, ঢাকা : রশীদ বুক হাউস, ৭নং প্যারিদাস রোড়, ১৯৯১
৯২.	নেছারাবাদী, মুহাম্মদ আযীযুর রহমান	:	*ইসলাম ও তাসাউফ*, ঝালকাঠী : নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ২০১০
৯৩.	নুমানী, মুহাম্মদ মনযুর	:	*তাসাওউফ কাকে বলে*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯
৯৪.	নুমানী, মুহাম্মদ মনযুর	:	*দ্বীন ও শরীয়ত*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯
৯৫.	নুরী, ড. মো. শহীদুল ইসলাম	:	*বাংলার মুসলিম জাগরণ*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬
৯৬.	নোমান, ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু	:	*ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসার অবদান*, চট্টগ্রাম : আলহাজ্ব আবুল কালাম, ২০১৫
৯৭.	নোমান, ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ আবু	:	*ইস্‌রা ও মিরাজুন্নবী (সা.) : একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার মূলনীতি*, চট্টগ্রাম : সাইয়েদা আফিফা মুবাশশিরা, ২০১৬
৯৮.	পাটোয়ারী, ড. মো. আবু ছালেহ	:	*হাফেজ মাওলানা আবদুর রহমান হানাফী (র.) : ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১৩
৯৯.	ফরিদপুরী (রহ.), মাওলানা শামছুল হক	:	*তাছাওউফ তত্ত্ব*, ঢাকা : আল-আশরাফ প্রকাশনী, ২০০৭
১০০.	রব, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর ও অন্যান্য	:	*ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯
১০১.	বদিউজ্জমান, ডক্টর	:	*ইসামঈল হোসেন শিরাজী: জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮
১০২.	বাকী, ড. মুহাম্মদ আবদুল	:	*বাংলাদেশে বিভিন্ন মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত ও মতাদর্শ*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশনা, ২০০৯
১০৩.	বাতিন, মওলানা আব্দুল	:	*সীরাত এ মাওলানা কারামাত আলী জৌনপুরী*, এলাহাবাদ : আসরারে করিমী প্রেস, ১৯৪৭
১০৪.	বিন ফজল, এম. শাহ্জাহান	:	*বড়পীর হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর জীবনী*, ঢাকা : মিনা বুক হাউস, ২০০০
১০৫.	ভুঁইয়া, ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম	:	*বিদ'আতের পরিচয় ও পরিণাম*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০
১০৫	মঈনুদ্দীন, গোলাম	:	*কবি ফররুখ : ঐতিহ্যের নব মূল্যায়ন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৫
১০৭.	মওদুদ, আবদুল	:	*মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭

১০৮.	মজযূব, খাজা আযীযুল হাসান	:	*আশরাফ চরিত*, ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০
১০৯.	মজিদী, নূর হোসেন	:	*মাওলানা আবদুর রহীম একটি বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা : মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩
১১০.	মল্লিক, ড. এ. আর	:	*ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলিম*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮২
১১১.	মহিউদ্দিন, সুফী গোলাম	:	*হালাতে মাশায়েখে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়া*, ঢাকা : খানকাহ শরীফ, নারিন্দা, ১৯৯৭
১১২.	মিয়া, বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান	:	*হযরত শাহ্ মখদুম (রহ.) এর জীবনী*, ঢাকা : দি প্রিন্টার্স কম্পিউটার, ১৯৯৮
১১৩.	মোস্তফা, গোলাম	:	*বিশ্বনবী*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১০
১১৪.	রশীদ, ফকীর আব্দুর	:	*সূফী দর্শন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫
১১৫.	রহমান, মো. আতিকুর	:	*সমাজকল্যাণ*, ঢাকা : কোরআন মহল, ১৯৯০
১১৬.	রহমান, আফযালুর	:	*হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯
১১৭.	রহমান, চৌধুরী শামসুল	:	*সুফিদর্শন*, ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০২
১১৮.	রহমান, ড. মাহবুবুর	:	*বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭–১৯৭১*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, অক্টোবর ১৯৯৯
১১৯.	রহমান, মওলানা মাহবুবুর	:	*শিক্ষা ও সমাজসেবায় বায়তুশ শরফের অবদান*, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আনজুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ২০১৭
১২০.	রহমান, শেখ মুজিবুর	:	*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২
১২১.	রহমান, হাকিম হাবীবুর	:	*আসুদগান-এ ঢাকা*, ঢাকা : ফয়সাল একাডেমী, ১৯৪৬
১২২.	রহমানী, এস. এস. এম. আবদুল কাদের	:	*বাংলাদেশে মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমের সমস্যা ও সম্ভাবনা : একটি সমীক্ষা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২
১২৩.	রহীম, মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর	:	*শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০০
১২৪.	রহীম, মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর	:	*খিলাফতে রাশেদা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫
১২৫.	রহীম. এম. এ.	:	*বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭–১৯৪৭ খ্রি.)*, ঢাকা: আহমদ পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯
১২৬.	রহিম, ডক্টর এম. এ.	:	*বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫
১২৭.	রাজ্জাক, অধ্যক্ষ আবদুর	:	*মানব সভ্যতায় মসজিদের অবদান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭
১২৮.	রব, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুর	:	*ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯
১২৯.	রশিদ, ড. হারুন-অর	:	*বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭–২০০০)*, ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন, ২০০১

১৩০. রশীদ, মো. আবদুর : *ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭

১৩১. রায়, ড. অতুল চন্দ্র, : *ভারতের ইতিহাস*, কলিকাতা : মৌলিক লাইবেরী, ১৯৮১

১৩২. লতিফ, আবূ হামিদ : *উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪

১৩৩. শাযলি, শায়খ আবদুল কাদির : *হাকায়িক আন আল-তাসাওউফ*, মুহাম্মদ আকরাম আল-আযহারী অনূদিত, লাহোর : যাভীয়া ট্রেডার্স, ১৯৯৮

১৩৪. শাহ্জাহান, মোহাম্মদ : *শাহ্ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জীবন ও অবদান*, চট্টগ্রাম : আলহাজ্ব তাহের সোবহান, ২০১২

১৩৫. শাহ্, খাজা আবদুল মজিদ : *অজীফা ও তরীকত পীরগণের শজারা*, নওয়াপাড়া : ফাইন আর্ট প্রেস, তা. বি

১৩৬. শূর, শিব প্রসাদ : *সুফী জীবন দর্শন: প্রেক্ষিত চট্টগ্রাম*, চট্টগ্রাম : মনন প্রকাশন, ২০১০

১৩৭. সরকার, গোলাম সোলায়মান আলী : *ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দিন রুমি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪

১৩৮. সাইয়েদ, ড. আহসান : *বাংলাদেশে হাদীছ চর্চা ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৯

১৩৯. সাকলায়েন, ড. গোলাম : *বাংলাদেশের সূফী-সাধক*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩

১৪০. সাত্তার, ড. মো. আবদুস : *বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সমাজ জীবনে তার প্রভাব*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

১৪১. সামাদ, অধ্যাপক আবদুস : *আধুনিক সমাজকল্যাণ*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৭

১৪২. সারজানি, ড. রাগিব : *মুসলিমজাতি বিশ্বকে কী দিয়েছে*, আবদুস সাত্তার আইনী অনূদিত, ঢাকা : মাকতাবাতুল হাসান, ২০২১

১৪৩. সালাম, মুহাম্মদ আবদুস : *মাওলানা রুহুল আমীন : জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫

১৪৪. সালাম, ড. মুহাম্মদ আবদুস : *ফুরফুরা শরীফের তিন পথিকৃৎ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৬

১৪৫. সিদ্দীক, আ. ফ. ম. আবু বকর : *মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

১৪৬. সিদ্দীক, ড. আ. ফ. ম. আবু বকর : *বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)*, ঢাকা : হেরাল্ড প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৯৮৮

১৪৭. সিদ্দিকুল্লাহ্, মওলানা মুহাম্মদ ও অন্যান্য, : *কাশফুল রাজি ফি হল্লে সিরাজি*, ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা. বি.

১৪৮. সিরাজ, মিনজাহ-ই : *তকাতে-ই-নাসিরী*, আ. ক. ম. যাকারিয়া অনূদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩

১৪৯. সুলতানা, সৈয়দা তাহমিনা : *রাহ্‌তাল্লিল আলামীনের গৌরবময় জীবনকথা*, ঢাকা : সূফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮

১৫০. রশীদ, হারুনুর : *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩

১৫১. রায়, ভবেশ : *বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা*, ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশন, ১৯৯৮

১৫২. হক, ড. খোন্দকার সিরাজুল : *মুসলিম সাহিত্য, সমাজ চিন্তা ও সাহিত্যিক কর্ম*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪

১৫৩. হক, মেসবাহুল : *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, আবদুল গফুর সম্পাদিত, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭

১৫৪. হক, মেসবাহুল : *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭

১৫৫. হক, মুহাম্মদ লুতফুল : *ফোরকানিয়া মকতব পরিচালনা পদ্ধতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ২০০০

১৫৬. হাই, মুহাম্মদ আবদুল : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৪

১৫৭. হাই, হুমায়ন আবদুল : *মুসলিম সংস্কার ও সাধক*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৬

১৫৮. হাকিম, মো. লোকমান : *মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রহ.) : তফসীর সাহিত্যে তাঁর অবদান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১২

১৫৯. হাজারী, আবদুর রহীম : *সূফী তত্ত্বের আত্মকথা*, ঢাকা : নবরাগ প্রকাশনী, ২০০৬

১৬০. হানিফ, আনোয়ারুল কবির মো. : *কারবার সংগঠন ও পরিসংখ্যান*, ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ১৯৯৫

১৬১. হান্টার, ডব্লিউ ডব্লিউ : *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, আবদুল মওদূদ অনূদিত, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০১২

১৬২. হাবিবুল্লাহ, মুহাম্মদ : *কুতবে জমান শায়খুল আরব ওয়াল্ 'আজম আল্লামা শাহ্ হাজী মুহাম্মদ ইউনুস রহ.*, চট্টগ্রাম : আল্লামা শাহ্ ইউনুস (রহ.) একাডেমি, ২০১৪

১৬৩. হালিম, মোহাম্মদ আবদুল : *গ্রীক দর্শন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮১

১৬৪. হালদার, গোলাপ : *বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ*, ঢাকা : স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৫

১৬৫. হাসান, ড. সৈয়দ মাহমুদুল : *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী, ১৯৭৫

১৬৬. হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল : *বাংলাদেশের মসজিদ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫

১৬৭. হাসান, এ. টি. এম. রফিকুল : *বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তিন মসজিদ*, কলিকাতা : লেখা প্রকাশনী, ২০০২

১৬৮. হুসাইন, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরিফ : *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৯৬

১৬৯. হোসেন, ইমরান : *বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩

১৭০. হোসেন, অধ্যাপক ইসমাঈল ও অন্যান্য : *অর্থনীতি*, গাজীপুর : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯

১৭১. হোসাইন মুহাম্মদ তাফাজ্জল ও ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন : *মুজিযার স্বরূপ ও মুজিযা*, ঢাকা : ইসলামিক রিচার্স ইনিস্টিটিউট, ১৯৯৯

আরবি ও উর্দু উৎস

০১. আল-কুর'আনুল কারিম : সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

০২. আছ-ছা'লাভি, আহমদ আবু ইসহাক : *আল-কাশফু ওয়াল বায়ান 'আন তাফসিরিল কুর'আন*, জেদ্দা : দারুত তাফসির, ২০১৫

০৩. আজ-জওযিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম : *মাদারিজুল সালিকিন*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘আরাবি, ২০০৩

০৪. আজ-জওযিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়্যিম : *সিরাতে ওয়া মনাকিবে ‘উমর ইব্ন ‘আব্দিল ‘আযিয আল-খলিফাতুয যাহিদ*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১৯৮৪

০৫. আজ-জাওযিয়্যাহ্, ইবনুল কাইয়্যিম : *বাদা’য়িউল ফাওয়া’য়িদ*, জেদ্দা : মাজমা’উল ফিক্‌হিল ইসলামি, ২০০৮

০৬. আত-তাবারি, আবু জা‘ফর মুহাম্মদ ইবন জারির : *তারিখুল রুসুল ওয়াল মুলুক*, রিয়াদ : বায়তুল আফকারিদ দাওলিয়্যাহ,তা. বি.

০৭. আত-তিরমিযি, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা : *জামে‘ তিরমিযি*, বৈরুত : দারু এহ্ইয়াইত তুরাস আল-আরাবি, তা. বি.

০৮. আতাউল্লাহ্, ড. খিদির আহমাদ : *বায়তুশ হিকমা ফিল ‘আসরি আল-আব্বাসিয়্যিন*, কায়রো : দারুল ফিকরি আল-আরাবি, তা. বি.

০৯. আদ-দাওআদি, ড. গালিব আলি : *আল-মাদ্‌খাল ইসলা ইলমিল কানুন*, উমান : দারু ওয়াঈল লিত্ তিবাআতি ওয়ান্ নাশরি, ২০০৪

১০. আদ-দারেমি, আবু মুহাম্মদ আবদিল্লাহ : *আল-মুসনাদুল জামি‘*, বৈরুত : দারুল বাশা’য়ির আল-ইসলামিয়া, ২০১৩

১১. আদ-দেহলভি, আবদুল হক মুহাদ্দিস : *আল কাওলুল জামিল*, উর্দু অনুবাদ, করাচি : এডুকেশন প্রেস, সাঈদ কোম্পানী, আদব মনজিল, ১৯৮৫

১২. আদ-দেহলভি, আবদুল হক মুহাদ্দিস : *আখবারুল আখইয়ার*, কায়রো : আল-হায়’আতুল ‘আমাতু লিদারিল কুতুবি ওয়াল ওছায়িকিল কওমিয়্যাহ, তা. বি.

১৩. আদ-দেহলভি, আবদুল হক ইবন সাইফুদ্দিন : *মা সাবাতা বিস্ সুন্নাত ফি আইয়্যামিস্ সানাহ*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ২০১৮

১৪. আদ-দেহলভি, শাহ্ আবদুল আযিয : *তাফসিরে আযিযি*, দিল্লি : এদারায়ে ইসলামিয়্যাহ, ১৮৫০

১৫. আন-নওশাহরবি, আবু ইয়াহইয়া : *তারাজিমে উলামায়ে হিন্দ*, ফয়সালাবাদ : জামি‘আ সালাফিয়া, ১৯৮১

১৬. আবিদিন, মুহাম্মদ আমিন ইব্ন ‘উমর : *হাশিয়া ইব্ন আবিদিন*, কায়রো : ‘আলিমুল কুতুব, ২০০৩

১৭. আল-আবশিহি, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আবিল ফতহি : *আল-মুস্তাতরাফ ফি কুল্লি ফন্নি মুস্তাযরফ*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩

১৮. আল-জুরজানি, আলি আশ-শরিফ : *আত-তারিফাত*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবি, ১৯৮৪

১৯. আন্-নববি, ইয়াহ্ইয়া ইবন শারফ : *আল্-আযকার*, সৌদি আরব : মাক্কাতুল মুকাররামা, ২০০৩

২০. ‘আবদুল্লাহ্, ড. হাশেম জামিল : *আসারু ‘ইলালিল হাদিস ফি ইখতিলাফিল ফুকাহা*, ইরাক : সাদ্দাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯

২১. আমিন, সায়্যিদ : *মা‘আরিবুত তালাবা*, মায়ানমার : দারুল উলুম মুহাম্মদিয়া, তা. বি.

২২. আয-যারকানি, আবদুল করিম : *মানাহিলুল ‘ইরফান ফি ‘উলুমিল কুরআন*, রিয়াদ : মাকতাবাতু মাযালি মুস্তফা আল-বায, ১৯৯৬

২৩. আয-যায়্যাত, আহমদ হাসান : *তারিখুল আদাবিল ‘আরবি*, বৈরুত : দারুল মা‘রিফাহ, ১৯৮৭

২৪. আয-যাহাবি, ড. মুহাম্মদ হুসাইন : *আত-তাফসির ওয়াল মুফাসসিরুন*, মিশর : মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ১৯৭৬

২৫. আয-যাহাবি, শামসুদ্দিন : *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, বৈরুত : মুওয়াসসাতুল রিসালাহ, ১৯৯৩

২৬. আল-আবদ, ড. আবদুল লতীফ মুহাম্মদ : *আল-তাসাওউফ ফিল ইসলাম*, কায়রো : জামেয়া আল-কাহেরা কুল্লিয়্যাত দারুল উলুম, ১৯৮৬

২৭. আল-আলুসি, শিহাবুদ্দিন : *রূহুল মা'আনি*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪

২৮. আল-কাত্তান, মান্না খলিল : *তারিখুল তাশরিইল ইসলামি*, কায়রো : মাকতাবতু ওয়াহাবাহ, ২০০১

২৯. আল-কস্তুলানি, শিহাবুদ্দিন : *আল-মাওয়াহিবুল লাদুনিয়াহ*, কায়রো : আল-মাকতাবাতু তাওফিকিয়্যাহ, ২০১০

৩০. আল-কাসেমি, জামাল উদ্দিন : *কাওয়াইদুত তাহ্দিস মিন ফুনুনি মুসতালাহিল হাদিস*, বৈরুত : দারুল নাফায়েস, ২০০১

৩১. আল-কুবায়সি, মুহাম্মদ 'উবায়দ 'আবদুল্লাহ্ : *আহকামুল ওয়াক্ফ ফিশ শরি'আতিল ইসলামিয়া*, বাগদাদ : ওযারাতুল আওকাফ, ১৯৭৭

৩২. আল-কুশাইরি, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : *সহিহ মুসলিম*, কায়রো : দারু এহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা. বি.

৩৩. আল-খতিব, ড. মুহাম্মদ 'উজাজ : *উলুমুল হাদিস*, বৈরুত : দারুল ফিক্হ, ২০০১

৩৪. আল-গাযালি, আবু হামিদ ইব্ন মুহাম্মদ : *ইহইয়াউ 'উলুমিদ দীন*, মিসর : মুস্তফা হালাবী, ১৯৩৯

৩৫. আল-জায়াইরি, আবু বকর জাবির : *'আকিদাতুল মু'মিন*, জেদ্দা : দারুস সুলুক, ১৯৮৭

৩৬. আল-জুরজানি, সাইয়েদ শরিফ : *কিতাবুত তা'রিফাত*, করাচি : কদিমি কুতুবখানা, তা. বি.

৩৭. আল-বাগদাদি, ইবনুন নাজ্জার : *যায়লু তারিখি বাগদাদ*, বৈরুত : মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৬

৩৮. আল-বাগাভি, মহিউস্ সুন্নাহ : *মা'আলিমুত তানযিল*, রিয়াদ : দারু তাইয়িবাহ, ১৯৯৭

৩৯. আল্-বুখারি, মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল : *সহিহ্ বুখারি*, বৈরুত : দারুল কাসির, ইয়ামাহ, ১৯৮৭

৪০. আল-বুখারি, 'আলাউদ্দিন 'আবদুল 'আযিয : *কাশফুল আসরার 'আন উসুলি ফাখরিল ইসলাম আল-বাযদাভি*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'আরাবি, ১৯৭৪

৪১. আল-মাওয়ার্দি, আবুল হাসান : *আন-নুকাত ওয়াল 'উয়ুন (তাফসিরুল মাওয়ার্দি)*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০১০

৪২. আল-হাশিমি, আহমদ : *জাওয়াহিরুল আদাব*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, তা. বি.

৪৩. আলবানি, আল্লামা নাসির উদ্দিন : *সহিহ আত-তারগিব ওয়াত তারহিব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'রিফ, ১৯৯৫

৪৫. আল-বাগাভি, মহিউস সুন্নাহ : *শরহুস সুন্নাহ*, বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৯৮৩

৪৬. আল-আলুসি, শিহাবুদ্দিন : *তাফসিরে রূহুল মা'আনি*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫

৪৭. আল-হানফি, মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীন : *হাশিয়াহ্ শায়খ যাদাহ্ আলা তাফসির আল কাযি আল-বায়দাভি*, ইস্তাম্বুল : হাকিকাত কিবাবিভি, ১৯৯৪

৪৮. আল-হাশিমি, আহমদ : *জাওয়াহিরুল আদাব*, বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, তা. বি.

৪৯.	আলী, সাইয়্যিদ আলতাফ	:	*হায়াতে হাফিজ রহমত খান*, বাদায়ূন : নেযামি প্রেস, তা. বি.
৫০.	আশ-শাতিবি, ইবরাহিম ইব্ন মুসা	:	*আল-মুওয়াফাকাত ফি উসুলিশ শরি'আহ্*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩
৫১.	আসকালানি, ইব্ন হাজার	:	*'উমদাতুল কারি*, দিল্লি : রশিদিয়া লাইব্রেরি, তা. বি.
৫২.	'আসকালানি, আহমদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাজর	:	*ফতহুল বারি ফি শরহি সহিহিল বুখারি*, কায়রো : মাকতাবাতুস সাফা, ২০০৩
৫৩.	'আসকালানি, আহমদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাজর	:	*নুযহাতুন নাযার ফি তাওহিদে নুখবাতিল ফিক্র*, ঢাকা : নাদিয়াতুল কুরআন, তা. বি.
৫৪.	আস-সাম'আনি, আবু সা'ঈদ আবদুল করিম	:	*আদাবুল ইমলা ওয়াল-ইসতিমলা*, জেদ্দা : মাতবা'আতুল মাহমুদিয়্যাহ, ১৯৯৩
৫৫.	আস-সারাখ্সি, শামসুদ্দিন	:	*আল-মবসুত*, বৈরুত : দারুল মা'রিফ, ১৯৯৮
৫৬.	আস-সারাখসি, আবু বকর মুহাম্মদ	:	*উসুলুস সারাখসি*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৩
৫৭.	আস-সিবায়ি, মুস্তাফা ইব্ন হাসনি	:	*মিন রাওয়ায়িয়ি হাদারাতিনা*, দিমাশ্ক : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২০০৯
৫৮.	আস-সুয়ুতি, আল্লামা জালাল উদ্দিন	:	*আল-দুররুল মনছুর ফি তাফসিরিল মা'ছুর*, কায়রো : মারকাযুল হিজর লিল বুহুছি ওয়াদ দিরাসাতিল 'আরাবিয়্যাহ ওয়াল ইসলামিয়্যাহ, ২০১১
৫৯.	আস-সুহরাওয়ার্দি, আবু হাফস 'উমার	:	*'আওয়ারিফুল মা'আরিফ*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইসলমিয়্যাহ, ১৯৯৯
৬০.	আশ'আছ, আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল	:	*সুনান আবি দাউদ*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি.
৬১.	আস্তারাবাদে, মুহাম্মদ কাসিম হিন্দু শাহ	:	*তারিখে ফেরেস্তা*, তেহরান : আন্‌জুমনে আছারে ওয়া মফাখিরে ফরহাঙ্গি, ১৯৭৩
৬২.	আসির, মাজিদুদ্দিন ইবনুল	:	*আল-নিহায়া ফি গরিবিল হাদিস ওয়াল-আসর*, বৈরুত : আল-মকতবাতুল 'ইলমিয়্যা, ১৯৭৯
৬৩.	আহমদ মাদানি, সাইয়্যিদ হুসাইন	:	*নক্শে হায়াত*, করাচি : দারুল ইশা'আত, তা. বি.
৬৪.	ইবনু 'আইয়াদ, আহমদ	:	*আল-মাফাখিরুল 'আলিয়্যাতু ফিল মা'ছারিশ শাযিলিয়্যাহ্*, কায়রো : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০১৬
৬৫.	ইবনুল আছির, আবুস সা'আদাত আল-মুবারক	:	*আন-নিহায়াহ ফি গরিবিল আছার*, বৈরুত : দারুল কতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯
৬৬.	ইবনু 'আবেদিন	:	*রদ্দুল মুখতার*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৬৬
৬৭.	ইব্ন আবি উসাইবি'আ	:	*উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, কায়রো : দারুল মা'রিফ, ১৯৯৬
৬৮.	ইব্ন আলি, আহমদ	:	*মারাহ আল-আরওয়াহ*, দিল্লি : মাকতবায়ে থানভিয়্যাহ, তা. বি.
৬৯.	ইবনুল আসির, মুহাম্মদ	:	*আল-কামিল ফিত তারিখ*, রিয়াদ : বায়তুল আফকারিদ দাওলিয়্যাহ,তা. বি.
৭০.	ইব্ন কাসির, আবুল ফিদা 'ইমাদুদ্দিন ইসমা'ঈল	:	*তাফসিরুল কুর'আনিল 'আজিম*, দারু তিবাতি লিন নশর ওয়াত-তাওযি', ১৯৯৯
৭১.	ইবনু খালদুন, আবদুর রহমান	:	*তারিখু ইবনি খালদুন*, বৈরুত : দারু কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ,

১৯৯২

৭২. ইব্‌ন খুযাইমা, আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক : *আস-সহিহ*, বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৯৭০

৭৩. ইব্‌ন তাইমিয়্যাহ, তাকি উদ্দিন আহমদ : *আল-উবুদিয়াতু*, বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২০০৫

৭৪. ইব্‌ন মাজাহ, মুহাম্মদ ইবন ইয়াযি : *সুনান ইবন মাজাহ*, বৈরুত : দারুল ফিকর, তা. বি.

৭৫. ইব্‌ন মুস্তফা, শায়খ ইসমাঈল হক্কি : *তাফসিরে রুহুল বায়ান*, বৈরুত : দারু কুতুবিল ‘ইলমিয়্যাহ, তা. বি.

৭৬. ইব্‌ন মুহাম্মদ, আবু আবদিল্লাহ ‘উবাইদিল্লাহ : *আল্-ইবানাতুল কুব্‌রা*, রিয়াদ : দারুল রা’য়াতে, ১৯৯৪

৭৭. ইব্‌ন সা‘দ, আবদুল্লাহ্ : *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, বৈরুত : দারু সাদির, তা. বি.

৭৮. ইব্‌ন হিব্বান, মুহাম্মদ : *আস-সহিহ*, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩

৭৯. ইহসান, মুফতি সাইয়েদ ‘আমিমুল : *কাওয়াইদুল ফিক্‌হ*, দেওবন্দ : আশরাফি বুক ডিপো, ১৯৯১

৮০. উসমানি, মুফতি মুহাম্মদ তাকি : *ইসলাহি মাজালিস*, ইউ, পি : যমযম প্রকাশনী, ২০০৭

৮১. ওয়াকিদি, মুহাম্মদ বিন ‘উমর : *আল-মাগাযী*, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৬৬

৮২. ওয়াহ্‌হাব, আল-ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল : *মুখতাসারু সিরাতিল রসুল (সা.)*, সৌদিআরব : ওযারাতুল ’উয়োনিল ইসলামিয়া ওয়াল আওকাফ, ১৪১৮

৮৩. কাদিরি, সায়্যিদ ওয়াজ্‌হাতুর রাসুল : *আহলে তাসাউরে জিহাদ*, লাহোর : রেযা একাডেমি, তা. বি.

৮৪. কারি, মোল্লা আলি : *মিরকাতুল মাফাতিহ শরহু মিশকাতিল মাসাবিহ*, দিল্লি : ইশ‘আতুল ইসলাম কুতুবখানা, তা. বি.

৮৫. কায়ুম, আবদুল : *তারিখে আদবিয়ানে মুসলমানে পাকিস্তান ও হিন্দ*, পাঞ্জাব : পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, ১৯৭২

৮৬. কুরতুবি, আবু আবদুল্লাহ্ : *আল-জামি‘ লি আহকামিল কুর’আন*, কায়রো : দারুশ শা‘ব, ১৯৭২

৮৭. কুশাইরি, আবদুল করিম : *আর-রিসালাতুল কুরাইশিয়্যাহ ফি ‘ইলমিত তাসাওউফ*, কায়রো : দারুল কুতুবিল ‘আরাবিয়্যাহ আল-কুবরা, ২০১৯

৮৮. খাদিম, আবু সা‘ঈদ মুহাম্মদ : *বারীকাতুন মাহমুদিয়্যাতুন ফি শারহিত তারিকাতিল মুহাম্মদিয়্যাহ*, কায়রো : মাতবা‘আতুল হালভি, ১৯২১

৮৯. খাযিন, আলাউদ্দিন : *লুবাবুত তা’ভিল (তাফিসিরুল খাযিন)*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮৭

৯০. গাযালি, আবু হামিদ : *ইহ্‌ইয়াউ উলুমিদ্দিন*, কায়রো : দারুল ফজরি লিত তুরাস, ১০৯৬

৯১. জামি, নুরউদ্দিন আবদুর রহমান : *নাফাহাতুল উন্‌স*, করাচি : মদিনা পাবলিশিং কোম্পানি, ১৯৮২

৯২. তবরানি : *আল-মু‘জামুস সগির*, বৈরুত : আল-মকতাবুল ইসলামি, ১৯৮৫

৯৩. থানভি, আশরাফ আলি : *তালিমুদ্দিন*, ঢাকা : এমদাদিয়া প্রেস, ১৯৮০

৯৪. নজদি,শেখ মোহাম্মদ ইবন্ আবদুল ওয়াহাব : *মুখতাছারু সিরাতির রাসুল*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল ‘আরাবি, ১৯৫৬

৯৫. নদবি, আবুল হাসান আলি : *আল-ইসলাম ওয়া আসারুহু ফিল হাদারাতি ওয়া ফাদলুহু*

			‘আলাল ইনসানিয়্যাহ, বৈরুত : দারু ইবনে কাসির, ১৯৯৯
৯৬.	নদবি, আবুল হাসান আলি	:	*মাযা খাসিরাল ‘আলামু বিইন্হিতাতিল মুসলিম*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল ঈমান, ২০১৪
৯৭.	নদবি, সাইয়িদ সুলায়মান	:	*আস-সিরাতুল নাবাবিয়্যাহ্*, বৈরুত : দারু ইবনে কাসির, ২০০২
৯৮.	নাসা‘ঈ, আহমদ বিন শু‘আইব	:	*সুনান আন্-নাসা‘ঈ*, দামেস্ক : হালাব, মাকতাবুল মাতবু‘আত আল-ইসলামিয়্যাহ, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৬
৯৯.	নাসা‘ঈ, আহমদ বিন শু‘আইব	:	*আস-সুনানুল কুবরা*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯১
১০০.	নাসার, ড. আলি মুহাম্মদ	:	*আন-নাহ্জুল হাদিস ফি মুখতাসারি ‘উলুমিল হাদিস*, মক্কাতুল মুকার্‌রামাহ : ইদারাতুছ ছাহাফাতি ওয়ান নাশরি, ১৯৮৫
১০১.	নিযামি, খালিক আহমেদ	:	*তারিখে মাশায়েখে চিশত*, দিল্লি : নাদ্ওয়াতুল মুসান্নিফিন, ১৯৬৩
১০২.	বাতিন, মাওলানা আবদুল	:	*সিরাতে মওলানা কারামত আলি জৌনপুরি*, এলাহাবাদ : আসরারে করিমি প্রেস, ১৩৬৮
১০৩.	বায়দাবি, কাযি নাসিরুদ্দিন	:	*তাফসিরে বায়দাবি*, দেওবন্দ : কুতুবখানা মুজতাবায়ি, তা. বি.
১০৪.	বায়হাকি, আহমদ ইব্ন হুসাইন	:	*শু‘আবুল ঈমান*, বৈরুত : দারুল কুতবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১০
১০৫.	মিরদাভি, আবুল হাসান ‘আলি	:	*আত-তাহবির শারহুত তাহরির*, রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০০
১০৬.	মিয়া, সাইয়্যিদ মুহাম্মদ	:	*উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযি*, দিল্লি : কিতাবিস্তান এম ব্রাদার্স, ১৯৮৫
১০৭.	মুহাম্মদ, হুসাইন ইবনে	:	*আল-মুফরাদাত ফি গরিবিল কুর’আন*, কায়রো : আল-মকতাবাতুল তাওফিকিয়্যাহ, ২০১৫
১০৮.	যামাখশারি, আবুল কাসিম মাহমুদ	:	*আল-ফা’য়িক ফি গরিবিল হাদিস*, বৈরুত : দারুল মা‘রিফাহ, তা. বি.
১০৯.	যামাখশারি, আবুল কাসিম মাহমুদ	:	*আল-কাশশাফ ‘আন হাকা’য়িকিত তানযিল*, বৈরুত : দারুল মা‘রিফাত, তা.বি.
১১০.	যামাখশারি, আবুল কাসিম মাহমুদ	:	*রবি‘উল আবরার*, বৈরুত : মু‘আস্‌সাসাতুল আ‘লমি, ১৯৮১
১১১.	যাহির, ইহসান ইলাহি	:	*আত-তাসাওউফ : আল-মানশা’ ওয়াল মাসাদির*, লাহোর : ইদারায়ে তরজুমানুস সুন্নাহ, তা. বি.
১১২.	রহমান, আবদুর	:	*তাহরীকে রেশমি রুমাল*, লাহোর : ক্লাসিক উর্দু প্রেস, ১৯৬০
১১৩.	রহিম, যয়নুদ্দীন আবিল ফযল ইব্ন আবদির	:	*শরহুত তাসরিব ফি শরহিত তাকরিব*, বৈরুত : এহইয়ায়িত তুরাসি আরাবি, তা. বি.
১১৪.	শফী, মুফতি আহমদ	:	*ফুয়ুযাতে আহমদিয়্যাহ*, চট্টগ্রাম : মাকতাবাতুল মাদানি, তা. বি.
১১৫.	শারবিনি, মুহাম্মদ আল-খতিব	:	*মুগনিউল মুহতাজ ফি আলফালি মিনহাজ*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৯৯৪
১১৬.	শুরুনবুলারি, হাসান ইব্ন ‘আম্মার ইবন্ আলী	:	*মারাকিউল ফালাহ ফি শরহে নুরুল ইযা*, বৈরুত : আল-মাকাতাবাতুল ‘আসরিয়্যাহ, ২০০৫
১১৭.	শেরকুঠি, মুহাম্মদ আনওয়ারুল হক	:	*হায়াত-এ ‘উসমানি*, করাচি : মাকতাবা-এ দারুল উলুম, ১৯৮৫
১১৮.	সবরি, আহমদ মুহাম্মদ	:	*দায়িরাতুল মা‘আরিফিল ইসলামিয়্যাহ*, জেরুজালেম :

			মাকতাবাতুন নুর, ২০২০
১১৯.	সাবুনি, মুহাম্মদ 'আলি	:	*আত-তিব্ইয়ান ফি 'উলুমিল কুরআন*, মক্কাতুল মুকার্রামা : দারুস-সাবুনি, ২০০৩
১২০.	সাইলি, মুবারক ইবন মুহাম্মদ	:	*আশ-শিরক ওয়া মাজাহিরুহু*, মদিনা মুনাওয়ারা : ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা মুনাওয়ারাহ, ১৪০৭
১২১.	সুয়ুতি, আবদুর রহমান জালালুদ্দিন	:	*আল্-ইতকান ফি উলুমিল কুর'আন*, দিল্লি : মাকতাবাতু ইশা'আতিল ইসলাম, তা. বি.
১২২.	সুয়ুতি, আবদুর রহমান জালালুদ্দিন	:	*মিফতাহুল জান্নাহ ফিল-ইহতিজাজি বিস-সুন্নাহ*, মদিনা মুনাওয়ারা : আল-জামি'আতুল ইসলামিয়্যাহ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৮
১২৩.	সুহাইলি, আবদুর রহমান	:	*আর-রওযুল ইনুফ*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০৯
১২৪.	হাম্বল, আহমদ ইব্ন	:	*আল-মুসনদ*, কাইরো : মুআসসাসাতু কুরতুবাহ ও দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৮
১২৫.	হাম্বলি, 'আলা উদ্দিন	:	*আল-ইনসাফ ফি মা'রিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ লিল মরদাভি*. বৈরুত : দারু ইহইয়ায়িত তুরাসিল 'আরাবি, তা. বি.
১২৬.	হাসান, ড. হাসান ইব্রাহিম	:	*তারিখুল ইসলাম*, কায়রো : মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়া, ১৯৯১
১২৭.	কান্ধলভি, মুহাম্মদ ইদরিস	:	*খুতবাতে মাদানি*, দেওবন্দ : যম্যম বুক ডিপো, ১৯৯৭

ইংরেজি উৎস

01.	Ahmad, D.S.	:	*Asceticism, its Essence and Growth,* Index Islamicus, LXI, 1993
02.	Aristotle	:	*Politics,* Translated by Benjamin Jowett, Batto che Books Kitchener, 1999
03.	Akhand, Latifa	:	*Social History of the Muslims in Bengal,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1981
04.	Alam, Shamsul	:	*Islamic Thought,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1986
05.	Ali, Dr. A. K. M. Ayub	:	*History of Traditional Islamic Education in Bangladesh,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh 1983
06.	Ali, Muhammad Mohar	:	*History of the Muslims in Bengal,* Vol-1A, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 2003
07.	Beaunissant, Vionie	:	*The Religion of Islam,* Delhi : Motilal Banarasidass, 1994
08.	Dr. Iqbal,	:	*The Development of Metaphysics in Parsia : A Contribution to the History of Muslim Philosophy,* Lahore : Bazm-e-Iqbal, 1954
09.	Dutta, Romesh Chunder	:	*The Economic of Indian tn the Victorian Age :From the Accession of Queen Victoria in 1837,* London : 1908
10.	Friedlander, Watter A.	:	*Introduction to Soial welfare,* Prentice Hall, New Delhi, 1963

11. Giddings, Franklin Henry : *The Elements of Sociology*, New York : The Macmillan Company, 1906

12. Graves, Idris Shah : *The Sufis*, New York : Doubledy & company, 1994

13. Hai, Sayed Abdul : *Muslim Philosophy*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1982

14. Hudson, W. H. : *An introduction of the study of literature*, London : Harrap and Co. 1949

15. Jock, J. C. : *Bengal District Gazetters : Bakargong* (Bengal District Gazetteer Vol 36), Calcutta : Bengal secretariat book depot, 1918

16. Khandakar, Mahbub Karim : *The Provinces of Bihar and Bengal under Shajahan*, Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh Publication, 1974

17. Karim, Dr. Abdul : *Social History of the Muslims in Bengal (Down to A. D. 1538)*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1979

18. Karim, Abdul : *Muhammadan Education in Bengal*, Calcutta : Metealfe Press, 1900

19. Kapur, Adam : *The Social Science Encyclopaedia*, London : Library of Contaloging in Publication Data

20. Khan, S. U. : *A Measure of Economic Growth in East and in West Pakistan*, Islamabad : Pakistan Institute of Development Economics, 1961

21. Maciver, Robert Morrison & Charles Harrison Page, : *Society : an introductory analysis*, New York : Rinehart, 1949

22. Misra, Bankey Bihari : *The Indian Middle Classes : Their Grouth in Modern Times*, Bombay : Oxford University Press, 1961

23. Murry, T. Titus : *Islam in India and Pakistan*, Madrasha : The Diocesam Press, 1959

24. Nicholson, A. Reunold : *The Mystics of Islam*, London : George Bell & sons Ltd.,1914

25. Price, Kingsley : *Education and Philosophical Thought*, Boston : Allyn and Bacon, 1967

26. Qureshi, Ishtiaq Husain : *Ulema in Politics*, Delhi : Renaissance Publishing House, 1985

27. Rashid, Dr. Muhammad : *Growth and Development of Fiqh in Bengel*, Unpublished Thesis, University of Dhaka, 1990

28. Seligman, Edwin Robert Anderson and Alvin Saunders Johnson : *Encyclopaedia of Social Sciences*, New York : The Macmilan Company, 1963

29. Sufia, Ahmed : *Muslim Community in Bengal*, Oxford University Press 1974

30. Trimingham, J. Spencer : *The Sufi orders in Islam*, Oxford : Oxford University Press, 1982

31. Valiuddin, Dr. Mir. : *The Quranic Sufism*, Delhi : Motilal Banarsidan, 1959

32. Wickenden, Elizabath : *Social Welfare in Changing World*, Washingtion : Department of Health Education and Wealfare, 1965

33. Welensky, Harold L. : *Industrial Society and Social welfare*, Russel Sage foundation, New York, 1958

সম্পাদিত উৎসসমূহ

০১. আল-আয্হারী, শায়খ মো. আনোয়ারুল হক : *তাজবীদ কালার সহীহ্ ওয়াজ্বীফাহ্*, চট্টগ্রাম : নিভাদ ওয়েলফেয়ার কমিউনিটি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০২০

০২. আল-মুতী, আবদুল্লাহ্ ও অন্যান্য সম্পাদিত : *শিশু বিশ্বকোষ*, ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, খ.১-৪, ১৯৯৭

০৩. ইসলাম সিরাজুল সম্পাদিত : *বাংলাপিডিয়া*, খ.১–১০, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩

০৪. ইসলাম, ড. সিরাজুল সম্পাদিত : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩

০৫. ইসলাম, মওলানা এ. এম. এম. সিরাজুল ও অন্যান্য সম্পাদিত : *ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯

০৬. উদ্দিন, আ.ত.ত. মুছলেহ ও অন্যান্য সম্পাদিত : *আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬

০৭. উদ্দীন, প্রফেসর মওলানা মোহাম্মদ সালাহ ও অন্যন্য কর্তৃক সম্পাদিত : *আল-কুরআনুল কারীম সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০

০৮. উল্লাহ, মুহাম্মদ জাফর সম্পাদিত : *আল আছ্রার*, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ১৯৯৬

০৯. উল্লাহ, মুহাম্মদ জাফর সম্পাদিত : *জান্নাতের পথে বায়তুশ শরফের পীর*, আল-আছ্রার, স্মারক গ্রন্থ, চট্টগ্রাম, বায়তুশ শরফ, ১৯৯৮

১০. উল্লাহ, মুহাম্মদ জাফর সম্পাদিত : *বায়তুশ শরফের ত্রিরত্ন*, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০১০

১১. উল্লাহ, মুহাম্মদ জাফর সম্পাদিত : *বায়তুশ শরফের আয়না*, চট্টগ্রাম : বায়তুশ শরফ আন্জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ, ২০১১

১২. খান, কামরুজ্জামান সম্পাদিত : *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : কিশোরগঞ্জ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪

১৩. চৌধুরী, নূরুল আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত : *আমাদের সুফিয়ায়ে কেরাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫

১৪. নদভী, মওলানা আবদুল হাই সম্পাদিত : *ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*, চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমী, ১৯৯৯

১৫. নদভী, মওলানা আবদুল হাই সম্পাদিত : *আধ্যাত্মিক সাধক ও সমাজ সংস্কারক বায়তুশ শরফের পীর ছাহেব*, চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ শরফ একাডেমি, ২০০৫

১৬. নদভী, মওলানা আবদুল হাই সম্পাদিত : *আধ্যাত্মিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র বায়তুশ শরফের পীর হযরত শাহ্ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)*,

			চট্টগ্রাম : শাহ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমি, ১৯৯৯
১৭.	নদভী, মওলানা আবদুল হাই সম্পাদিত	:	*নিবেদিত কবিতা*, চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ্ শরফ একাডেমী, ১৯৯৮
১৮.	নদভী, মুহাম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত	:	*নিবেদিত কবিতা*, চট্টগ্রাম : শাহ্ আবদুল জব্বার আশ্ শরফ একাডেমী, ১৯৯৮
১৯.	ফরিদী, আ. ফ. ম. আবদুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত	:	*ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.১–২০, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬–২০০০
২০.	ফরিদী, আ. ফ. ম. আবদুল হক ও অন্যান্য কর্তৃক সম্পাদিত	:	*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.১-২, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬-১৯৮৭
২১.	রহমান, প্রফেসর নীলুফার সম্পাদিত	:	*মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল*, ঢাকা : উপনুষ্ঠানিক মিক্ষা অধিদপ্তর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, ১৯৯৭
২২.	সম্পাদনা পরিষদ	:	*ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯
২৩.	সম্পাদনা পরিষদ	:	*সাতকানিয়ার শ্রেষ্ঠ ১০০ আলেমের জীবনী*, চট্টগ্রাম : বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষক পরিষদ, সাতকানিয়া, ২০১২
২৪.	সম্পাদনা পরিষদ	:	*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০
২৫.	সম্পাদনা পরিষদ	:	*ইসলামিয়াত*, ঢাকা : ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইফাবা, ১৯৯৬
২৬.	হক, ড. সিরাজুল ও অন্যান্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত	:	*বাংলাপিডিয়া*, খ.১–১৪, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩
২৭.	হাকিম, খান বাহাদুর আবদুল সম্পাদিত	:	*বাংলা বিশ্বকোষ*, খ.১–৪, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২-১৯৭৬
২৮.	হোসেন, সেলিনা ও নুরুল ইসলাম সম্পাদিত	:	*বাংলা একাডেমি চরিতাভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫

অভিধান (বাংলা/ আরবি/ ইংরেজি)

০১.	আবু হাবিব, সাদি	:	*আল-কামুসুল ফিকহি*, করাচি : ইদারাতুল কুরআন, ১৩৯৭
০২.	আল-আযহারি, মুহাম্মদ 'আলাউদ্দিন	:	*আরবি-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৫
০৩.	আল-ইস্পাহানি, রাগিব	:	*আল-মুফরাদাত ফি গরিবিল-কুরআন*, কায়রো : আল-মাকতাবাতুত্-তাওফীকিয়্যাহ্, তা.বি
০৪.	আল-ফায়উমি, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলি	:	*আল-মিসবাহুল মুনির*, বৈরুত : দারুল কিতাবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪
০৫.	আল-রাযি, কাদির	:	*মুখতারুস সিহাহ*, বৈরুত : দারুল ফিক্‌র আরবি, ১৯৯৭
০৬.	ইবনু মন্‌জুর, আবুল ফযল জামাল উদ্দিন	:	*লিসানুল 'আরব*, বৈরুত : দারু সাদের, তা. বি.
০৭.	কিলাজি, ড. মুহাম্মদ রওয়াস ও অন্যান্য	:	*মু'জামু লুগাতিল ফোকহা*, বৈরুত : দারুন নাফায়িস ১৯৮৮
০৯.	চৌধুরী, জামিল সম্পাদিত	:	*বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৬

১১.	চৌধুরী, জামিল সম্পাদিত	: *বাংলা একাডেমি বাংলা বানান-অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৩
১২.	নদভী, মওলানা হাবীবুর রহমান মুনির	: *মিসবাহুল লুগাত*, ঢাকা : ইসলামিয়া কুতুবখানা, ২০০০
১৩.	মুখতার, ড. আহমদ	: *মু'জামুল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ আল-মু'আসিরাহ*, বৈরুত : দারু 'আলামিল কুতুব, ২০০৮
১৪.	মা'লুফ, লুইস	: *আল-মুনজিদ ফিল লুগাতিল ওয়াল 'আলাম*, বৈরুত : দারুল মাশরিক, ১৯৯২
১৫.	মাদকুর, ইবরাহিম	: *আল-মু'জামুল ওসিত*, কায়রো : মাজ'মাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, ১৯৭২
১৬.	রহমান, ড. মুহাম্মদ ফজলুর	: *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯
১৭.	সুফিয়ান, মাওলানা আবু ও অন্যান্য	: *ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ*, ঢাকা : রশিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৮
১৮.	হক, ড. মুহাম্মদ এনামুল সম্পাদিত	: *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১৪
১৯.	Ali, Mohammad	: *Bangla Academy Bengali-English Dictionary,* Dhaka : Bangla Academy, Twenty ninth Reprint, November, 2011
২০.	Baalaki, Dr. Rohi	: *AL-Mawrid,* Lebanon : Dar El-ilm Lilmalayin, Eighth Edition, 1996
২১.	Hughes, Thomas Patrick	: *Dictionary of Islam,* New Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1976
২২.	Siddiqui, Zillur Rahman	: *Bangla Academy English-Bengali Dictionary,* Dhaka : Bangla Academy, 12th Reprint, January 1998 A. D.
২৩.	Wehr, Hans	: *A Dictionary of Modren Written Arabic*, London : 3rd printing, May 1980

জার্নাল ও পত্র-পত্রিকা

১. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ত্রৈমাসিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
বিভিন্ন সংখ্যা:

(ক) ২৭ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৮
(খ) ৩৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০০
(গ) ৪১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০২
(ঘ) ৪৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৩
(ঙ) ৪৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৭
(চ) ৪৯ বর্ষ, ২য়, অক্টোবর-নভেম্বর, ২০০৯
(ছ) ৫৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০১৬
(জ) ৫৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৬

২. *আল-আছরার (সাময়িকী)*, বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চট্টগ্রাম।
বিভিন্ন সংখ্যা:

(ক) আল-আছরারে বায়তুশ শরফ-জানুয়ারি, ১৯৮৬
(খ) আল-আছরার (শহীদ হাফেয আব্দুর রহীম সংখ্যা), মার্চ, ১৯৮৭
(গ) আল-আছরার, জানুয়ারি ১৯৮৮
(ঘ) আল-আছরার, জানুয়ারি ১৯৮৯
(ঙ) আল-আছরার ('উলামায়ে কিরাম ও মনীষীদের দৃষ্টিতে বায়তুশ শরফের পীর সাহেব), ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০
(চ) আল-আছরার (হুজুর কেবলার আমেরিকা সফর), ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২
(ছ) আল-আছরার (বায়তুশ শরফের মর্মকথা), জানুয়ারি, ১৯৯৩
(জ) আল-আছরার (এ দেশ শাহ্ জালাল, খান জাহান, শাহ্ মাখদুম ও শাহ্ আখতরের), জানুয়ারি ১৯৯৪
(ঝ) আল-আছরার (সমাজসেবক ও আধ্যাত্মিক সাধক বায়তুশ শরফের পীর সাহেব), ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫
(ঞ) আল-আছরার (বায়তুশ শরফ আমার ভালবাসা), জানুয়ারি, ১৯৯৬
(ট) আল আছরার (বায়তুশ শরফের মর্মবাণী), জানুয়ারি, ১৯৯৭
(ঠ) আল-আছরার (আবদুল কাদের জিলানি রহ., ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮
(ড) আল-আছরার (হুজুর কেবলা রহ. এর স্মরণে), ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯

৩. *ইসলামী ঐতিহ্য*, ১ম সংখ্যা, জুন ১৯৮৫ (বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র)
৪. *গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক ১৯৯৪-১৯৯৮*, চট্টগ্রাম: বায়তুশ শরফ আন্জুমনে ইত্তেহাদ বাংলাদেশ
৫. *বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা বার্ষিক ম্যাগাজিন :*
   (ক) *আন্-নকীব দোয়া ও বিদায়ী স্মারক গ্রন্থ'০৯*
   (খ) ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বার্ষিকী *আলো* ১৯৯৬-১৯৯৮
৬. *চুনতি হাকিমিয়া কামিল মাদ্রাসা, আন্জুমন ২০১০, ২০০ বছর পূর্তি সংখ্যা (১৮১০–২০১০)*, আন্জুমনে তোলাবায়ে সাবেক্বীন, চট্টগ্রাম
৭. *দ্যা ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল-অব ইসলামিক স্টাডিজ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানু-জুন ২০০৭
৮. *মনযিল*, ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম, ২০০৩
৯. *আশ্-শরফ*, আবুল হায়াত মুহাম্মদ তারেক (সম্পাদিত), কক্সবাজার : বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ১৯৯৮
১০. *মাসিক দ্বীন দুনিয়া*, চট্টগ্রাম: স্মরণ সংখ্যা, মে ১৯৯৮

১১. দৈনিক পত্রিকা

i) *দৈনিক আজাদী*, চট্টগ্রাম, ১৭ জুলাই, ২০১২
ii) *আলোকিত লোহাগাড়ার আলো*, চট্টগ্রাম : ১ম সংখ্যা, ৮ জানুয়ারি, ২০১৬
iii) *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা :
   (ক) ২৬ মার্চ, ১৯৯৮
   (খ) ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৮
   (গ) ১৪ মার্চ, ১৯৯৯
   (ঘ) ১৮ মে, ২০০০
   (ঙ) ১৭ মে, ২০১৩

i) *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা : ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩
ii) *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ঢাকা :
   (ক) ২৫ মার্চ, ২০১২

(খ) ৪ মার্চ, ২০১৬

i) *দৈনিক কর্ণফুলী*, চট্টগ্রাম :

(ক) ২৭ নভেম্বর, ১৯৯৬

(খ) ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭

(গ) ২৭ মে, ১৯৯৭

(ঘ) ৩ এপ্রিল, ১৯৯৮

(ঙ) ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯

(চ) ২৫ মার্চ, ১৯৯৯

i) *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা : ২০ নভেম্বর, ১৯৯৬

ii) *দৈনিক পূর্বদেশ*, চট্টগ্রাম : ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৫

iii) *দৈনিক ঈশান*, চট্টগ্রাম : ৩ এপ্রিল, ১৯৯৮

iv) *দৈনিক মিল্লাত*, ঢাকা : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮২

v) *দৈনিক সাঙ্গু*, চট্টগ্রাম : ২২ এপ্রিল, ২০১৬, ৫বর্ষ, সংখ্যা ২৯৫

vi) *দৈনিক গণমুক্তি*, চট্টগ্রাম : ২৭ এপ্রিল, ২০০১, ২৯বর্ষ, সংখ্যা ১০২

পরিশিষ্ট

শাহ্সূফী মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলাধীন বড়হাতিয়ার মিয়াজী পাড়ায়
মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর আপন নিবাস

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত
প্রথম বায়তুশ শরফ জামে মসজিদ কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল (অনার্স-মাস্টার্স) মাদ্‌রাসা, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমী (স্কুল এন্ড কলেজ), কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

খাগড়াছড়ি বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া হেফজখানা, আরামবাগ, খাগড়াছড়ি

বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে 'বাংলাদেশে ইসলাম' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রফেসর ড. মনজুর-ই-খুদা, মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.), প্রফেসর ড. মঈনুদ্দিন আহমদ খান ও প্রফেসর ড. আবদুল করিম

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে সংবর্ধিত গুণীজন : কবি আবদুল হালিম খাঁ, মওলানা মহিউদ্দিন খান, ড. শমসের আলী ও এডভোকেট আমিরুল কবীর চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

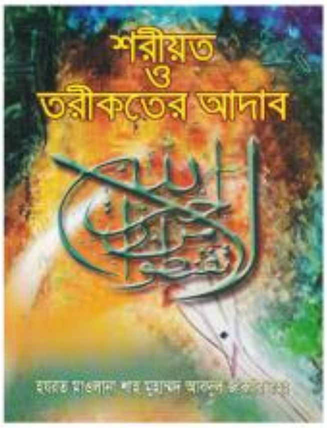

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) লিখিত প্রথম গ্রন্থ

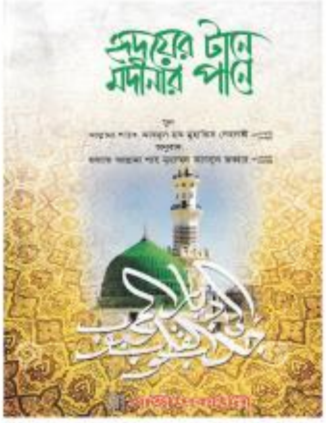

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থ

মাসিক দ্বীন দুনিয়া, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

ইসলামী বিশ্বকোষে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) জীবনী

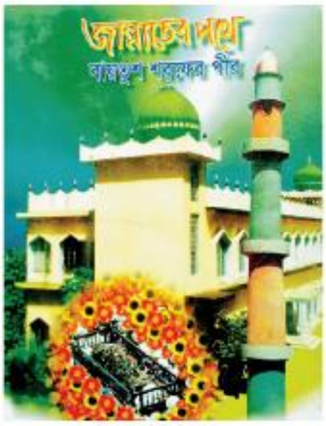

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ইন্তিকালের পর প্রথম প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ

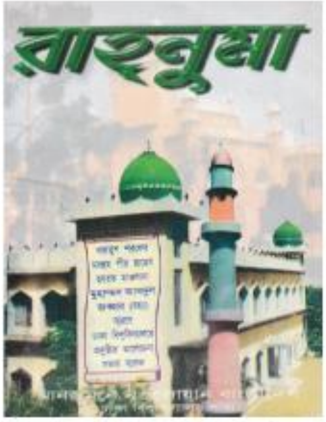

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার স্মারকগ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর হস্তলিপি।

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ব্যবহৃত জুব্বা ও টুপি

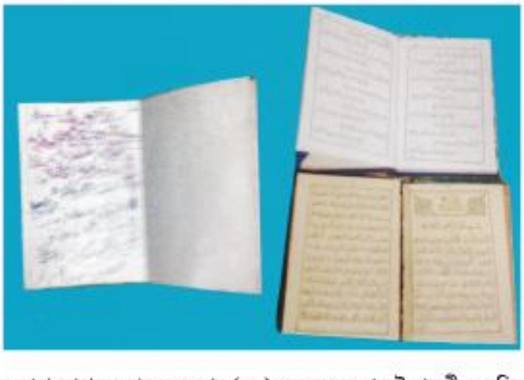

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর ব্যবহৃত পকেট ডায়েরী ও অজিফা

Dhaka University Institutional Repository

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 'মুসলিম নারী শিক্ষা উন্নয়ন' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)

আবুধাবী ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ
সাউথ আফ্রিকার আহমদ দিদাতের সাথে মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)

SYED ALI AHSAN
National Professor, Bangladesh
Officer de L' order des Arts et des Letters:France
60/1, North Dhanmondi, Dhaka, Bangladesh
Tel : Res 9116689

হযরত শেখ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার
পীর ছাহেব, বায়তুশ শরফ
বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম-৪১০০।

শ্রদ্ধেয় হযরত,

আমার আন্তরিক সালাম গ্রহণ করবেন। দীর্ঘদিন আপনার সাথে সাক্ষাত হয়নি সেজন্য আমি খুব ব্যাকুল রয়েছি। আমি আপনার খাদেম ঈশা শাহেদীকে খবর দিয়ে রেখেছিলাম আপনি ঢাকায় এলেই যেন আমাকে জানায়। কিন্তু সে জানাতে পারেনি। আমি এ মাসের ২৯ তারিখে চট্টগ্রামে আসব। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার একটি বক্তৃতা আছে। আমি ২রা অক্টোবর ঢাকায় ফিরব। আমি ১লা অক্টোবর কোন এক সময় আপনার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা রাখি। চট্টগ্রামে পৌঁছেই আমি আপনাকে খবর দেব।

আমি আপনার 'দ্বীন-দুনিয়া' পত্রিকাটি নিয়মিতভাবে পাই এবং বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করি। পত্রিকাটি আল্লাহর পথের মানুষদের জন্য একটি পথ প্রদর্শক।

আপনি পুনরায় আমার সালাম গ্রহণ করুন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আরজ ইতি-

(সৈয়দ আলী আহসান)
০২/০৯/১৯৯৬

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান কর্তৃক
মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর কাছে প্রেরিত পত্র

Dhaka University Institutional Repository

কক্সবাজার বায়তুশ শরফ (চক্ষু-পঙ্গু) হাসপাতাল, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার

বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া এতিমখানা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কক্সবাজার

১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বন্যা দুর্গতের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছেন
মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.) ও তাঁর ভক্ত-অনুরক্তরা

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমাজকল্যাণ ফেডারেশন
ও
চট্টগ্রাম সমাজ কল্যাণ পরিষদ

প্রশংসা পত্র

সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২৫ অক্টোবর, ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে
চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমাজকল্যাণ ফেডারেশন ও চট্টগ্রাম সমাজ কল্যাণ পরিষদ
কর্তৃক মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-কে সনদপত্র ও স্বর্ণপদকে ভূষিত

চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক পলোগ্রাউন্ড ময়দানে শাহ্‌সূফী মওলানা
মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর জানাযার একাংশ

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (রহ.)-এর কবর। বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম।